বাঙ্গালীর ইতিহাস
আদি পর্ব

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

দ্বিতীয় খণ্ড



ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়।
৬/১ এ. ধীরেন ধর সরণী। কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৯

প্রকাশক
ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

বিষয়-সূচী

(দ্বিতীয় খণ্ড)

*

সংস্কৃতি

একাদশ অধ্যায় ঃ দৈনন্দিন জীবন ৫৬১—৬০৪ পৃষ্ঠা

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণা ৬০৫—৭১৮ পৃষ্ঠা

ত্রয়োদশ অধ্যায় : ভাষা-সাহিত্য ; জ্ঞান-বিজ্ঞান : শিক্ষা-দীক্ষা

৭১৯—৮০২ পৃষ্ঠা

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ শিল্পকলা ৮০৩—৮৭৩ পৃষ্ঠা

শেষ কথা

পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ ইতিহাসের ইঙ্গিত ৮৭৪—৯১২ পৃষ্ঠা

একাদশ অধ্যায়

দৈনন্দিন জীবন

১

যুক্তি

দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন, আমাদের প্রতিদিনের অশন-বসন, বিলাস-ব্যসন, চলন-বলন, আমোদ-উৎসব, খেলাধূলা প্রভৃতি যে আমাদের মনন ও কল্পনা, অভ্যাস ও সংস্কারকে ব্যক্ত করে, অর্থাৎ এ-গুলি যে আমাদের মানস-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে, এ-সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন নয়। কোনো দেশকালবদ্ধ নরনারীর মনন-কল্পনা ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি শুধু ধর্মকর্ম-শিল্পকলা-জ্ঞানবিজ্ঞানেই আবদ্ধ নয় এবং ইহাদের মধ্যে শেষও নয়। জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ও ব্যবহারে, শীলাচরণ ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনচর্যার মধ্যেও তাহা ব্যক্ত হয়। চর্চা যেমন সংস্কৃতির লক্ষণ, চর্যা বা আচরণও তাহাই; বরং এক হিসাবে চর্যা বা আচরণই চর্চাকে সার্থকতা দান করে, এবং উভয়ে মিলিয়া সংস্কৃতি গড়িয়া তোলে। চর্যার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। জীবনের এমন কোনো দিক বা ক্ষেত্র নাই যেখানে মানুষ মনন-কল্পনা বা ধ্যান-ধারণালব্ধ গভীর সত্য ও সৌন্দর্যকে জীবনের আচরণে ফুটাইয়া তুলিতে না পারে। দৈনন্দিন জীবনাচরণের ভিতর দিয়া এই সত্য ও সৌন্দর্যকে প্রকাশ করাই তো সংস্কৃতির মৌলিক বিকাশ। দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক দিকটায় এই আচরণ যতটুকু প্রকাশ পায় তাহার সবটুকুই সেই হেতু মানুষের মানস-সংস্কৃতিরই পরিচয়, এবং বোধ হয় তাহার মৌলিক পরিচয়ও বটে।

প্রাচীন বাঙলার মানস-সংস্কৃতির কথা বলিতে বসিয়া সেইজন্য দৈনন্দিন জীবন-চর্যার কথাই সর্বাগ্রে বলিতেছি। কিন্তু, এই দৈনন্দিন জীবনের চলমান জীবন্তরূপ ফুটাইয়া তুলিবার উপায় তথ্যগত ইতিহাস-রচনায় নাই। সেই চলমান মানবপ্রবাহের জীবন্তরূপ সমসাময়িক কোনো সাহিত্যে কেহ ধরিয়া রাখেন নাই; অন্তত তেমন উপাদান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। তবু, তথ্যগত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া আধুনিক সাহিত্য-রচয়িতারা সেদিকে কিছু কিছু সার্থক চেষ্টা করিয়াছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস শশাঙ্ক ও ধর্মপাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বেণের মেয়ে সে-চেষ্টার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু ঔপন্যাসিকের যে সুবিধা ঐতিহাসিকের তাহা নাই। কাজেই সে-চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। আমি এই অধ্যায়ে দৈনন্দিন জীবনচর্যার যে-সব দিক ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সংবাদ বর্তমান শুধু সেই সব দিক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণামাত্র করিতেছি। কালক্রমানুযায়ী সবিস্তারে বলিবার মত যথেষ্ট উপাদান আমাদের নাই; আহার-বিহার, বসন-ভূষণ, খেলাধূলা, আমোদ-উৎসব প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন তথ্য শুধু বর্তমান। বিশেষ ভাবে এ-সব সংবাদ বহন করিবার জন্য

কোনো গ্রন্থ সমসাময়িক কালে কেহ রচনা করেন নাই ; অন্তত এ-যাবৎ আমরা জানি না। এমন কাব্য বা কাহিনীও কিছু নাই যেখানে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুসংবদ্ধ এবং সমগ্র পরিচয় কিছু পাওয়া যায়। স্পষ্টতই, যে-সব তথ্য আমরা পাইতেছি তাহা সমস্তই প্রায় পরোক্ষ, অর্থাৎ অন্য প্রসঙ্গের আশ্রয়ে যতটুকু উল্লিখিত ততটুকুই।

উপাদান

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি, আমাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক দৈনন্দিন জীবনের মূল অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী আদি কৌমসমাজের মধ্যে। সেই হেতু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাচীনতম আভাস এই দুই ভাষার এমন সব শব্দের মধ্যে পাওয়া যাইবে যে-সব শব্দ ও শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তু আজও আমাদের মধ্যে কোনো না কোনো রূপে বর্তমান। এই ধরনের কিছু কিছু শব্দের আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে। আমাদের আহার-বিহার, বসন ভূষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত এই সুদীর্ঘ শব্দেতিহাসের মধ্যে পাওয়া যাইবে। এই হিসাবে এই শব্দগুলিই আমাদের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উপাদান এবং নির্ভরযোগ্য উপাদানও বটে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন-সাহিত্যেও কিছু পরোক্ষ উপাদান পাওয়া যায়, কিন্তু দুই একটি বিষয়ে ছাড়া এই সব উপাদান কতটা বাঙলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র জাতীয় গ্রন্থেও কিছু কিছু সংবাদ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ; শেষোক্ত গ্রন্থটির সংবাদ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর, বিশেষ ভাবে বিলাস-ব্যসন ও কামচর্চা সম্বন্ধে, এবং বাঙলার নাগর-সভ্যতার প্রথম নির্ভরযোগ্য জীবনতথ্য এই গ্রন্থেই জানা যায়। এই দুইটি গ্রন্থ ছাড়া গুপ্তপূর্ব ও গুপ্ত-পর্বের বাঙলার দৈনন্দিন জীবনের কোনো খবর আর কোথাও দেখিতেছি না।

গুপ্ত-পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত অসংখ্য লিপিমালায় আমাদের আহার্য ও পরিধেয়, বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরে সাংসারিক জীবনের মান, সাংসারিক আদর্শ সম্বন্ধে টুক্‌রা-টাক্‌রো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংবাদ একেবারে দুর্লভ নয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় সমসাময়িক প্রস্তর ও ধাতব দেবদেবীর মূর্তি-গুলিতে এবং পোড়ামাটির অসংখ্য ফলকে, বিশেষভাবে শেষোক্ত উপাদান সমূহে। দেব-দেবীর মূর্তিগুলি প্রায় সমস্তই প্রতিমা-লক্ষণ শাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত ; সেইহেতু দেবদেবীদের বেশভূষা, অলংকরণ, দেহসজ্জা প্রভৃতিতে জীবনের যে-চিত্র দৃষ্টিগোচর তাহা কতকটা আদর্শগত, ভাবমূলক ও প্রথাবদ্ধ মনন-কল্পনা দ্বারা রঞ্জিত ও প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু পাহাড়পুরের অথবা ময়নামতীর বিহার-মন্দির-গাত্রের অগণিত পোড়ামাটির ফলকগুলি সম্বন্ধে এ-কথা বলা চলে না। এই ফলকগুলিতে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা তাহার অকৃত্রিম সারল্য ও বস্তুময়তায় প্রতিফলিত ; যে-সব দিক সম্বন্ধে অন্যত্র

কোনো সংবাদই প্রায় পাওয়া যায় না, লোকায়ত জীবনের সে-সবদিকের নানা ছোট বড় তথ্য একমাত্র ইহাদের মধ্যেই দীপ্যমান। গ্রাম্য কৃষিজীবী সমাজের জীবনযাত্রার এমন সুস্পষ্ট ছবি আর কোথাও পাইবার উপায় নাই।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের কিছু কিছু খবর বাঙলার সুদীর্ঘ লিপিমালায়ও পাওয়া যায়। আহার-বিহার, বসন-ভূষণ এবং গ্রাম্য ও নগর-জীবন সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন তথ্য ইহাদের মধ্য হইতে আহরণ করা হয়তো কঠিন নয়, কিন্তু সে-সব তথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা কবি-কল্পনায়, নানা আলংকারিক অত্যুক্তিতে আচ্ছন্ন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো বহু অভ্যস্ত এবং সুপরিচিত রীতি-পালন মাত্র, হয়তো যথার্থ বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ শিথিল, অথবা একেবারেই নাই। বসন-ভূষণ এবং সাধারণ সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে কিছুটা তথ্য অসংখ্য প্রস্তর ও ধাতব প্রতিমা-প্রমাণ হইতেও আহরণ করা সম্ভব, কিন্তু সে-সব তথ্য দৈনন্দিন ব্যবহারিক সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে কতটা প্রযোজ্য নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন।

সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং বিস্তৃত খবর পাওয়া যায় সমসাময়িক সংস্কৃত ও প্রাকৃত অপভ্রংশ সাহিত্যে। বাঙলার সুবিস্তৃত স্মৃতি-সাহিত্য, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, চর্যাগীতি-মালা, দোহাকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত-ধৃত কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন শ্লোক, প্রাকৃতপৈঙ্গলের কিছু কিছু শ্লোক, রামচরিত ও পবনদূতের মতন কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থে সমসাময়িক বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের নানা তথ্য নানা উপলক্ষে ধরা পড়িয়াছে। কোনো সুসংবদ্ধ নিয়মিত বিবরণ কিছু নাই, কোনো বিশেষ দিক সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ চিত্রও নাই ; তবু এই সব গ্রন্থের ইতস্তত উল্লিখিত তথ্যাদি একত্র করিলে মোটামুটি একটা ছবি ধরিতে পারা হয়তো খুব কঠিন নয়। সদ্যোক্ত সমস্ত গ্রন্থেরই দেশকাল মোটামুটি সুনির্ধারিত, অর্থাৎ ইহাদের অধিকাংশই বাঙলাদেশে, এবং দশম হইতে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে রচিত। শ্রীহর্ষের নৈষধ-চরিতে দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার বাঙালীত্ব সর্বজনগ্রাহ্য নয়। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এই গ্রন্থ নয়, তবে নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার বাঙালীত্বের যে-সব যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে নৈষধচরিতের বিবরণ বাঙলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। বিবাহ ও আহার-বিহার সম্বন্ধে কিছু কিছু রীতি-নিয়ম, কোনো কোনো তথ্য যেন বাঙলা দেশ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। ভারতের অন্যত্র এ-সবের প্রচলন থাকিলেও শ্রীহর্ষ যে-ভাবে বর্ণনা দিতেছেন তাহাতে তো মনে হয়, তিনি বাঙালী হউন বা না হউন, এমন দেশখণ্ডের কথাই তিনি বলিতেছেন যেখানে এই সব রীতি, আচার, অভ্যাস ও সংস্কারের বহুল প্রচার বিদ্যমান, এবং সেই দেশখণ্ড হইতেছে বাঙলাদেশ।

অন্যান্য অধ্যায়ের মত এ-অধ্যায়ে কালপর্বানুযায়ী তথ্য সন্নিবেশ করিয়া ধারাবাহিক

একটা বর্ণনা দাঁড় করানো কঠিন; তথ্যই অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন এবং তাহার অধিকাংশই দশম শতকপরবর্তী কালের; কিছু কিছু অবশ্য পূর্ববর্তী কালেরও, সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ববর্তী বা পরবর্তীই হোক, এই অধ্যায়ের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র মোটা-মুটিভাবে প্রাচীন বাঙলা সম্বন্ধে প্রযোজ্য, একথা বলিলে অন্যায় বলা হয় না। সুদীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া গ্রাম্য জীবনযাত্রার তেমন পরিবর্তন কিছু হইয়াছিল, এমন মনে হয় না।

২

মধ্যযুগীয় সুবিস্তৃত বাঙলা সাহিত্যে বাঙালীর আহার্য ও পানীয় সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় এবং তাহার মধ্যে রুচি ও রসনার যে সূক্ষ্ম বোধ সুস্পষ্ট, রন্ধনকলার যে সূক্ষ্ম ও জটিল পরিচয় বিদ্যমান, আদিপর্বের সংক্ষিপ্ত উপাদানের মধ্যে কোথাও সে-পরিচয় ধরা পড়ে নাই। এ-পর্বে জীবনের এই দিকটায় বাঙালীর বুদ্ধি ও কল্পনা প্রসারিত হয় নাই, প্রমাণের অভাবে সে-কথা জোর করিয়া বলা যায় না, তবে সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুপস্থিত, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। সমস্ত সংবাদই পরোক্ষ এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

আহার-বিহার

ইতিহাসের উষাকাল হইতেই ধান্য যে-দেশের প্রথম ও প্রধান উৎপন্ন বস্তু, সে-দেশে প্রধান খাদ্যই হইবে ভাত তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। ভাত-ভক্ষণের এই অভ্যাস ও সংস্কার অস্ট্রিক্ ভাষাভাষী আদি-আস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান। উচ্চকোটির লোক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম কোটির লোক পর্যন্ত সকলেরই প্রধান ভোজ্যবস্তু ভাত, এবং 'হাঁড়িত ভাত নাহি, নিতি আবেশী', ইহাই বাঙালী জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ। ভাত রাঁধার প্রক্রিয়ার তারতম্য তো ছিলই, কিন্তু তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ নাই বলিলেই চলে। উচ্চকোটির বিবাহভোজে যে-অন্ন পরিবেশন করা হইত সে-অন্নের কিছু বিবরণ নৈষধচরিতে দময়ন্তীর বিবাহভোজের বর্ণনায় পাওয়া যায়। গরম ধূমায়িত ভাত ঘৃত সহযোগে ভক্ষণ করাটাই ছিল বোধ হয় সাধারণ রীতি। প্রাকৃত-পৈঙ্গল-গ্রন্থেও (চতুর্দশ শতকের শেষাশেষি ?) প্রাকৃত বাঙালীর আহার্য দেখিতেছি কলাপাতায়, 'ওগ্গরা ভত্তা গাইক ঘিত্তা,' গো ঘৃত সহকারে সফেন গরম ভাত। নৈষধ-চরিতের বর্ণনা বিস্তৃততর: পরিবেশিত অন্ন হইতে ধূম উঠিতেছে, তাহার প্রত্যেকটি কণা অভগ্ন, একটি হইতে আর একটি বিচ্ছিন্ন (ঝরঝরে ভাত), সে-অন্ন সুসিদ্ধ, সুস্বাদু ও শুভ্রবর্ণ, সরু এবং সৌরভময় (১৬।৬৮)। দুগ্ধ ও অম্লপক্ক পায়সও উচ্চকোটির লোকদের এবং সামাজিক ভোজে অন্যতম প্রিয় ভক্ষ্য ছিল (১৬।৭০)।

প্রাকৃত বাঙালীর খাদ্য

ভাত সাধারণত খাওয়া হইত শাক ও অন্যান্য ব্যঞ্জন সহযোগে। দরিদ্র এবং গ্রাম্য লোকদের প্রধান উপাদানই ছিল বোধ হয় শাক ও অন্যান্য সব্জী তরকারী। ডাল খাওয়ার কোনো উল্লেখই কিন্তু কোথাও দেখিতেছি না। উৎপন্ন দ্রব্যাদির সুদীর্ঘ তালিকায়ও ডালের বা কোনো কলাইর উল্লেখ কোথাও যেন নাই। নানা শাকের মধ্যে নালিতা (পাট) শাকের উল্লেখ প্রাকৃত পৈঙ্গলে দেখিতেছি। বস্তুত, এই গ্রন্থের *প্রাকৃত বাঙালীর খাদ্য-তালিকাটি উল্লেখযোগ্য :*

ওগ্‌গরা ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সজুত্তা
মোইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা দিজ্জই কান্তা খা (ই) পুনবন্তা।

বিবাহভোজ

কলাপাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল এবং নালিতা শাক যে-স্ত্রী নিত্য পরিবেশন করিতে পারেন তাঁহার স্বামী পুণ্যবান, এ-সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি! কিন্তু সামাজিক ভোজে, বিশেষত বিবাহভোজে বরযাত্রীরা শাকসব্জীর তরকারী পছন্দ করিতেন না। দময়ন্তীর বিবাহভোজে সবুজবর্ণ পাত্রে ভাত-তরকারী পরিবেশন করা হইয়াছিল; বরযাত্রীরা মনে করিলেন বুঝি বা শাকান্ন পরিবেশন করা হইয়াছে; একটু বিরক্তির ভাবই প্রকাশ করিলেন দেখিয়া কন্যাপক্ষীয়েরা বলিলেন, আপনাদের শাক পরিবেশন করা হয় নাই, পাত্রটির বর্ণ সবুজ বলিয়াই অন্নব্যঞ্জন সবুজ দেখাইতেছে। এই বিবাহভোজে যে-সব ব্যঞ্জন পরিবেশন করা হইয়াছিল তাহাতে দেখা যাইতেছে, ব্যঞ্জন তরকারী প্রভৃতির বাহুল্য সেই যুগেও উচ্চকোটির বাঙালী সমাজে যথেষ্টই ছিল, এবং এত বেশি আয়োজন হইত যে, লোকেরা সব খাইয়া, এমন কি গণনাও করিয়া উঠিতে পারিত না। এই ধরনের বৃহৎ ভোজে সামাজিক অপচয়ের কথা ই-ৎসিঙ্‌ও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কবি শ্রীহর্ষের কালে এবং আজও দেখিতেছি, বাঙলা দেশে তাহা অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। যে-সব ব্যঞ্জনাদি এই বিবাহভোজে পরিবেশিত হইয়াছিল তাহা তালিকাগত করা যাইতে পারে : দই ও রাই সরিষার প্রস্তুত শ্বেতবর্ণ কিন্তু বেশ ঝালযুক্ত কোনো ব্যঞ্জন (খাইতে খাইতে লোকদের মাথা ঝাঁকিতে এবং তালু চাপড়াইতে হইয়াছিল); হরিণ, ছাগ এবং পক্ষী মাংসের নানা রকমের ব্যঞ্জন; মাংসের নয় কিন্তু দৃশ্যত মাংসোপম, বিবিধ উপাদানযুক্ত কোনো ব্যঞ্জন; মাছের ব্যঞ্জন এবং অন্যান্য আরো নানা প্রকারের সুগন্ধি ও প্রচুর মসলাযুক্ত ব্যঞ্জনাদি, নানা প্রকারের সুমিষ্ট পিষ্টক এবং দই ইত্যাদি। পানীয় পরিবেশিত হইয়াছিল কর্পূরমিশ্রিত সুগন্ধি জল। ভোজের পর দেওয়া হইয়াছিল নানা মসলাযুক্ত পানের খিলি। অবান্তর হইলেও একটি অনুমানগত তথ্যের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে। সমস্ত প্রশান্ত

মহাসাগরীয় দেশগুলিতে এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-ভারতে পান পরিবেশনের রীতি হইতেছে পান, সুপারী এবং অন্যান্য মসলা পৃথক পৃথক ভাবে সাজাইয়া দেওয়া। পূজা-পার্বণেও তাহাই প্রচলিত রীতি; আদিবাসী কৌমসমাজের রীতিও তাহাই। পান খিলি করিয়া পরিবেশন করা বোধ হয় পরবর্তী আর্য ভারতীয় রীতি এবং উচ্চকোটি লোকস্তরে ক্রমশ সেই রীতিই প্রবর্তিত হয়। বৌদ্ধ গান ও দোহায় দেখিতেছি পানের সঙ্গে মসলা হিসাবে কর্পূর ব্যবহার করা হইত।

দই, পায়স, ক্ষীর প্রভৃতি দুগ্ধজাত নানাপ্রকারের খাদ্যের উল্লেখ একাধিক ক্ষেত্রে পাইতেছি। এ-গুলি চিরকালই বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। ভবদেব-ভট্টের প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ-গ্রন্থে নানাপ্রকারের দুগ্ধপান সম্বন্ধে কিছু কিছু বিধিনিষেধ আছে, কিন্তু তাহা সমস্তই স্বাস্থ্যগত কারণে।

মৎস্য ও মাংস আহার

মাংসের মধ্যে হরিণের মাংস খুবই প্রিয় ছিল, বিশেষ ভাবে শবর পুলিন্দ প্রভৃতি শীকারজীবী লোকদের মধ্যে এবং সমাজের অভিজাত স্তরে। ছাগ মাংসও বহুল প্রচলিত ছিল সমাজের সকল স্তরেই। কোনো কোনো প্রান্তে ও লোকস্তরে, বিশেষভাবে আদিবাসী কোমে বোধ হয় শুকনো মাংস খাওয়াও প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভবদেব-ভট্ট কোনো কারণেই এবং কোনো অবস্থাতেই শুকনো মাংস খাওয়া অনুমোদন করেন নাই, বরং নিষিদ্ধই বলিয়াছেন। কিন্তু মাছই হোক আর মাংসই হোক্, অথবা নিরামিষই হোক্, বাঙ্গালীর রান্নার প্রক্রিয়া যে ছিল জটিল এবং নানা উপাদানবহুল তাহা নৈষধ-চরিতের ভোজের বিবরণেই সুস্পষ্ট।

বারিবহুল, নদনদী-খালবিল বহুল, প্রশান্ত-সভ্যতাপ্রভাবিত এবং আদি-অস্ট্রেলীয়মূল বাঙলায় মৎস্য অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তু রূপে পরিগণিত হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, পূর্বদক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিদের আহার্য তালিকার দিকে তাকাইলেই বুঝা যায়, বাঙলাদেশ এই হিসাবে কোন্ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সর্বত্রই এই তালিকায় ভাত ও মাছই প্রধান খাদ্যবস্তু। বাংলাদেশের এই মৎস্যপ্রীতি আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতি কোনোদিনই প্রীতির চক্ষে দেখিত না, আজও দেখে না: অবজ্ঞার দৃষ্টিটাই বরং সুস্পষ্ট। মাংসের প্রতিও বাঙ্গালীর বিরাগ কোনোদিনই ছিল না, কিন্তু আর্য ব্রাহ্মণ্য ভারতে ছিল; বিশেষভাবে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক হইতেই খাদ্যের জন্য প্রাণীহত্যার প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্মে (বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে তো বটেই) একটা নৈতিক আপত্তি ক্রমশ দানা বাঁধিতেছিল এবং আর্য-ব্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষ ক্রমশ নিরামিষ আহার্যের প্রতিই পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছিল। বাংলাদেশেও এই আপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু, চিরাচরিত এবং বহু অভ্যস্ত প্রথার

বিরুদ্ধে তাহা যথেষ্ট কার্যকরী হইতে পারে নাই ! বাংলার অন্যতম প্রথম ও প্রধান স্মৃতিকার ভট্ট ভবদেব সুদীর্ঘ যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিয়া বাঙালীর এই অভ্যাস সমর্থন করিয়াছেন। মনু যাজ্ঞবল্ক্য-ব্যাস ছাগলেয় প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিকারদের মতামত উদ্ধার করিয়া ভবদেব বলিতেছেন, ইঁহাদের নিষেধবাক্য তো শুধু চতুর্দশী তিথি বা এই ধরনের বিশেষ বিশেষ বার বা তিথি উপলক্ষে' প্রযোজ্য, কাজেই মাছ বা মাংস খাওয়ায় কোনো দোষ স্পর্শে না। বস্তুত, মাংস ও মৎস্য আহার বাঙলাদেশে এত সুপ্রচলিত ও গভীরাভ্যস্ত যে, এই সমর্থন ছাড়া ভবদেবের আর কোনো উপায় ছিল না। বাংলার অন্যতম স্মৃতিকার শ্রীনাথাচার্যও তাহাই করিয়াছেন; বিষ্ণুপুরাণ হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কয়েকটি পর্বদিবস ছাড়া আর কোনো দিনেই মৎস্য বা মাংস আহার গর্হিত কাজ কিছু নয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে রোহিত, শফর (পুঁটি বা শফরী মাছ) সকুল (সোল) এবং শ্বেতবর্ণ ও আঁশযুক্ত অন্যান্য মৎস্য ব্রাহ্মণদের ভক্ষ্য। প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল বা চর্বির তালিকা দিতে গিয়া জীমূতবাহন ইল্লিস (ইলিস বা ইল্‌সা) মাছের তৈলের উল্লেখ ও বহুল ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন। মনে হয়, আজিকার দিনের মত প্রাচীনকালেও ইলিস মাছ বাঙালীর অন্যতম প্রিয় খাদ্য ছিল এবং ইলিশের তৈল নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত। সব মাছ কিন্তু ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য ছিল না; যে-সব মাছ গর্তে কাদায় বাস করে, যাহাদের মুখ ও মাথা সাপের মত (যেমন, বাণ মাছ), বদাকৃতি যাহাদের চেহারা, যাহাদের আঁস নাই সে-সব মাছ ব্রাহ্মণের পক্ষে খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পচা ও শুকনো মাছ খাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু টীকাসর্বস্ব-গ্রন্থের লেখক সর্বানন্দ বলিতেছেন, বঙ্গালদেশের লোকেরা সিহুলী বা শুকনো মাছ খাইতে ভালবাসিত (যত্র বঙ্গালবচ্চারণাং প্রীতিঃ)। এখনও তো তাহাই। শামুক, কাঁকড়া, মোরগ, সারস, বক হাঁস, দাত্যুহ পক্ষী, উট, গরু, শূকর প্রভৃতির মাংস একেবারেই ছিল অভক্ষ্য, অন্তত ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাসিত সমাজে। তবে, সন্দেহ নাই, নিম্নতর সমাজস্তরে এবং আদিবাসী কোমের লোকদের মধ্যে আজিকার মতই শামুক, কাঁকড়া, মোরগ প্রভৃতির মাংস, নানাপ্রকারের আঁস ছাড়া মাছ, সর্পাকৃতি বাণ মাছ, গর্তকাদাবাসী নানাপ্রকারের অকুলীন মৎস্য, নানাপ্রকারের পক্ষীমাংস সমস্তই ভক্ষ্য ছিল। পঞ্চনখ প্রাণীদের মধ্যে গোধা, শশক, সজারু এবং কচ্ছপ খাওয়ার খুব বাধানিষেধ কাহারো পক্ষে কিছু ছিল না, এ-কথা ভবদেব নিজেই বলিতেছেন তাঁহার প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ-গ্রন্থে। বাঙালীর মৎস্যপ্রীতির পরিচয় পাহাড়পুর এবং ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলিতে কিছু কিছু পাওয়া যায়। মাছ কোটা এবং ঝুড়িতে ভরিয়া মাছ হাটে লইয়া যাওয়ার দু'টি অতি বাস্তবচিত্র কয়েকটি ফলকেই উৎকীর্ণ। (শবর) পুরুষ হরিণ শীকার করিয়া কাঁধে ফেলিয়া বাড়ী লইয়া যাইতেছে, সে-চিত্রও বিদ্যমান। শবর, পুলিন্দ, নিষাদ জাতীয় ব্যাধদের প্রধান বৃত্তিই তো ছিল হরিণ ও অন্যান্য পশুপক্ষী

শীকার। হরিণ-শীকারের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে একাধিক চর্যাগীতে। একটি গীতে চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত ভীত সন্ত্রস্ত হরিণের যে বর্ণনা আছে অবান্তর হইলেও তাহা উদ্ধারের লোভ সংবরণ করা কঠিন।

তেন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলয় ন জাণী ॥
হরিণী বোলঅ সুন হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো ॥
তরংগতে হরিণার খুর ন দাসই।
ভুসুকু ভণই মূঢ় হি‌অহি ন পইসই ॥

(ভয়ে) হরিণ তৃণ ছোয় না, জল খায় না; হরিণ জানে না হরিণীর ঠিকানা। হরিণী (আসিয়া) বলে, শোন হরিণ, এ-বন ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইয়া (চলিয়া) যাও। তীরগতিতে ধাবমান হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলেন, মূঢ়ের হৃদয়ে একথা প্রবেশ করে না।

জালের সাহায্যেও হরিণ ধরা হইত, এই ধরনের ইঙ্গিত আছে ভুসুকুরই আর একটি গীতিতে। তরঙ্গসংকুল মাঝনদীতে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিবার ইঙ্গিতও আছে একটি চর্যাগীতে। কাহ্নুপাদ বলিতেছেন,

তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।
মাঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ ॥
পঞ্চতথাগত কিঅ কেড়ুয়াল।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মায়াজাল ॥

তরকারী

যে-সব উদ্ভিদ্ তরকারী আজও আমরা ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই, যেমন, বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিঙে, কাঁকরুল, কচু (কন্দ) প্রভৃতি আদি-অস্ট্রেলীয় অস্ট্রিক্ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দান। এ-সব তরকারী বাঙালী খুব সুপ্রাচীন কাল হইতেই ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে এই অনুমান অনৈতিহাসিক নয়। পরবর্তী কালে, বিশেষভাবে মধ্যযুগে, পর্তুগীজদের চেষ্টায় এবং অন্যান্য নানাসূত্রে নানা তরকারী, যেমন, আলু, আমাদের খাদ্যের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আদিপর্বে তাহাদের অস্তিত্ব ছিল না। নানাপ্রকারের শাক খাওয়ার অভ্যাসও বাঙালীর সুপ্রাচীন।

ফল

ফলের মধ্যে কলা, তাল, আম, কাঁঠাল, নারিকেল ও ইক্ষুর উল্লেখই পাইতেছি বারবার। আম ও কাঁঠালের উল্লেখ তো লিপিমালায় সুপ্রচুর। কলা আদি-অস্ট্রেলীয় অস্ট্রিক্ ভাষাভাষী লোকদের দান; প্রাচীন বাঙলার চিত্রে ও ভাস্কর্যে ফলভারাবনত কলাগাছের বাস্তব চিত্র সুপ্রচুর। পূজা, বিবাহ, মঙ্গলযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কলাগাছের ব্যবহার সমসাময়িক সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইক্ষুর রস আজিকার মত তখনও পানীয় হিসাবে সমাদৃত ছিল; ইক্ষু রস জ্বাল দিয়া একপ্রকার গুড় (এবং বোধ হয় শর্করাখণ্ড জাতীয় একপ্রকার 'খণ্ড' চিনিও) প্রস্তুত হইত। হেমন্তে নূতন গুড়ের গন্ধে আমোদিত বাঙলার গ্রামের বর্ণনা সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে দীপ্যমান। অন্যত্র এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছি। তেঁতুলের উল্লেখ আছে চর্যাগীতিতে।

কালবিবেক ও কৃত্যতত্ত্বার্ণব-গ্রন্থে আশ্বিন মাসে কোজাগর পূর্ণিমা রাত্রে আত্মীয় বান্ধবদের চিপিটক বা চিঁড়া এবং নারিকেলের প্রস্তুত নানাপ্রকারের সন্দেশে পরিতৃপ্ত করিতে হইত, এবং সমস্ত রাত বিনিদ্র কাটিত পাশা খেলায়। খৈ-মুড়ি (লাজ) খাওয়ার রীতিও বোধ হয় তখন হইতেই প্রচলিত ছিল; খৈ বা লাজ যে অজ্ঞাত ছিল না তাহার প্রমাণ বিবাহোৎসবে সুপ্রচুর খৈ বর্ষণের বর্ণনায় লাজহোমের অনুষ্ঠানে।

পানীয় মদ্যপান

দুধ, নারিকেলের জল, ইক্ষুরস, তালরস ছাড়া মদ্য জাতীয় নানাপ্রকারের পানীয় প্রাচীন বাঙলায় সুপ্রচলিত ছিল। গুড় হইতে প্রস্তুত সর্বপ্রকার গৌড়ীয় মদ্যের খ্যাতি ছিল সর্বভারতব্যাপী। ভাত, গম, গুড়, মধু, ইক্ষু ও তালরস প্রভৃতি গাঁজাইয়া নানা-প্রকারের মদ্য প্রস্তুত হইত। ভবদেব-ভট্ট তাঁহার প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ-গ্রন্থে নানাপ্রকার মদ্য-পানীয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজ ও দ্বিজেতর সকলের পক্ষেই মদ্যপান নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাঁহার এই স্মৃতি-নির্দেশ কতটা মানিয়া চলিত, বলা কঠিন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেখিতেছি, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কালে স্বর্ণ, মদ্য, রক্ত, মৎস্য ও মাংস উপাচারে এবং নরবলি সহকারে ব্রাহ্মণের পক্ষে শিব-পূজা নিষিদ্ধ। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, শিবপূজা পক্ষে এই নিষেধ প্রযোজ্য হইলেও শক্তিপূজায় এই সব উপাচার ও নরবলি নিষিদ্ধ ছিলনা, আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ কাল ছাড়া অন্য সময়ে কোনো পূজায়ই তেমন নিষেধ ছিল না। চর্যাগীতির একাধিক গীতিতে যে-ভাবে শৌণ্ডিকালয় বা শুঁড়িখানার উল্লেখ পাইতেছি, মনে হয়, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ভিতর মদ্যপান খুব গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত না। শৌণ্ডিকালয়ে বসিয়া শৌণ্ডিক বা শুঁড়ির স্ত্রী মদ্য বিক্রয় করিতেন,এবং ক্রেতারা সেইখানে বসিয়াই তাহা পান করিতেন। শুঁড়িখানার দরজায় বোধ হয় একটা কিছু চিহ্ন আঁকা থাকিত, এবং মদ্যাভিলাষীরা

সেই চিহ্ন দেখিয়াই গন্তব্য স্থানটি চিনিয়া লইতেন ! এক জাতীয় গাছের সরু বাকল (অন্যমতে, শিকড়) শুকাইয়া গুড়া করিয়া তাহা দ্বারা মদ চোলাই করা হইত। বেলের খোলা করিয়া মদ্য পানের উল্লেখ আছে সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে ; চর্যাগীতিতে দেখিতেছি, মদ্য ঢালা হইত ঘড়ায় ঘড়ায়। বিরুবাপাদ বলিতেছেন,

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅন বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ।
* * *
দশমী দুআরত চিহ্ন দেখিয়া।
আইল গরাহক অপণে বহিআ॥
চউশটি ঘড়িয়ে দেল পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা॥
এক সে ঘড়লী সরুই নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল॥

এক শুঁড়িনী দুই ঘরে সান্ধে (ঢোকে), সে চিকণ বাকল দ্বারা বারুণী (মদ) বাঁধে। শুঁড়ির ঘরের চিহ্ন (আছে) দুয়ারেই ; সেই চিহ্ন দেখিয়া গ্রাহক নিজেই চলিয়া আসে। চৌষট্টি ঘড়ায় মদ ঢালা হইয়াছে, গ্রাহক যে ঘরে ঢুকিল তাহার আর সাড়াশব্দ কিছু নাই (মদের নেশায় এমনই বিভোর)! সরু নালে একটি ঘড়ায় মদ ঢালা হইতেছে—বিরুপা সাবধান করিতেছেন, সরু নল দিয়া চাল স্থির করিয়া বারুণী ঢাল।

প্রাচীন বাঙালী কি ডাল খাইত না ?

আগেই বলিয়াছি, প্রাচীন বাঙালীর খাদ্য তালিকায় ডালের উল্লেখ কোথাও দেখিতেছি না। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। বাঙলা, আসাম ও ওড়িষায় যত ডাল আজও ব্যবহৃত হয়—এ-ব্যবহার ক্রমশ বাড়িতেছে সমাজের সকল স্তরেই—তাহার খুব স্বল্পাংশই এই তিন প্রদেশে জন্মায়। পূর্বেও তাহাই ছিল ; বোধ হয় উৎপাদন আরও কম ছিল। পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার, প্রশান্ত মহাসাগরের দেশ ও দ্বীপগুলিতে আজও ডালের ব্যবহার অত্যন্ত কম, নাই বলিলেই চলে। সেই জন্য ডালের চাষও নাই। বাঙলা দেশের কোনো কোনো জেলায়, যেমন বরিশালে ও ফরিদপুরে, উচ্চকোটি লোকস্তরে বহুক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জ ও আমিষ ব্যঞ্জনাদি খাওয়ার পর সর্বশেষে ডাল খাওয়ার রীতি প্রচলিত। আর, নিম্নকোটি স্তরে বাঙলার সর্বত্রই আজও অনেকে ডাল ব্যবহারই করেন না ; প্রাচীন কালে বোধ হয় একেবারেই করিতেন না। আর, সুলভ মৎস্যভোজীর পক্ষে তাহার প্রয়োজনও ছিল কম। বস্তুত, ডালের চাষ ও ডাল খাওয়ার রীতিটা বোধ হয় আর্য-ভারতের দান, এবং তাহা মধ্যযুগে।

এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, সুপ্রাচীন কাল হইতেই মৎস্যভোজী বাঙালীর আহার্য অবাঙালীদের রুচি ও রসনায় খুব শ্রদ্ধেয় ও প্রীতিকর ছিল না ; আজও নয়। তীর্থংকর মহাবীর যখন ধর্মপ্রচারোদ্দেশে শিষ্যদল লইয়া পথহীন রাঢ় ও বজ্রভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন তাঁহাদের অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া দিন কাটাইতে হইয়াছিল। সন্দেহ নাই যে, সেই আদিবাসী কৌম-সমাজের মৎস্য ও শীকার মাংস ভক্ষণ, সমসাময়িক সাধারণ বাঙালীর উদ্ভিজ্জ ব্যঞ্জনাদি, এবং তাহাদের আদিম রন্ধন প্রণালী ভিন্ প্রদেশী জৈন আচার্যদের নিরামিষ রুচি ও রসনায় অশ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিল। সেই অশ্রদ্ধা আজও বিদ্যমান!

শীকার ও অন্যান্য শারীর-ক্রিয়া গৃহক্রীড়া

রাজা-মহারাজ-সামন্ত-মহাসামন্ত প্রভৃতিদের প্রধান বিহারই ছিল শীকার বা মৃগয়া। আর, অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি অরণ্যচারী কোমদের শীকারই ছিল প্রধান উপজীব্য ও বিহার দুইই। ইঁহাদের কিছু কিছু শীকার-চিত্র পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ফলকগুলিতে দেখা যায়। এই ফলকগুলিতেই দেখিতেছি, কুস্তী বা মল্লযুদ্ধ এবং নানাপ্রকারের দুঃসাধ্য শারীর ক্রিয়া ছিল নিম্নকোটির লোকদের অন্যতম বিহার। পবনদূতে নারীদের জলক্রীড়া এবং উদ্যানরচনার উল্লেখ আছে ; এই দুইটিই বোধ হয় ছিল তাঁহাদের প্রধান শারীর-ক্রিয়া। দ্যূত বা পাশাখেলা এবং দাবা খেলার প্রচলন ছিল খুব বেশি। পাশা খেলা তো বিবাহোৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হইত। দাবা খেলার প্রচলন যে বাঙলাদেশে কবে হইয়াছিল, বলা কঠিন ; তবে চর্যাগীতিতে 'ঠাকুর' (অর্থাৎ 'রাজা'), 'মন্ত্রী', গজবর', এবং 'বড়ে', এই চারিটি গুটি, খেলার 'দান' এবং ছকের চৌষট্টি কোঠার বা ঘরের উল্লেখ এমন সহজভাবে পাইতেছি যে মনে হয়, দশম-একাদশ শতকের আগেই এই খেলা বাঙলাদেশে সুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। কাহ্নপাদ বলিতেছেন,

> করুণা পিহাড়ি খেলহু নঅবলা
> সদ্গুরু-বোহেঁ জিতেল ভববল ॥
> ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর ।
> উআরি লএসে' কাহ্ন নিঅড় জিনউর ॥
> পহিলে' তোড়িয়া বড়ি আ মারিউ ॥
> গঅবরে' তোড়িআ পাঞ্চজনা ঘালিউ ।
> মতিএ' ঠাকুরক পরিনিবিত্তা
> অবশ করিআ ভববল জিতা ॥
> ভণই কাহ্নু অম্হে ভাল দান দেহু' ।
> চউষট্‌ঠি কোঠা গুনিয়া লেহু ।

করুণার পিঁড়িতে নববল (দাবা) খেলি, সদ্গুরুবোধে ভববল জিতিলাম। দুই নষ্ট হইল, ঠাকুরকে (রাজাকে) দিওনা ; উপকারীর উপদেশে কাহ্নর নিকটে জিনপুর। প্রথমে বড়িয়া তুড়িয়া মারিলাম (অর্থাৎ, প্রথমেই হইল বড়ের চাল); তারপর গজবর (হাতী) তুলিয়া পাঁচজনকে ঘায়েল করিলাম। মন্ত্রীকে দিয়া ঠাকুরকে (রাজাকে) প্রতিনিবৃত্ত করিলাম (ঠেকাইলাম) ; অবশ করিয়া ভববল জিতিলাম। কাহ্নু বলে, দান আমি ভালই দিই, চৌষট্টি কোঠা গুনিয়া লই।

নিম্নকোটি স্তরে এবং নারীদের মধ্যে কড়ির সাহায্যে নানাপ্রকার খেলা, যথা, গুঁটি বা ঘুণ্টিখেলা, বাঘবন্দী, ষোলঘর, দশপঁচিশ, আড়াইঘর, প্রভৃতি তখন হইতেই সুপ্রচলিত ছিল, এমন অনুমানে কিছু মাত্র বাধা নাই। সাংস্কৃতিক জনতত্ত্বের অনুসন্ধানে বহুদিন ধরা পড়িয়াছে যে, এই সমস্ত খেলা সমগ্র পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরবদ্ধ দেশ ও দ্বীপগুলির সুপ্রাচীন কৌমসমাজের একেবারে মৌলিক গৃহক্রীড়া।

সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব-গ্রন্থ হইতে জানা যায়, 'অড্ড' বা 'আঢ', অর্থাৎ বাজি রাখিয়া তখনকার দিনের লোকেরা জুয়া খেলিতেও অভ্যস্ত ছিল। লোকেরা বাজি রাখিয়া ভেড়া ও মুরগীর লড়াই খেলিত ও খেলাইত।

সমতটেশ্বর শ্রীধারণ-রাতের কৈলান-লিপিতে বলা হইয়াছে, সতত হস্তী ও অশ্বক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকার ফলে শ্রীধারণের দেহ ছিল পেশীসমৃদ্ধ এবং সুদর্শন (গজতুরগ-সতত-পীড়ন-ক্রমোচিতশ্রম বলিততনুবিভাগ-রম্যদর্শন)। রাজ-পরিবারে এবং অভিজাতবর্গের পুরুষদের মধ্যে হস্তী ও অশ্বক্রীড়া সুপ্রচলিত ছিল, সন্দেহ নাই।

নৃত্যগীতবাদ্য ও অভিনয়

নৃত্যগীত বাদ্যের প্রচলন ও প্রসার সম্বন্ধে প্রমাণ সুপ্রচুর। রামচরিত, পবনদূত প্রভৃতি কাব্যে, নানা লিপিতে, সদুক্তিকর্ণামৃতের প্রকীর্ণ শ্লোকে, চর্যাগীতি ও দোঁহা-কোষের নানা জায়গায় নানাসূত্রে নৃত্যগীতবাদ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, উচ্চ ও নিম্নকোটি উভয় স্তরেই এই দুই বিদ্যা ও ব্যসনের সমাদর ছিল যথেষ্ট। বাররামা ও দেবদাসীদের সকলকেই নৃত্যগীতবাদ্যপটীয়সী হইতে হইত। তাঁহারা যে নানা কলানিপুণা ছিলেন, এ-কথার ইঙ্গিত সেন-লিপিতে এবং পবনদূতেও আছে। রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থে দেখিতেছি, পুণ্ড্রবর্ধনের কার্তিকেয় মন্দিরে যে নৃত্যগীত হইত তাহা ভারতের নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী, এবং নৃত্যগীতমুগ্ধ জয়ন্ত স্বয়ং ভরতানুমোদিত নৃত্যগীত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলিতে এবং অসংখ্য ধাতব ও প্রস্তরমূর্তিতে নানা ভঙ্গিতে নৃত্যপর পুরুষ ও নারীর প্রতিকৃতি সুপ্রচুর। বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত উভয় পুরাণেই নট পৃথক বর্ণহিসাবেই উল্লিখিত হইয়াছেন, সমাজের নিম্নতর স্তরে। এখনও বাঙালী সমাজের নিম্নস্তরে এক ধরনের

গায়কগায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়, গান গাহিয়া এবং নাচিয়াই যাঁহারা জীবিকা নির্বাহ করেন; ইঁহারাই বোধ হয় উপরোক্ত পুরাণ দুইটির নটবর্ণ। কিন্তু উচ্চ-কোটির কেহ কেহও বোধ হয় নটনটীর বৃত্তি গ্রহণ করিতেন। জয়দেব-গৃহিণী পদ্মাবতী প্রাক্‌বিবাহ-জীবনে কুশলী নটী ছিলেন এবং সঙ্গীতে তাঁহার খুব প্রসিদ্ধি ছিল। পাহাড়-পুর ও ময়নামতীর ফলকগুলিতে, কোনো কোনো প্রস্তরচিত্রে, নানা প্রকারের বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, যেমন, কাঁশর, করতাল, ঢাক, বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, মৃৎভাণ্ড প্রভৃতি। রামচরিতে দেখিতেছি, বরেন্দ্রীতে বিশেষ এক ধরনের মুরজ (মৃদঙ্গ) বাদ্য প্রচলিত ছিল; বাঙলার অন্যত্র বোধ হয় অন্য প্রকারের মুরজের প্রচলন ছিল। সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকে আছে তুম্বীবীণার উল্লেখ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ বিবরণ পাইতেছি চর্যাগীতিতে—কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত উভয়েরই, নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের এবং বোধ হয় গীতাভিনয়েরও। নিম্নশ্রেণীর নটনটীদের কথা আগেই বলিয়াছি। চর্যাগীতিতে দেখিতেছি, ডোম্বীরা সাধারণত খুব নৃত্যগীতপরায়ণা হইতেন।

এক সো পদ্ম চৌষঠী পাখুড়ী।
তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।

একটি পদ্ম, তাহার চৌষট্টি পাপড়ী; তাহাতে চড়িয়া নাচে ডোম্বী।

লাউ-এর খোলা আর বাঁশের ডাঁট বা দণ্ডে তন্ত্রী (তার) লাগাইয়া বীণা জাতীয় এক প্রকার যন্ত্র ইঁহারা প্রস্তুত করিতেন, আর গান গাহিয়া গাহিয়া গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অনহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তিধ্বনি বিলসই রুণা॥
* * *
নাচন্তি বাজিল গাঅন্তি দেবী
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই॥

সূর্য লাউ-এ শশী লাগিল তন্ত্রী, অনাহত দণ্ড—সব এক করিয়া অবধূতী। ওলো সখি, হেরুক-বীণা বাজিতেছে; শোন্, তন্ত্রীধ্বনি কি সকরুণ বাজিতেছে! * * * বজ্রাচার্য নাচিতেছে, দেবী গাহিতেছে—এই ভাবে বুদ্ধনাটক সুসম্পন্ন হয়।

বুদ্ধ-নাটকের উল্লেখ লক্ষ্য করিবার মতন। নৃত্য এবং গীতের সাহায্যে এক ধরনের নাট্যাভিনয় বোধ হয় প্রাচীন বাঙলায় সুপ্রচলিত ছিল, এবং এই নাচ-গানের ভিতর দিয়াই

বোধ হয় কোনো বিশেষ ঘটনাকে (এই ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনীকে ?) রূপদান করা হইত।

অবান্তর হইলেও এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা চলে, নৃত্যগীতপরায়ণা ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ডোম্বী ও অন্যান্য তথাকথিত নীচ জাতীয়া রমণীদের সামাজিক নীতিবন্ধন কিছুটা চঞ্চল ও শিথিল হইত, এবং সেই হেতু তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে উচ্চকোটির পুরুষদেরও মনোহরণে সমর্থ হইতেন। তাহা ছাড়া জাতি ও শ্রেণীসংস্কারমুক্ত সহজযানী ও কাপালিকদের যোগের সঙ্গিনী হইতেও কোনো বাধা তাঁহাদের বা যোগীদের কাহারও হইত না।

কইসণি হালো ডোম্বী তোহেরি ভাভরী আলী।
অন্তে কুলিণজন মাঝে কাবালী।
*   *   *
কেহো কেহো তোহেরে বিরুআ বোলই।
বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলই॥
কাহ্নে গায় তু কামচণ্ডালী।
ডোম্বীত আগলি নাহি চ্ছিনালী॥

হাঁলো ডোম্বী, কিরূপ (আশ্চর্য) তোর চাতুরী! তোর (এক) অন্তে কুলীন জন, (আর) মধ্যে কাপালী! কেহ কেহ তোকে বলে বিরূপ (তাহাদের প্রতি), (কিন্তু) বিদ্বজ্জন তোকে কণ্ঠ হইতে ছাড়ে না। কাহ্ন গায়, তুই কামচণ্ডালী, ডোম্বীর চেয়ে বেশি ছিনালী (আর) কেহ নাই।

লোকায়ত সমাজে এবং সামাজিক ও ধর্মগত উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে, নানা ক্রিয়াকর্মে নৃত্যগীতের প্রমাণ সমসাময়িক শিল্প-সাহিত্যে সুস্পষ্ট। চর্যাগীতির একটি গীতে সমসাময়িক বিবাহযাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর বর্ণনা আছে এবং সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি বাদ্য যন্ত্রেরও উল্লেখ আছে। কাহ্নপাদ বলিতেছেন,

ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা।
মনপবন বেণি করণ্ডকশালা॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম
জউতুকে কিঅ আণতু ধাম॥

ভব ও নির্বাণ হইল পটহ মাদল; মনপবন দুই করণ্ডক শালা। জয় জয় দুন্দুভি শব্দ উচ্ছলিত করিয়া কাহ্ন চলিল ডোম্বীকে বিবাহ করিতে। ডোম্বীকে

বিবাহ করিয়া জন্ম খাইলাম, কিন্তু যৌতুকে (লাভ) করিলাম অনুত্তরধাম (অর্থাৎ, নীচু জাতের ডোম্বীকে বিবাহ করিয়া জাত্ কুল গেল বটে, কিন্তু ভাল যৌতুক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই ক্ষতি যেন সব পূরণ হইয়া গিয়াছে, এই ভাবে)।

তখনকার দিনেও বাঙলাদেশে বিবাহ ব্যাপারে বরপক্ষ যৌতুক লাভ করিত, এবং যৌতুকের লোভে নীচকুল হইতে কন্যাগ্রহণেও খুব আপত্তি ছিল না, অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটিও এই গীতে বিদ্যমান।

যানবাহন। নৌযান

সাধারণ লোকেরা স্থলপথে পদব্রজে এবং জলপথে ভেলা বা ডিঙ্গা এবং নৌকাযোগেই যাতায়াত করিত। ভেলা, ডিঙ্গা-ডিঙ্গী-ডোঙ্গা, প্রত্যেকটি শব্দই অস্ট্রিক্ ভাষার দান, এবং মনে হয়, আদিমতম কাল হইতেই ইহাদের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। নৌকার ব্যবহার, নৌ-বন্দর, নৌ-ঘাট, নৌবাণিজ্য, নৌদণ্ডক প্রভৃতির কথা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে আগেই বলিয়াছি ; কিন্তু নৌকার সঙ্গে বাঙালী জীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগের কথা ধরা পড়িয়াছে চর্যাগীতিতে। রূপকছলে নৌকা, নৌকার হাল, গুণ, কেড়ুয়াল, পুলিন্দা, খোল, চক্র বা চাকা, খুঁটি, বাছি, সেঁউতি, পাল প্রভৃতি এমন সহজ-ভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে যে, মনে হয়, এই যানটির সঙ্গে বাঙালীর হৃদয়ের একটি গভীর যোগ ছিল। নৌকায় খেয়া-পারাপারের ইঙ্গিতও আছে। পারের মাশুল আদায় হইত কড়িতে (কবড়ী) বা বোড়িতে। খেয়া-পারাপারের কাজ অনেক সময় নিম্নশ্রেণীর নারীরাও করিতেন। চর্যাগীতির একটি গীতিতে দেখিতেছি পাটনীর কাজটি করিতেছেন জনৈকা ডোম্বী।

গঙ্গা জউনা মাঝেরে বহই নাই।
তাহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করেই ॥
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্‌গুরু পাঅপত্র জাইব পুনু জিন উরা ॥
পাঞ্চ কেড়ু আল পড়ন্তে মাঙ্গে পিঠত কচ্ছী বান্ধী।
গঅণ খোলেঁ সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধী ॥
*   *   *
কবড়ী ন লেই বাড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করই।
জো রথে চড়িলা বাহবা ন জাই কুলে কুলে বুলই ॥

গঙ্গা আর যমুনার মাঝে বহিতেছে নৌকা ; মাতঙ্গ কন্যা ডোম্বী তাহাতে জলে

ডুবিয়া ডুবিয়া লীলায় পার করিতেছে। বাহ গো ডোম্বী, বাহিয়া চল, পথেই দেরি হইয়া যাইতেছে; সদ্‌গুরু পাদপদ্মে যাইব জিনপুর। পাঁচটি দাঁড় পড়িতেছে পথে, পিঠে কাছি বাঁধ, সেঁউতিতে জল সেচ, জল যেন সন্ধিতে প্রবেশ না করিতে পারে। * * * কড়িও লয় না, বুড়িও লয় না, স্বেচ্ছায় করে পার; যাহারা রথে চড়িল, নৌকা বাওয়া জানিল না, তাহারা শুধু কূলে কূলে ঘুরিয়া ফিরিল।

সরহপাদের একটি গীতে আছে,

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেড়ুআল।
সদ্‌গুরু-বঅণে ধর পতিবাল॥
চীঅ থির করি ধরহুরে নাই।
আন উপায়ে পার ণ জাই॥
নৌবাহী নৌকা টানঅ গুণে।
মেলি মেল সহজে জাউ ণ আণেং॥
বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ।
ভব উলোলেং সব বি বোলিআ॥
কুল লই খর সে উজাঅং।
সরহ ভণই গঅণেং সমাঅ॥

কায় (হইতেছে) নৌকা, খাঁটি মন (হইল তাহার) দাঁড়; সদ্‌গুরু বচনে হাল ধর। চিত্ত স্থির করিয়া নৌকা ধর; অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যায় না। নৌবাহী নৌকা টানে গুণে; সহজে গিয়া মিলিত হও, অন্য (পথে) যাইও না। পথে (আছে) ভয়, বলবান দস্যু; ভব উল্লোলে (তরঙ্গে) সবই টলমল। কূল ধরিয়া খরস্রোতে উজাইয়া যায়; সরহ বলে, গগনে গিয়া প্রবেশ করে।

অন্যত্র কম্বলপাদ বলিতেছেন,

খুণ্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি॥
মাঙ্গত চড়্‌হিলে চউদিস চাহঅ।
কেড়ুআল নাহি কেঁকি বাহবকে পারঅ॥

খুঁটি (গোঁজ) উপড়াইয়া কাছি খুলিয়া দাও; হে কামলি (পূর্ব-বাঙলায় মাঝি প্রভৃতি দিন-মজুরদের আজও বলে কামলা বা কামলা) সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া

নৌকা বাহিয়া চল। পথ চড়িয়া (মাছনদীতে আসিয়া) চারিদিকে চাহিয়া দেখ,
দাঁড় না থাকিলে কে বাহিতে পারে।

নদ-নদী-খাল-বিলের বাঙলাদেশে নৌকা ও নদীকে কেন্দ্র করিয়া অধ্যাত্ম-জীবনের রূপ-রূপক গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়।

ভবনই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী ॥

ভবনদী গভীর, গম্ভীর বেগে বহিয়া চলে; দুইতীরে কাদা, মাঝে ঠাঁই নাই।

এ-ছবি তো একান্তই বাঙলার নদনদীগুলির : দুই তীর পলিমাটির কাদায় ভরা। আর, নদীর গভীর গম্ভীর বেগ, সেও তো গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা-লৌহিত্যেরই। সরহপাদের একটি গীতে আছে,

বাম দহিন জো খাল-বিখলা।
সরহ ভণই বাপা উজুবাট ভইলা ॥

(পথে) বামে দক্ষিণে অনেক খাল-বিখাল; সরহ বলেন, সোজা পথ ধরিয়া চল
(অর্থাৎ, খাল-বিখালের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িও না, সোজা চলিয়া যাও)।

এই ছবিও তো একান্তই বাংলাদেশের। এত খাল-বিখালই বা আর কোথায়! শান্তিপাদের একটি গীতে আছে,

কুলে কুলে মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল ভিণ একুবাকু ণ ভুলহ রাজপথ কন্ধারা ॥
মাআ মোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥
সুনাপান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।
এস আট মহাসিদ্ধি সিঝই উজুবাট জাঅন্তে ॥
বামদ হিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট ণ গুমা খড়তড়ি ণ হোই আখি বুঝিঅ বাট জাইউ ॥

হে মূঢ়, কূলে কূলে ঘুরিয়া ফিরিও না; সংসারের (মাঝখানে রহিয়াছে) সহজ পথ। সম্মুখে পড়িয়া আছে যে সমুদ্র, তাহার অন্ত যদি না বুঝা যায়, থই যদি না পাওয়া যায়, সম্মুখে যদি কোনো নৌকা বা ভেলা দেখা না যায়, তবে অভিজ্ঞ পথিক যাঁহারা তাঁহাদের নিকট হইতে পথের দিশা জানিয়া লও। শূন্য প্রান্তরে যদি পথের ঠিকানা না মেলে, তবু ভ্রান্তির পথে আগাইয়া যাওয়া উচিত নয়। সোজা সহজ পথ ধরিয়া গেলেই মিলিবে অষ্টমহাসিদ্ধি। খেলা করিতে করিতে বাম ও দক্ষিণ পথ ছাড়িয়া (মাঝপথে) চলিতে হইবে। এই সহজপথে ঘাট ঝোপ কিছু নাই, বাধাবিঘ্ন কিছু নাই; চোখ বুজিয়া এই পথে চলা যায়।

গো-যান। হস্তী ও অশ্বযান

স্থলপথে গ্রাম হইতে দূরে গ্রামান্তরে বা নগরে যাইবার লোকায়ত যান ছিল গো-রথ বা গরুর গাড়ী। মহিষের গাড়ীর উল্লেখ দেখিতেছি না; কিন্তু নৈষধচরিতের সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, বাঙালী প্রাচীন কালে মহিষের দধি ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে দেখিতেছি, প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্রের রাজাদের চতুরশ্ববাহিত রথ ছিল। অশ্ববাহিত যান উচ্চকোটির লোকেরা ব্যবহার করিতেন, সন্দেহ করিবার কারণ নাই। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলিতেছেন, যুদ্ধে গঙ্গা-রাষ্ট্রের সৈন্যবলের মধ্যে প্রধান বলই ছিল হস্তীবল। অসংখ্য লিপিতেও হস্তীসৈন্যের উল্লেখ সুপ্রচুর। সুপ্রাচীন কাল হইতেই পূর্বভারতের হস্তী অন্যতম প্রধান বাহন বলিয়াও গণ্য হইত। এই পূর্ব-ভারতেই, বিশেষভাবে বাঙলাদেশে ও কামরূপে, হাতী ধরা ও হাতীর চিকিৎসা ইত্যাদি সম্বন্ধে একটি বিশেষ শাস্ত্রই গড়িয়া উঠিয়াছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তো বলেন, হস্তী-আয়ুর্বেদ বাঙলার অন্যতম প্রধান গৌরব। রাজ-রাজড়া, সামন্ত-মহাসামন্তরা, বড় বড় ভূম্যধিকারীরা হাতীতে চড়িয়াও যাতায়াত করিতেন, সন্দেহ নাই। চর্যাগীতি ও দোহাকোষে হাতির রূপক আশ্রয়ে অনেকগুলি গীত স্থান পাইয়াছে, এবং রূপকগুলি এমন, মনে হয়, এই প্রাণীটির সঙ্গে বাঙালীর প্রাণের গভীর পরিচয় ছিল। খেদা পাতিয়া আজিকার দিনে যেমন করিয়া হাতী ধরা হয় তখনও তেমন করিয়াই হাতী এবং হাতীশিশু (করভ) ধরা হইত। বন্য হাতী সুদৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত। চর্যাগীতিতে কাহ্নুপাদের একটি গীত আছে,

> এবং কার দৃঢ় বাখোড় মোড়িউ।
> বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ।
> কাহ্ন বিলসঅ আসব মাতা।
> সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ॥

কিন্তু বন্যহাতী কোনো বাধা বন্ধনই মানিত না, সমস্ত শিকল ছিঁড়িয়া খুঁটি ভাঙ্গিয়া পদ্মবনে গিয়া প্রবেশ করিত। পাগলা হাতীর বর্ণনা মহীধরপাদের একটি গানেও আছে।

> মাতেল চীঅ গএন্দা ধাবই।
> নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই ॥
> পাপ পুন্ন বেণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠানা।
> গঅন টাকলি লাগিয়ে চিত্ত পইতি নিবানা ॥

আমার মত্ত চিত্তগজেন্দ্র ধাবিত হইতেছে; নিরন্তর গগনে সকল কিছু ঘোলাইয়া যাইতেছে। পাপ ও পুণ্য উভয়েই শিকল ছিঁড়িয়া এবং সকল খাম্ভা মাড়াইয়া গগন-শিখরে গিয়া পৌঁছিয়া একেবারে শান্ত হইয়াছে।

উত্তর ও পূর্ব-বাঙলার পার্বত্য নদীর তীরে হাতীরা ঘুরিয়া বেড়াইত যথেচ্ছ ভাবে। সরহপাদ বলিতেছেন,

মুক্কউ চিত্তগজেন্দ করু এথ বিঅপ্প ণ পুচ্ছ।
গঅন গিরী ণইজল পিঅউ তিহু তড় বসউ সইচ্ছ॥

চিত্ত গজেন্দ্রকে মুক্ত কর; এ বিষয়ে আর কোনো বিকল্প জিজ্ঞাসা করিও না।
গগন গিরির নদী জল সে পান করুক, তাহার তটে স্বেচ্ছায় সে বাস করুক।

হাতী ধরিবার আগে সারিগান গাহিয়া হাতীর মনকে বশ করিতে হইত। বীণাপাদের একটি গানে আছে,

আলি কালি বেঁণ সারি মুনিআ।
গঅবর সমরস সান্ধি গুণি আ॥

গরুর গাড়ীর চেহারা এখনও যেরূপ প্রাচীনকালেও তাহাই ছিল; বাঙলা ও ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন প্রস্তর ও মৃৎফলকই তাহার প্রমাণ। বরযাত্রায়ও গরুর গাড়ী ব্যবহার করা হইত, চর্যাগীতির একটি গীতে এইরূপ ইঙ্গিত আছে। পাহাড়পুরের একটি মৃৎফলকে সুসজ্জিত অশ্বের একটি চিত্র আছে; এই ধরনের সজ্জিত অশ্বে চড়িয়াই সঙ্গতিসম্পন্ন লোকেরা যাতায়াত করিতেন।

পাল্কীর ব্যবহারও ছিল বলিয়াই মনে হয়। কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপিতে দেখিতেছি, একটু প্রচ্ছন্ন ভাবে হস্তীদন্তনির্মিত বাহদণ্ডযুক্ত পাল্কীর উল্লেখ। বল্লালসেন নাকি তাঁহার শত্রুদের রাজলক্ষ্মীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, এই ধরনের পাল্কী চড়াইয়া।

রামচরিত ও পবনদূতে রামাবতী ও বিজয়পুরের বর্ণনা এবং বাণগড়, রামপাল, মহাস্থান, দেওপাড়া প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে মনে হয়, সমৃদ্ধ নগরবাসীরা ইটকাঠের তৈরি ক্ষুদ্র বৃহৎ হর্মে বাস করিতেন; রাজপ্রাসাদও তৈরি হইত ইটকাঠেই। কিন্তু এই সব ভবনের আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। গ্রামে ইটকাঠের বাড়ী বড় একটা ছিল বলিয়া মনে হয় না; কোনো গ্রামবর্ণনাতেই সেরূপ কোনো উল্লেখ দেখিতেছি না। দরিদ্র নিম্নকোটির লোকেরা ত বটেই, এমন কি সম্পন্ন মহত্তর-কুটুম্ব-গৃহস্থরাও সাধারণত মাটি, খড়, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদির তৈরি বাড়ীতে বাস করিতেন; মৃৎফলকের সাক্ষ্যে মনে হয়, চাল হইত খড়ের, বাঁশের চাঁচারি বুনিয়া তৈরি হইত বেড়া, আর খুঁটি হইত বাঁশের বা কাঠের। চর্যাগীতিতে বাঁশের চাঁচারী দিয়া বেড়া বাঁধিবার কথা আছে (চারিপাশে ছাইলারে দিআ চঞ্চালী)। মাটির দেয়ালও ছিল; রাঢ়াঞ্চলে ও উত্তর-বঙ্গে মাটির দেয়াল, পূর্বাঞ্চলে চাঁচারীর বেড়া। প্রস্তর ও মৃৎফলকের চিত্র এবং পাণ্ডুলিপি-চিত্র হইতে মনে হয়, আজিকার মতন তখনও বাঁশের বা কাঠের খুঁটির উপর ধনুকাকৃতি বা দুই তিন স্তরে পিরামিডা-

কৃতির চাল বা ছাউনি তৈরি হইত। একান্ত গরীব গৃহস্থ ও সমাজ-শ্রমিকেরা কুঁড়েঘরে বাস করিতেন। সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের একটি শ্লোকে এই ধরনের কুঁড়েঘরের একটি বাস্তব বর্ণনা আছে। 'প্রচুর পয়সি' প্রাচ্য দেশে এবং বৃষ্টিবহুল বাঙলাদেশে দরিদ্র গৃহস্থের জীর্ণগৃহের দুর্দশার এমন বস্তুনির্ভর অথচ কাব্যময় বর্ণনা বিরল। কবি বার ছবি আঁকিয়াছেন,

চলৎ কাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণ সঞ্চয়ম।
গণ্ডূপদার্থিমণ্ডূকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম॥

কাঠের খুঁটি নড়িতেছে, মাটির দেয়াল গলিয়া পড়িতেছে, চালের খড় উড়িয়া যাইতেছে; কেঁচোর সন্ধানে নিরত ব্যাঙের দ্বারা আমার জীর্ণ গৃহ আকীর্ণ।

নদ-নদী-খাল-বিখালের বাঙলাদেশে এ-পাড়া হইতে ও-পাড়া যাইতে আজিকার মত তখনও সাঁকোর প্রয়োজন ছিলই; এই কারণেই বাঁশ কিংবা কাঠের সাঁকোর সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়ও ছিল প্রাচীন কাল হইতেই। চর্যাগীতির একটি গীতে বলা হইয়াছে, পারগামী লোক যাহাতে নির্ভয়ে পারাপার করিতে পারে সেজন্য চাটিলপাদ বেশ একটি দৃঢ় সাঁকো প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। বড় গাছ চিরিয়া সাঁকোর পাট জোড়া দেওয়া হইত এবং টাঙ্গি দ্বারা ইহা শক্ত করা হইত।

ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামী লোঅ নিভর তরই॥
ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ
অদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ॥

তৈজসপত্র

গৃহের আসবাবপত্রের মধ্যে নানা জিনিসের উল্লেখ চর্যাগীতি, রামচরিত, পবনদূত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে, এবং তাহাদের প্রতিকৃতি প্রস্তর ও মৃৎফলকে দেখিতেছি। সমৃদ্ধ, বিত্তবান্ লোকেরা সোনা ও রূপার তৈরি থালা-বাসন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু গ্রামবাসী সাধারণ গৃহস্থেরা কাঁসার এবং দরিদ্র লোকেরা সাধারণত মাটির ভোজন ও পানপাত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। বাংলার নানা প্রত্নস্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে অসংখ্য মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুক্‌রা প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৃৎফলকে এবং নানা প্রস্তরফলকে মাটির খেলনা, ফুলদানী, খাট, নানা আকৃতির কলস, বাটি, পান ও ভোজনপাত্র, মাটির জালা, লোটা, দোয়াত, দীপাধার, ঘড়া, জলচৌকী, পুস্তকাধার প্রভৃতির প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এ-সব তৈজসপত্রের বহুল প্রচলন ছিল, সন্দেহ নাই। নানা সুদৃশ্য মণ্ডনালংকারযুক্ত এবং স্বর্ণনির্মিত বিচিত্র আসবাবপত্রের কথা রামচরিতে উল্লিখিত আছে। এ-সব তৈজসপত্র সমৃদ্ধ লোকদের আয়ত্ত ছিল, সন্দেহ নাই।

তবকাত্-ই-নাসীরী-গ্রন্থে আছে, লক্ষ্মণসেনের রাজপ্রাসাদে সোনা ও রূপার ভোজনপাত্র ব্যবহৃত হইত। কেশবসেনের ইদিলপুর লিপিতে লোহার জলপাত্রের উল্লেখ আছে।

৩

বসন ভূষণ বিলাস-ব্যসন। কাশ্মীরে গৌড়ীয় বিদ্যার্থী

পূর্বের এক অধ্যায়ে দেশ-পরিচয় প্রসঙ্গে আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-প্রকৃতির কথা বলিয়াছি। এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিব না। শুধু কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার দশোপদেশ-গ্রন্থে কাশ্মীর-প্রবাসী গৌড়ীয় বিদ্যার্থীদের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি একটু সবিস্তারে। দশম-একাদশ শতকে প্রচুর গৌড়ীয় বিদ্যার্থী কাশ্মীরে যাইতেন বিদ্যালাভের জন্য। ক্ষেমেন্দ্র বলিতেছেন, ইঁহাদের প্রকৃতি ও ব্যবহার ছিল রূঢ় এবং অমার্জিত। ইঁহারা ছিলেন অত্যন্ত ছুঁৎমার্গী; ইঁহাদের দেহ ক্ষীণ, কঙ্কালমাত্র সার, এবং একটু ধাক্কা লাগিলেই ভাঙ্গিয়া পড়িবেন, এই আশংকায় সকলেই ইঁহাদের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। কিন্তু কিছুদিন প্রবাস-যাপনের পরই কাশ্মীরের জল-হাওয়ায় ইঁহারা বেশ মেদ ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেন। 'ওঙ্কার' ও 'স্বস্তি' উচ্চারণ যদিও ছিল ইঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কর্ম, তবু পাতঞ্জল ভাষ্য, তর্ক, মীমাংসা সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহাদের পড়া চাই (বোধ হয়, কাশ্মীরী মানদণ্ডে বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ যথেষ্ট শুদ্ধ ও মার্জিত ছিল না; ইহাই সম্ভবত ক্ষেমেন্দ্রের বক্রোক্তির কারণ)। ক্ষেমেন্দ্র আরও বলিতেছেন, গৌড়ীয় বিদ্যার্থীরা ধীরে ধীরে পথ চলেন এবং থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাদের দর্পিত মাথাটি এদিক্ সেদিক্ দোলান। হাঁটিবার সময় তাঁহার ময়ূরপঙ্খী জুতায় মচ্‌মচ্ শব্দ হয়। মাঝে মাঝে তিনি তাঁহার সুবেশ সুবিন্যস্ত চেহারাটার দিকে তাকাইয়া দেখেন। তাঁহার ক্ষীণ কটিতে লাল কটিবন্ধ। তাঁহার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিবার জন্য ভিক্ষুক এবং অন্যান্য পরাশ্রয়ী লোকেরা তাঁহার তোষামোদ করিয়া গান গায় ও ছড়া বাঁধে। কৃষ্ণ বর্ণ ও শ্বেতদন্তপংক্তিতে তাঁহাকে দেখায় যেন বানরটি। তাঁহার দুই কর্ণলতিকায় তিন তিনটি করিয়া স্বর্ণ কর্ণভূষণ, হাতে যষ্ঠি; দেখিয়া মনে হয় যেন সাক্ষাৎ কুবের। স্বল্পমাত্র অজুহাতেই তিনি রোষে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন; সাধারণ একটু কলহেই ক্ষিপ্ত হইয়া ছুরিকাঘাতে নিজের সহআবাসিকের পেট চিরিয়া দিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন না। গর্ব করিয়া তিনি নিজের পরিচয় দেন ঠক্কুর বা ঠাকুর বলিয়া এবং কম দাম দিয়া বেশি জিনিস দাবি করিয়া দোকানদারদের উত্যক্ত করেন।

বিদেশে বাঙালী বিদ্যার্থীর বসনভূষণ সম্বন্ধে আংশিক পরিচয় এই কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার বিস্তৃত পরিচয় লইতে হইলে বাংলাদেশের সমসাময়িক

সাহিত্য-গ্রন্থের এবং প্রত্নবস্তুর মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই সব সাক্ষ্য হইতে বসনভূষণের মোটামুটি একটা ছবি দাঁড় করানো কঠিন নয়।

বসন ও পরিধানভঙ্গি

গ্রন্থারম্ভে এক অধ্যায়ে বলিয়াছি, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সেলাই করা বস্ত্র পরিধানের রীতি আদিমকালে ছিল না; সেলাইবিহীন একবস্ত্র পরাটাই ছিল পুরারীতি। সেলাই করা জামা বা গাত্রাবরণ মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে পরবর্তী কালে আমদানী করা হইয়াছিল; কিন্তু অধোবাসের ক্ষেত্রে বাঙালী অথবা তামিল অথবা গুজরাতী-মারাঠীরা ধুতি পরিত্যাগ করিয়া ঢিলা বা চুড়িদার পাজামা গ্রহণ করেন নাই। পুরুষের অধোবাস যেমন ধুতি, মেয়েদের তেমনই শাড়ি। ধুতি ও শাড়িই ছিল প্রাচীন বাঙালীর সাধারণ পরিধেয়, তবে একটু সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের ভিতর ভদ্র বেশ ছিল উত্তরবাসরূপে আর এক খণ্ড সেলাইবিহীন বস্ত্রের ব্যবহার, যাহা ছিল পুরুষদের ক্ষেত্রে উত্তরীয়, নারীদের ক্ষেত্রে ওড়না। ওড়নাই প্রয়োজন মত অবগুণ্ঠনের কাজ করিত। দরিদ্র ও সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ নারীদের এক বস্ত্র পরাটাই ছিল রীতি, এবং সেই বস্ত্রাঞ্চল টানিয়াই হইত অবগুণ্ঠন।

আজকাল আমরা যেমন পায়ের কণ্ঠা পর্যন্ত ঝুলাইয়া কোঁচা দিয়া কাপড় পরি, প্রাচীন কালের বাঙালী তাহা করিতেন না। তখনকার ধুতি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনেক ছিল ছোট; হাঁটুর নিচে নামাইয়া কাপড় পরা ছিল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম; সাধারণত হাঁটুর উপর পর্যন্তই ছিল কাপড়ের প্রস্থ। ধুতির মাঝখানটা কোমরে জড়াইয়া দুই প্রান্ত টানিয়া পশ্চাদ্দিকে কচ্ছ বা কাছা। ঠিক নাভির নিচেই দুই তিন প্যাঁচের একটি কটিবন্ধের সাহায্যে কাপড়টি কোমরে আটকানো; কটিবন্ধের গাঁটটি ঠিক নাভির নিচেই দুল্যমান। কেহ কেহ ধুতির একটি প্রান্ত পেছনের দিকে টানিয়া কাছা দিতেন, অন্য প্রান্তটি ভাঁজ করিয়া সম্মুখ দিকে কোঁচার মত ঝুলাইয়া দিতেন। নারীদের শাড়ি পরিবার ধরনও প্রায় একই রকম, তবে শাড়ি ধুতির মত এত খাটো নয়, পায়ের কব্জি পর্যন্ত ঝুলানো, এবং বসনপ্রান্ত পশ্চাদ্দিকে টানিয়া কচ্ছে রূপান্তরিতও নয়। আজিকার দিনের বাঙালী নারীরা যেভাবে কোমরে এক বা একাধিক প্যাঁচ দিয়া অধোবাস রচনা করেন প্রাচীন পদ্ধতিও তদনুরূপ, তবে আজিকার মতন প্রাচীন বাঙালী নারী শাড়ির সাহায্যে উত্তরবাস রচনা করিয়া দেহ আবৃত করিতেন না; তাঁহাদের উত্তর-দেহাংশ অনাবৃত রাখাই ছিল সাধারণ নিয়ম। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বোধ হয় সঙ্গতিসম্পন্ন উচ্চকোটি স্তরে এবং নগরে—হয়তো কতকটা মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রেরণায়—কেহ কেহ উত্তরী বা ওড়নার সাহায্যে উত্তরার্ধের কিছু অংশ ঢাকিয়া রাখিতেন, বা স্তনযুগলকে রক্ষা

করিতেন চোলি বা স্তনপট্টের সাহায্যে। কেহ কেহ আবার উত্তরবাস রূপে সেলাই করা 'বডিস্' জাতীয় এক প্রকার জামার সাহায্যে স্তননিম্ন ও বাহু-ঊর্ধ্ব পর্যন্ত দেহাংশ ঢাকিয়া রাখিতেন। সন্দেহ নাই, এই জাতীয় উত্তরবাসের ব্যবহার নগর ও উচ্চকোটি স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। নারীর সদ্যোক্ত উত্তরবাস ও তাহার শাড়ি এবং পুরুষের ধুতি প্রভৃতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে—সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি চিত্রের সাক্ষ্যে এ-তথ্য সুস্পষ্ট—নানাপ্রকার লতাপাতা, ফুল এবং জ্যামিতিক নক্সাদ্বারা মুদ্রিত হইত। এই ধরনের নক্সা-মুদ্রিত বস্ত্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিচয় আরম্ভ হয় খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে, এবং সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র ও গুজরাত্ ছিল গোড়ার দিকে এই বস্ত্র-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। পরে ভারতবর্ষের অন্যত্রও ক্রমশ তাহা ছড়াইয়া পড়ে। এই নক্সা-মুদ্রিত বস্ত্রের ইতিহাসের মধ্যে ভারত-ইরাণ-মধ্য-এশিয়ার ঘনিষ্ঠ শিল্প ও অলংকরণগত সম্বন্ধের ইতিহাস লুক্কায়িত। কিন্তু সে কথা এ-ক্ষেত্রে অবান্তর। যাহাই হউক, নারীদের দেহের উত্তরার্ধ অনাবৃত রাখার ঐতিহ্য শুধু প্রাচীন বাঙলা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন নয়; বস্তুত সমগ্র প্রাচীন আদি অস্ট্রেলীয়-পলিনেশিয়-মেলানেশিয় নরগোষ্ঠীর মধ্যে ইহাই ছিল প্রচলিত নিয়ম। বলিদ্বীপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অন্যান্য কয়েকটি দ্বীপে সেই অভ্যাস ও ঐতিহ্যের অবশেষ এখনও বিদ্যমান।

সভা সমিতি এবং বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা ছিল। জীমূতবাহন দায়ভাগ-গ্রন্থে সভা-সমিতির জন্য পৃথক পোষাকের কথা বলিয়াছেন। নর্তকী নারীরা পরিতেন পায়ের কণ্ঠা পর্যন্ত বিলম্বিত আঁটসাঁট পা'জামা; দেহের উত্তরার্ধে কাঁধের উপর দিয়া ঝুলাইয়া দিতেন একটি দীর্ঘ ওড়না; নৃত্যের গতিতে ওড়নার প্রান্ত উড়িত লীলায়িত ভঙ্গিতে। সন্ন্যাসী-তপস্বীরা এবং একান্ত দরিদ্র সমাজ-শ্রমিকেরা পরিতেন ন্যাঙ্গোটি। সৈনিক ও মল্লবীরেরা পরিতেন উরু পর্যন্ত লম্বিত খাটো আঁট পা'জামা; সাধারণ মজুররাও বোধ হয় কখনো কখনো এই ধরনের পোষাক পরিতেন; অন্তত পাহাড়পুরের ফলকচিত্রের সাক্ষ্য তাহাই। শিশুদের পরিধেয় ছিল হয় হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত ধুতি না হয় আঁট পা'জামা, আর কটিতলে জড়ানো ধটি; তাহাদের কণ্ঠে দুল্যমান এক বা একাধিক পাটা বা পদক-সম্বলিত সূত্রহার।

কেশবিন্যাস

আজিকার মত প্রাচীন কালেও বাঙালীর মস্তকাবরণ কিছু ছিলনা। নানা কৌশলে সুবিন্যস্ত কেশই ছিল তাহাদের শিরোভূষণ। পুরুষেরাও লম্বা বাব্‌রীর মতন চুল রাখিতেন; কুঞ্চিত থোকায় থোকায় তাহা কাঁধের উপর ঝুলিত; কাহারও কাহারও আবার উপরে একটি প্যাঁচানো ঝুঁটি; কপালের উপর দুল্যমান কুঞ্চিত কেশদাম বস্ত্রখণ্ড-দ্বারা ফিতার মতন করিয়া বাঁধা। নারীদেরও লম্বমান কেশগুচ্ছ ঘাড়ের উপর খোঁপা

করিয়া বাঁধা ; কাহারও কাহারও বা মাথার পশ্চাদ্দিকে এলানো। সন্ন্যাসী-তপস্বীদের লম্বা জটা দুই ধাপে মাথার উপরে জড়ানো। শিশুদের চুল তিনটি 'কাকপক্ষ' গুচ্ছে মাথার উপরে বাঁধা।

পাদুকা

ময়নামতি ও পাহাড়পুরের মৃৎফলক-সাক্ষ্যে মনে হয়, যোদ্ধারা পাদুকা ব্যবহার করিতেন ; প্রহরী দ্বারবানেরাও করিতেন ; এবং সে-পাদুকা চামড়ার দ্বারা তৈরি হইত এমন ভাবে যাহাতে পায়ের কণ্ঠা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে। ব্যাদিতমুখ সেই জুতা ছিল ফিতাবিহীন। সাধারণ লোকেরা বোধ হয় কোনো চর্মপাদুকা ব্যবহার করিতেন না, যদিও কর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি ও পিতৃদয়িত-গ্রন্থে পুরুষদের পক্ষে কাষ্ঠ এবং চর্মপাদুকা উভয়ের ব্যবহারেরই ইঙ্গিত বর্তমান। সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের মধ্যেও কাষ্ঠপাদুকার চলন খুব বেশি ছিল। বাঁশের লাঠি এবং ছাতা ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। মৃৎ ও প্রস্তর ফলকে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে ছত্র ব্যবহারের সাক্ষ্য সুপ্রচুর ; লাঠির সাক্ষ্য স্বল্প হইলেও বিদ্যমান। প্রহরী, দ্বারবান্, মল্লবীরেরা সকলেই সুদীর্ঘ বাঁশের লাঠি ব্যবহার করিতেন।

সধবা নারীরা কপালে পরিতেন কাজলের টিপ্ এবং সীমান্তে সিঁদুরের রেখা ; পায়ে পরিতেন লাক্ষারস অলক্তক, ঠোঁটে সিঁদুর ; দেহ ও মুখমণ্ডল প্রসাধনে ব্যবহার করিতেন চন্দনের গুঁড়া ও চন্দনপঙ্ক, মৃগনাভি, জাফ্রান প্রভৃতি। বাৎস্যায়ন বলিতেছেন, গৌড়ীয় পুরুষেরা হস্তশোভী ও চিত্তগ্রাহী লম্বা লম্বা নখ রাখিতেন এবং সেই নখে রং লাগাইতেন, বোধ হয় যুবতীদের মনোরঞ্জনের জন্য। নারীরাও নখে রং লাগাইতেন কি-না, এ-বিষয়ে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাইতেছেনা। তবে চোখে যে কাজল তাঁহারা লাগাইতেন, তাহার ইঙ্গিত আছে দামোদর-দেবের চট্টগ্রাম-লিপিতে। প্রসাধন-ক্রিয়ায় কর্পূর-ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে মদনপালের মনহলি-লিপিতে, এবং রং ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে নারায়ণপালের ভাগলপুর লিপিতে। ঠোঁটে লাক্ষারস (অলক্তরাগ) এবং খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া দেওয়া যে তরুণীদের বিলাস-প্রসাধনের অঙ্গ ছিল, এ-কথা সমসাময়িক বাঙালী কবি সাঞ্চাধরও বলিয়াছেন। বিধবা হইবার সঙ্গে সঙ্গে সীমন্তের সিঁদুর যাইত ঘুচিয়া, এ-কথার ইঙ্গিত পাইতেছি দেবপালের নালন্দা লিপিতে, মদনপালের মনহলি-লিপিতে, বল্লালসেনের অদ্ভুত-সাগর-গ্রন্থে, গোবর্ধনাচার্যের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে।

বন্ধনভাজোঽমুষ্যাঃ চিকুর কলাপস্য মুক্তমানস্য।
সিন্দূরিত সীমন্তচ্ছলেন হৃদয়ং বিদীর্ণমেব॥

প্রসাধন

নারীরা গলায় ফুলের মালা পরিতেন এবং মাথার খোঁপায় ফুল গুঁজিতেন, এ-সাক্ষ্য দিতেছে নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপি এবং কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপি। নারায়ণ-

পালের ভাগলপুর-লিপিতে আছে, বুকের বসন স্থানচ্যুত হইয়া পড়াতে লজ্জায় আনতনয়না নারী কথঞ্চিৎ লজ্জা নিবারণ করিতেছেন তাঁহার গলার ফুলের মালাদ্বারা বক্ষ ঢাকিয়া। বলা বাহুল্য, এ-চিত্র নাগর-সমাজের উচ্চকোটি স্তরের। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষদ-লিপি এবং সমসাময়িক অন্যান্য লিপির সাক্ষ্য একত্র করিলে মনে হয়, এই সমাজস্তরের নারীরা, বিশেষভাবে বিবাহিতা নারীরা প্রতি সন্ধ্যায় নদী বা দীঘিতে অবগাহনান্তর প্রসাধনে-অলংকারে সজ্জিত ও শোভিত হইয়া আনন্দ ও ঔজ্জ্বল্যের প্রতিমা হইয়া বিরাজ করিতেন। বক্ষযুগলে কর্পূর ও মৃগনাভি রচনার সংবাদ পাওয়া যায় বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতে। রাজা-মহারাজ-সামন্ত-মহাসামন্ত এবং রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন নাগর-পরিবারের নারীরা বেশভূষা, প্রসাধন, অলংকার ইত্যাদিতে উত্তরাপথের আদর্শই মানিয়া চলিতেন; অন্তত সদ্যোক্ত বিবরণ হইতে তো তাহাই মনে হয়। রাজমহিষীরা তো ভারতবর্ষের নানা জায়গা হইতেই আসিতেন, আর নাগর-সমাজে রাজ-পরিবারের আদর্শটাই সাধারণত সক্রিয় হয়। নগরবাসিনী বঙ্গবিলাসিনীদের বেশভূষার একটি সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত অজ্ঞাতনামা জনৈক কবির এই শ্লোকটিতে :

> বাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি ভুজয়োঃ কাঞ্চনী চাঙ্গদশ্রীর্
> মালাগর্ভঃ সুরভি মসৃণৈর্গন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ডঃ।
> কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং
> বেশং কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গবারাঙ্গনাম॥

দেহে সূক্ষ্মবসন, ভুজবন্ধে সুবর্ণ অঙ্গদ (তাগা); গন্ধতৈলসিক্ত মসৃণ কেশদাম মাথার উপরে শিখণ্ড বা চূড়ার মত করিয়া বাঁধা, তাহাতে আবার ফুলের মালা জড়ানো; কানে নবশশিকলার মতন নির্মল তালপত্রের কর্ণাভরণ—বঙ্গবারাঙ্গনাদের এই বেশ কাহার না মন হরণ করে।

চন্দ্রকলার মত কোমল কচি তালপাতার কর্ণভূষণের কথা পবনদূত-রচয়িতা ধোয়ীও বলিয়াছেন; 'রসময় সুহ্মদেশে' নূতন চন্দ্রকলার মত কোমল তালীপত্র ব্রাহ্মণ-মহিলাদের কর্ণাভরণ হইবার দাবি করিয়া থাকে :

> [রসময় সুহ্মদেশঃ] শ্রোত্রাভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং
> তালিপত্রং নবশশিকলা কোমলং যত্র যাতি।

রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাচ্যজনপদবাসীদের প্রসাধনের বর্ণনা দিতে গিয়া শুধু গৌড় রমণীর বেশ-প্রসাধনের বর্ণনাই করিয়াছেন; বোধ হয় ইহাই ছিল মানদণ্ড।

> আদ্রার্দ্রচন্দন কুচার্পিত সূত্রহারঃ
> সীমন্তচুম্বিসিচয়ঃ স্ফুটবাহুমূলঃ।

দূর্বাগ্রকাণ্ড রুচিরাস্বগুরূপভোগাদ্
গৌড়াঙ্গনাসু চিরমেষ চকাস্তু বেষঃ ॥

বক্ষে আর্দ্রচন্দন, গলায় সূতার হার, সীমন্ত পর্যন্ত আনত শিরোবসন, অনাবৃত বাহুমূল, অঙ্গে অগুরু-প্রসাধন, অঙ্গবর্ণ যেন 'দূর্বাগ্রকাণ্ড রুচির', অর্থাৎ দূর্বাদলের মত শ্যাম—ইহাই হইতেছে গৌড়াঙ্গনাদের বেশ।

নগর ও পল্লীবাসিনী

একদিকে এই নগরবাসিনীদের চিত্র, অন্যদিকে সরল, স্বভাবসুন্দর পল্লীবাসিনী নারীর চিত্রও আছে। পল্লী অঞ্চলের লোকেরা নগরবাসিনী বিলাসিনীদের বেশভূষা চালচলন পছন্দ করিতেন না। কবি গোবর্ধনাচার্য বলিতেছেন,

ঋজুনা নিধেহি চরণৌ পরিহর সখি নিখিলনাগরাচারম।
ইহ ডাকিনীতি পল্লীপতিঃ কটাক্ষেঽপি দণ্ডয়তি ॥

সখি, সোজা পা ফেলিয়া চল, নাগরাচার সব ছাড়। একটু কটাক্ষপাত করিলেও এখানে পল্লীপতি (গ্রামপতি) ডাকিনী বলিয়া দণ্ড দেন।

পল্লী-সুন্দরীদের প্রসাধন-অলংকরণের কথা বলিয়াছেন কবি চন্দ্রচন্দ্র ঃ

ভালে কজ্জলবিন্দুরিন্দুকিরণস্পর্ধী মৃণালাঙ্কুরো
দোর্বল্লীষু শলাটুফেনিলফলোত্তংসশ্চ কর্ণাতিথিঃ
ধম্মিল্লস্তিলপল্লবাভিবর্ণাস্নিগ্ধ স্বভাবাদয়ং
পন্থানং মন্থরয়ত্যনাগরবধূবর্গস্য বেশগ্রহঃ ॥

কপালে কাজলের টিপ, হাতে ইন্দুকিরণস্পর্ধী শাদা পদ্মমৃণালের বালা, কানে কচি রীঠাফুলের কর্ণাভরণ, স্নিগ্ধকেশ কবরীতে তিলপল্লব—অনাগর (অর্থাৎ, পল্লীবাসী) বধূদের এই বেশ স্বভাবতই পথিকদের গতি মন্থর করিয়া আনে।

সাধারণ পল্লী ও নগরবাসী দরিদ্র গৃহস্থ মেয়েরা গৃহকর্মাদি তো করিতেনই, মাঠে-ঘাটেও তাঁহাদের খাটিতে হইত সংসারজীবন নির্বাহের জন্য, হাটবাজারেও যাইতে হইত, সওদা কেনাবেচা করিতে হইত, আবার স্বামীপুত্রকন্যাপরিজনদের পরিচর্যাও করিতে হইত। এইরূপ কর্মব্যস্ত মেয়েদের একটি সুন্দর বস্তুময়, কাব্যময় চিত্র আঁকিয়াছেন কবি শরণ। তাঁহারা যে একবস্ত্র পরিহিতা সে-কথাও শরণের এই শ্লোকটিতে জানা যায়। অন্যত্র অন্য প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছি; এখানে শুধু একটি মর্মানুবাদ রাখিলাম।

এই যে হাটের কাজ শেষ করিয়া ধাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে পৌরাঙ্গনারা, তাহাদের দৃষ্টি সন্ধ্যাসূর্যের মত (অরুণবর্ণ)। দ্রুত ধাইয়া চলিবার জন্য তাহাদের স্কন্ধ হইতে বস্ত্রাঞ্চল স্খলিত হইয়া পড়িতেছে বারবার, আর তাহাই বারবার তাহারা তুলিয়া দিতে চাহিতেছে। ঘরের চাষী সেই সকালবেলা মাঠে কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে, এখন

তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিবার সময়—এই কথা ভাবিয়া মেয়েরা লাফাইয়া লাফাইয়া ছুটিয়া পথ সংক্ষেপ করিয়া আনিতেছে, আর ব্যস্ত হইয়া হাটে কেনাবেচার দাম আঙুলে গুণিতেছে।

বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতে নানা প্রকার ক্ষৌমবস্ত্রের একটু ইঙ্গিত আছে; তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপিতে পড়িতেছি, রত্নদ্যুতিখচিত অংশুক বস্ত্রের কথা। সূক্ষ্ম কার্পাস ও রেশম বস্ত্রের কথা তো নানাসূত্রেই পাওয়া যাইতেছে। ইহা কিছু আশ্চর্যও নয়। বাঙলাদেশ যে নানাপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরে সুবিখ্যাত ছিল, এ-কথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও গ্রীক্ পেরিপ্লাস-গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া আরব বণিক সুলেমান (নবম শতক), ভিনিসিয় মার্কো পোলো (ত্রয়োদশ শতক), চীন পরিব্রাজক মা-হুয়ান্ (পঞ্চদশ শতক) পর্যন্ত সকলেই বলিয়া গিয়াছেন। বস্তুত, অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই খ্যাতি অক্ষুন্ন ছিল। চতুর্দশ শতকে তীরভুক্তি বা তিরহুতবাসী কবি শেখরাচার্য জ্যোতিরীশ্বর নানাপ্রকারের পট্টাম্বরের মধ্যে বাঙলাদেশের মেঘ-উদুম্বর, গঙ্গাসাগর, গাঙ্গের, লক্ষ্মীবিলাস, দ্বারবাসিনী, এবং শিলহটী পট্টাম্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। এ-গুলি বোধ হয় সমস্তই অলংকৃত পট্টবস্ত্র; কারণ ইহার পরই জ্যোতিরীশ্বর বলিতেছেন নিভূর্ষণ বস্ত্রের কথা। কিন্তু 'ক্ষৌম' বা 'কৌষেয়', 'দুকুল' বা 'পত্রোর্ণ' বস্ত্র, অলংকৃত পট্টবস্ত্র বা কার্পাস বস্ত্র যাহাই হউক, সাধারণ দরিদ্র লোকদের এ-সব বস্ত্র পরিবার সুযোগ ও সংগতি কিছুই ছিল না; তাহাদের ভাগ্যে জুটিত মোটা নিভূর্ষণ কার্পাস বস্ত্র মাত্র, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা ছিন্ন ও জীর্ণ। অন্তত কবি বীর এবং আরও একজন অজ্ঞাতনামা কবি বাঙালীর দারিদ্র্যের যে ছবি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অন্যতম প্রধান উপকরণ 'স্ফুটিত' জীর্ণ বস্ত্র। এই দুইটি শ্লোকই সদুক্তিকর্ণামৃত হইতে এই গ্রন্থেরই অন্যত্র অন্য প্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছি; বাহুল্যভয়ে এখানে শুধু তাহার উল্লেখ রাখিয়া যাইতেছি মাত্র। সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র শুধু মেয়েরাই বোধ হয় পরিতেন; অনেকে নিজেরাই যে সে কাপড়ের সূতা কাটিয়া পাকাইয়া লইতেন, বিশেষভাবে নির্ধন ব্রাহ্মণগৃহের নারীরা, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কবি শুভাংকের নিম্নোক্ত রাজপ্রশস্তি শ্লোকটিতে।

কার্পাসাস্থি প্রচয়নিচিতা নির্ধনশ্রোত্রিয়াণাং
যেষাং বাত্যা প্রবিততকুটী প্রাঙ্গণান্তা বভূবুঃ।
তৎসৌধানাং পরিসরভুবি ত্বৎপ্রাসাদাদিদানীং
ক্রীড়াযুদ্ধচ্ছিদুরযুবতীরমুক্তাঃ পতন্তি ॥

যে-সব দরিদ্র শ্রোত্রিয়দিগের ঝটিকাহত কুটীরের প্রাঙ্গণ কার্পাস বীজের দ্বারা আকীর্ণ ছিল, (হে মহারাজ), এখন তোমার কৃপায় সেখানকার সৌধাবলীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যুবতীদের ক্রীড়াযুদ্ধে ছিন্নহারের মুক্তাসমূহ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

অলংকরণ

সমসাময়িক সাহিত্য ও প্রত্নবস্তুর সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয়, প্রাচীন বাঙালী নারী ও পুরুষ এমন কতকগুলি অলংকার ব্যবহার করিতেন যাহা উভয় ক্ষেত্রেই এক। কর্ণকুণ্ডল ও কর্ণাঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়ক, কণ্ঠহার, বলয়, কেয়ূর, মেখলা, ইত্যাদি নরনারী নির্বিশেষে ব্যবহৃত হইত। নারীরা, সম্ভবত বিবাহিত নারীরা, বিশেষভাবে ব্যবহার করিতেন শঙ্খবলয়। মুক্তাখচিত হারের কথা, মহানীলরক্তাক্ষমালার কথা, বিজয়সেনের নৈহাটি-লিপিতে পাইতেছি এবং দেওপাড়া-প্রশস্তিতেই শুনিতেছি, রাজবাড়ীর ভৃত্যের স্ত্রীরাও নাকি হার, কর্ণাঙ্গুরী, মালা, মল এবং সুবর্ণবলয় ইত্যাদি পরিতেন, মূল্যবান্ পাথরের তৈরি ফুল ইত্যাদিও ব্যবহার করিতেন। মুক্তাখচিত হার পরিতেন রাজপরিবারের মেয়েরা (নৈহাটি-লিপি)*। রামচরিতে পড়া যায়, হীরাখচিত নানা সুন্দর অলংকার এবং রত্নখচিত ঘুঙুরের কথা, মুক্তা, মরকত, নীলকান্তমণি, চুণী প্রভৃতি রত্নাদি ব্যবহারের কথা। আর, সোনা ও রূপার গহনা তো ছিলই। বলা বাহুল্য, এই সব অলংকরণ-বিলাস ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থদের নাগালের বাহিরে; বড় জোর শঙ্খবলয়, কচি তালপাতার কর্ণাভরণ, এবং ফুলের মালাতেই তাঁহাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। দেওপাড়া-প্রশস্তিতে কবি উমাপতি-ধর বলিতেছেন, পল্লীবাসী নির্ধন ব্রাহ্মণ রমণীরা রাজার কৃপায় নগরে আসিয়া বহুবিভবশালিনী হইলেও তাঁহার মুক্তা ও কার্পাসবীজে, মরকত ও শাকপাতায়, রূপা ও লাউফুলের, রত্ন ও পাকা ডালিমের বীজে, সোনা ও কুমড়া ফুলের পার্থক্য যে কি তাহা জানিতেন না।

উচ্চকোটিস্তরে বিবাহোপলক্ষে কন্যাকে কি ভাবে সজ্জিত ও অলংকৃত করা হইত তাহার কিছু বর্ণনা আছে নৈষধচরিতে। প্রসঙ্গত উৎসব-সজ্জার কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। প্রথমেই কুলাচার অনুসারে সধবা ও পুত্রবতী গৃহিণীরা মঙ্গলগীত গাহিতে গাহিতে কন্যাকে স্নান করাইতেন এবং পরে শুভ্র পট্টবস্ত্র পরাইতেন। তারপর সখীরা দময়ন্তীকে কপালে পরাইলেন মনঃশিলার তিলক, সোনার টীপ, কাজল আঁকিয়া দিলেন চোখে, কর্ণযুগলে পরাইলেন দুইটি মণিকুণ্ডল, ঠোঁটে আলতা, কণ্ঠে সাতনহর মুক্তার মালা, দুই হাতে শঙ্খ ও স্বর্ণবলয়, চরণে আলতা। বিবাহের মাঙ্গলিকানুষ্ঠানে অভ্যস্তা অন্তঃপুরিকারা স্ত্রী-আচারগুলি পালন করিতেন, আর পুরুষেরা ও ব্রাহ্মণেরা বেদোক্ত স্মৃত্যুক্ত কার্যগুলি সম্পাদন করিতেন। বিবাহ-স্থানে আলপনা আঁকা হইত এবং কাজটি করিতেন মেয়েরা। শিল্পীরা নানাপ্রকার রঞ্জিত কাপড় দিয়া তৈরি ফুলে নগরের পথ-ঘাট সাজাইতেন, বাড়ির দেয়ালে নানা ছবি আঁকিতেন। নানা প্রকার বাদ্যের মধ্যে বাঁশি, বীণা, করতাল, মৃদঙ্গ ছিল প্রধান। বরযাত্রাকালে নগরীর নারীরা বরকে দেখিবার জন্য রাজপথের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেন। মঙ্গলানুষ্ঠান উপলক্ষে গৃহতোরণের দুইপাশে কদলীস্তম্ভ রোপণ করা হইত; বাসর ঘরে (কৌতুকগৃহে)

আজিকার মতন তখনও চুরি করিয়া চুপি দেওয়া এবং আড়িপাতা হইত (সকৌতুকাগারমগাত্ পুরন্ধ্রিভিঃ সহস্র রন্ধ্রোকৃতমীক্ষিতুংততঃ। অথাত্ সহস্রাক্ষ-তনুভ্রমিব্রতাং অধিষ্ঠিতং যত্ খলু জিষ্ণুনামুনা ॥); বরকন্যার গাঁটছড়াও বাধা হইত। বরযাত্রীদের পরিচর্যা এবং ভোজনে পরিবেশন করিতেন পুরনারীরা এবং তাঁহাদের লইয়া বরযাত্রীরা নানা প্রকার ঠাট্টা-রসিকতা করিতেও ছাড়িতেন না; সে-সব ঠাট্টা ও রসিকতা আজিকার দিনে খুব মার্জিত বলিয়া মনে হইবার কারণ নাই। পুরনারীরাও নানাপ্রকারে বরযাত্রীদের ঠকাইতে চেষ্টা করিতেন, আজও যেমন করা হয়। নল-দময়ন্তীর বিবাহ বর্ণনা-সাক্ষ্যে মনে হয়, বিবাহের পরও বর ও বরযাত্রীরা বিবাহ-বাড়িতে ৪।৫ দিন বাস করিতেন। সেই কয়েকদিনও বরযাত্রীরা বারসুন্দরী বা বাররামাদের সঙ্গলাভ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। বস্তুত, সৌখীন উচ্চস্তরে যুবকদের মধ্যে বাররামাসঙ্গ বোধ হয় খুব দোষের বলিয়া গণ্য হইত না।

বসন-ভূষণ-প্রসাধন-অলংকার প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা টুক্‌রা টাক্‌রা খবর নানাদিক হইতে পাওয়া যায়। ভরতমুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে (আনুমানিক তৃতীয় শতক) বলিতেছেন, "গৌড়ীনামলকপ্রায়ং সশিখাপাশবেণিকম্"—অর্থাৎ গৌড়ীয় নারীদের মাথায় কুঞ্চিত কেশ, এবং তাঁহাদের চুলের বেণীর শেষাংশ থাকিত শিখার মত মুক্ত। রাজশেখর (নবম-দশম শতক) তাঁহার কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে অঙ্গ-বঙ্গ-সুহ্ম-ব্রহ্ম-পুণ্ড্র প্রভৃতি প্রাচ্যবাসীদের বেশ (বেষ) বর্ণনা উপলক্ষে গৌড়-নারীর বেশের (বেষের) যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা একটু আগেই উল্লেখ করিয়াছি।

প্রাচীন বাঙালীর দেহবর্ণ কিরূপ ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় ভরত-নাট্যশাস্ত্রের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি হইতে।

> শকাশ্চ যবনাশ্চৈব পহ্লবা বাহ্লিকাদয়ঃ
> প্রায়েণ গৌরাঃ কর্তব্যা উত্তরাং যে শ্রিতাদিশম।
> পাঞ্চালাঃ শূরসেনাশ্চ তথা চৈবোড্রমাগধাঃ
> অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাস্তু শ্যামা কার্যাস্তু বর্ণতঃ ॥

(নাটকের) শক-যবন পহ্লব-বাহ্লিক প্রভৃতি যে সব (পাত্রপাত্রী) উত্তর দেশবাসী তাহাদের দেহের বর্ণ করিতে হইবে সাধারণত গৌর; পঞ্চাল, শূরসেন, উড্র, মগধ এবং অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গবাসীদের বর্ণ করিতে হইবে শ্যাম।

রাজশেখরও বলিতেছেন, "তত্র পৌরস্ত্যানাং (প্রাচ্যবাসীদের) শ্যামো বর্ণঃ, দাক্ষিণাত্যানাং কৃষ্ণঃ, পাশ্চাত্যানাং পাণ্ডুঃ, উদীচ্যানাং গৌরঃ, মধ্যদেশ্যানাং কৃষ্ণঃ শ্যামো গৌরশ্চ।" গৌড়াঙ্গনাদের দেহও যে শ্যামবর্ণ, রাজশেখরের এই উক্তি আগেই উল্লেখ করিয়াছি; অন্যত্রও তিনি বলিতেছেন,

> শ্যামেষঙ্গেষু গৌড়ীনাং সুরহারৈহারিষু।
> চন্দ্রীকৃত্য ধনুঃ পৌষ্পমনঙ্গো বল্গু বল্গতি ॥

এই সব উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, গৌড়বাসীদের, তথা প্রাচ্যবাসীদের দেহবর্ণ সাধারণত ছিল শ্যাম, তবে রাজপরিবার এবং অন্যান্য অভিজাত পরিবারের নরনারীদের দেহবর্ণ যে অনেক সময় হইত গৌর বা পাণ্ডুবর্ণ, তাহাও রাজশেখর বলিয়াছেন, "বিশেষস্তু পূর্বদেশে রাজপুত্র্যাদীনাং গৌরঃ পাণ্ডুর্বা বর্ণঃ"।

৪

জীবনচিত্র। বাসনা ও ব্যসন। নাগরাদর্শ

প্রাচীন বাঙালী সমাজের নানা কামবাসনা ও ব্যসনের কথা নানা প্রসঙ্গে বর্তমান ও অন্যান্য অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এখানে সমস্ত সাক্ষ্য একত্র করিয়া সার সংকলন করা অনুচিত হইবে না। খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতেই বাঙলাদেশ, স্বল্পাংশে হইলেও, উত্তর-ভারতীয় সদাগরী ধনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল এবং উত্তর-ভারতের নাগর-সভ্যতার স্পর্শও তাহার অঙ্গে লাগিয়াছিল; বাৎস্যায়নীয় নাগরাদর্শ বাঙলার নাগর-সমাজেরও আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। গৌড়ের যুবক-যুবতীদের কামলীলার কথা, তাহাদের বাসনা ও ব্যসনের কথা এবং গৌড়-বঙ্গের রাজান্তঃপুরের মহিলারা যে নির্লজ্জভাবে ব্রাহ্মণ, রাজকর্মচারী ও দাস-ভৃত্যদের সঙ্গে কাম-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেন তাহার বিবরণ বাৎস্যায়নই রাখিয়া গিয়াছেন। সে বিবরণ পড়িলে মনে হয়, ভিন্ন-প্রদেশীরা গৌড়-বঙ্গের যুবক-যুবতীদের এই ধরনের কামবাসনা ও ব্যসনকে খুব সুনজরে দেখিতেন না। স্মৃতিকার বৃহস্পতির কয়েকটি শ্লোক দেবণভট্টের স্মৃতিচন্দ্রিকা-গ্রন্থে ও ভট্ট নীলকণ্ঠের ব্যবহার-ময়ূখ-গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহা হইতে জানা যায়, বৃহস্পতি দুই কারণে বাঙালী দ্বিজবর্ণের লোকদের নিন্দা করিয়াছেন: প্রথম কারণ, তাঁহাদের মৎস্য ভক্ষণ; দ্বিতীয় কারণ, তাঁহাদের সমাজের নারীরা দুর্নীতিপরায়ণা! শুধু বাৎস্যায়নের কালেই নয়, তাহার পরেও প্রাচীন বাঙালী বোধ হয় কামবাসনায় সংযম অভ্যাসে অভ্যস্ত হয় নাই। ধোয়ীর পবন-দূতেও দেখিতেছি, কামচরিতার্থতার অবাধলীলা কবি সোৎসাহে এবং সাড়ম্বরে বিবৃত করিয়াছেন। পবনদূত এবং রামচরিত উভয় কাব্যেই, যে-ভাবে সভানন্দিনীদের উচ্ছ্বসিত স্তুতিগান এবং তাহাদের বিলাসলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, নাগর-সমাজের সমৃদ্ধ উচ্চস্তরে ইঁহাদের আকর্ষণ ও প্রভাব স্বল্প ছিল না, এবং ইঁহারা নাগর সমাজের বিশেষ অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপি ও বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষদ-লিপিতে আছে, প্রতি সন্ধ্যায় এইসব সভানন্দিনীদের নূপুর-ঝংকারে সভা ও আমোদগৃহগুলি পরিপূরিত হইত। সন্দেহ নাই, রাজসভায় এবং বিত্তবান্ সমাজে এই নন্দিনীদের বিশেষ একটা স্থান ছিল। তাহা ছাড়া নগরে ও গ্রামে বিত্তবানদের ঘরে দাসী রাখার প্রথা যে প্রায়

সর্বব্যাপী ছিল, তাহা তো জীমূতবাহনই দায়ভাগ-গ্রন্থে বলিয়াছেন। টীকাকার মহেশ্বর বলিতেছেন, দাসী রাখা হইত শুধু কামচরিতার্থতার জন্য! এই ধরনের দাসী রাখার প্রথা বাঙলাদেশে বহুদিন প্রচলিত। বাৎস্যায়নও ইঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই দাসীরা অস্থাবর সম্পত্তির মত যথেচ্ছ ক্রীত ও বিক্রীত হইতেন; দায়ভাগ-গ্রন্থে বলা হইয়াছে, উত্তরাধিকার সূত্রে একাধিক ব্যক্তি যদি একটি মাত্র দাসীর অধিকারী হন, তাহা হইলে সেই দাসী প্রত্যেকের অংশানুযায়ী পর পর প্রত্যেকের অধিকারে থাকিবেন!

এর উপর ছিল আবার দেবদাসী প্রথা। বাঙলাদেশে এই প্রথার প্রথম উল্লেখ অষ্টম শতকে, এবং তাহা কল্হনের রাজতরঙ্গিনী-গ্রন্থে, নর্তকী কমলা-প্রসঙ্গে। কমলা ছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনের কোনো মন্দিরের প্রধানা দেবদাসী, নৃত্যগীতবাদ্যে সুনিপুণা, বিবিধ কলায় কলাবতী। দেবদাসীরা সাধারণত প্রায় সকলেই নানা কলানিপুণা হইতেন; কমলা আবার তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন আরও উচ্চস্তরের। কিন্তু তাহা হইলেও দেবদাসীরা বিত্তবান্ ও প্রভাবশালী সমাজের কামবাসনা পরিপূরণের সঙ্গিনী হইতেন, সন্দেহ নাই, এবং এই হিসাবে বাররামাদের সঙ্গে তাঁহাদের পার্থক্য বিশেষ কিছু ছিল না। রামচরিত-কাব্যে তো ইঁহাদের স্পষ্টত দেব-বারবনিতাই বলা হইয়াছে; পবনদূতে বলা হইয়াছে বাররামা। কল্হনের সুদীর্ঘ কমলা-কাহিনী প্রসঙ্গে সমসাময়িক বাঙলার দেবদাসীদের জীবনযাত্রা এবং সমাজের উচ্চকোটির লোকদের নৈতিক আদর্শ, বাসনা ও ব্যসনের মোটামুটি একটু পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পাল-আমলে এই প্রথা খুব বিস্তৃত ছিল না; পরে দাক্ষিণী প্রভাব ও সংস্পর্শের ফলে ক্রমশ দেবদাসী প্রথা দেশে বিস্তার লাভ করে এবং সেন-বর্মণ আমলে দেবদাসীরা সমাজের উচ্চস্তরের মন ও কল্পনা, কামনা ও বাসনাকে একান্ত ভাবে অধিকার করিয়া বসেন। বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তি এবং ভট্টভবদেবের লিপিতে যে-ভাবে ইঁহাদের বিলাসলাস্য ও সৌন্দর্যলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে এবং প্রশস্তিকারেরা যে-ভাবে ইঁহাদের উপর কবিকল্পনার সুনির্বাচিত রূপকালংকার বর্ষণ করিয়াছেন তাহাতে এ-সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ আর কিছু নাই। ধোয়ী কবি ইঁহাদের আখ্যা দিতেছেন বাররামা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন, ইঁহাদের দেখিলে মনে হয়, লক্ষ্মী যেন স্বয়ং সুহ্মদেশে অবতীর্ণা হইয়াছেন তাঁহার পতি মুরারীর পাশে। তিনিই ইঙ্গিত করিতেছেন, সেন-বংশীয় রাজাদের পাশে সর্বদা স্বভাবসুন্দরী বারনারীরা অবস্থান করিতেন, মনে হইত যেন মুরারীর পাশে লক্ষ্মী। আর, ভবদেব-ভট্ট বলিতেছেন, বিষ্ণুমন্দিরে উৎসর্গীকৃত শত দেবদাসীরা যেন কামদেবতাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন, তাঁহারা যেন কামাতুর জনের কারাগৃহ, যেন সঙ্গীত, লাস্য এবং সৌন্দর্যের শোভামন্দির!

ব্রাহ্মণ্যাদর্শ

অথচ, অন্যদিকে সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-গ্রন্থাদি পড়িলে মনে হয়, সমাজের নৈতিকাদর্শ উচ্চে তুলিয়া ধরিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ব্রাহ্মণ্য লেখকেরা এবং সমাজের নেতারা সকল প্রকার দুর্নীতি এবং সংযমশাসনবিহীন বল্গাহীন কাম-বাসনার বিরুদ্ধে নিজদের কণ্ঠ ও লেখনী নিয়োগ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক লিপিমালা পাঠ করিলে স্বতই মনে হয়, তাঁহারা জনসাধারণের সম্মুখে যে-সব নৈতিকাদর্শ তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন তাহা চিরাচরিত ঔপনিষদিক, পৌরাণিক এবং রামায়ণ-মহাভারতীয় ব্রাহ্মণ্য নৈতিকাদর্শেরই সমষ্টি; সে-আদর্শ পাতিব্রত্যের, শুভ্র শুচিতার, স্থৈর্য ও সংযমের, শ্রী, শ্লীলতা ও ঔদার্যের, দয়া, দান ও ক্ষমার। প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ-গ্রন্থে সর্বপ্রকারের দুর্নীতি, কামাতুরতা, মদ্যাসক্তি, চৌর্য এবং পরনারী ও পরপুরুষগমনের নিন্দা করা হইয়াছে, এবং এই সব অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দণ্ডের এবং প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলন করিতে বলা হইয়াছে, সত্য, দান, শুচিতা, দয়া এবং সংযম প্রভৃতি গুণের।

পল্লীর জীবনাদর্শ

আংশিকত এই ধরনের আদর্শপ্রচারের ফলে, আংশিকত বৃহত্তর পল্লীসমাজের ধনোৎপাদন ব্যবস্থা ও সামাজিক জীবন-বিন্যাসের ফলে সাধারণ ভাবে প্রাচীন বাঙালী জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হইতে পারে নাই। যে-সব বিলাস-ব্যসন ও অসংযত কামনা-বাসনার কথা একটু আগে বলিয়াছি, তাহা সাধারণত নাগর-সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; পল্লীবাসীরা এই সব নাগরাচার পছন্দ করিতেন না, এবং ইহাদের বিরুদ্ধে পল্লীপতিদের দৃষ্টি সদাজাগ্রত ছিল। গোবর্ধনাচার্যের একটি শ্লোকে তাহার আভাস আগেই আমরা পাইয়াছি। বৃহত্তর পল্লীসমাজে জীবনের একটি সরল শান্ত সহজ আদর্শ ছিল সক্রিয়, এবং সমসাময়িক কালের এই আদর্শকে ব্যক্ত করিয়াছেন কবি শুভাংক।

> বিষয়পতিরলুব্ধ ধেনুভির্ধাম পূতং
> কতিচিদভিমতায়াং সীম্নি সীরা বহন্তি।
> শিথিলয়তি চ ভার্যা নাতিথেয়ী সপর্য্যাম
> ইতি সুকৃতিমনেন ব্যঞ্জিতং নঃ ফলেন॥

বিষয়পতি (অর্থাৎ, স্থানীয় শাসনকর্তা) লোভহীন, ধেনুদ্বারা গৃহ পবিত্র, নিজ নিজ ক্ষেত্রে উপযুক্ত চাষ হয়, অতিথি-পরিচর্যায় গৃহিণী কখনও ক্লান্ত হন্ না,—এই সব ফল দ্বারা ইঁহার পুণ্য (বা সুকৃতি) আমাদের নিকট ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

ইহাই ছিল পল্লীবাসী কৃষিনির্ভর প্রাচীন বাঙালী সমাজের মধ্যবিত্ত লোকদের জীবনাদর্শ। এই সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শের ইঙ্গিত প্রাকৃতপৈঙ্গলের দুই একটি পদেও পাওয়া যায়।

পুত্ত পবিত্ত বহুত্ত ধণা ভত্তি কুটুম্বিণি সুদ্ধমণা।
হাক্ক তরাসই ভিচ্চগণা কো কর বব্বর সগ্গমণা॥

পুত্র পবিত্রমনা, প্রচুর ধন, স্ত্রী ও কুটুম্বিনীরা শুদ্ধচিত্তা, হাঁকে ত্রস্ত হয় ভৃত্যগণ—এই সব ছাড়িয়া কোন্ বর্বর স্বর্গে যাইতে চায়!

অন্য একটি পদে আছে :

সের এক্ক জই পাঅই ঘিত্তা
মণ্ডা বীস পকাইল ণিত্তা॥
টঙ্ক এক্ক জই সিন্ধব পাআ।
জো হউ রঙ্ক সো হউ রাআ॥

এক সের ঘী যদি পাই তবে নিত্য বিশটা মণ্ডা পাকাই; যদি এক টাকার সৈন্ধব পাওয়া যায় তবে হোক্ সে নিঃস্ব, তবু সে রাজা!

দরিদ্র নিম্নবিত্ত সমাজে বাঙালীর সনাতন দুঃখ কষ্ট লাগিয়াই ছিল; 'হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্যই উপবাস, অথচ ব্যাঙের সংসার বাড়িয়াই চলিয়াছে', 'ক্ষুধায় শিশুদের চোখ ও পেট বসিয়া গিয়াছে, তাহাদের দেহ শবের মত শীর্ণ', 'ভাঙা কলসীতে এক ফোঁটা মাত্র জল ধরে', 'পরিধানে জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র, সেলাই করিবার মত সূঁচও নাই ঘরে', 'ভাঙা কুঁড়েঘরের খুঁটি নড়িতেছে, চাল উড়িতেছে, মাটির দেয়াল গলিয়া পড়িতেছে'—এই সব ছবি সমসাময়িক সাহিত্যে দুর্লভ নয়। নানা প্রসঙ্গে এই ধরনের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়াছি; এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া লাভ নাই।

দারিদ্র্যাভিশাপক্লিষ্ট নিরানন্দ জীবনের একমাত্র আনন্দ বোধ হয় ছিল গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ-বাড়ীর পার্বণ ব্রত, সম্পন্নতর গৃহের পূজা-উৎসব, এবং দরিদ্রতর স্তরের নানা আদিম কৌমগত যৌথ নৃত্য, গীত ও পূজা। এই সব আশ্রয় করিয়াই মাঝে মাঝে গ্রামের সাধারণ লোকেরা তাঁহাদের দৈনন্দিন দারিদ্র্য-দুঃখ মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন।

দশম-একাদশ-শতকের বাঙালীর নানা টুকরোটাক্‌রা জীবনচিত্র কল্পনায় আঁকিয়া তোলা যায় বাঙালী কবিকুলরচিত সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত নানা প্রকীর্ণ শ্লোকগুলি হইতে। বর্ষায় গ্রাম্য কৃষকযুবকের সুখস্বপ্ন আঁকিয়াছেন কবি যোগেশ্বর; হেমন্তে বাঙলার গ্রামাঞ্চলের শোভা ও সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা, বাঙলার ভাষা, বাঙলার ধর্মকর্ম—বিশেষভাবে শিব ও গৌরী কল্পনা—, সাধারণ মানুষের প্রেম, সুখ-দুঃখ, দারিদ্র্য, ঋতুচর্যা, যুদ্ধ, শৌর্য, কীর্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কিছু কিছু বর্তমান গ্রন্থে নানাপ্রসঙ্গে

নানা অধ্যায়ে উদ্ধার করিয়াছি ; সব উদ্ধার করা সম্ভব নয়। বাঙলার জনসাধারণের যে-সব চিত্র এই শ্লোকগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা যে শুধু সুন্দর, বস্তুময় এবং কাব্যময় তাহাই নয়, অন্যত্র, অন্য উপাদান, অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণে তাহা দুর্লভ। কিন্তু, বাঙালী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আজও এই সব সমসাময়িক জীবন-সাক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই!

চর্যাগীতিতে গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র

চর্যাগীতির অনেকগুলি গীতেও বাঙালীর সমসাময়িক গার্হস্থ্য-জীবনের চিত্র দৃষ্টিগোচর। দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব বোধ হয় বেশ ছিল, সমর্থ প্রহরীর প্রয়োজন হইত, দরজায় তালা লাগাইতে হইত। কাহ্নুপাদ বলিতেছেন,

সুনবাহ তথতা পহারী
মোহ ভাণ্ডার লই সঅলা অহারী ॥

শূন্য গৃহে তথতা প্রহরী ; মোহভাণ্ডার সকলই কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

আর, সহরপাদের দোহায় আছে, "জই পবন-গমন-দুআরে দিঢ় তালা বি দিজ্জই"। ঘরে তালা লাগাইবার ইঙ্গিত চর্যাপদেও আছে (৯নং)। আয়না ব্যবহারের কথাও আছে (৪৯ নং)। চুরি-ডাকাতি যে হইত, সন্দেহ কি ? একটি গীতে কুক্কুরীপাদ বলিতেছেন,

আঙ্গণ ঘরপণ সুন বিআতী।
কানেট চোরে নিল অধরাতী ॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥

অঙ্গন ঘরের কোনেই ; হে অবধূতি, শোনো, কানেট অর্ধরাত্রে চোরে লইয়া গেল ; শ্বশুর পড়িল ঘুমাইয়া, বহুড়ি আছে জাগিয়া, কানেট নিল চোরে, কোথায় গিয়া আবার তাহা মাগিবে! (কানের গহনা কানে পরিয়াই ঘরের বৌ পড়িয়াছিল ঘুমাইয়া, মাঝরাত্রে চোর আসিয়া গহনাটি চুরি করিয়া লইয়া গেল। শ্বশুর তখনও ঘুমে ; কিন্তু ভয়ে ভয়ে জাগিয়া বসিয়া আছে বৌ। মনে বড় ভয় ও ভাবনা ; চোরের ভয় একদিকে, অন্যদিকে গহনাটি চুরি গিয়াছে—লজ্জা ও অর্থদণ্ড দুইই। কার কাছে চাহিলেই বা গহনা আর পাওয়া যাইবে!)

এই গীতটির মধ্যে ঘরের বৌ-এর একটু চঞ্চল চরিত্রের ইঙ্গিতও যে নাই, এমন নয়। ভয় ও লজ্জা কতকটা সেই জন্যও ; শ্বশুর কি বলিবেন, এই ভাবনা! এই গীতে একটু পরেই আছে, বৌটির এতই ভয় যে, দিনের বেলা কাকের ভয়েই চীৎকার করিয়া ওঠে, অথচ রাত্রি হইলেই কোথায় যে চলিয়া যায় সে!

দিবসই বহুড়ি কাগ ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥

এই পদটিতে অসতী কুলবধূ সম্বন্ধে সর্বভারত-প্রচলিত একটি উক্তির প্রতিধ্বনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

তখনকার দিনেও গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর একত্র বসিয়া খাওয়া নিন্দনীয় ছিল, দেশাচারে অসিদ্ধ ছিল। দোহাকোষে আছে,

ঘরবই খজ্জই ঘরিণীএহি জঁহি দেসহি অবিসার।

বিবাহে বরপক্ষ কর্তৃক যৌতুক-গ্রহণের কথা আগেই বলিয়াছি। যৌতুকের লোভে অনেকেই নিম্ন জাতের ভিতর হইতে কন্যাগ্রহণেও আপত্তি করিতেন না।

দোহাকোষে একটি অর্থবহ দোহা আছে। পরনারীতে আসক্ত পুরুষদের দোহাকার উপদেশ দিতেছেন,

নিঅ ঘরে ঘরিণী জাব ণ মজ্জই।
তাব কি পঞ্চবগ্ন বিহারিজ্জই॥

নিজের ঘরে আপন গৃহিণী যে পর্যন্ত না মজেন সে পর্যন্ত কি পঞ্চবর্ণে বিহার করা যায়?

বঙ্গাল দেশের সঙ্গে বোধ হয় তখনও পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গের বিবাহাদি সম্পর্ক প্রচলিত ছিল না। তাহা ছাড়া, পশ্চিম ও উতর-বঙ্গবাসীরা বোধ হয় বঙ্গালবাসীদের খুব প্রীতির চক্ষেও দেখিতেন না। সহরপাদের একটি দোহায় আছে; বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহর বিণাণা", অর্থাৎ, বঙ্গে (পূর্ব-বঙ্গ হইতে) লইয়াছিস্ স্ত্রী, পরে (তাহার ফলে) ভাগিল তোর বিজ্ঞান (তোর বুদ্ধি গেল খোয়া)। ভুসুকুপাদের একটি গানে আছে, ভুসুকু যেদিন চণ্ডালীকে নিজের গৃহিণী করিলেন সেদিন তিনি যথার্থ বঙ্গালী হইলেন। অর্থ বোধ হয় এই যে, আগে শুধু জন্মে বঙ্গালী ছিলেন, চণ্ডালীকে যোগসঙ্গিনী করায় যথার্থ বঙ্গালী হইলেন।

শবর-শবরী এবং অন্যান্য অন্ত্য বর্ণের জীবনযাত্রা

শবরদের সম্বন্ধে নানা অধ্যায়ে নানা প্রসঙ্গে নানা কথা বলা হইয়াছে। চর্যাগীতির একাধিক গীতে ইঁহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। ইঁহারা বাস করিতেন বড় বড় পাহাড়ের সুউচ্চ শিখরচূড়ায় (বরগিরিসিহর উতুঙ্গ মুণি সবরে জঁহি কিঅ বাস—কাহ্নুপাদ)। ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে পর্ণশবরীর ধ্যান-প্রসঙ্গে শবরপাদের একটি গীত উদ্ধার করিয়াছি, এই গীতটিতে শবর-শবরীদের পাহাড়ী জীবনযাত্রার সুন্দর বর্ণনা আছে। জনবসতি হইতে দূরে উঁচু পাহাড়ে শবর-শবরীদের বাস; শবরী গুঞ্জার মালা পরেন গলায়, কটিতে জড়ান ময়ূরের পাখ্, কানে পরেন কুণ্ডল। উন্মত্ত শবর নেশার ঝোঁকে শবরীকে যান ভুলিয়া; তখন শবরী তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া আবার ঘর সামলান। কুঁড়ে ঘরে খাটিয়ার উপর তাঁহাদের সুখশয়ন; সেই খাটিয়ায় নিবিড়

তাঁহাদের মিলন। তাম্বুল (পান) আর কর্পূর তাঁহাদের পূর্বরাগের উপাদান। শরধনু লইয়া শীকার তাঁহাদের জীবিকা। এক একদিন শবর রাগ করিয়া অনেকদূরে পাহাড়ের গুহায় চলিয়া যান ; শবরী তখন একা একা তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ান। এই শবরপাদেরই (ইনি কি নিজেই শবর ছিলেন ?) আর একটি গীত আছে শবরদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে : এ-চিত্রটিও সুন্দর ও বস্তুময়।

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিয়েঁ কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥

*   *   *

হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসম সমতুলা।
সুকড় এ সেরে কপাসু ফুটিলা।

*   *   *

কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর-শবরী মাতেলা।
অনুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভোলা ॥
চারিপাসেঁ ছাইলারে দিয়া চঞ্চালী।
তহিঁ তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণ শিআলী ॥

পাহাড়ের উপর প্রায় আকাশের গায়ে শবর-শবরীর বাড়ী ; বাড়ীর চারধারে কার্পাস গাছে ফুল ফুটিয়া আছে। চিনা ধান (কাগনী ধান) পাকিয়াছে, আর শবর-শবরীদের জীবনে উৎসব লাগিয়াছে। চারিদিকে শকুন আর শেয়ালের বড় উপদ্রব ; ইহারা ক্ষেতে পড়িয়া পক্ব শস্য নষ্ট করে ; বাঁশের চাঁচারীর বেড়া দিয়া সেই জন্য চিনা ধানের ক্ষেত রক্ষা করিতে হয়। ইঁদুরের উপদ্রবও ছিল ; একটি চর্যাগীতে তাহারও ইঙ্গিত আছে।

ডোম, নিষাদ প্রভৃতিরা গ্রামের বাহিরে উঁচু জায়গায় বাস করিতেন ; ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরা ইঁহাদের ছুঁইতেন না। নৌকায় ছিল ইঁহাদের যাওয়া আসা ; বাঁশের তাঁত, চাঙাড়ি ইত্যাদি তৈরি ও বিক্রয় ছিল ইঁহাদের বৃত্তি। নলের তৈরী পেটিকা ছাড়িয়া লোকেরা বাঁশের এই সব জিনিস কিনিত। একাধিক চর্যাগীতে এই সব উক্তির সাক্ষ্য বিদ্যমান। বাংলাদেশের নানা জায়গায় এই ধরনের নিম্নজাতীয় যাযাবর নরনারী আজও দেখা যায় ; নৌকাই ইঁহাদের বাড়ীঘর, এবং আজও বাঁশের নানা জিনিস তৈরি করিয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করা ইঁহাদের ব্যবসা। মৎস্যজীবী, তন্তুবায়, ধুনুরী, সূত্রধর প্রভৃতি বৃত্তির লোকদের সাক্ষাৎ চর্যাগীতিতে পাওয়া যায়, এবং তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ বৃত্তির টুকরোটাকরা ছবিও দৃষ্টিগোচর হয়। অন্যত্র নানাপ্রসঙ্গে সে-সব উল্লেখ করিয়াছি। একটি গীতে সূত্রধর বা ছুতোর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"জো তরু ছেব ভেবউ

ন জানই", যে গাছ ছেদন ও ভেদনের কৌশল জানেনা। স্পষ্টতই বোঝা যাইতেছে, এই দুই কর্মেরই একটা বিশেষ কৌশল ছিল যাহা সকলের আয়ত্ত ছিল না।

অন্ত্যজ বর্ণের যাযাবর ডোম-শবর-পুলিন্দ-নিষাদ বেদে প্রভৃতিদেরই অন্যতম বৃত্তি ছিল সাপ-খেলানো, যাদুবিদ্যার নানা খেলা দেখানো ইত্যাদি। সাপের উপদ্রব খুবই ছিল; মনসা-পূজাই তাহার অন্যতম সাক্ষ্য। রাজসভায় জাঙ্গলিক বা বিষবৈদ্য অন্যতম রাজপুরুষ ছিলেন; জাঙ্গুলী সাপেরই অন্য নাম। সাপের কামড়ে অনেককেই প্রাণ দিতে হইত; সেই জন্য ওঝা বা বিষবৈদ্যদের সমাজে একটা স্থান ছিল; ইঁহারাই ছিলেন সাপুড়ে। উমাপতি-ধরের একটি শ্লোকে এই সাপ-খেলানোর সুন্দর বর্ণনা আছে।

ক্ষুদ্রাস্তে ভুজগাঃ শিরাংসি নময়ত্যাদায় যেষামিদং
ভ্রাতর্জাঙ্গলিক ত্বদাননমিলন্মন্ত্রানুবিদ্ধং রজঃ।
জীর্ণস্তেষফণীন যস্য কিমপি ত্বাদৃগগুণীন্দ্রব্রজা-
কীর্ণক্ষ্মাতলধাবনাদপি ভজত্যানম্রভাবং শিরঃ ॥

ভাই জাঙ্গলিক (সাপুড়ে), তোমার এই সাপগুলি ছোট ছোট; তোমার মুখের মন্ত্রপড়া ধূলি ইহাদের মাথা নমিত করিয়া দিতেছে। এই ফণাধারী সাপটি বোধ হয় জীর্ণ (অর্থাৎ প্রবীণ বা অভিজ্ঞ), কেননা তোমার মত গুণী দ্বারা পূর্ণ মাটিতে ধাবন করিয়াও ইহার মাথা নম্রভাব হইতেছে না (অর্থাৎ নমিত হইতেছে না)।

গোবর্ধন-আচার্যের একটি শ্লোকে আছে,

কিং পরজীবৈর্দীব্যসি বিস্ময়মধুরাক্ষি গচ্ছ সখি দূরম্।
অহিমধিচত্বরগগ্রাহী খেলয়তু নির্বিঘ্ন ॥

হে সখি, সাপ খেলা দেখিতে দেখিতে তোমার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া মধুরতর দেখাইতেছে। অতএব, কেন তুমি পরের জীবনকে বিপদাপন্ন করিতেছ? তুমি দূরে সরিয়া যাও, সাপুড়ে প্রাঙ্গণে নির্বিঘ্নে সাপ খেলা দেখাক্।

সর্বানন্দ বলিতেছেন, বেদিয়ারা সাপ-খেলা দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত।

৫

নারী সমাজ

বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে গৌড়ের নারীদের মৃদুভাষিণী, অনুরাগবতী, এবং কোমলাঙ্গী বলিয়া (মৃদুভাষিণ্যোঽনুরাগবত্যো মৃদ্বঙ্গ্যশ্চগৌড়্যঃ) তৃতীয়-চতুর্থ শতকে যে উক্তি করিয়া গিয়াছেন তাহা আজও মোটামুটি সত্য বলিলে ইতিহাসের অপলাপ করা হয় না।

কিন্তু বাৎস্যায়নের উক্তির ভিতর প্রাচীন বাঙালী নারীর সমগ্র ছবিটি পাইতেছিনা ; সে-চিত্র ফুটাইয়া তুলিবার উপাদানও অত্যন্ত স্বল্প। এই অধ্যায়ে এবং অন্যত্র প্রাচীন বাঙালী নারীর কোনো কোনো দিক সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহাদের প্রসাধন, অলংকার, বিলাস-ব্যসন সম্বন্ধে স্বল্প যাহা জানা যায়, তাহা বলিয়াছি ; সভানন্দিনী-বাররামা-দেবদাসীদের সম্বন্ধে বলিয়াছি ; শবরী-ডোম্বীদের জীবন-যাত্রার কিছু কিছু চিত্র ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। সম্পন্ন, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত নারীদের কথাও যেটুকু পাওয়া যায় বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যে, ততটুকু বলিয়াছি। তবু, আরও যাহা বলিবার বাকী রহিয়া গেল তাহা না বলিলে ঐতিহাসিকের কর্তব্য করা হইবেনা ; এই প্রসঙ্গে সে-কর্তব্য পালন করা যাইতে পারে।

গোড়াতেই বলা চলে, বৃহত্তর হিন্দুসমাজের গভীরে (শিক্ষিত নাগর-সমাজের কথা বলিতেছিনা) আজও যে-সব আদর্শ, আচার ও অনুষ্ঠান সক্রিয় প্রাচীন বাঙালী সমাজেও তাহাই ছিল ; যে-সব সামাজিক রীতি ও অনুষ্ঠান পল্লী ও নগরবাসী সাধারণ নারীরা দৈনন্দিন জীবনে আজও পালন করিয়া থাকেন, যে সব সামাজিক বাসনা ও আদর্শ পোষণ করেন, প্রাচীন বাঙালী নারীদের মধ্যেও মোটামুটি তাহাই ছিল সক্রিয়। বাংলার লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যই তাহার প্রমাণ। যে অসবর্ণ বিবাহ আজও বৃহত্তর হিন্দুসমাজে প্রচলিত অথচ সুআদৃত নয়, মাঝে মাঝে তেমন ঘটিয়াও থাকে, এবং সমাজ ক্রমে সেই বিবাহ স্বীকার করিয়াও লয়, প্রাচীন বাংলায়ও অবস্থাটা ঠিক তাহাই ছিল। দশম-একাদশ দ্বাদশ শতকের বাঙালী রচিত স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে অসবর্ণ বিবাহের কোনো বিধান নাই, সবর্ণে বিবাহই ছিল সাধারণ নিয়ম, কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ যে প্রাচীন বাংলায় একেবারে অপ্রচলিত ছিলনা তাহার প্রমাণ সমতট-রাজ লোকনাথের মাতামহ পারশব কেশব। কেশবের পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ কিন্তু মাতা বোধ হয় ছিলেন শূদ্রকন্যা ; কেশবের পারশব পরিচয়ের ইহাই কারণ। কিন্তু তাহাতে কেশবকে সমাজে কিছু হীনতা স্বীকার করিতে হয় নাই, তাঁহার কন্যা গোত্রদেবী বা দৌহিত্র লোকনাথকেও নয়। কিন্তু কেবল সপ্তম শতকেই বোধ হয় নয়, পরেও এই ধরনের অসবর্ণ বিবাহ কিছু কিছু সংঘটিত হইত ; নহিলে পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় সুলতান জলাল্-উদ্-দীন বা যদুর সভাপণ্ডিত ও মন্ত্রী বাঙালী বৃহস্পতি মিশ্র যে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্য নিম্নতর বর্ণ হইতে স্ত্রী গ্রহণে কোনো বাধা নাই, এ-বিধান দিবার কোনো প্রয়োজন হইত না।

বাংলার পাল ও সেন-আমলের লিপিগুলি পড়িলে মনে হয় লক্ষীর মত কল্যাণী, বসুধার মত সর্বংসহা, স্বামীব্রতনিরতা নারীত্বই ছিল প্রাচীন বাঙালী নারীর চিত্তাদর্শ ; বিশ্বস্তা, সহৃদয়া, বন্ধুসমা এবং স্থৈর্য, শান্তি ও আনন্দের উৎসস্বরূপা স্ত্রী হওয়াই ছিল তাঁহাদের একান্ত কামনা। স্বামীর ইচ্ছাস্বরূপিনী হওয়াই তাঁহাদের বাসনা ; এবং

শামুক যেমন প্রসব করে মুক্তা তেমনই মুক্তাস্বরূপ বীর ও গুণী পুত্রের প্রসবিনী হওয়াই সকল বাসনার চরম বাসনা। বন্ধ্যা নারীর জীবন কেহই কামনা করিতেন না। লিপির পর লিপিতে এই সব কামনা, বাসনা ও আদর্শ নানা প্রসঙ্গে বারবার ব্যক্ত হইয়াছে। উচ্চকোটি শিক্ষিত সমাজে মাতা ও পত্নীর সম্মান ও মর্যাদা এই জন্যই বেশ উঁচুই ছিল, সন্দেহ নাই। লিপিগুলিতে উভয়েরই সম্বন্ধ ও সসম্মান উল্লেখ তাহার সাক্ষ্য; কোনো কোনো রাজকার্যে রাজ্ঞীর অনুমোদন গ্রহণও তাহার অন্যতম সাক্ষ্য।

সমসাময়িক নারীজীবনের আদর্শ ও কামনা লিপিমালায় আরও সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে, রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক বিচিত্র নারীচরিত্রের সঙ্গে সমসাময়িক নারীদের তুলনায় এবং প্রাসঙ্গিক উল্লেখের ভিতর দিয়া। ধর্মপালের মাতা দেদ্দদেবীর তুলনা করা হইয়াছে চন্দ্রদেবতার পত্নী রোহিণী, অগ্নিপত্নী স্বাহা, শিবপত্নী সর্বাণী, কুবেরপত্নী ভদ্রা, ইন্দ্রপত্নী পৌলোমী এবং বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীর সঙ্গে। শ্রীচন্দ্রের পত্নী শ্রীকাঞ্চনার তুলনা করা হইয়াছে শচী, গৌরী এবং শ্রীর সঙ্গে। ধবলঘোষের পত্নী সদ্ভাবা তুলিতা হইয়াছেন ভবানী, সীতা এবং বিষ্ণুজায়া পদ্মা, এবং বিজয়সেন-মহিষী বিলাসদেবী লক্ষ্মী এবং গৌরীর সঙ্গে। সমসাময়িক কামরূপ-শাসনাবলীতেও এই ধরনের তুলনাগত উল্লেখ সুপ্রচুর।

মাতার কামনা ছিল শুভ্র নিষ্কলঙ্ক সুদর্শন সন্তানের জননী হওয়া; প্রসবাবস্থায় কামনানুরূপ সন্তান জন্মলাভ করে, এই বিশ্বাসও জননীর মধ্যে সক্রিয় ছিল। শ্রীচন্দ্রের রামপাল লিপিতে সুবর্ণচন্দ্রের নামকরণ সম্বন্ধে একটি সুন্দর ইঙ্গিত আছে। প্রসূতির স্বাভাবিক প্রবণতানুযায়ী সুবর্ণচন্দ্রের মাতার ইচ্ছা হইয়াছিল শুক্লপক্ষে নবোদিত চন্দ্রের পূর্ণ ব্যাসরেখা দেখিবার; তাঁহার সে ইচ্ছা পূরণ হওয়ায় তিনি সোনার মত উজ্জ্বল অর্থাৎ সুবর্ণময় একটি চন্দ্র (অর্থাৎ সুবর্ণচন্দ্ররূপ পুত্র) দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। বাংলাদেশে সাধারণ লোকদের মধ্যে এ-বিশ্বাস আজও সক্রিয় যে শুক্লপক্ষের গোড়ার দিকে নবোদিত চন্দ্রের পূর্ণ গোলকরেখা প্রত্যক্ষ করিলে প্রসূতি চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ সুন্দর সন্তান প্রসব করেন।

সংক্রান্তি ও একাদশী তিথিতে এবং সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণে তীর্থস্নান, উপবাস এবং দানে অনেক নারীই অভ্যস্তা ছিলেন; রাজান্তঃপুরিকারাও ছিলেন। স্বামী ও স্ত্রী একই সঙ্গে দান-ধ্যান করিতেন, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়; স্ত্রী ও মাতারা একক অনেক মূর্তি ও মন্দির ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, দান ধ্যান করিতেছেন এ-রকম সাক্ষ্যও সুপ্রচুর। রামায়ণ-মহাভারতের কথা প্রাচীন বাঙলায় সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত ছিল, এমন কি নারীদের মধ্যেও। মদনপালের মহিষী চিত্রমতিকা দেবী বেদব্যাস-প্রোক্ত মহাভারত আনুপূর্বিক পাঠ ও ব্যাখ্যা করাইয়া শুনিয়াছিলেন, এবং নীতিপাঠক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাস্বরূপ মদনপাল কিছুও ভূমিদানও করিয়াছিলেন।

নারীরা বোধ হয় কখনও কখনও সম্পন্ন অভিজাত গৃহে শিশুধাত্রীর কাজও করিতেন। তৃতীয় গোপালদেব শৈশবে ধাত্রীর ক্রোড়ে শুইয়া খেলিয়া মানুষ হইয়াছিলেন, মদনপালের মনহলি লিপিতে এই রকম একটু ইঙ্গিত আছে। জীমূতবাহনের দায়ভাগ-গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, নারীরা প্রয়োজন হইলে সূতা কাটিয়া, তাঁত বুনিয়া অথবা অন্য কোনো শিল্পকর্ম করিয়া স্বামীদের উপার্জনে সাহায্য করিতেন, কখনো কখনো অর্থলোভে প্ররোচিতা হইয়া স্ত্রীরা স্বামীদের শ্রমিকের কাজ করিতে পাঠাইতেন। এ ব্যাপারে স্ত্রীরা নিয়োগকর্তাদের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণে দ্বিধাবোধ করিতেন না।

একটি মাত্র স্ত্রী গ্রহণই ছিল সমাজের সাধারণ নিয়ম; সাধারণ লোকেরা তাহাই করিতেন। তবে, রাজরাজড়া, সামন্ত মহাসামন্তদের মধ্যে, অভিজাত সমাজে, সম্পন্ন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ একেবারে অপ্রচলিত ছিল না, এবং সপত্নী-বিদ্বেষও অজ্ঞাত ছিল না। দেবপালের মুঙ্গের-লিপিতে, মহীপালের বাণগড়-লিপিতে সপত্নী বিদ্বেষের ইঙ্গিত আছে; আবার কোনো কোনো লিপিতে স্বামী সমভাবে সকল স্ত্রীকেই ভালবাসিতেছেন, সে-ইঙ্গিতও আছে (ঘোষরাবা লিপি)। প্রাচীন বাঙলার লিপিমালায় বহুবিবাহের দৃষ্টান্ত সুপ্রচুর; তবে একপত্নীত্বই যে সুখী পরিবারের আদর্শ তাহা স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপিতে।

প্রাচীন বাঙলায়ও বৈধব্যজীবন নারীজীবনের চরম অভিশাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রথমই ঘুচিয়া যাইত সীমন্তের সিঁদুর, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত প্রসাধন-অলংকার, সমস্ত সুখসম্ভোগ পড়িত খসিয়া। সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যত্র যেমন, প্রাচীন বাঙলায়ও কন্যা বা স্ত্রী হিসাবে ছাড়া নারীদের ধনসম্পত্তিতে কোনো বিধিবিধানগত ব্যক্তিগত অধিকার বা সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিলনা। কিন্তু স্মৃতিকার জীমূতবাহন বিধান দিতেছেন, স্বামীর অবর্তমানে অপুত্রক বিধবা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকারের দাবি করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে জীমূতবাহন অন্যান্য স্মৃতিকারদের বিরুদ্ধ মতামত সব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা বিধান দিতেছেন যে, বিধবা স্ত্রী শুধু খোরাকপোষাকের দাবি ছাড়া আর কিছু করিতে পারেন না, কিংবা মৃত স্বামীর ভ্রাতা এবং নিকট আত্মীয়বর্গের দাবি বিধবা স্ত্রী-র দাবি অপেক্ষা অধিকতর বিধিসঙ্গত, তাঁহাদের বিধান সজোরে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবশ্য একথা বলিয়াছেন, সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক বা দানে বিধবার কোনো অধিকার নাই, এবং তিনি যদি যথার্থ বৈধব্য জীবন যাপন করেন তবেই স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। বিধবাকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বামীগৃহে স্বামীর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বাস করিতে হইবে, প্রসাধন-অলংকার বিলাসবিহীন সংযত জীবন যাপন করিতে হইবে, এবং স্বামীর পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থে যে-সব ক্রিয়াকর্মানুষ্ঠানের বিধান

আছে তাহা পালন করিতে হইবে। স্বামীগৃহে যদি কোনো পুরুষ আত্মীয় না থাকেন তাহা হইলে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহাকে পিতৃগৃহে আসিয়া বাস করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ-গ্রন্থ মতে বিধবাদের মৎস্য, মাংস প্রভৃতি যে কোনো রূপ উত্তেজক পদার্থভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল; বৃহদ্ধর্মপুরাণের বিধানও তাহাই। বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বিধবাদের উপস্থিতি অমঙ্গলসূচক বলিয়া তখনও পরিগণিত হইত, এবং তাঁহারা সাধারণত উৎসব ও অন্যান্য মঙ্গলানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন না। স্বামীর চিতায় সহমরণে যাইবার জন্য তখনও ব্রাহ্মণ্যসমাজ বিধবাদের উৎসাহিত করিতেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বলা হইয়াছে, 'যে-স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায় তিনি স্বামীকে গুরু পাপ হইতে উদ্ধার করেন। নারীর পক্ষে ইহার চেয়ে সাহস ও বীরত্বের কাজ আর কিছু নাই; এই সহমরণের ফলেই স্ত্রী স্বর্গে গিয়া পূর্ণ এক মন্বন্তর স্বামীর সঙ্গে সহবাস করিতে পারেন। স্বামীর মৃত্যুর বহু পরেও একান্ত স্বামীগতচিত্ত হইয়া স্বামীর কোনো প্রিয় বস্তুর সঙ্গে এক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া যে বিধবা আত্মাহুতি দিতে পারেন, তিনিও পূর্বোক্তফল প্রাপ্ত হন।' বৃহদ্ধর্মপুরাণের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, সতীদাহ ও সহমরণপ্রথা প্রাচীন বাংলায়, অন্তত আদিপর্বের শেষ দিকে অজ্ঞাত ছিলনা।

নারীদের যৌনশুচিতা ও সতীত্বের আদর্শ স্মৃতিকারেরা যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই প্রচার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই; সমাজের মোটামুটি আদর্শও তাহাই ছিল, এ-বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ কম। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হয়, বিত্তবান্ নাগর-সমাজে তাহার ব্যতিক্রমও কম ছিল না। আর, পল্লীসমাজের যে-স্তরে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ পুরাপুরি স্বীকৃত ছিল না, আদিম কৌমগত সামাজিক আদর্শ ছিল বলবত্তর, সে-স্তরে যৌনজীবনের আদর্শই ছিল অন্য মাপের, রীতিনীতিও ছিল অন্যতর। হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শদ্বারা তাহার বিচার চলিতে পারেনা। হাড়ি, ডোম, নিষাদ, শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল প্রভৃতিদের বিবাহ ও যৌনজীবনের রীতিনীতি ও আদর্শ কি ছিল, তাহা জানিতে হইলে তাহা আজিকার সাঁওতাল, কোল, হো, মুণ্ডা প্রভৃতিদের ভিতর খুঁজিতে হইবে। ব্রাহ্মণ্য আদর্শ দ্বারা শাসিত সমাজেও অনিচ্ছায় বলপূর্বক ধর্ষিতা নারী তখনকার দিনেও সমাজে পতিত বা সমাজচ্যুত বলিয়া গণ্য হইতেন না; বিধিবদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানেই তাঁহার শুদ্ধি হইয়া যাইত, এ-সাক্ষ্য আমরা পাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। হিন্দুসমাজের নিম্নতম স্তরে বিধবা-বিবাহও একে-বারে অপ্রচলিত ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

নাগর-সমাজের উচ্চকোটি স্তরের নারীরা লেখাপড়া শিখিতেন বলিয়া মনে হয়; পবনদূত কাব্যে নারীদের প্রেমপত্র-রচনার ইঙ্গিত আছে। নানা কলাবিদ্যায় নিপুণতাও তাঁহাদের অর্জন করিতে হইত, বিশেষ ভাবে নৃত্যগীতে। নট গাঙ্গো বা গাঙ্গোকের পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভা সম্বন্ধে সেক-শুভোদয়ায় যে সুন্দর গল্পটি আছে তাহাই এই উক্তির সাক্ষ্য। জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতীও নৃত্যগীতে সুদক্ষা ছিলেন।

বাৎস্যায়নের সাক্ষ্যে মনে হয়, প্রাচীন বাঙলার রাজান্তঃপুরের মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরায় খুব অভ্যস্ত ছিলেন না ; পর্দার আড়াল হইতে তাঁহারা অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন। অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠনময়ীর জীবনই সমাজের উচ্চকোটি স্তরে সাধারণ নিয়ম ছিল বলিয়া মনে করিবার হেতু বিদ্যমান। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-লিপিতে রাজান্তঃপুরের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপিতে আছে, বল্লাল সেন তাঁহার বিজিত শত্রুর রাজলক্ষ্মীকে জয় করিয়া আনিয়াছিলেন পাল্কীতে বহন করিয়া। মনে হয়, সম্ভ্রান্ত মহিলারা পথে ঘাটে যাতায়াতকালে পথযাত্রীদের দৃষ্টি হইতে নিজেদের আড়াল করিয়াই চলিতেন। কেশবসেন সুপুরুষ ছিলেন ; তাঁহার ইদিলপুর লিপিতে দেখিতেছি, তিনি যখন রাজপথে বাহির হইতেন, পৌরসীমন্তিনীরা সৌধশিখরে উঠিয়া তাঁহার রূপ নিরীক্ষণ করিতেন। কিন্তু, পবনদূতে বিজয়পুরের মহিলাদের যে-বর্ণনা পাইতেছি তাহাতে মনে হয়, তাঁহাদের অবগুণ্ঠনের বালাই খুব বেশি ছিলনা। সম্ভ্রান্ত স্তরে যাহাই হউক, সমাজের যে স্তরে নারীদের, হাটে-মাঠে-ঘাটে খাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হইত, নানা কাজে কর্মে শারীরিক শ্রম করিতে হইত তাঁহাদের মধ্যে অবগুণ্ঠিত জীবনযাপনের কোনো সুযোগই ছিলনা, প্রয়োজনও ছিলনা, সে-আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাও ছিলনা। মধ্যবিত্ত কুলমহিলারা অবগুণ্ঠন দিতেন ; বস্তুত, অবগুণ্ঠন ছিল তাঁহাদের কুলমর্যাদা জ্ঞাপনের অন্যতম অভিজ্ঞান। এই মধ্যবিত্ত কুলমহিলাদের জীবনচর্যার একটি সুন্দরছবি রাখিয়া গিয়াছেন কবি লক্ষ্মীধর।

> শিরোযদবগুণ্ঠিতং সহজরূঢ়লজ্জানতং
> গতং চ পরিমন্থরং চরণকোটীলগ্নে দৃশৌ ॥
> বচঃ পরিমিতং চ যন্মধুরমন্দমন্দাক্ষরং
> নিজং তদিয়মঙ্গনা বদতি নূনমুচ্চৈঃ কুলম্ ॥

অবগুণ্ঠিত শির স্বতই লজ্জানত, গমন মন্থর দৃষ্টি পায়ে নিবদ্ধ, বাক্য পরিমিত এবং মৃদুমধুর—এই সব দ্বারা এই মহিলা যেন উচ্চস্বরে নিজের কুলমর্যাদা প্রকাশ করিতেছেন।

বাংলার কবি উমাপতি-ধর বাঙালী নারীর সুন্দর একটি প্রাকৃত অথচ অনন্যসাধারণ ছবি আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এবং সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ছবিটি উদ্ধার করিয়াই এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করা যাইতে পারে। একবসনা পল্লীবাসিনী বাঙালী নারী বনের মধ্যে ঢুকিয়াছেন ফুল আহরণের জন্য ; একটু উঁচুতে নাগালের বাহিরে গাছের ডালে ফুল ফুটিয়া আছে, পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বাহু উপরের দিকে তুলিয়া সুন্দরী ফুল পাড়িতেছেন ; নাভিরন্ধ্র

বসনমুক্ত, একদিকের স্তন প্রকাশিত। সুন্দর অনবদ্য কাব্যময়তায় উমাপতি-ধর ছবি আঁকিয়াছেন ঃ

দূরোদঞ্চিত বাহুমূলবিলসচ্চীন প্রকাশ স্তনা—
ভোগব্যয়ত মধ্যলম্বিবসনানির্মুক্ত নাভিহ্রদা।
আকৃষ্টোজ্ঝিত-পুষ্প মঞ্জরিরজ: পাতাবরুদ্ধেক্ষনা
চিম্বত্যাঃ কুসুমং ধিনোতি সুদৃশঃ পাদাগ্র দুস্থা তনুঃ॥

একাদশ অধ্যায়ের পাঠ পঞ্জী

এমন কোনও একক উৎসের খবর আমার জানা নেই, যেখানে ইতিহাসের কোনও পর্ববিশেষে প্রাচীন বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের কোনও মোটামুটি সম্পূর্ণ চিত্র ও প্রকৃতি ধরা পড়ে। মূল গ্রন্থে যে-চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে তার উৎস নানা গ্রন্থে নানা লিপিতে ইতস্তত প্রাচীন তথ্যাদি ; সে সব তথ্যের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকটির উৎস ও কাল উল্লেখ করা হয়েছে। লিপিগুলির তালিকা পরিশিষ্ট "খ"-তে পাওয়া যাবে। আর, যে-সব প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান প্রধান হচ্ছে কলহনের রাজতরঙ্গিণী, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রম্ চর্যাগীতি, জীমূতবাহনের কাল বিবেক, দায়ভাগ ও পিতৃদয়িত, ধোয়ীর পবনদূতম, প্রাকৃতপৈঙ্গল, বাৎস্যায়নের কামসূত্রম, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরান, ভবদেব ভট্টের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ ও কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতিতে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা, শ্রীধরদাসের সদুক্তি কর্ণামৃত' শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত, সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত, ক্ষেমেন্দ্রের দশোপদেশ প্রভৃতি।

আধুনিক কয়েকটি বাঙলা ও ইংরেজি বই ও নিবন্ধ আমার কাজে লেগেছে ; তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেওয়া হচ্ছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধ গান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সং ; শশিভূষণ দাশগুপ্ত, চর্যাগীতিতে বাঙ্গালী সমাজ (?), বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৪ ; সুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী' বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ গ্রন্থমালা, বিশ্ব-ভারতী ; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ; Bagchi, Prabodh Chandra, Materials for a critical edition of the Bengali Caryapadas, Calcutta University ; Chakravarty, Taponath, "Women in the early inscriptions of Bengal," B. C, Law Festschrift, Vol, II, p. 243 ff ; Dacca University, History of Bengal, Vol. I, Dacca Ist. edn., Chap. XV. ; Dikshit, K. N. excavations at Paharpur, A S I Memoir no. 55 ; Hazra R. C., Studies in the Puranic Records on Hindu rites and customs ; Dacca, 1940 ; Ramachandran, T. N., "Recent archaeological discoveries along the Mainamati and Lalmai ranges", B, C. Law festschrift. Vol. II, p. 213 ff.

দ্বাদশ অধ্যায়

ধর্মকর্ম ঃ ধ্যান-ধারণা

১

প্রাচীন বাঙালীর ধর্মকর্মগত জীবনের সুস্পষ্ট একটি চিত্ররচনা দুরূহ। স্বভাবতই ধর্মকর্মগত মানস-জীবন ব্যবহারিক জীবন অপেক্ষা অনেক বেশি জটিল। তাহার উপর, বর্ণ, শ্রেণী ও কোমবিন্যস্ত সমাজে সে-জীবন জটিলতর হইতে বাধ্য। ধর্মকর্ম ভাবনা ও সংস্কার বর্ণ, শ্রেণী ও কোমভেদে পৃথক; একই কালে একই বিশ্বাস বা একই পূজা ইত্যাদির রূপ সমাজের সকল স্তরে এক নয়, বিভিন্নকালে বিভিন্ন দেশখণ্ডে তো নয়ই। তা ছাড়া, নূতন কোনো বিশ্বাস বা সংস্কার বা পূজানুষ্ঠান ইত্যাদি সমাজে সহসা প্রচার লাভ করেনা; তাহার প্রত্যেকটির পশ্চাতে বহুদিনের ধ্যান ও ধারণা, অভ্যাস ও সংস্কার লুকানো থাকে, এবং সমাজের ভিতরে ও বাহিরে নানা গোষ্ঠী, নানা স্তর, নানা কোমের ভক্তি-বিশ্বাস-পূজাচার প্রভৃতির যোগাযোগের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাসও আত্মগোপন করিয়া থাকে; কালে কালে সেই ইতিহাস বিবর্তিত হইয়া সমসাময়িক কালের রূপ গ্রহণ করে মাত্র, এবং তাহাও একান্তই সমসাময়িক সমাজ-ভাবনা ও চেতনানুযায়ী, সমসাময়িক সামাজিক শ্রেণী ও স্তর বিশেষ অনুযায়ী। কোনো শ্রেণীগত বা কোমগত বিশ্বাস বা সংস্কারই আবার একান্তভাবে সেই শ্রেণী বা কোমের মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকে না, অন্যান্য শ্রেণী ও কোম, স্তর ও উপস্তরের সঙ্গে পরস্পর যোগাযোগের ফলে এবং সেই যোগাযোগের শক্তি ও পরিমাণ অনুযায়ী এক শ্রেণী ও কোমের, স্তর ও অংশের ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস, অনুষ্ঠান প্রভৃতি অন্য শ্রেণী ও কোমে, স্তর ও অংশে সঞ্চারিত হয়, এবং দ্রুত বা দীর্ঘ মিলন বিরোধের ভিতর দিয়া অনবরতই নূতন নূতন ধ্যান-ধারণ, ভক্তি-বিশ্বাস, অনুষ্ঠানউপাচার প্রভৃতি সৃষ্টি লাভ করিতে থাকে। যে-শ্রেণী বা কোমের আত্মিক ও ব্যবহারিক শক্তি বেশি সেই শ্রেণী বা কোমের ধর্মকর্মগত জীবন অধিকতর সক্রিয়, এবং তাহারা যেমন অন্য শ্রেণী ও কোমের ধর্মকর্মগত জীবনকে বেশি প্রভাবান্বিত করে, তেমনই নিজেরাও সে-জীবন দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, দুইই একই সঙ্গে সমান গতিতেই চলে এবং সমন্বয় চলিতে থাকে স্থূল লোকচক্ষুর আড়ালে একটা জটিল সমন্বয়ের দিকেই সমানেই চলিতে থাকে।

সমন্বয়

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই সমন্বয়ের গতি-প্রকৃতি সমাজবিজ্ঞানীর চোখে বহুদিন ধরা পড়িয়াছে এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক জনতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলাপ-আলোচনা যত

অগ্রসর হইতেছে ততই আমরা স্পষ্ট জানিতেছি, আজ আমরা যাকে হিন্দু ধর্মকর্মসাধনা বলিয়া দেখি, বা যাহাকে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সাধনা বলিয়া জানি তাহা একদিকে আর্য ও অন্যদিকে প্রাক্-আর্য বা অনার্য ধর্মকর্মসাধনার সমন্বিত রূপ মাত্র। অরণ্যচারী হিংস্র উলঙ্গ অর্ধমানবের বোম হইতে আরম্ভ করিয়া কত শ্রেণী, কত স্তর, কত দেশখণ্ডের মানুষের ধর্মকর্মসাধনা যে এই চলমান আর্য-ব্রাহ্মণ্য স্রোতপ্রবাহে তাহাদের ক্ষীণ ও বেগবান্ প্রবাহ মিশাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বস্তুত, আর্য-ব্রাহ্মণ্য সাধনায় যথার্থ আর্যপ্রবাহ মূলত ক্ষীণ, ক্রমে ক্রমে কালে কালে নানা বিচিত্র সংস্কৃতি সে-প্রবাহে সমন্বিত হওয়ার ফলে আজ সে-প্রবাহ প্রশস্ত ও বেগবান। সচেতন সক্রিয়তায় সমন্বয়ের এই কাজটির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ নায়কেরা, এ-কথা যেমন সত্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিরোধটাও তাঁহাদের দিক হইতেই দেখা দিয়াছিল, এ-কথাও তেমন সত্য। কিন্তু, প্রাথমিক বিরোধের পর স্বীকৃতি যখন অনিবার্য হইয়া উঠল তখন সমন্বয়ের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণের নায়কত্ব তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই। অন্য দিকে, প্রাক্-আর্য বা অনার্য আদিবাসীরা যে বিনা বাধায় বা বিনা বিরোধে আর্য বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মের আদর্শ বা অনুষ্ঠান ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন বা চলমান প্রবাহে নিজেদের ধারা মিশাইয়াছিলেন, তাহাও নয়। জৈব প্রকৃতিই হইতেছে সেই জিনিস যাহা নিজের বিশ্বাস ও সংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখা; চলমান আর্যপ্রবাহে স্বীকৃতি লাভের পরও বহু বিশ্বাস বহু সংস্কার বহু আচারানুষ্ঠান এই জৈব প্রকৃতির বশেই নিজেদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। কালে কালে ক্রমে ক্রমে তাহার কিছু কিছু চলমান প্রবাহে স্বীকৃতিলাভ করিয়া তাহার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, হয় অবিকৃত না হয় বিবর্তিত রূপে। অবান্তর হইলেও উল্লেখ করা প্রয়োজন, আর্য-অনার্যের এই সমন্বয় ক্রিয়া আজও চলিতেছে, আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্ম আজও লোকায়ত অনার্য ধর্মকর্মের অনেক আচারানুষ্ঠান, দেবদেবী ধীরে ধীরে নিজের কুক্ষিগত করিতেছে, কোথাও তাহাদের চেহারার আমূল পরিবর্তন করিয়া, কোথাও একেবারে অবিকৃত রূপে। বাংলাদেশে মোটামুটি খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে আর্যধর্মের প্রবাহ প্রবলতর হওয়ার সময় হইতেই সদ্যোক্ত সমন্বয় ক্রিয়া চলিতে আরম্ভ করে; মধ্যযুগে এই সমন্বয়-সাধনা সামাজিক চেতনার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং আজও তা চলিতেছে লোকচক্ষুর অগোচরে।

বাঙালীর ইতিহাসের আদিপর্বে এই সমন্বয় সাক্ষ্য খুব বেশি উপস্থিত নাই, কিন্তু তখনকার দিনের বাঙালী সমাজে ও বাংলা সংস্কৃতিতে এর চেয়ে বড় সত্য কমই আছে। বস্তুত, বাঙালীর ধর্মকর্মের গোড়াকার ইতিহাস হইতেছে রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কোমের, এক কথায় বাংলার আদিবাসিদেরই পূজা, আচার, অনুষ্ঠান, ভয় বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস। শুধু বাঙালীরই বা বলি কেন,

আর্যপূর্ব ও আর্যেতর ধর্ম

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোকদের ধর্মকর্ম সম্বন্ধেই এ-কথা সত্য। এ-তথ্য সর্বজনস্বীকৃত যে, আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস সংস্কার ও আচারানুষ্ঠান, নানা দেবদেবীর রূপ ও কল্পনা, আহার-বিহারের ছোঁয়াছুঁয়ি অনেক কিছুই আমরা সেই আদিবাসীদের নিকট হইতেই আত্মসাৎ করিয়াছি। বিশেষভাবে, হিন্দুর জন্মান্তরবাদ, পরলোক সম্বন্ধে ধারণা, প্রেততত্ত্ব, পিতৃতর্পণ, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধাদি সংক্রান্ত অনেক অনুষ্ঠান, আভ্যুদয়িক ইত্যাদি সমস্তই আমাদেরই প্রতিবাসীর এবং আমাদের অনেকেরই রক্তস্রোতে বহমান সেই আদিবাসী রক্তের দান। হিন্দুর ধর্মকর্মের গোড়ায় এ কথাটা না জানিলে অনেকখানিই অজানা থাকিয়া যায়।

বাঙালীর ইতিহাস বলিতে বসিয়া বাংলার কথাই বিশেষভাবে বলি; সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়া লাভ নাই। গ্রন্থারম্ভে এক অধ্যায়ে বলিয়াছি, ভারতীয় আদিবাসিরা, অন্যান্য দেশের অনেক আদিবাসিদের মতে, বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফল, ফুল, পশু, পক্ষী, বিশেষ বিশেষ স্থান ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিত; এখনও খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশী, বুনো, শবর ইত্যাদি কোমের লোকেরা তাহাই করিয়া থাকে। বাংলাদেশে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজের মেয়েদের মধ্যে, বিশেষত পাড়াগাঁয়ে, গাছপূজা এখনো বহুল প্রচলিত, বিশেষভাবে তুলসী গাছ, সেওড়া গাছ ও বটগাছ। অনেক পূজায় ও ব্রতোৎসবে গাছের একটা ডাল আনিয়া পুঁতিয়া দেওয়া হয়, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মস্বীকৃত দেবদেবীর সঙ্গে সেই গাছটিরও পূজা হয়। আমাদের সমস্ত শুভানুষ্ঠানে যে আম্রপল্লবের ঘটের প্রয়োজন হয়, যে-কলাবৌর পূজা হয়, অনেক ব্রতে যে ধানের ছড়ার প্রয়োজন হয়, এ-সমস্তই সেই আদিবাসিদের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের এবং বিশ্বাস ও ধারণার স্মৃতি বহন করে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, এই সব ধারণা, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান আদিম কৃষি ও গ্রামীণ সমাজের গাছ-পাথর পূজা, প্রজনন শক্তির পূজা, পশুপক্ষীর পূজা প্রভৃতির স্মৃতি বহন করে। বিশেষ বিশেষ ফলমূল সম্বন্ধে আমাদের সমাজে যে সব বিধিনিষেধ প্রচলিত, যে সব ফলমূল—যেমন আক, চাল-কুমড়, কলা ইত্যাদি—আমাদের পূজার্চনায় উৎসর্গ করা হয়, আমাদের মধ্যে যে নবান্ন উৎসব এবং আনুসাঙ্গিক অনুষ্ঠান প্রচলিত, আমাদের ঘরের মেয়েরা যে সব ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি করিয়া থাকেন, বস্তুত, আমাদের দৈনন্দিন অনেক আচারানুষ্ঠানই বাংলার আদিমতম জন ও কোমদের ধর্মবিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। আমাদের নানা আচারানুষ্ঠানে, ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আজও ধান, ধানের গুচ্ছ, ধানদুর্বার আশীর্বাদ, কলা, হলুদ, সুপারি, পান, নারিকেল, সিন্দুর, কলাগাছ, ঘট, ঘটের উপর আঁকা প্রতীক চিহ্ন, নানা প্রকার আলপনা, গোবর, কড়ি, প্রভৃতি অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। বস্তুত,

আমাদের আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে যাহা কিছু শিল্প-সুষমাময় তাহার অনেকখানিই এই আদিবাসিদের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশে, বিশেষভাবে পূর্ব-বাংলায়, এক বিবাহ-ব্যাপারেই পানখিলি, গাত্রহরিদ্রা, গুটিখেলা, ধান ও কড়ির স্ত্রী আচার, খৈ ছড়ানো, লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপনা, দধিমঙ্গল প্রভৃতি সমস্তই আদিবাসিদের দান বলিয়া অনুমিত। বস্তুত, বিবাহ-ব্যাপারে সম্প্রদান, যজ্ঞ, এবং সপ্তপদী অর্থাৎ মন্ত্র অংশ ছাড়া আর সবটাই অবৈদিক, অস্মার্ত ও অব্রাহ্মণ্য। অন্যান্য অনেক ব্যাপারেও তাই। পূজার্চনার মধ্যে ঘটলক্ষ্মীর পূজা, ষষ্ঠীপূজা, মনসাপূজা, লিঙ্গ-যোনী পূজা, শ্মশান-শিব ও ভৈরবের পূজা, শ্মশান-কালী পূজা প্রভৃতির প্রায় সব বা অধিকাংশই মূলত এই সব আদিবাসিদের ধর্মকর্মানুষ্ঠান হইতেই আমরা গ্রহণ করিয়াছি, অল্পবিস্তর রূপান্তর ও ভাবান্তর ঘটাইয়া। এই সব আচারানুষ্ঠানের প্রত্যেকটির সুবিস্তৃত বিশ্লেষণ এবং ইহাদের রহস্য উদ্ঘাটন আমাদের সাংস্কৃতিক জনতত্ত্বের আলোচনা-গবেষণার বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়; মাত্র দুই চারিটি আচারানুষ্ঠানের জীবনেতিহাস আমরা জানি, যেমন চড়কপূজা, হোলী, ষষ্ঠীপূজা, চণ্ডী-দুর্গা-কালী প্রভৃতি মাতৃকাতন্ত্রের পূজা, মনসাপূজা, পৌষপার্বন, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি। আগেও বলিয়াছি, এবং একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, এই সব আচারানুষ্ঠানের অনেকগুলিই মূলত গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের প্রধানতম ও আদিমতম ভয়-বিস্ময়-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকল কথা বলিবার বা আলোচনা-গবেষণার স্থান ও সুযোগ এই গ্রন্থ নয়, উপায়ও নাই; তবু ইঙ্গিতটুকু ধরিয়া না দিলে বাঙালীর ধর্মকর্মানুষ্ঠানের গোড়ার কথাটি, তাহার অন্তর্নিহিত অর্থটি বুঝা যাইবেনা।

২

এই ইঙ্গিত ধরিবার উপাদান উপকরণ সুপ্রচুর, এবং তাহা বাঙলার সর্বত্র পথে ঘাটে, বাঙালীর জীবনচর্যার নানাক্ষেত্রে ইতস্তত ছড়াইয়া আছে। সাংস্কৃতিক জনতত্ত্ব লইয়া যাঁহারা আলোচনা-গবেষণা ইত্যাদি করিয়া থাকেন তাঁহারা এ-সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয়, আমাদের ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের দিক্ হইতে এই সব ইঙ্গিত ফুটাইবার প্রয়োজনীয়তা আজও খুব স্বীকার করেন না। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় জরীপ ও অনুসন্ধান যে-ভাবে হইয়া থাকে, এ-ক্ষেত্রে আজও তাহার সূত্রপাতই হয় নাই। অথচ, বহুদিন আগে বহুভাবে রবীন্দ্রনাথ এ-সম্বন্ধে আমাদের সজাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই প্রেরণায় কিছু কিছু কাজও কেহ কেহ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে-কাজ জন-বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে করা হয় নাই বলিয়া তাহা আজও যথার্থ ফলপ্রসূও হয় নাই।

অথচ, আজিকার দিনে কিংবা আদি ও মধ্যযুগে 'ভদ্র', উচ্চস্তরের বাঙালী জীবনে যে ধর্মকর্মানুষ্ঠানের প্রচলন আমরা দেখি ও যাহাকে আমরা বাঙালীর ধর্মকর্ম-জীবনের

বিশিষ্টতম ও প্রধানতম রূপ বলিয়া জানি, অর্থাৎ বিষ্ণু, শিব, সূর্য, দেবী, গণেশ, অসংখ্য বৌদ্ধ, জৈন, শৈব ও তান্ত্রিক বিচিত্র দেবদেবী লইয়া আমাদের যে ধর্মকর্মের জীবন তাহা একান্তই আর্য ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন-তান্ত্রিক ধর্মকর্মের চন্দনানুলেপনমাত্র এবং তাহা, সংস্কৃতির গভীরতা ও ব্যাপকতার দিক্ হইতে, একান্তই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে ধর্মকর্মময় সাংস্কৃতিক জীবন বাঙালীর জীবনের গভীরে বিস্তৃত, যে-জীবন নগরের সীমা অতিক্রম করিয়া গ্রামে কুটীরের কোনে, চাষীর মাঠে, গৃহস্থের আঙিনায়, ফসলের ক্ষেতে, গ্রাম্য সমাজের চণ্ডীমণ্ডপে, বারোয়ারী তলায়, নদীর পাড়ে বটের ছায়ায়, জনহীন শ্মশানে অন্ধকার অরণ্যে, নৃত্য-সঙ্গীত-পূজা-আরাধনার বিচিত্র আনন্দে, দুঃখ-শোক-মৃত্যুর বিচিত্র লীলায় বিস্তৃত, সেই ধর্মকর্মময় সংস্কৃতি আর্য-মনের, আর্য ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন-তান্ত্রিক ধর্মকর্মের সাধনা ও অনুষ্ঠানের নীচে চাপা পড়িয়া আছে। এই চাপা পড়ার ফলে কোথাও কোথাও সেই জীবনের কণ্ঠ ও নিশ্বাসরোধে একেবারে মরিয়া গিয়াছে, তাহার নিষ্প্রাণ কঙ্কাল শুধু বর্তমান, কোথাও কোথাও উপরের স্তরের চক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া এখনও বাঁচিয়া আছে—নিশীথ অন্ধকারে লোকালয় অতিক্রম করিয়া ভয়কম্পিত হৃদয়ে সুদীর্ঘ সঙ্কটময় পথ ধরিয়া নদীর ধারে বা প্রান্তরের সীমান্তে শ্মশানের ধারে গিয়া লোকালয়েরই লোক সেই সংস্কৃতির পাদমূলে একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া তেমনই নিভৃতে গোপনে ফিরিয়া আসে। আবার কোথাও কোথাও নিজেরই প্রাণশক্তির জোরে সে তাহার নিজের একটু স্থান করিয়া লইয়াছে আর্য ধর্মকর্মের একটি প্রান্তে; আবার অন্যত্র হয়তো প্রাণশক্তির প্রাবল্যে আর্য ধর্মকর্মের ভাব ও রূপ উভয়ই দিয়াছে বদলাইয়া। এই বৃদ্ধ ও মৃত, মরণোন্মুখ অথবা চলমান ধর্মকর্ম স্রোতের সকল চিহ্ন তুলিয়া ধরিবার উপায় এখানে নাই; দুই চারিটি ইঙ্গিত তুলিয়া ধরা চলে মাত্র।

বাংলাদেশে পল্লীগ্রামের কৃষিজীবনের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন, মাঠে হল চালনার প্রথম দিনে, বীজ ছড়াইবার, শালিধান বুনিবার, ফসল কাটিবার বা ঘরে গোলায় তুলিবার আগে নানা প্রকারের আচারানুষ্ঠান বাংলার নানা জায়গায় আজও প্রচলিত। এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই বিচিত্র শিল্পসুষমায় এবং জীবনের সুসম আনন্দে মণ্ডিত; কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, ইহার একটিতেও সাধারণত কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এই সব পূজানুষ্ঠানের অধিকারী। নবান্ন উৎসব বা নূতন গাছের বা নূতন ঋতুর প্রথম ফল ও ফসলকে কেন্দ্র করিয়া যে সব পূজানুষ্ঠান আমাদের মধ্যে প্রচলিত তাহার মূলেও একই চিত্তধর্মের একই বিশিষ্ট প্রকৃতি সক্রিয়। শুধু কৃষিজীবনকে আশ্রয় করিয়াই নয়, শিল্পজীবনেও দেখা যায়, বিশেষ বিশেষ দিনে কামারের হাঁপর, কুমোরের চাক, তাঁতীর তাঁত, চাষীর লাঙল, ছুতোর-রাজমিস্ত্রীর কারুযন্ত্র প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া এক ধরনের ধর্মকর্মানুষ্ঠান আজও প্রচলিত; তাহারই কিছুটা আর্যীকৃত সংস্কৃতরূপ আমরা বিশ্বকর্মাপূজার মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু

মূলত এই ধরনের পূজাচারেও ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের কোনো প্রয়োজন হয় না। উৎপাদন যন্ত্রের এই পূজাচারের সঙ্গে আদিবাসিদের প্রজনন শক্তির পূজাচারের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যাহাই হউক, এই সব গ্রাম্য কৃষি ও কারুজীবনের পূজাচারকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙালীর ধর্মকর্মময় জীবনের অনেক সৃষ্টির আনন্দ ও উদ্যোগ, শিল্পময় জীবনের অনেক মাধুর্য ও সৌন্দর্য, এই সব আচারানুষ্ঠানের অনেক আবহ ও উপচার আমাদের 'ভদ্র'স্তরের আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে অনুসৃত হইয়া গিয়াছে।

গ্রাম-দেবতা

অনেকে নিশ্চয়ই জানেন, বাঙলার পাড়াগাঁয়ে সর্বত্রই গ্রামের বাহিরে জনপদসীমার বাহিরে 'থান' বা 'স্থান' বলিয়া একটা জায়গা নির্দিষ্ট থাকে; কোথাও কোথাও এই 'থান' উন্মুক্ত আকাশের নীচে বা গাছের ছায়ায়; কোথাও কোথাও গ্রামবাসীরা তাহার উপর একটা আচ্ছাদনও গড়িয়ে দেয়। এই 'থান' বা স্থানে—সংস্কৃতরূপে দেবস্থান বা দেওথান—মূর্তিরূপী কোনো দেবতা অধিষ্ঠিত কোথাও থাকেন, কোথাও থাকেন না, কিন্তু থাকুন বা না-ই থাকুন, সর্বত্রই তিনি পশু ও পক্ষী বলি গ্রহণ করিয়া থাকেন। গ্রামবাসীরা তাঁহার নামে 'মানৎ' করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ভয়ভক্তি করেন, এবং যথারীতি তাঁহাকে তুষ্ট রাখার চেষ্টাও করেন সকলেই, কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, গ্রামের ভিতরে বা লোকালয়ে তাঁহার কোনো স্থান নাই। 'গ্রাম-দেবতা' সর্বত্র একই নামে বা একই রূপে পরিচিত নহেন; সাম্প্রতিক বাঙলায় কোথাও তিনি কালী, কোথাও ভৈরব বা ভৈরবী, কোথাও বনদুর্গা বা চণ্ডী, কোথা বা অন্য কোনো স্থানীয় নামে পরিচিত। কিন্তু যে নামেই পরিচিত তিনি হউন, পুরুষ বা প্রকৃতি-তন্ত্রেরই হউন, সংশয় নাই যে, সর্বত্রই তিনি প্রাক-আর্য আদিম গ্রামগোষ্ঠীর ভয়-ভক্তির দেবতা। আদিবাসীদের এই সব গ্রাম্য দেবতাদের প্রতি আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি খুব শ্রদ্ধিতচিত্ত ছিল না। ব্রাহ্মণ্য বিধানে গ্রাম্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ, মনু তো বারবার এই সব দেবতার পূজারীদের পতিতই বলিয়াছেন। কিন্তু কোনো বিধান, কোনো বিধিনিষেধই ইঁহাদের পূজা ঠেকাইয়া রাখিতে আজও পারে না, আগেও পারে নাই। ইঁহাদের কেহ কেহ ক্রমশ ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন, এমনও বিচিত্র নয়। শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, নানাপ্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ডমালিনী শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি অনার্য্য গ্রাম্য দেবদেবীরা এইভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মকর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; দুই চারি ক্ষেত্রে তাহার কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়। পরে তাহা বলিতেছি।

ধ্বজ। পূজা।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন, গরুড়ধ্বজা, মীনধ্বজা, ইন্দ্রধ্বজা, ময়ূরধ্বজা, কপিধ্বজা প্রভৃতি নানাপ্রকারের ধ্বজাপূজা ও উৎসব এক সময় আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাঙলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম ছিল না ; ঐতিহাসিক প্রমাণও কিছু কিছু আছে। শক্রধ্বজা বা ইন্দ্রধ্বজের পূজা যে একাদশ শতকের আগে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ তো গোবর্ধন আচার্যই রাখিয়া গিয়াছেন। শক্রোত্থান বা শক্রধ্বজা পূজার কথা জীমূতবাহনের কালবিবেক-গ্রন্থেও পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, হংসধ্বজ প্রভৃতি নাম প্রাচীন কালের রাজ-রাজড়ার ভিতর একেবারে অপ্রতুল নয়। এক এক কোম বা গোষ্ঠীর এক এক পশু বা পক্ষী-লাঞ্ছিত ধ্বজা ; সেই ধ্বজার পূজাই বিশেষ গোষ্ঠীর বিশিষ্ট কোমগত পূজা এবং তাহাই তাঁহাদের পরিচয় ; সেই কোমের যিনি নায়ক বিশেষ বিশেষ লাঞ্ছন অনুযায়ী তাঁহার নাম তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, বা হংসধ্বজ। এই ধরনের পশু বা পক্ষীলাঞ্ছিত পতাকার পূজা আদিম পশুপক্ষী হইতেই উদ্ভূত ; বহু পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক দেবদেবীর রূপ-কল্পনায় তাহা পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই। প্রমাণ, আমাদের বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন, দেবীর বাহন সিংহ, কার্তিকের বাহন ময়ূর, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, শিবের বাহন নন্দী, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচক, সরস্বতীর বাহন হংস, ব্রহ্মার বাহন হংস, গঙ্গার বাহন মকর, যমুনার বাহন কূর্ম, সমস্তই সেই আদিম পশুপক্ষী পূজার অবশেষ। আদিম কোমগত পূজার উপর ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সঙ্গে এই সব পশুপক্ষীরাও আজও আমাদের পূজা লাভ করে, সন্দেহ কি ? দেবদেবীর মূর্তিপূজার সঙ্গে এই সব ধ্বজাপূজার প্রচলন সুপ্রাচীন। দেবী বা মন্দিরের সম্মুখে স্তম্ভের উপর বা মন্দিরের চূড়ায় উড্ডীয়মান ধ্বজা বা কেতনের পূজা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক বেশনগরের (মান্দাশোর, মধ্যভারত) সেই গরুড়ধ্বজ, তালধ্বজ মকরকেতন প্রভৃতির পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া আজিকার চড়কপূজা, ধর্মপূজা, অশ্বত্থ ও অন্যান্য বৃক্ষপূজা পর্যন্ত সর্বত্রই বর্তমান। সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাসিয়া, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি আদিবাসী কোম এবং বাঙালীর তথাকথিত অন্ত্যজ বা নিম্নস্তরের জন-সাধারণের মধ্যে কোন ধর্মকর্ম ধ্বজা এবং ধ্বজাপূজা ছাড়া অনুষ্ঠিতই হয় না প্রায় বলা চলে। সমস্ত উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত জুড়িয়া ধর্মস্থান বা 'থানে'র সঙ্গে ধ্বজা এবং ধ্বজাপূজার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য।

গাছপূজা

গাছপূজা, নানা প্রকারের মাতৃআর্য়ি দেবীর পূজা, ক্ষেত্রপালের পূজা, নানা লৌকিক দেবতা-উপদেবতার পূজার কথা আগেই বলিয়াছি। গ্রামের উপান্তে বসতির বাহিরে যে-সব জায়গায় এই সব অনুষ্ঠান হইত এবং এখনও হয় সেই সব পূজাস্থানকে আশ্রয়

করিয়া বাঙলার নানাজায়গায় নানা-তীর্থস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ধরনের গাছ বা অন্যান্য গ্রাম্য লৌকিক দেবদেবীর পূজার কিছু কিছু বিবরণ বাঙালীর প্রাচীনতম সাহিত্যে বিবৃত হইয়া আছে। বটগাছের পূজা সম্বন্ধে কবি গোবর্ধন-আচার্যের একটি শ্লোক আছে ঃ

ত্বয়ি কুগ্রাম বটদ্রুম বৈশ্রবণো বসতু বা লক্ষ্মীঃ।
পামরকুঠারপাতাৎ কাসরশিরসৈব তে রক্ষা ॥

হে কুগ্রামের বটগাছ, তোমার মধ্যে বৈশ্রবণের (কুবের) অথবা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান থাকুক বা না থাকুক, মূর্খ গ্রাম্য লোকের কুঠারাঘাত হইতে তোমাকে রক্ষা করে শুধু মহিষের শৃঙ্গ তাড়না।

সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকে গ্রাম্য লৌকিক দেবদেবী পূজার একটি ভাল বিবরণ পাওয়া যায়।

তৈস্তৈর্জীবোপহারৈর্গিরি কুহরশিলা সংশ্রয়ামর্চয়িত্বা
দেবীং কান্তারদুর্গাং রুধিরমুপতরু ক্ষেত্রপালায় দত্বা।
তুম্বীবীণা বিনোদ ব্যবহৃত সরকামহি জীর্ণে পুরাণীং
হালাং মালুরকোষৈর্যুবতি সহচরা বর্বরাঃ শীলয়ন্তি ॥

বর্বর [গ্রাম্যলোকেরা] নানা জীববলি দিয়া পাথরের পূজা করে, রক্ত দিয়া কান্তারদুর্গার পূজা করে, গাছতলায় ক্ষেত্রপালের পূজা করে, এবং দিনের শেষে তাহাদের যুবতী সহচরীদের লইয়া তুম্বীবীণা বাজাইয়া নাচগান করিতে করিতে বেলের খোলায় মদ্যপান করিয়া আনন্দে মত্ত হয়।

কৃষিকর্ম সংক্রান্ত নানাপ্রকার দেবদেবীর পূজার কথাও আগেই বলিয়াছি। আখ-মাড়াই ঘরের (বা যন্ত্রের ?) যিনি ছিলেন দেবতা তিনি পণ্ডাসুর (পুণ্ড্রাসুর) নামে খ্যাত, আর পুণ্ড্র বা পুঁড় যে এক প্রকারের আখ তাহা তো অন্য প্রসঙ্গে একাধিকবার বলিয়াছি। উত্তর ও পশ্চিম-বঙ্গে এই পণ্ডাসুরের পূজা এখনও প্রচলিত ; সেখানে তিনি পড়াসর (সংস্কৃতীকরণ, পরাশর) নামে খ্যাত। এর পূজার অর্বাচীন একটি মন্ত্র এইরূপ ঃ

পণ্ডাসুর ইহাগচ্ছ ক্ষেত্রপাল শুভপ্রদ।
পাহি মামিক্ষুযন্ত্রেস্তং তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ ॥
পণ্ডাসুর নমস্তুভ্যামিক্ষুবাটি নিবাসিনে।
যজমান হিতার্থায় গুড়বৃদ্ধিপ্রদায়িনে ॥

যাত্রা

ধ্বজা বা কেতনপূজার মত নানাপ্রকারের যাত্রাও বাঙলার আদিবাসী কোমগুলির অন্যতম প্রধান উৎসব বলিয়া গণ্য করা হইত। রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি

ধর্মোৎসব মূলত তাঁহাদেরই ; পরে ক্রমশ ইহাদের আর্যীকরণ নিষ্পন্ন হইয়াছে। লৌকিক ধর্মোৎসবে এই ধরনের যাত্রা বা সচল নৃত্যগীতসহ সামাজিক ধর্মানুষ্ঠানের বিবরণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও প্রাচীন বৌদ্ধ সংযুত্তনিকায়-গ্রন্থে জানা যায়। আর্য ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উচ্চ কোটির লোকেরা বোধ হয় এই ধরনের সমাজোৎসব ও যাত্রা খুব পছন্দ করিতেন না ; সেইজন্যই সম্রাট অশোক সমাজোৎসবের বিরুদ্ধে অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনো রাজকীয় অনুশাসনই লোকায়ত ধর্মের এই লৌকিক প্রকাশকে চাপিয়া রাখিতে পারে নাই ; জনসাধারণের ধর্মোৎসব ক্রমশ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল, এবং তাহারই ফলে রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি ধর্মোৎসবের প্রচলন আজও অব্যাহত। প্রাচীন বাঙলাদেশে প্রচলিত স্নানযাত্রাগুলির মধ্যে অগস্ত্যার্ঘ্যযাত্রা (দশহরার স্নান), অষ্টমী স্নানযাত্রা, মাঘীসপ্তমী স্নানযাত্রা প্রভৃতির কথা কালবিবেক-গ্রন্থে জানা যায়।

ব্রতোৎসব

যাত্রা, ধ্বজাপূজা প্রভৃতির মত ব্রতোৎসবও বাঙালীর দৈনন্দিন ধর্মজীবনে একটি বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই ব্রতোৎসবের ইতিহাস অতি জটিল ও সুপ্রাচীন, তবে এই ধরনের ধর্মোৎসব যে প্রাক্-বৈদিক আদিবাসি কোমদের সময় হইতেই সুপ্রচলিত ছিল এ সম্বন্ধে সংশয় বোধ হয় নাই। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যাঁহাদের বলিয়াছে 'ব্রাত্য' বা পতিত তাঁহারা কি ব্রতধর্ম পালন করিতেন বলিয়াই ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, এবং সেইজন্যই কি আর্যরা তাঁহাদের পতিত বলিয়া গণ্য করিতেন ? বোধ হয় তাহাই।*

ব্রতের সঙ্গে ব্রাত্যদের সম্বন্ধ কোনো অকাট্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। তবে, এই অনুমান একেবারে অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক নাও হইতে পারে। ঋগ্বেদীয় আর্যরা ছিলেন যজ্ঞধর্মী ; যজ্ঞধর্মী আর্যদের বাহিরে যাঁহারা ব্রতধর্ম পালন করিতেন, ব্রতের গুহ্য যাদুশক্তি বা ম্যাজিকে বিশ্বাস করিতেন তাঁহারাই হয়ত ছিলেন ব্রাত্য। এই ব্রাত্যরা যে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে জড়িত তাহা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য এবং ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, ব্রতধর্মের প্রসার বিহার, বাঙলা, আসাম এবং উড়িষ্যাতেই সবচেয়ে বেশি। ব্রতকথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ-ই বোধ হয় (বৃ ধাতু+ক্ত) আবৃত করা, সীমা টানিয়া পৃথক করা। নির্বাচন করাই ব্রতের উদ্দেশ্য ; বরণ কথাটিরও একই ব্যঞ্জনা। ব্রতানুষ্ঠানে আলপনা দিয়া অথবা বৃত্তাকারে সীমা রেখা টানিয়া দিয়া ব্রতস্থান চিহ্নিত করিয়া লওয়া হয় ; এই সীমা রেখা টানা স্থান নির্বাচন বা চিহ্নিত করার মধ্যে যাদুশক্তির বা ম্যাজিকের বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন। আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে বরণ করার যে স্ত্রী-আচার প্রচলিত—যেমন নূতন বরের মুখের সম্মুখে হাত ও হাতের আঙুল নানা ভঙ্গীতে ঘুরানো, কুলার উপর প্রদীপ ইত্যাদি সাজাইয়া বরের দুই বাহুতে, বুকে কপালে ঠেকানো ও সঙ্গে সঙ্গে বরণের ছড়া উচ্চারণ—

অন্তত সাংস্কৃতিক জনতত্ত্বের আলোচনায় ক্রমশ এই তথ্যই যেন সুস্পষ্ট হইতেছে যে, আমাদের গ্রাম্য-সমাজে, বিশেষভাবে নারীদের ভিতর, যে-সব ব্রত আজও প্রচলিত তাহার অধিকাংশই অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য এবং মূলত গুহ্য যাদু ও প্রজনন শক্তির পূজা, যে-পূজা গ্রাম্য কৃষিসমাজের সঙ্গে একান্ত সংপৃক্ত। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসূত্র কোথাও কোনো প্রচলিত ব্রতের কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নাই। আদি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম যে এই ধর্মানুষ্ঠানকে স্বীকার করিত না এ-তথ্য পরিষ্কার। অশোক তো স্পষ্টই বলিয়াছেন, গ্রাম্য লোকায়ত ধর্মের আচারানুষ্ঠান তিনি পছন্দ করিতেন না; বিশেষত নারীদের মধ্যে প্রচলিত নানাপ্রকারের মঙ্গলানুষ্ঠান প্রভৃতি তাঁহার বড়ই অপ্রীতিকর ছিল। তিনি তাঁহাদের আহ্বান করিয়াছিলেন এই সব মঙ্গলানুষ্ঠান ছাড়িয়া তাঁহারই অনুমোদিত ধর্মমংগলের পথে চলিবার জন্য। নারীসমাজে প্রচলিত এইসব মঙ্গলানুষ্ঠান বলিতে অশোক ব্রতানুষ্ঠানের কথাই বলিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই. আর, সাধারণ মঙ্গলানুষ্ঠান বলিতে মধ্যযুগীয় বাঙলার মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ইত্যাদি জাতীয় পুরাপ্রচলিত পূজানুষ্ঠানের ইঙ্গিতই হয়তো করিয়া থাকিবেন। কিন্তু সে যাহাই হউক, বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুরাণগুলি যখন সংকলিত হইতেছিল তখন এবং বোধ হয় তাহার কিছুকাল আগে হইতেই ব্রতানুষ্ঠানের প্রতি আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মনোভাবের পরিবর্তন হইতেছিল, কারণ এই সব পুরাণে দেখিতেছি, লৌকিক অনেক ব্রতানুষ্ঠান ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুমোদন লাভ করিয়া ঐ ধর্মের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে এবং ব্রাহ্মণেরা সেই সব অবৈদিক, অস্মার্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যও করিতেছেন। প্রাক-আর্য ও অনার্য নরনারীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সীমায় গৃহীত হইবার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বাংলাদেশে সমস্ত আদি ও মধ্যযুগ ব্যাপিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দীর ভিতর দিয়া বহু অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ব্রতানুষ্ঠান এই ভাবে ক্রমশ ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে; আজও করিতেছে। যে-সব ব্রত এই ধরনের স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে তাহাদের অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয়, যে-সব করে নাই সে-সব ক্ষেত্রে কোনো পুরোহিতেরই প্রয়োজন হয় না; গৃহস্থ মেয়েরাই সে সব পূজা নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। আমাদের চোখের সম্মুখেই দেখিতেছি, পঁচিশ বৎসর আগে গ্রামাঞ্চলে যে সব ব্রতানুষ্ঠানে পুরোহিতের প্রয়োজন হইত না আজ

তাহার ভিতরও ম্যাজিকেরই অবশেষ আজও লুক্কায়িত। এই বরণের অর্থও অশুভ শক্তির প্রভাব হইতে পৃথক করা, আবৃত করা, নির্বাচন করা। ব্রত এবং বরণের স্ত্রী-আচারগুলি লক্ষ্য করিলেই ইহাদের সমগোত্রীয়তা ধরা পড়িয়া যায়, এবং গোড়ায় যে ইহাদের সঙ্গে ম্যাজিকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল তাহাও পরিষ্কার হইয়া যায়। ব্রত এবং বরণ উভয় অনুষ্ঠানেই শুধু মেয়েদেরই যে অধিকার এ-তথ্যও লক্ষণীয়। এই ম্যাজিক্-বিশ্বাসী ব্রত-চারী লোকেরাই ঋগ্বেদীয় আর্যদের চোখে বোধ হয় ছিলেন ব্রাত্য।

সে-সব ক্ষেত্রে পুরোহিত আসিয়া মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই সব ব্রত ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। তবু, আজও যে-সব ব্রত এই স্বীকৃত-সীমার বাহিরে তাহাদের সংখ্যা কম নয়; সম্বৎসর ব্যাপিয়া মাসে মাসে এই সব বিচিত্র ব্রতের অনুষ্ঠান আমাদের গ্রাম্য সমাজ-জীবনকে এখনও কতকটা সচল ও সজীব করিয়া রাখিয়াছে, এবং বাঙালীর ধর্মকর্মে এই সব ব্রতানুষ্ঠান খুব বড় একটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। অগণিত এই সব ব্রতের মধ্যে কয়েকটি তালিকাবদ্ধ করিতেছি:

বৈশাখে—পুণ্যপুকুর ব্রত (বারি বর্ষণের জন্য গুহ্য যাদুশক্তির পূজা), শিবপূজা ব্রত (প্রজনন শক্তির পূজা), চম্পা-চন্দন ব্রত (ঐ), পৃথ্বীপূজা ব্রত (ঐ এবং গুহ্য যাদুশক্তির পূজা), গোকাল ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পূজা), অশ্বত্থপট ব্রত (ঐ), হরিচরণ ব্রত (গুহ্য যাদুশক্তির পূজা), মধুসংক্রান্তি ব্রত (ঐ), গুপ্তধন ব্রত (ঐ , ধানগোছানো ব্রত (ঐ), যাচা পান ব্রত (ঐ), তেজোদর্পণ ব্রত (ঐ), রণে এয়ো ব্রত (ঐ), দশ পুতুলের ব্রত (ঐ) সন্ধ্যামণি ব্রত খোয়াখুয়ি ব্রত (ই), (ঐ), বসুন্ধরা ব্রত (বারি বর্ষণের জন্য প্রজনন শক্তির পূজা)।

জ্যৈষ্ঠে—জয়মংগলের ব্রত (প্রজনন শক্তির পূজা)।

ভাদ্রে—ভাদুরি ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত গুহ্য যাদুশক্তির পূজা), তিলকুন্ডারি ব্রত (কৃষি-সংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পূজা)।

কার্তিকে—কুলকুলটি ব্রত (গুহ্য যাদুশক্তির পূজা), ইতুপূজা ব্রত (প্রজনন শক্তির পূজা)।

অগ্রহায়ণে—যমপুকুর ব্রত (কৃষি সংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পূজা), সেঁজুতি ব্রত (গুহ্য যাদুশক্তির পূজা), তুষতুষলি ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পূজা)।

মাঘে—তারণ ব্রত (কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পুজা), মাঘমণ্ডল ব্রত (ঐ)।

ফাল্গুনে—ইতুকুমার ব্রত (ঐ), বসন্ত রায় ও উত্তম ঠাকুর ব্রত (ঐ), সদপাত্র ব্রত (ঐ)

চৈত্রে—নখছুটের ব্রত (গুহ্য যাদুশক্তির পূজা)।

এগুলি ছাড়াও বাঙালীর অন্তঃপুরে আরো অনেক ব্রত আছে যাহা মূলত গুহ্য যাদুশক্তি ও প্রজনন শক্তির পূজারূপে আদিবাসি কোমদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তেমন অনেক ব্রত ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া আমাদের শুভকর্ম পঞ্জিকাতেও স্থান পাইয়া গিয়াছে, যেমন, ষষ্ঠী ব্রত, মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, সুবচনী ব্রত, ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত এবং প্রাচীন বাঙলাদেশে প্রচলিত ব্রতের একটি তালিকা প্রাচীন বাঙলার স্মৃতিগুলি হইতেই ছাঁকিয়া বাহির করা যায় : সুখরাত্রি ব্রত (কার্তিক মাস), পাষাণ-চতুর্দশী ব্রত (অগ্রহায়ণ), দ্যূত-প্রতিপদ ব্রত (কার্তিকের শুক্ল প্রতিপদ), কোজাগর-পূর্ণিমা ব্রত (আশ্বিনের পূর্ণিমা), ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ব্রত (কার্তিক), আকাশ-প্রদীপ ব্রত (কার্তিক), অক্ষয়-তৃতীয়া ব্রত, অশোকাষ্টমী ব্রত ইত্যাদি। এই সব ক'টি ব্রতের

উল্লেখ জীমূতবাহনের কালবিবেক-গ্রন্থে পাওয়া যায়। জন্মাষ্টমী পূজা ও স্নানের কথাও জীমূতবাহন বলিয়া গিয়াছেন। ইহাদের কতকগুলি ব্রত একান্তই আদিম কৌম সমাজের ব্রতগুলির পরিবর্তিত, পারমার্জিত রূপ; আবার কতকগুলি আদিম কৌম সমাজের ব্রতের আদর্শ এবং ভাবানুযায়ী নূতন ব্রতের সৃষ্টি। তিথি-নক্ষত্র আশ্রয় করিয়া যে-সব ব্রতোৎসব আছে তাহার মূলে বহিরাগত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের কিছুটা প্রভাব বিদ্যমান, এ-কথা একেবারে অসম্ভব না-ও হইতে পারে। পুরাণগুলির ভিতর হইতেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত ব্রতের একটি তালিকা পাওয়া যায়, যেমন, শিবরাত্রি ব্রত, অখণ্ড দ্বাদশী ব্রত, পূর্ণিমা ব্রত, নক্ষত্র ব্রত, দীপদান ব্রত, ঋতু ব্রত, কৌমুদী ব্রত, মদন বা অনঙ্গ ত্রয়োদশী ব্রত, রম্ভাতৃতীয়া ব্রত, মহানবমী ব্রত, বুধাষ্টমী ব্রত, একাদশী ব্রত, নক্ষত্র-পুরুষ ব্রত, আদিত্যশয়ান ব্রত, সৌভাগ্যশয়ন ব্রত রসকল্যাণী ব্রত, অঙ্গারক ব্রত, শর্করা ব্রত, অশূন্যশয়ন ব্রত, অনঙ্গদান ব্রত, ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন বাংলায় এই সব ব্রতের কোন্ কোন্‌টি প্রচলিত ছিল তাহা বলিবার কোনো উপায় নাই।

ব্রতোৎসবের বাহিরে বাঙালী সমাজের নিম্নস্তরে অন্তত দুইটি ধর্মানুষ্ঠান আছে যাহার ব্যাপ্তি ও প্রভাব সুবিস্তৃত এবং যাহা মূলত অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য। একটি ধর্মঠাকুরের পূজা ও আর একটি চৈত্র মাসে নীল বা চড়ক পূজা। মালদহ অঞ্চলে যে গম্ভীরার পূজা বা বাঙলার অন্যত্র যে শিবের গাজন হয় তাহা এই চড়ক পূজারই বিভিন্নরূপ। শিবের গাজন যেমন, ধর্মঠাকুরেরও তেমনই গাজন আছে এবং এই গাজন-উৎসবের দুইটি প্রধান অঙ্গ, একটি ঘরভরা বা গৃহাভরণ এবং অন্যটি 'কালিকা পাতা' বা 'কালি-কাচ' নৃত্য, অর্থাৎ নরমুণ্ড হাতে লইয়া কালি বেশে অর্থাৎ কালির প্রতিবিম্বে নৃত্য।

ধর্মঠাকুর

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও আমরা ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধমতের 'ধর্ম' বলিয়া মনে করিতাম এবং এই পূজার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ খুঁজিয়া বেড়াইতাম। কিন্তু সম্প্রতি নানা গবেষণার ফলে আমরা জানিয়াছি, ধর্মঠাকুর মূলত ছিলেন প্রাক্-আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা; পরে বৈদিক ও পৌরাণিক, দেশি ও বিদেশি নানা দেবতা তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধর্মঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে। ধর্মঠাকুরের আসল প্রতীক পাদুকাচিহ্ন এবং ধর্ম-পূজার পুরোহিতেরা তাঁহাদের গলায় ঝুলাইয়া রাখেন একখণ্ড পাদুকা বা পাদুকার মালা। আজও ধর্মপূজার প্রধান অধিকারী ডোমেরা, যদিও এখন কৈবর্ত, শুঁড়ি, বাগ্‌দী, ধোপা প্রভৃতিদের ভিতরও ধর্মপণ্ডিত বা ধর্মপূজার পুরোহিত বিরল নয়। রাঢ়দেশেই ধর্মপূজার প্রচলন ছিল বেশি, এখনও তাহাই; তবে এখন কোথাও কোথাও ধর্মঠাকুর শিব বা বিষ্ণুতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছেন, সেখানে তিনি ব্রাহ্মণ-পুরোহিত

ছাড়া অন্য কাহারও পূজা গ্রহণ করেন না। স্তূপীকৃত পিষ্টক আর প্রচুর মদ্য দিয়া ("মদ্যের পুষ্করণী দিব পিষ্টের জাঙ্গাল") ধর্মঠাকুরের পূজা হইত। মৃতদেহ ও নরমুণ্ড লইয়া ছিল ধর্মের গাজনের নাচ। শূন্যপুরাণে বলা হইয়াছে, ধর্মঠাকুর ছিলেন শূন্যমূর্তি, তিনি 'নিরঞ্জন', 'শূন্যদেহ', তাঁহার বাহন শাদা পেঁচক বা শাদা কাক। যে-প্রতীকের পূজা করা হইত তাহা কূর্মাকৃতি পাষাণখণ্ড বা পাষাণ-নির্মিত কূর্মবিগ্রহ; তাহার উপর আঁকা থাকিত পাদুকাচিহ্ন। আদিতে যে তিনি প্রাক্-আর্য বা অনার্য দেবতা, এ-সম্বন্ধে তাহা হইলে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। পরে তিনি একে একে বৈদিক বরুণ, অশ্বরথ-বাহিত সূর্য, উদীচ্যবেশী অর্থাৎ বুটপরা ঘোড়াচড়া মিহির বা সূর্য, পৌরাণিক কূর্মাবতার ও কল্কি অবতার প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া বর্তমান ধর্মঠাকুরে রূপান্তরিত হইয়া প্রধানত রাঢ় অঞ্চলেই পূজালাভ করিতেছেন। বৃন্দাবন দাসের "মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে" বোধ হয় এই ধর্মঠাকুরেরই পূজা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তো মনে করেন, 'ধর্ম' শব্দটিই বোধ হয় প্রাচীন কোনো অস্ট্রিক্ শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর, এবং বৌদ্ধ ত্রয়ীর মধ্যম শব্দ অর্থাৎ 'ধর্ম' এবং তাহার পূজা মূলত আদিবাসী কোমের ধর্মপূজা হইতেই গৃহীত। রাজা হরিশচন্দ্র এবং 'ধর্ম'রাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধও একই উৎস হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। মহিষবাহন ধর্মরাজ যমও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

চড়কপূজা

ধর্মপূজা সম্বন্ধে যাহা সত্য নীল বা চড়কপূজা সম্বন্ধেও তাহাই। এই চড়কপূজা এখন শিবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত। জলভরা একটি পাত্রে প্রতিষ্ঠিত যে-প্রতীকটি এই পূজার কেন্দ্র সেই প্রতীক শিবলিঙ্গ, এবং ইহাই পূজারীদের নিকট 'বুড়া শিব' নামে আখ্যাত। এই পূজার পুরোহিত সাধারণত আচার্য-ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিপ্র, এবং গ্রহবিপ্রেরা যে ব্রাহ্মণ্যস্মৃতি অনুযায়ী পতিত্-ব্রাহ্মণ, এ-তথ্য সর্বজনবিদিত। কুমীরের পূজা, জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর হোলা কাঁটা ও ছুরির উপর ঝম্প, বাণফোঁড়া, শিবের বিবাহ ও অগ্নিনৃত্য, চড়কগাছ হইতে দোলা এবং দানো (ভূত) বারাণো বা হাজরা পূজা চড়কপূজার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ। এই শেষোক্ত 'দানো বারাণো' বা 'হাজরা পূজা'র স্থান সাধারণত শ্মশানে এবং এই অনুষ্ঠানটির সঙ্গেই পোড়া শোল মাছ এবং তাহার পুনর্জন্মের কাহিনী (মহাভারতের শ্রীবৎসরাজার উপাখ্যান তুলনীয়), চড়কের সং (কলিকাতার জেলেপাড়ার সং তুলনীয়) প্রভৃতি জড়িত। চড়ক-পূজার পূজারীরা আজও আমাদের সমাজে সাধারণত জল অনাচরণীয় স্তরের। সামাজিক জনতত্ত্বের দৃষ্টিতে ধর্ম ও চড়ক-পূজা দুইই আদিম কোম সমাজের ভূতবাদ ও পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত; প্রত্যেক কোমের মৃত ব্যক্তিদের পুনর্জন্মের কামনাতেই এই দুই পূজার

বাৎসরিক অনুষ্ঠান। তাহা ছাড়া বাণফোঁড়া এবং দৈহিক যন্ত্রণা-গ্রহণ বা রক্তপাত উদ্দেশ্যে যে-সব অনুষ্ঠান চড়ক-পূজার সঙ্গে জড়িত তাহার মূলে সুপ্রাচীন কোম সমাজের নরবলি প্রথার স্মৃতি বিদ্যমান, এ-সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ কম। ধর্মপূজার মূলেও তাহাই; এ ক্ষেত্রেও যে অজশিশুটিকে ধর্মের উদ্দেশ্যে বলিপ্রদান করা হয়, সে-টি প্রাচীন নরবলিরই আর্য-ব্রাহ্মণ্য রূপান্তর। রামাই পণ্ডিতের *শূন্যপুরাণ*-গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, ধর্মপূজার প্রচলন সেন-আমলে, তুর্কী-বিজয়ের আগেই দেখা দিয়াছিল।

হোলী বা হোলাক উৎসব

ধর্মপূজা ও চড়কের সঙ্গে একই পর্যায়ভুক্ত আমাদের হোলী বা হোলাক ধর্মোৎসব। এই উৎসবটি উত্তর-ভারতের সর্বত্র যেমন বাংলাদেশেও তেমনই সুপ্রচলিত এবং সুআদৃত। হোলাক বা হোলক উৎসবের কথা জীমূতবাহনের দায়ভাগ-গ্রন্থে আছে; দ্বাদশ শতকের আগেই যে এই উৎসব বাঙলাদেশে প্রচলিত হইয়াছিল ইহাই তাহার প্রমাণ। এই হোলী উৎসবের বিবর্তন লক্ষ্যণীয়। বাঙলাদেশে ফাল্গুনী শুক্লাচতুর্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে হোলীর সঙ্গে যে-সব আচারানুষ্ঠান জড়িত সংস্কৃতিগত জনতত্ত্বের দিক হইতে তাহার কিছু কিছু আলোচনা-গবেষণা হইয়াছে; ভারতের অন্যত্র যে-সব জায়গায় হোলীর প্রচলন তাহাও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এ-তথ্য এখন অনেকটা পরিষ্কার যে, আদিতে হোলী ছিল কৃষিসমাজের পূজা; সুশস্য উৎপাদন-কামনায় নরবলি ও যৌনলীলাময় নৃত্যগীত উৎসব ছিল তাহার প্রধান অঙ্গ। পরবর্তী স্তরে কোনো সময়ে নরবলির স্থান লইল পশুবলি এবং হোমযজ্ঞ ইহার অঙ্গীভূত হইল। কিন্তু হোলীর সঙ্গে প্রধানত যে উৎসবানুষ্ঠানের যোগ তাহা বসন্ত বা মদন বা কামোৎসবের, রাধাকৃষ্ণ ঝুলনের এবং কোথাও কোথাও মূর্খতম এক রাজাকে লইয়া নানাপ্রকারের ছল-চাতুরী ও তামাসার। তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শতক পর্যন্ত উত্তর-ভারতের সর্বত্রই বসন্ত বা মদন বা কাম-মহোৎসব নামে একটি উৎসবের প্রচলন দেখা যায়। বাৎস্যায়নের কামসূত্র (তৃতীয়-চতুর্থ শতক), শ্রীকৃষ্ণের রত্নাবলী (সপ্তম শতক), মালতীমাধব নাটক (অষ্টম শতক), অল্-বেরুণী (একাদশ শতক), জীমূতবাহনের কালবিবেক (দ্বাদশ শতক) এবং রঘুনন্দন (ষোড়শ শতক), সকলেই এই উৎসবের কথা বলিয়াছেন অল্পবিস্তর বর্ণনায়। প্রচুর নৃত্যগীতবাদ্য, জুগুপ্সিত উক্তি, যৌন অঙ্গভঙ্গি এবং ব্যঞ্জনা প্রভৃতি ছিল এই উৎসবের অঙ্গ, এবং পূজাটি হইত মদন ও রতির, চৈত্র মাসে অশোক ফুলের সুপ্রচুর বর্ষণের নীচে। প্রাচীন বাঙলা দেশে এই উৎসবের কথা জীমূতবাহনই বলিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী সাক্ষ্য দিতেছেন রঘুনন্দন। মনে হয়, ষোড়শ শতকের পর কোনো সময়ে চৈত্রীয় বসন্ত বা মদন বা কামোৎসব ফাল্গুনী হোলী বা হোলক উৎসবের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়,

এবং কামমহোৎসব অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। বস্তুত, ষোড়শ শতকের পর কাম-মহোৎসবের কোনো উল্লেখ বা প্রচলন কোথাও আর দেখা যায় না। মুসলমান রাজা-ওমরাহ্‌রা এবং হারামের মহিলারা হোলী উৎসবের খুব বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং বোধ হয় তাঁহাদেরই পৃষ্ঠপোষকতার ফলে হোলী ক্রমশ মদনোৎসবকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু হোলীর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের ঝুলন এবং আবীর-কুমকুম খেলার ইতিহাসের যোগ আবার অন্য পথে। রামগড় গুহার এক লিপিতে (খ্রীষ্টপূর্ব ২য়-৩য় শতক) এক ঝুলন উৎসবের কথা আমরা প্রথম শুনি। কিন্তু সে-ঝুলন কোনো দেবদেবীর নয়, বোধ হয় নেহাত্‌ই মানুষের ঝুলন। ঝুলনায় মানুষেরা, নরনারী উভয়ই, দোলা খাইত, বেশি করিয়া দোলা দিত মানবশিশুকে, তাহাকে আনন্দ দিবার জন্য। হয়তো তাহারই প্রকাশ পরবর্তী সাহিত্যে। বালকৃষ্ণ বা বালগোপালাকে দোলাইতেন মাতা যশোদা। তারপরের পর্বে আর শুধু বালগোপাল নহেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যৌবনলীলার সহচরী রাধাও আসিয়া উঠিলেন সেই ঝুলনায়, এবং একাদশ শতকের আগেই কৃষ্ণরাধার ঝুলন-লীলা ভারতবর্ষের অন্যতম ধর্মোৎসবে পরিগণিত হইয়া গেল। অল্‌ বেরুণীর সাক্ষ্যে মনে হয়, এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত চৈত্রমাসে; গরুড়-পুরাণ এবং পদ্মপুরাণের সাক্ষ্যও তাহাই। পরবর্তী কোনো সময়ে এই উৎসব ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে আগাইয়া আসে (পদ্ম-পুরাণ, পাতালখণ্ড এবং স্কন্দপুরাণ, উৎকলখণ্ড দ্রষ্টব্য) এবং হোলীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়। ঝুলনায় রাধাকৃষ্ণকে দোলাইয়া তাঁহাদের উপর ফুল, কুমকুম এবং আবীরগোলা জল ছড়ানো হইত এবং তাঁহারাও সহচরীদের উপর ফুল, কুমকুম ইত্যাদি ছুঁড়িয়া মারিতেন। হোলীর সঙ্গে পীচ্‌কারী খেলার যোগাযোগ এই ভাবেই। প্রাক-বৈদিক আদিম কৃষিসমাজের বলি ও নৃত্যগীতোৎসব এই ভাবেই বর্তমান হোলীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভারতের নানা জায়গায় এখনও হোলী বা হোলাক উৎসবকে বলা হয় শূদ্রোৎসব; হোলীর আগুন এখনও ভারতের অনেক স্থানে অস্পৃশ্যদের ঘর হইতেই আনিতে হয়।

অম্বুবাচীর পারণ

ভারতবর্ষের সর্বত্রই বর্ষাঋতুতে নারীদের মধ্যে বিশেষভাবে বিধবা নারীদের ভিতর অম্বুবাচী নামে এক পারণ পালনের রীতি প্রচলিত। এই পারণের তিন দিন বা সাত দিন তাঁহারা কোনো অগ্নিপক্ক খাদ্য গ্রহণ করেন না, মাটি খুঁড়েন না, আগুন জ্বালেন না, রন্ধনাদি করেন না, এমন কিছু করেন না যাহাতে পৃথিবীর, মাতা বসুধার অঙ্গে কোনো আঘাত লাগে। কারণ প্রচলিত বিশ্বাস এই যে এই ক'দিন মাতা বসুধার ঋতুপর্ব, এবং যতদিন তিনি ঋতুমতী থাকেন ততদিন তাঁহার অঙ্গে কোনো আঘাত লাগে, এমন কিছু করিতে নাই। এই বিশ্বাস এবং অম্বুবাচীর পারণ, দুইই আদিম কৌম সমাজের প্রজননশক্তির পূজা এবং তৎসংপৃক্ত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে জড়িত।

বাঙালী হিন্দুর ধর্মকর্মানুষ্ঠানের যে-সব স্তরে ও অংশে আদিবাসী কৌম সমাজের অনার্য, অব্রাহ্মণ্য ধ্যান-ধারণা ও উৎসবানুষ্ঠান এখনও সক্রিয় তাহার মাত্র কয়েকটির ইঙ্গিত এ-পর্যন্ত ধরিতে চেষ্টা করিলাম। আর বেশি বলিবার উপায়ও নাই, বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজনও নাই। তবে, এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার আগে এমন দুই চারিটি বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর কথা বলিতেই হয় যাঁহাদের জন্মই হইতেছে এই আদিবাসী কৌম সমাজের ধ্যান ধারণা এবং অভ্যাস হইতে। এ-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শিব ও শিবলিঙ্গ, দুর্গা, কালী বা করালী, অর্থাৎ মাতৃকাতন্ত্রের দেবী, নারায়ণ-শিলা, গণেশ, ভৈরব, বৌদ্ধ জম্ভল, হারীতি, একজটা, নৈরাত্মা, ভৃকুটি প্রভৃতি দেবদেবীদের কথা উল্লেখ করিতেছি না; কারণ, ভারতীয় মূর্তিতত্ত্বের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারাই জানেন, এই সব এবং আরও অনেক দেবদেবীর ইতিহাস অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আদিবাসী কৌম-সমাজের বিশ্বাস ও অভ্যাসের সঙ্গে জড়িত। আমি শুধু এমন দুই চারিটি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর কথাই এখানে উল্লেখ করিতেছি যাঁহাদের পূজা বিশেষ ভাবে পূর্ব-ভারতেই প্রচলিত এবং যাঁহাদের জন্মেতিহাস সুস্পষ্ট ভাবেই এই কৌম সমাজের ধ্যান, ধারণা ও অভ্যাসগত, অথচ সে-তথ্য সুস্পষ্ট জ্ঞাত ও স্বীকৃত নয়।

মনসা পূজা

বাঙলা, আসাম ও ওড়িষায় মনসাদেবীর পূজা সুপ্রচলিত। এই পূজা এখন যে-ভাবে সাধরেণত অনুষ্ঠিত হয় তাহা ঠিক প্রতিমাপূজা নয়, ঘট-মনসা বা পট মনসার পূজা এবং মধ্যযুগীয় বাঙলার মনসামঙ্গলের সঙ্গে এই ঘট-মনসা ও পট-মনসার সম্বন্ধই ঘনিষ্ঠ। ধান্যপূর্ণ মাটির ঘটের উপর সর্পধারিণী বা সর্পালংকারা মনসার ছবি আঁকিয়া তাঁহার পূজা, অথবা শোলা বা কাপড়ের পটের উপর সর্পময়ী বা সর্পধারিণী বা সর্পালংকারা মনসার কাহিনী আঁকিয়া টাঙ্গানো পটের সম্মুখে পূজাই সাধারণ রীতি। কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক-পূর্ব বাংলাদেশে মনসার প্রতিমাপূজা হইত; তাহার কয়েকটি মূর্তি প্রমাণও বিদ্যমান। মনসাদেবী যে কি করিয়া উচ্চতর সামাজিক স্তরে উন্নীত হইলেন তাহার বিস্তৃত পুরাণ-কাহিনী বাংলাদেশে সুবিদিত। সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতেই মনসা-পূজার উদ্ভব, এ-তথ্য নিঃসন্দেহ। পৃথিবী জুড়িয়া আদিবাসী সমাজে কোনো না কোনো রূপে সর্পপূজার প্রচলন ছিলই। বাংলাদেশে যে-সব মনসাদেবীর প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের, ক্রোড়াসীন একটি মানবশিশুর, একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। ইহাদের প্রত্যেকটিই প্রজনন শক্তির প্রতীক। একটি মূর্তির পাদপীঠে "ভট্টিনী মট্টুবা' লিপি উৎকীর্ণ। এই লিপির অর্থ কি রাজমহিষী মট্টুবা না আর কিছু, বলা কঠিন। মট্টুবা কি তদ্ভব, না দেশজ

অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষার শব্দ, তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে এ তথ্য নিঃসংশয় যে, পাল-আমলের প্রথম পর্বেই মনসাদেবী ব্রাহ্মণ্যধর্মে পূজিতা ও স্বীকৃতা হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। মহাভারত ও ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের কাহিনী হইতেই প্রমাণ হয়, মনসাদেবীর প্রাচীন বৈদিক বা পৌরাণিক কোনো ঐতিহ্যই ছিল না; ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্বীকৃত হওয়ার পরও বহুদিন পর্যন্ত তাঁহার রূপ সুনির্দিষ্ট হয় নাই। কোনো কোনো ধ্যানে তাঁহার বাহন হইতেছেন হংস এবং তিনি পুস্তক ও অমৃতকুম্ভধারিণী। বলা বাহুল্য, এই সব উপকরণ সরস্বতীর, এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের একটি ধ্যানে মনসাকে সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। তেলেগু ও কানাড়ী-ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে 'মঞ্চাম্মা' নামে এক সর্পদেবীর পূজা আজও প্রচলিত এবং আমাদের দেশে মধ্যযুগে মনসাদেবীর যে ধরনের কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে, সেখানেও অম্মাবরু নামীয় এক সর্পদেবী সম্বন্ধে অনুরূপ কাহিনী সুপ্রচলিত। অসম্ভব নয় যে, দক্ষিণী মঞ্চাম্মাই আমাদের মনসা, এবং অম্মাবরুর কাহিনীই আমাদের মনসাকে আশ্রয় করিয়াছে। ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে বলিতে হয়, বাঙলাদেশে মনসা-পূজার বহুল প্রচলন হয় দক্ষিণী সেন-বর্মণ রাজাদের আমলেই।

জাঙ্গুলী

মনসার সঙ্গেই নাম করিতে হয় জঙ্গলবাসী, শবরকুমারীরূপিণী বৌদ্ধ জাঙ্গুলীদেবীর। এই দেবী বীণাবাদয়িত্রী এবং মনসার মত তিনিও সর্পবিষমোচয়িত্রী। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বৈদিক সরস্বতীও অন্যতম রূপে সর্ববিষমোচয়িত্রী এবং সেক্ষেত্রে তিনি শবর-কন্যা। এই গুণসাম্যের উপর নির্ভর করিয়াই পরবর্তীকালে, মনসাকে যেমন তেমনই, জাঙ্গুলীকেও কোথাও কোথাও বৈদিক সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্না বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণ্য মনসা এবং বৌদ্ধ জাঙ্গুলী যে একই দেবী তাহাও বলা হইয়াছে। মনসাদেবীর প্রসারের প্রমাণ কালবিবেক-গ্রন্থে সুস্পষ্ট।

পর্ণশবরী

প্রাক্-আর্যব্রাহ্মণ্য শবরদের সঙ্গে আর একটি বজ্রযানী বৌদ্ধ দেবীর সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; ইঁহার নাম পর্ণশবরী। ইনি ব্যাঘ্রচর্ম ও বৃক্ষপত্র পরিহিতা, যৌবনরূপিণী, বজ্রকুণ্ডলধারিণী, এবং পদতলে তিনি অগণিত রোগ ও মারী মাড়াইয়া চলেন। ধ্যানেই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি ডাকিনী, পিশাচী এবং মারীসংহারিকা। সন্দেহ নাই যে, আদিতে তিনি শবরদেরই আরাধ্য দেবী ছিলেন; পরে কালক্রমে যখন আর্যধর্মে স্বীকৃতি লাভ করেন তখন তাঁহার পরিচয় হইল "সর্বশবরানাম ভগবতী", সকল শবরের ভগবতী বা দুর্গা। বজ্রযানী বৌদ্ধসাধনায় শবরদের যে একটা বিশেষ স্থান ছিল চর্যাগীতির

একাধিক গানই তাহার প্রমাণ। একটি মাত্র গান উদ্ধার করিতেছি ; পর্ণশবরীর ধ্যান এবং এই গানটির রূপ-কল্পনার মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই।

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসহি সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি
নিত্য ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মৌউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেহ্মরাতি পোহাইলী॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই॥
গুরুবাক্ পুঞ্ছিআ বিন্ধ নিঅমণ বাণে।
একে শর সন্ধানে বিন্ধহ বিন্ধহ পরমাণ বাণে॥
উমত সবরো গরুআ রোষে।
উমত-সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোভির কই সে॥

শবরোৎসব

পূর্ব-ভারতে শবরদের এক সুপ্রাচীন ও সুবিস্তৃত সংস্কৃতির অবশেষ আমাদের জীবন-যাত্রার নানাক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট। পাহাড়পুর মন্দিরের অসংখ্য মাটির ফলকে শবর নরনারীদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ছবি যে-ভাবে উৎকীর্ণ আছে, মনে হয়, জন-সাধারণের জীবনের সঙ্গে তাঁহাদের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। বাঙলার নানা স্থানে, যেমন উত্তর-বঙ্গে ও পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গে, এই শবররা কালক্রমে আমাদের হিন্দু সমাজের নিম্নতম স্তরে স্বাঙ্গীকৃত হইয়া গিয়াছে। নীলাচলক্ষেত্র পুরীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথদেবের মন্দির ও তাঁহার পূজার সঙ্গে শবরদের ধর্ম ও পূজানুষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা আজ আর অবিদিত নাই। বাঙলাদেশেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ঘনিষ্ঠতা ধরা পড়িবে, বিচিত্র কি? কালবিবেক-গ্রন্থ ও পরবর্তী কালিকাপুরাণে শারদীয়া দুর্গাপূজার দশমী তিথিতে শাবরোৎসব নামে এক উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়। এই উৎসবে লোকেরা শবরদের মত নগ্ন অঙ্গে গাছের পাতা জড়াইয়া, সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া তালে-বেতালে পূর্ণ উদ্যমে গান গাহিত, নাচিত এবং ঢাক বাজাইত। যৌনলীলার নানা গান গাওয়া, কাহিনী বলা এবং তদনুরূপ অঙ্গভঙ্গী করাও এই উৎসবের অঙ্গ ছিল। এ-সব

না করিলে নাকি দেবী ভগবতী ক্রুদ্ধা হইতেন। বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে এ-সম্বন্ধে একটু বিধিনিষেধ আছে; এই সব অনুষ্ঠানে বিশেষ আপত্তি করা হয় নাই, তবে মা বোনদের সম্মুখে এবং শক্তিধর্মে অদীক্ষিত মেয়েদের সম্মুখে পূর্বোক্তরূপ আচরণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

ঘটলক্ষ্মীর পূজা

মনসাদেবীর ক্ষেত্রে যেমন দুই রকমের পূজা (এক, মনসার মূর্তিপূজা এবং আর এক, তাঁহারই চিত্রাঙ্কিত ঘটের পূজা) বাঙলার অন্যান দুই একটি দেবীমূর্তির ক্ষেত্রেও তাহাই। আমাদের দেশে লক্ষ্মীর পৃথক মূর্তিপূজা খুব সুপ্রচলিত নয়। বিষ্ণু-নারায়ণের শক্তি হিসাবেই তাঁহার যাহা কিছু প্রতিপত্তি, অন্তত প্রাচীন বাঙলায় তাহাই ছিল। সাহিত্যে ও শিল্পে নারায়ণের শক্তিরূপিনী এই পৌরাণিক লক্ষ্মীই বন্দিতা হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের লোকধর্মে লক্ষ্মীর আর একটি পরিচয় আমরা জানি এবং তাঁহার পূজা বাঙালী সমাজে নারীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। এই লক্ষ্মী কৃষিসমাজের মানস-কল্পনার সৃষ্টি; শস্য-প্রাচুর্যের এবং সমৃদ্ধির তিনি দেবী। এই লক্ষ্মীর পূজা ঘটলক্ষ্মী বা ধান্যশীর্ষপূর্ণ চিত্রাঙ্কিত ঘটের পূজা, এবং এই পূজাব্রতের সঙ্গে সে-সব ব্রতকথা এবং যে-সব পৌরাণিক কাহিনী জড়িত তাহা একত্র বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে দেরী হয় না যে, লক্ষ্মীর এই লৌকিক মানস-কল্পনাই ক্রমশ পৌরাণিক লক্ষ্মীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, স্তরে স্তরে নানা স্ববিরোধী ধ্যান ও অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কৌম সমাজের ঘটলক্ষ্মীর বা শস্যলক্ষ্মীর যে আদিমতম পূজা বা কল্পনা তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। বাঙালী হিন্দুর ঘরে ঘরে নারীসমাজে সে পূজা আজও অব্যাহত। আর শারদীয়া পূর্ণিমাতে কোজাগর-লক্ষ্মীর যে-পূজা অনুষ্ঠিত হয় তাহাও আদিতে এই কৌম সমাজেরই পূজা বলিলে অন্যায় হয় না। বস্তুত, দ্বাদশ শতক পর্যন্ত শারদীয়া কোজাগর উৎসবের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর পূজার কোনো সম্পর্কই ছিলনা।

ষষ্ঠীপূজা

ষষ্ঠীপূজা সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। ষষ্ঠীদেবীর কোনো প্রতিমা পূজার প্রচলন ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নাই; বৌদ্ধ প্রতিমা-শাস্ত্রে এবং ধর্মানুষ্ঠানে ষষ্ঠীদেবীর মানস-কল্পনাই বোধ হয় হারীতীদেবীর রূপ-কল্পনায় বিবর্তিত হইয়াছে। ষষ্ঠীপূজার ব্রতকথা, মহাবস্তু, সর্বাস্তিবাদী বিনয়পিটক, চীনা সূত্রপিটকগ্রন্থের সংযুক্তরত্নসূত্র ও ক্ষেমেন্দ্রের বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা-গ্রন্থে হারীতীর জন্মকাহিনী অনুসরণ করিলে স্পষ্টতই বুঝা যায়, ষষ্ঠী এবং হারীতীর জন্ম একই মানস-কল্পনায়, এবং দু'য়েরই মূলে প্রজনন শক্তিতে এবং মারীনিবারক যাদু-শক্তিতে বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন। বৌদ্ধ ধর্মাচারে হারীতী দেবীর মূর্তিপূজা সুপ্রচলিত ছিল, কিন্তু ষষ্ঠীপূজার আজও কোনো মূর্তিপূজা নাই এবং শেষোক্ত পূজা এখনও

নারী-সমাজেই সীমাবদ্ধ ; সন্তান কামনায় ও সন্তানের মঙ্গল কামনায় আজ এই পূজা বিবর্তিত। ষষ্ঠী-হারীতীর মারীনিবারক যাদুশক্তির পূজা এখন আশ্রয় করিয়াছে গর্দভবাহিনী শীতলাদেবীকে।

এইখানেই যে প্রাক্-আর্য বাঙালী সমাজের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের বিবরণ শেষ হইল তাহা বলা চলেনা। বরং বলা উচিত ইহা সূচনা মাত্র। বস্তুত, এ-সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণা এত কম হইয়াছে যে, রেখা রচনা ছাড়া, কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া বিস্তৃত কিছু বলিবার উপায় নাই। তবু, যেটুকু আমরা জানি, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বাঙালী সমাজে নারীদের মধ্যে এবং সাধারণ আর্য ব্রাহ্মণ্য পূজাচারের মধ্যে যে সব লৌকিক স্থানীয় অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত তাহা প্রায় সমস্তই প্রাক্-আর্য কৌম-সমাজের দান।

প্রাক্-আর্য ধ্যান-ধারণা

প্রাক্-আর্য কৌম বাঙালী সমাজের ধ্যান-ধারণার কথা আগেই কিছু বলিয়াছি, বর্তমান অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে। ভূতপ্রেতবাদে বিশ্বাস, পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস, প্রজনন শক্তি, যাদুশক্তি প্রভৃতির প্রতীকের উপর দেবত্ব আরোপ এবং তাহাদের শুভ-অশুভ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতায় বিশ্বাস প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাদের ধ্যান-ধারণার অন্তর্গত ছিল। আজও সেই সব ধ্যান ধারণা বাঙালী সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে এবং আমাদের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের অনেক আচার-ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, পিতৃপুরুষের তর্পণ প্রভৃতি ব্যাপারে যে ধ্যান আমাদের মনন-কল্পনায় তাহার মূলে প্রাক্-আর্য কৌমসমাজের বিশ্বাস সক্রিয়, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। শ্রাদ্ধের সঙ্গে জড়িত বৃষকাষ্ঠ ও তাহার বিসর্জন, শ্রাদ্ধের পর কাক ডাকিয়া হবিষ্যান্ন খাওয়ানো, পিণ্ডদান প্রভৃতি সমস্তই আমরা আহরণ করিয়াছি আমাদেরই প্রতিবেশী শবর-পুলিন্দ-কিরাত-সাঁওতাল-মুণ্ডা-কোল-ভীলদের নিকট হইতে। মঙ্গলানুষ্ঠানের প্রারম্ভে আভ্যুদয়িক অনুষ্ঠানে মৃত পূর্বপুরুষদের স্মরণ ও তাঁহাদের পূজাও ইঁহাদের ধ্যান ধারণা হইতেই আহৃত। বাংলাদেশের বিবাহানুষ্ঠানে হোম সম্প্রদান ও সপ্তপদীগমন ছাড়া যে-সব স্ত্রী-আচার, লোকাচার প্রভৃতি প্রচলিত তাহাও মূলত এই কৌম সমাজেরই দান।

এই আদিমতম ধর্মকর্ম ও ধ্যান-ধারণার উপরেই বাংলার বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য এবং অবৈদিক বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার।

৩

প্রাক্ গুপ্তপর্বের ধর্মকর্ম ইত্যাদি। আর্যধর্মের-বিস্তার

জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধ ধর্মের পূর্বাভিযানকে আশ্রয় করিয়াই প্রাচীন বাঙলায় আর্য-ধর্মকর্মের প্রাথমিক সূচনা ও বিস্তার। এই তিন ধর্মমতই বেদবিরোধী, বেদের

অপৌরুষেয়ত্বে অবিশ্বাসী, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটিই মূলত আর্যধর্মাশ্রয়ী, আর্য ধ্যান-ধারণাই ইহাদের জীবনমূল। এই তিন ধর্মের মধ্যে আবার জৈন ও আজীবিক ধর্মের সঙ্গেই কৌম বাঙালীর প্রথম আর্য ধর্ম-পরিচয়।

জৈনধর্ম

জৈন-পুরাণের ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করিলে বলিতে হয়, মানভূম, সিংভূম, বীরভূম ও বর্ধমান, এই চারিটি স্থান-নামই জৈন তীর্থঙ্করদের নামের সঙ্গে জড়িত। জৈন-পুরাণ মতে ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে বিশ জনেরই নির্বাণস্থান হাজারিবাগ জেলার পরেশনাথ বা পার্শ্বনাথ পাহাড়ের সমেত্‌শিখর বা সমাধিশিখর। আয়ারঙ্গ বা আচারঙ্গ সূত্রকথিত মহাবীর ও তাঁহার শিষ্যবর্গের রাঢ়দেশ (বজ্রভূমি) পরিভ্রমণ, সেখানকার দুঃখ, দুর্গতি ও লাঞ্ছনাভোগের কথা, এবং তাঁহাদের পশ্চাতে কুকুর লেলাইয়া দিবার গল্প সুবিদিত! এই গল্পেই সুপ্রমাণ যে, প্রাক্‌-আর্য কৌমসমাজবদ্ধ রাঢ়-দেশে আর্যধর্মের প্রসার খুব সহজে হয় নাই। এখানকার খাদ্য, ভাষা, আচার-ব্যবহার আর্যদের কাছে সব কিছুই ছিল অরুচিকর, এবং স্থানীয় লোকেরাও আর্যধর্মের প্রসার খুব প্রীতির চক্ষে দেখে নাই। যাহাই হোক, যত অপ্রিয়ই হোক্‌, জৈনধর্মের অগ্রগতিকে ঠেকাইয়া রাখা বেশি দিন সম্ভব হয় নাই। হরিসষেণের বৃহৎকথাকোষ-গ্রন্থে (৯৩১ খ্রী) বর্ণিত আছে, মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু প্রখ্যাত জৈনসূরী ভদ্রবাহু ছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনান্তর্গত দেবকোটের এক ব্রাহ্মণের সন্তান। ভদ্রবাহুর শৈশবে চতুর্থ শ্রুতকেবলী গোবর্ধন একবার দেবকোটে বেড়াইতে আসিয়া শিশু ভদ্রবাহুকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং পিতার অনুমতি লইয়া শিশুটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। এই শিশুই কালক্রমে দীক্ষিত হইয়া শ্রুতকেবলী পদে উন্নীত হন। দিব্যাবদানের একটি গল্পে জানা যায়, অশোক একবার পুণ্ড্রবর্ধনের নিগ্রন্থদের (জৈনদের) অপরাধে (ভুল করিয়া ?) পাটলীপুত্রের ১৮,০০০ হাজার আজীবিকদের (চীনা অনুবাদ মতে, নিগ্রন্থপুত্রদের) হত্যা করিয়াছিলেন। এই দুই গ্রন্থের উক্তি প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে বাধা নাই যে, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকেই পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তর-বঙ্গে জৈনধর্মের যথেষ্ট প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধদের অপেক্ষা জৈনরা যে বাঙলা দেশ সম্বন্ধে বেশি খবরাখবর রাখিতেন তাহা জৈন ভগবতী-সূত্রের সাক্ষ্যেই সুপ্রমাণ। ষোড়শ মহাজনপদের তালিকায় বৌদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকায়-গ্রন্থে প্রাচ্যদেশের দু'টি মাত্র জনপদের নামোল্লেখ পাইতেছি—অঙ্গ এবং মগধ। জৈন ভগবতী-সূত্রে পাইতেছি তিনটির উল্লেখ—অঙ্গ, বঙ্গ এবং লাঢ় (রাঢ়)। জৈন সূত্র-গ্রন্থগুলিতে বঙ্গের উল্লেখ বারবারই পাওয়া যায়। আরও সুনির্দিষ্ট ও বিশ্বাস্য তথ্য পাওয়া যাইতেছে জৈন কল্পসূত্র-গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তামলিত্তিয়া, কোডিবর্ষীয়া, পোংড্রবর্ধনীয়া এবং (দাসী) খব্বডিয়া নামে জৈন গোদাস-গণীয় ভিক্ষুদের

চারিটি শাখার উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি শাখার নামকরণ স্থান-নাম হইতে এবং এই স্থান-নামগুলি যথাক্রমে তাম্রলিপ্ত (মেদিনীপুর), কোটিবর্ষ (দিনাজপুর), পুণ্ড্রবর্ধন (বগুড়া) এবং খর্বাট বা কর্বাট (পশ্চিমবঙ্গেরই কোনো স্থান)। জৈনধর্মের বহুল বিস্তৃতি না থাকিলে এতগুলি শাখা বাঙলাদেশে কেন্দ্রীকৃত হওয়ার কোনো সুযোগ থাকিত না। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক ও খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের একাধিক লিপিতে এই সব শাখাগুলির উল্লেখ হইতে মনে হয়, গোদাস-গণীয় জৈনদের চারিটি শাখা ততদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। (আনুমানিক) খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতকের মথুরার একটি শিলালিপি হইতে জানা যায়, রারা (রাঢ়দেশ) জনপদের অধিবাসী এক জৈনভিক্ষু মথুরায় একটি জৈনপ্রতিমা নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

আজীবিক ধর্ম

জৈনদের মত এতটা না হোক, আজীবিকেরাও সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশে কিছুটা প্রসার প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। আজীবিক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মখলিপুত্র গোসাল ও মহাবীর ছিলেন সমসাময়িক (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক) এবং পরস্পর পরম বন্ধু; ভগবতী-গ্রন্থমতে তাঁহারা দুইজনে একসঙ্গে ছয় বৎসর কাটাইয়াছিলেন বজ্রভূমির অন্তর্গত পণিত ভূমিতে। রাঢ়দেশ-পরিব্রজ্যায় আসিয়া মহাবীর এই ধর্মসম্প্রদায়ের দীর্ঘ বংশদণ্ডধারী অনেক ভিক্ষুর দেখা পাইয়াছিলেন; তাঁহারাও তখন ধর্মপ্রচারোদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। পাণিনি রাঢ়দেশে মস্করী সম্প্রদায়ের যে-বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাদের সঙ্গে এই ভিক্ষুবিবরণ বেশ মিলিয়া যায় এবং মনে হয়, তিনি যেন আজীবিকদের কথাই বলিয়াছেন। আর, আজীবিকেরা যে প্রাচ্যদেশে বেশ প্রভাবশালী সম্প্রদায় ছিলেন তাহা তো বিহারের নাগার্জুন ও বরাবর পাহাড়ের গুহাবলী এবং মৌর্যসম্রাট অশোক ও দশরথের একাধিক শিলালিপি-সাক্ষ্যেই সপ্রমাণ। ভগবতী-গ্রন্থের মতে পুণ্ড্ররাজ মহাপৌম আজীবিকদের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই পুণ্ড বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে বলিয়া বর্ণিত; মহাপৌমের রাজধানীর একশতটি ছিল প্রবেশ তোরণ। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, এই পুণ্ড পাটলীপুত্র, কিন্তু আমার তো মনে হয়, ভগবতী-গ্রন্থকার পুণ্ড বলিতে পুণ্ড্রই বুঝিয়াছেন। দিব্যাবদানে অনেক স্থানেই আজীবিক ও নিগ্রন্থদের মধ্যে তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে; অশোকের সেই ১৮,০০০ হাজার আজীবিক বা নিগ্রন্থপুত্র হত্যার গল্পেও তাহা হয় নাই, এ-কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়না। সম্ভবত, দিব্যাবদান রচনা কালে পুণ্ড্রবর্ধনে নিগ্রন্থ জৈনদের এবং আজীবিকদের বহুদিন এক সঙ্গে বসবাসের ফলে এবং তাঁহাদের ধর্মমত, আচারানুষ্ঠান এবং বসনভূষণ অনেকটা এক রকম হওয়ার ফলে বৌদ্ধদের দৃষ্টিতে ইঁহাদের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু ছিলনা।

বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধ জনশ্রুতির ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করিলে বলিতে হয়, জৈন ও আজীবিকদের সমসাময়িক কালে বৌদ্ধধর্মও প্রাচীন বাঙলায় বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করে। সংযুক্ত নিকায়-গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধদেব একবার সুম্ভভূমি (সুহ্মভূম) অন্তর্গত শেতক নগরে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। অঙ্গুত্তর নিকায়-গ্রন্থে বঙ্গান্তপুত্ত নামে এক বৌদ্ধ আচার্যের উল্লেখ পাইতেছি। বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা গ্রন্থের অনাথপিণ্ডকসুতা সুমাগধার কাহিনীতে জানা যায় যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং একবার ধর্মপ্রচারোদ্দেশে পুণ্ড্রবর্ধনে আসিয়া ছয় মাস বাস করিয়া গিয়াছিলেন। চীনা পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াঙ্ও বলিতেছেন, বুদ্ধদেব পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কর্ণসুবর্ণে আসিয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এতগুলি উল্লেখ সত্ত্বেও বুদ্ধদেবের বাঙলাদেশে আসা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মনে হয়না ; পূর্বদিকে তিনি দক্ষিণ-বিহারের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। দীক্ষাদান সম্পর্কে পালি বিনয়পিটক-গ্রন্থে আর্যাবর্তের পূর্বতম সীমা টানা হইয়াছে কজঙ্গলে ; সংস্কৃত বিনয়-গ্রন্থে এই সীমা বিস্তৃত হইয়াছে পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত। এই দু'টি সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, বুদ্ধদেব স্বয়ং বাঙলাদেশে আসুন বা না আসুন, মৌর্যসম্রাট অশোকের আগেই বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন বাঙলার কোনো কোনো স্থানে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। আর, অশোকের বৌদ্ধধর্মপ্রচার যে অন্তত কিছুটা বাঙলাদেশের চিত্তজয় করিয়াছিল তাহার প্রমাণ তো দিব্যাবদান-গ্রন্থ এবং য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণীতেই পাইতেছি। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ বলিতেছেন, অশোকের স্মৃতিবিজড়িত অনেকগুলি স্তূপ তিনি দেখিয়াছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনে,সমতটে, কর্ণসুবর্ণে এবং তাম্রলিপ্তিতে। পুণ্ড্রবর্ধন বোধ হয় সুবিস্তৃত অশোক-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তইছিল· অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পুণ্ডবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল মহাস্থান-শিলাখণ্ড-লিপিতে তো তাহার পাথুরে প্রমাণও বিদ্যমান। এই লিপিতে ছবগ্গীয় বা ষড়বর্গীয় থেরবাদী ভিক্ষুদের উল্লেখ তো আছেই, অত্যায়িক বা আপদকালে তাঁহাদিগকে রাজকীয় কোষাগার এবং শস্যভাণ্ডার হইতে তৈল, ধান, গণ্ডক ও কাকনিক মুদ্রা সাহায্যদানের কথাও আছে। তাঁহারা যে রাষ্ট্রের পোষকতা লাভ করিতেন, সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের একটি পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় সাঁচী স্তূপের দুইটি দানলিপি হইতে ; এই লিপি দু'টিতে জানা যায়, পুঞ্রবঢন বা পুণ্ড্রবর্ধনবাসী বৌদ্ধধর্মানুরাগী দুইটি ব্যক্তি—একটি মহিলা, নাম ধর্মদত্তা, অপরটি পুরুষ. নাম ঋষিনন্দন—সাঁচী স্তূপের বেষ্টনী ও তোরণ নির্মাণে কিছু দান করিয়াছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে সিংহলরাজ দুট্‌ঠগামণি মহাস্তূপ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে বিরাট উৎসব রচনা করিয়াছিলেন সেই উৎসবে আমন্ত্রিত ও আগত থেরবাদী বৌদ্ধদের সুদীর্ঘ তালিকায়, আশ্চর্যের বিষয়,

বাংলা দেশের কোনো উল্লেখই নাই। তবে, তিব্বতী জনশ্রুতি মতে নাগার্জুন বাংলা দেশে—বঙ্গাল ও পুণ্ড্রবর্ধনে—অনেকগুলি বিহার তৈরি করাইয়াছিলেন। বাংলা দেশে (এক্ষেত্রে বঙ্গে, অর্থাৎ পূর্ব বঙ্গে) বৌদ্ধধর্ম প্রসারের আরও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ পাইতেছি, খ্রীষ্টোত্তর তৃতীয় শতকের নাগার্জুনীকোণ্ডর একটি শিলালিপিতে। সিংহলী থেরবাদী বৌদ্ধদের চেষ্টা ও উৎসাহে ভারতবর্ষের অনেক জনপদ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ করিয়াছিল; এই সব দেশের একটি দীর্ঘ তালিকা এই লিপিটিতে দেওয়া হইয়াছে এবং তালিকাটিতে বঙ্গের উল্লেখ আছে। মহাযান সাহিত্যের মতে বৌদ্ধদের প্রাচীন ষোড়শ মহাস্থবিরের মধ্যে অন্তত একজন ছিলেন বাঙালী; তিনি তাম্রলিপ্তিবাসী স্থবির কালিক। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব কাল নির্ণয় করা কঠিন। মনে হয়, তিনি প্রাক্‌-গুপ্তপর্বের লোক।

প্রাক্‌গুপ্ত পর্বে বাঙলার জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধধর্মের প্রসারের অল্পবিস্তর প্রমাণ যদি বা পাওয়া যায়, আর্য বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রসারের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ প্রায় কিছুই নাই। বেদ-সংহিতায় বাঙলাদেশের তো কোনো উল্লেখই নাই; ঐতরেয় আরণ্যক-গ্রন্থে যদি বা আছে (?), তাহাও নিন্দাচ্ছলে। এমন কি বোধায়নের ধর্মসূত্র রচনাকালেও বাঙলাদেশ আর্য-বৈদিক সংস্কৃতিবহির্ভূত। অথচ, মিথিলা পর্যন্ত বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার তো উপনিষদ-যুগেই হইয়া গিয়াছিল, এবং বাঙলাদেশে সেই ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসারের পথে কোনো ভৌগোলিক বাধা ছিলনা। দু'একটি সূত্রগ্রন্থে প্রাচীন বাংলায় বৈদিক সংস্কৃতি আদৃতির একটু পরোক্ষ প্রমাণও পাওয়া যায়। বশিষ্ঠ-ধর্মসূত্রে জানা যায়, এক বিশিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের মতে বৈদিক ধর্মের প্রসার কৃষ্ণসার মৃগের বিচরণ ভূমির সীমা পর্যন্ত—পশ্চিমে সিন্ধু নদী এবং পূর্বদিকে সূর্যোদয়স্থান (অর্থাৎ পূর্বসমুদ্র)। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, সূত্রগ্রন্থ রচনাকালেও বাংলাদেশে বৈদিকধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এ-কথা বলিবার মত নির্ভরযোগ্য প্রমাণ কিছুই নাই। বস্তুত, ভাষাগত ও জনগত তথ্যপ্রমাণ হইতে মনে হয়, খ্রীষ্টোত্তর তৃতীয়-চতুর্থ শতক পর্যন্ত বাঙলাদেশে আর্য বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার কিছু হয় নাই; প্রাক্‌-আর্যভাষী কৌমজনের বাসভূমি যেমন ছিল এই দেশ তেমনই তাঁহাদের ধ্যান-ধারণা ধর্মকর্মই ছিল এই দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি। কখনও কখনও কোনো কোনো আর্য-বৈদিক নেতা বা সম্প্রদায়ের শুভাগমন হইত কি-না বলা কঠিন, কিন্তু হইলেও তাঁহারা যে খুব সমাদৃত হইতেন এমন মনে হয় না; মহাবীরের গল্প হইতে এই অনুমান করা চলে। জৈন-বৌদ্ধ-আজীবিকেরা আর্যধর্ম প্রসারের চেষ্টা কিছু করিয়াছিলেন এবং অল্পবিস্তর সার্থকতাও লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু বৈদিক ধর্মের দিক হইতে সে-চেষ্টা বিশেষ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, সার্থকতা লাভ তো দূরের কথা। বরং বৈদিক ব্রাহ্মণ্য উন্নাসিকতা বাঙলাদেশকে বহুদিন অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখিত।

তাহা সত্ত্বেও প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থে কোথাও কোথাও আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে স্থানীয় ধ্যান ধারণার সংঘর্ষের কিছু কিছু ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। হরিবংশে-গ্রন্থে যাদব-কৃষ্ণের সঙ্গে পুণ্ড্র-বাসুদেবের এক সংঘর্ষের কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধারী পৌণ্ড্র বাসুদেব কৃষ্ণের বাসুদেবত্বের দাবিতে অবিশ্বাসী ছিলেন; সংঘর্ষে পৌণ্ড্র পরাস্ত ও নিহত হন। মহাভারতে ভীমের পূর্বাভিযান-প্রসঙ্গে এক পৌণ্ড্রক-বাসুদেবের পরাজয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই পৌণ্ড্রক-বাসুদেবই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ-বিদ্বেষী পুণ্ড্র-বাসুদেব। স্বতঃই প্রশ্ন জাগে মনে, বাসুদেব কি পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসী ছিলেন? তাঁহার ধর্মমত ও বিশ্বাস কি ছিল? সে মত ও বিশ্বাস কাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল? ঐতিহাসিক গবেষণার বর্তমান অবস্থায় এই জাতীয় কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

বস্তুত, প্রাক্-গুপ্তপর্বের বাঙলায় আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয় ও প্রসারের নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণই আমাদের নাই। প্রাচ্যদেশে অবৈদিক ব্রাত্যধর্মের প্রসার ছিল এ-তথ্য সুবিদিত। অথর্ববেদের একটি ব্রাত্যস্তোত্রের ব্যাখ্যায় মনে হয়, ব্রাত্যধর্মের সঙ্গে যোগ-ধর্মের সম্বন্ধ বোধ হয় ছিল ঘনিষ্ঠ এবং এই যোগধর্মের অভ্যাস ও আচরণ প্রাচীন বাঙলায়ও হয়তো অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু, যোগধর্মের সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কোনো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, এমন মনে করিবার কারণ নাই; বরং সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কারে পণ্ডিতেরা মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যোগধর্ম প্রাক-বৈদিক, এবং শৈব ও তান্ত্রিক ধর্মের সঙ্গে যোগের সম্বন্ধ ঐতিহাসিক পর্বের।

একটি অর্বাচীন, অজ্ঞাতনামা লেখকের একটি শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন, শক্তিধর্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল গৌড়ে, প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল মিথিলায়, এখানে সেখানে কিঞ্চিত মহারাষ্ট্রে, জীর্ণত্ব প্রাপ্তি গুজরাটে। তাঁহার ধারণা, বৈদিক ও বেদোত্তর আর্যভূমির প্রত্যন্ত সীমায় যে-সব মাতৃতন্ত্রীয় কৌমজনেরা বাস করিতেন তাঁহাদের মধ্যে গিরিকান্তারময়ী একজাতীয় নারীশক্তির পূজা প্রচলন ছিল; বিন্ধ্যবাসিনী, শাকম্ভরী, কান্তারী প্রভৃতি নামে পরিচিতা দেবারা এই নারীশক্তিরই প্রতীক, এবং শক্তিধর্মের অভ্যুদয় ও প্রসার ইঁহাদের আশ্রয় করিয়াই। চন্দ মহাশয় মনে করেন, বাঙলাদেশও পূর্বতম প্রত্যন্ত দেশ হিসাবে এই ধর্মের অংশীদার ছিল। কিন্তু শক্তিধর্মের ধ্যান-ধারণাগত ইতিহাস চন্দ মহাশয়ের এই অনুমানের বিরোধী। শক্তিধর্মের শিব ও শক্তি সাংখ্য-ধ্যানোক্ত পুরুষ ও প্রকৃতিরই নামান্তর মাত্র, এবং এই পুরুষ-প্রকৃতি ধ্যান আর্য-ব্রাহ্মণ্য সৃষ্টি-ধ্যানের মূল রহস্য; সে-রহস্যে পুরুষ ধ্যানের বাহিরে বিশুদ্ধ একক শক্তি বা প্রকৃতির কোনো স্থান নাই। একবার যখন ভারতীয় ধ্যানে পুরুষ-প্রকৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলেন এবং ক্রমশ শিব-শক্তিতে রূপান্তরিত হইলেন তখন কৌম-সমাজের মাতৃকা দেবীরা ধীরে ধীরে আসিয়া শক্তিকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে আশ্রয়

করিবেন এবং তাঁহার সঙ্গে এক হইয়া যাইবেন, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। সেই জন্যই, পরবর্তীকালে আমরা যাহাকে শক্তিধর্ম বলিয়া জানি তাহা প্রাক্-গুপ্তপর্বে বাঙলাদেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এ-কথা বলিবার মত কোনো প্রমাণ আমাদের জানা নাই। তবে, কৌম-সমাজের মাতৃপ্রাধান্যের দেবীরা নিশ্চয়ই ছিলেন, এবং শক্তিধর্ম প্রসারের পর তাঁহারা শক্তিরূপিণী বিভিন্ন দেবীর সঙ্গে, বিশেষভাবে দুর্গা, তারা প্রভৃতি দেবীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া একও হইয়া গিয়াছিলেন।

৪

বাঙলাদেশের সর্বতোভদ্র আর্যীকরণ গভীর ভাবে এবং সার্থক রূপে আরম্ভ হইল গুপ্তপর্বেই। এই আরম্ভ হওয়ার মূলে সর্বভারতীয় ইতিহাসের একটি প্রেরণা সক্রিয়, কিন্তু সবিস্তারে তাহা বলিবার ক্ষেত্র এই গ্রন্থ নয়। শুধু ইঙ্গিতটুকু রাখা চলে মাত্র।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্ব : আ ৩৫০—৭৫০ খ্রী। বিবর্তন

খ্রীষ্ট শতকের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টোত্তর দেড়শত-দুইশত বৎসর ধরিয়া ভূমধ্যীয় যাবনিক এবং মধ্য এশীয় শক-কুষাণ ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রবাহ ভারতীয় প্রবাহে নূতন নূতন ধারা সঞ্চার করিতেছিল। সূচনাতেই এই সব বিচিত্র ধারাগুলিকে সংহত ও সমন্বিত করিয়া মূল প্রবাহের সঙ্গে একই খাতে প্রবাহিত করা সম্ভব হয় নাই ; তাহা স্বাভাবিকও নয়। তাহা ছাড়া, গ্রামীণ কৃষি-সভ্যতার ধীর মন্থর জীবনে এই সমন্বয়ের ও সংহতির গতিও ধীর মন্থর হইতে বাধ্য। বৌদ্ধ ধর্মে মহাযান-বাদের উদ্ভব, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধ্যানে অনেক নূতন দেবদেবীর সৃষ্টি ও রূপকল্পনা, ধর্মীয় ও সামাজিক আচারানুষ্ঠানে কিছু কিছু নূতন ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতি এই কালে দেখা দেয়। ইহাদের তরঙ্গাভিঘাত ভারতীয় জীবনের তটে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল সন্দেহ নাই। ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনেও এই সময় একটি গুরুতর রূপান্তর দেখা দেয়। প্রথম খ্রীষ্ট শতকের তৃতীয় পাদ হইতেই ভূমধ্যীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের এক ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। যে-দেশ ছিল প্রধানত ও প্রথমত কৃষিনির্ভর সেই দেশ, রোম সাম্রাজ্যের সকলপ্রান্ত হইতে প্রচুর সোনা আগমের ফলে, ক্রমশ আপেক্ষিকত শিল্প-বাণিজ্য নির্ভরতায় রূপান্তরিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সর্বত্র সমৃদ্ধ নগর, বন্দর, হাট বাজার ইত্যাদি গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। বিদেশি নানা ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির তরঙ্গাভিঘাত, নানা জাতি ও জনের সংঘাত এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর এই বিবর্তন, এই দুইএ মিলিয়া ভারতীয় জীবন-প্রবাহে এক

গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই চাঞ্চল্য শুধু জীবনের উপরের স্তরেই নয়, বরং ইহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিহিত চিন্তার ও কল্পনার গভীরতর স্তরে, জীবনের বিস্তারে। সংহতি ও সমন্বয়ের সজাগ প্রয়াস দেখা দেয় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতেই ; ঐ শতকেই দেখিতেছি সাতবাহনরাজ গোতমীপুত্র 'সাতকর্ণী বিনিবর্তিত চাতুর্বর্ণ্য সংকরস' চাতুর্বর্ণ্য সাংকর্য নিবারণ করিয়া তদানীন্তন বর্ণ-ব্যবস্থাকে একটা সমন্বিতরূপের মধ্যে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রয়াস জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির নব রূপান্তর ঘটাইতে পারিল শুধু তখনই যখন ভারতবর্ষের এক সুবৃহৎ অংশ গুপ্তবংশীয় সম্রাটদের রাষ্ট্রবন্ধনে এবং তাঁহাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাঁধা পড়িল। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনের এই সংহতিই ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সংহতিকে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিল। উপরোক্ত সমন্বয় ও সংহতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান হইতেছে ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, বৌদ্ধ ও জৈন পুরাণ। এ-গুলির সংকলন কাল গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগ।

ভারতীয় ইতিহাসের এই বিস্তৃত ও গভীর বিবর্তনের সঙ্গে সমসাময়িক বাঙলার ইতিহাস ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সংহতির মধ্যে ধরা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত সবেগে বাঙলা দেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে এবং দেখিতে দেখিতে এই দেশ ক্রমশ নিখিল ভারতীয় সংস্কৃতির এক প্রত্যন্ত অংশীদার হইয়া উঠে। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বের বাঙলার ইতিহাসে এই তথ্য গভীর অর্থবহ।

বৈদিক ধর্ম

প্রথমেই চোখে পড়ে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রসার প্রাক্-গুপ্তপর্বে কিন্তু তাহার অস্তিত্ব কোথাও সহজে ধরা পড়ে না। একটির পর একটি তাম্রপট্টে দেখিতেছি, বাঙলাদেশের নানা জায়গায় ব্রাহ্মণেরা আসিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া যাইতেছেন। ইঁহারা কেহ ঋগ্বেদীয়, কেহ বাজসনেয়ী শাখ্যাধ্যায়ী, কেহ যজুর্বেদীয়, কেহ বা সামবেদীয় ; কাহারও গোত্র কাণ্ব বা ভার্গব বা কাশ্যপ, কাহারও ভরদ্বাজ বা অগস্ত্য বা বাৎস্য বা কৌণ্ডিণ্য। ভূমিদান যাহা হইতেছে তাহার অধিকাংশই ব্রাহ্মণদের এবং দানপুণ্যের অধিকারী হইতেছেন দাতা এবং তাহার পিতামাতা। দানের উদ্দেশ্য দেবমন্দির নির্মাণ, মন্দির-সংস্কার, বিগ্রহের নিত্য নিয়মিত সেবা ও পূজার বিচিত্র উপকরণের ব্যয়-সংস্থান, বলি চরু-সত্র, ধূপ-দীপ-পুষ্প-চন্দন-মধুপর্ক প্রভৃতির সংস্থাপন, অগ্নিহোত্র ও পঞ্চমহাযজ্ঞের (অধ্যাপনা, হোম, তর্পণ, বলি ও অতিথি-পূজা) ব্যয়-সংস্থান, ইত্যাদি। একাধিক লিপিতে দেখিতেছি, গ্রামবাসী কোনো গৃহস্থ-ভূমি কিনিয়া ব্রাহ্মণদের আহ্বান করিয়া আনিয়া ভূমিদান করিয়া তাঁহাদের গ্রামে বসাইতেছেন। ষষ্ঠ শতকে এই বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবাহ বাঙলার পূর্বতম প্রান্তে পৌঁছিয়া গিয়াছে। ভাস্করবর্মার নিধনপুর লিপিতে

দেখি ভূতিবর্মার রাজত্বকালেই শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড গ্রামে দুই শতেরও উপর ব্রাহ্মণ পরিবার আহ্বান করিয়া আনিয়া বসানো হইতেছে। ইঁহারা কেহ ঋগ্বেদীয় বাহ্বৃচ্য শাখাধ্যায়ী, কেহ বা সামবেদীয় ছান্দোগ্য শাখাধ্যায়ী, আবার কেহ কেহ বা যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী, চারক্য বা তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী; প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন গোত্র ও প্রবর। সপ্তম শতকের লোকনাথ-পট্টোলীতে দেখিতেছি, সমতট দেশে বর্তমান ত্রিপুরা জেলায় জঙ্গল কাটিয়া নূতন বসতির পত্তন হইতেছে এবং সেই পত্তনে যাঁহাদের বসানো হইতেছে তাঁহারা সকলেই চতুর্বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ। সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই যে, এই পর্বে বাঙলার সর্বত্র বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিতেছে।

বৈষ্ণব ধর্ম

কিন্তু বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তারাপেক্ষাও লোকায়ত জীবনের দিক হইতে অধিকতর অর্থবহ পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার। ইহারও বিশেষ কিছু অস্তিত্ব প্রাক্‌-গুপ্ত বাঙলায় দেখিতেছি না। অথচ, চতুর্থ শতকেই দেখিতেছি, বাঙলার পশ্চিমতম প্রান্তে বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের এক গুহার প্রাচীরগাত্রে একটি বিষ্ণুচক্র উৎকীর্ণ এবং চক্রের নীচেই যাঁহার লিপিটি বিদ্যমান সেই রাজা চন্দ্রবর্ম লিপিতে নিজের পরিচয় দিতেছেন চক্রস্বামীর পূজক বলিয়া। চক্রস্বামী যে বিষ্ণু এবং গুহাটি যে একটি বিষ্ণুমন্দির রূপেই কল্পিত, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই। পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধে বগুড়া জেলার বালিগ্রামে এক গোবিন্দস্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠার খবর পাওয়া যাইতেছে। বৈগ্রাম-লিপিতে, এবং ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর-বঙ্গে, দুর্গম হিমবাচ্ছিখরে শ্বেতবরাহস্বামী ও কোকামুখস্বামী নামে দুই দেবতার দুই মন্দির প্রতিষ্ঠার খবর পাওয়া যাইতেছে ৪ নং ও ৫নং দামোদরপুর পট্টোলীতে। গোবিন্দস্বামী বিষ্ণুরই অন্যতম নাম সন্দেহ নাই: শ্বেতবরাহস্বামীও বরাহ-অবতার বিষ্ণুরই অন্যতম রূপ বলিয়া মনে হয়। কোকামুখস্বামীকে কেহ মনে করেন বিষ্ণুর অন্যতম রূপ, কেহ মনে করেন শিবের। বরাহপুরাণ মতে কোকামুখ স্থান-নাম; ইহার অবস্থিতি কৌশিকী ও ত্রিস্রোতার অনতিদূরে হিমালয়ের কোনো অংশে: স্থানটি বিষ্ণুর পরম প্রিয় এবং এখানকার বিষ্ণুপ্রতিমাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। দামোদরপুর-লিপির হিমবচ্ছিখরস্থ কোকামুখস্বামীর মন্দির কি বরাহপুরাণ-কথিত এই বিষ্ণু-প্রতিমার মন্দির? শ্বেতবরাহরূপী বিষ্ণু সহজ বোধ্য; কোকামুখ বিষ্ণু কি কৃষ্ণ বা রক্তবরাহরূপী বিষ্ণু? বোধ হয় তাহাই। যাহাই হউক, ইহার কিছুদিন পরই ত্রিপুরা-জেলার গুণাইঘর পট্টোলীতে এক প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের খবর পাইতেছি। প্রদ্যুম্নেশ্বরও বিষ্ণুর অন্যতম রূপ। সপ্তম শতকের লোকনাথ-পট্টোলীতে ত্রিপুরা-জেলায় ভগবান অনন্ত-নারায়ণের (অনন্তশয়ান বিষ্ণু) পূজার খবর পাওয়া যাইতেছে। এই সপ্তম শতকেরই কৈলান-পট্টোলীতে দেখিতেছি, শ্রীধারণরাত

ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং পুরুষোত্তমের ভক্ত উপাসক ; তিনি আবার পরম কারুণিকও ছিলেন এবং শাস্ত্রনিয়ম ছাড়া অযথা প্রাণীবধের বিরোধী ছিলেন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, পৌরাণিক বিষ্ণুর বিভিন্ন রূপ ও ধ্যানের সঙ্গে সমসাময়িক বাঙালীর পরিচয় ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। কারণ লিপিগত উল্লেখই তো শুধু নয়, সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিভিন্ন বৈষ্ণব প্রতিমার সাক্ষ্যও বিদ্যমান বাঙলার সমসাময়িক সাহিত্যে বা পুরাণে বা অন্য কোন গ্রন্থে পৌরাণিক দেবদেবীদের তত্ত্ব ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা বা বিবরণ জানিবার মতন উপকরণ যখন নাই তখন এই সব প্রতিমা-সাক্ষ্যই বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়গত দেবদেবীদের, এবং পৌরাণিক ধর্মের ধ্যান ও কল্পনার একমাত্র পরিচয়। সৌভাগ্যের বিষয়, প্রাচীন বাঙলায় এই ধরনের সাক্ষ্যের অভাব নাই, বিশেষ ভাবে অষ্টম শতক এবং অষ্টম শতকের পর হইতে। গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর যুগেরও অন্তত কয়েকটি বৈষ্ণব প্রতিমার কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। রংপুর জেলায় প্রাপ্ত একাধিক ধাতু নির্মিত বিষ্ণু-মূর্তি ও একটি অনন্তশয়ান বিষ্ণু-মূর্তি, বরিশাল জেলার লক্ষণকাঠির গরুড়বাহন এবং সপরিবার বিষ্ণু, রাজসাহী জেলার যোগীর সংযান গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণু-মূর্তি, মালদহ জেলার হাঁকরাইল গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণু মূর্তি ঢাকা জেলার সাভার গ্রামে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ এক বিষ্ণুর প্রতিমা প্রভৃতি সমস্তই এই পর্বের। এই প্রতিমাগুলির রূপ-কল্পনা ও লক্ষণ আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, পৌরাণিক বিষ্ণু তাঁহার নিজস্ব মর্যাদায় এবং সপরিবারে সমস্ত লক্ষণ ও লাঞ্ছন লইয়া বাঙলাদেশে আসিয়া আসন লাভ করিয়া গিয়াছেন গুপ্তপর্বেই।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বের বাঙলায় বিষ্ণুর যে কয়েকটি রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় (গোবিন্দস্বামী, কোকামুখস্বামী, শ্বেতবরাহস্বামী, প্রদ্যুম্নেশ্বর, অনন্ত-নারায়ণ, পুরুষোত্তম) তাহাদের মধ্যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য কিছু নাই। দেবতার নামের সঙ্গে স্বামী নামের যোগ সমসাময়িক ভারতীয় লিপিতে অজ্ঞাত নয় (তুলনীয়, চক্রস্বামী, চিত্রকূটস্বামী, স্বামী মহাসেন, যথাক্রমে বিষ্ণু, বিষ্ণু ও কার্তিক)। পঞ্চরাত্রীয় চতুর্ব্যূহবাদের কোনো আভাসও এই পর্বের লিপিগুলিতে কোথাও দেখিতেছি না। চতুর্ব্যূহের প্রদ্যুম্নের সঙ্গে উপরোক্ত প্রদ্যুম্নেশ্বরের কোনো সম্বন্ধ আছে বলিয়া তো মনে হয় না। গুপ্ত-পর্বের রাজা-মহারাজেরা নিজেদের পরিচয়ে সাধারণত 'পরমভাগবত' পদটি ব্যবহার করিতেন ; মনে হয়, তাঁহারা সকলেই ছিলেন বৈষ্ণব ভাগবদ্ধর্মে দীক্ষিত। আদিতে যাহাই হউক, অন্তত গুপ্ত-পর্বে এই ভাগবদ্ধর্মের সঙ্গে পঞ্চরাত্রীয় ব্যূহবাদের কোনো সম্বন্ধ ছিল না। বস্তুত, এই পর্বের ভাগবদ্ধর্ম ঋগ্বেদীয় বিষ্ণু, পঞ্চরাত্রীয় নারায়ণ, মথুরা অঞ্চলের সাত্বত-বৃষ্ণিদের বাসুদেব কৃষ্ণ, পশুপালক আভীর প্রভৃতি কোমের গোপাল ইত্যাদির সমন্বিত এক রূপ বলিয়াই মনে হয়। এই ভাগবদ্ধর্মই গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বে বাঙলাদেশে প্রচার লাভ করে এবং পালপর্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরমভাগবত্ পরিচয় ছাড়া, এই পর্বের একজন রাজা—

সপ্তম শতকের রাতবংশীয় সমতটেশ্বর শ্রীধারণ-আত্মপরিচয় দিতেছেন পুরুষোত্তমের পরমভক্ত পরম বৈষ্ণব রূপে। পুরুষোত্তম তো বিষ্ণুরই অন্যতম নাম ও রূপ।

বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত কৃষ্ণায়ণ ও রামায়ণ-কাহিনী যে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বেই বাঙলাদেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় পাহাড়পুর মন্দিরের পোড়ামাটির ও পাথরের ফলকগুলিতে। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণ, চাণুর ও মুষ্টিকের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামের মল্লযুদ্ধ যমালার্জুন অথবা জোড়া অর্জুন বৃক্ষ উৎপাটন, কেশী রাক্ষসবধ, গোপীলীলা কৃষ্ণকে লইয়া বাসুদেবের গোকুল গমন, রাখাল বালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরাম গোকুলে কৃষ্ণের বাল্যজীবনলীলা প্রভৃতি কৃষ্ণায়ণের অনেক গল্প এই ফলকগুলিতে উৎকীর্ণ হইয়াছে, শিল্পীর এবং সমসাময়িক লোকায়ত জীবনের পরম আনন্দে বলরাম ও দেবী যমুনার স্বতন্ত্র প্রতিকৃতিও বিদ্যমান। একটি ফলকে প্রভামণ্ডলযুক্ত, লাস্যভঙ্গীতে দণ্ডায়মান একজোড়া মিথুনমূর্তি উৎকীর্ণ—দক্ষিণে নারীমূর্তি, বামে নরমূর্তি। কেহ কেহ এই মূর্তি দুইটিকে রাধাকৃষ্ণের লাস্যরূপ বলিয়া চালাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু এরূপ মনে করিবার সংগত কোনো কারণ নাই। রাধা কল্পনার ঐতিহ্য এত প্রাচীন নয়। কালিদাসের "গোপবেশস্য কৃষ্ণ"-পদ রাধার অস্তিত্বের সূচক এ-কথা বলা কঠিন; এমন কি দ্বাদশ শতকীয় রাজা ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে কৃষ্ণের বিচিত্র মিথুনলীলার উল্লেখ থাকিলেও সে-লীলার সঙ্গে রাধার কোনো সম্বন্ধ দেখিতেছি না। হালের গাথা সপ্তশতীতে রাধার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সে-উল্লেখের প্রাচীনত্ব নিশ্চয় করিয়া নির্ধারণ কঠিন। তবে, জয়দেবের (দ্বাদশ শতক) পূর্বেই কোনো সময়ে, এই বাঙলাদেশেই রাধাতত্ত্ব ও রাধার রূপ-কল্পনা সৃষ্টিলাভ করিয়াছিল, এ-সম্বন্ধে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না। বস্তুত, বৈষ্ণব ধর্মের রাধা শাক্তধর্মের শক্তিরই বৈষ্ণব রূপান্তর ও নামান্তর মাত্র। শিবের মত কৃষ্ণ বা বিষ্ণুই বৈষ্ণব-ধর্মে পরমপুরুষ, এবং এই পুরুষের প্রকৃতি বা শক্তি হইতেছেন রাধা; এই পৃথিবী বা প্রকৃতি যে বিষ্ণুর শক্তি বা বৈষ্ণবী, এই ধ্যান ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই কতকটা প্রসার লাভ করিয়াছিল। হয়তো এই ধ্যানেরই বিবর্তিত রূপ হইতেছেন রাধা। পাহাড়পুরের যুগলমূর্তি কৃষ্ণ ও রুক্মিণী বা সত্যভামার শিল্পরূপ বলিয়াই মনে হয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, পাহাড়পুরে কৃষ্ণায়ণের এই গল্পগুলি মন্দিরের অলংকরণ-উদ্দেশ্যেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল, পূজার জন্য নহে। রামায়ণের কয়েকটি গল্পের যে প্রতিকৃতি আছে (যেমন, বানরসেনা কর্তৃক সেতু নির্মাণ, বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ, ইত্যাদি) সে-সম্বন্ধেও এ-উক্তি প্রযোজ্য। তবে, বোধ হয় সংশয় করা চলে না যে, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের লোকায়ত বাঙালী জীবনে কৃষ্ণায়ণ ও রামায়ণের কাহিনী যথেষ্ট প্রসার ও সমাদর লাভ করিয়াছিল এবং এই কৃষ্ণায়ণ ও রামায়ণ আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণব ধর্মের সীমাও বিস্তৃত হইয়াছিল।

শৈবধর্ম

এই পর্বের বাঙলায় শৈবধর্মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা এতটা কিন্তু দেখা যাইতেছে না যদিও যে-শৈবধর্মের দেখা পাইতেছি তাহা পুরাপুরি সমৃদ্ধ পৌরাণিক শৈবধর্ম। শিবের বিভিন্ন নাম ও রূপ-কল্পনার সঙ্গে পরিচয় সূচনাতেই ঘটিতেছে, এবং বস্তুলিঙ্গ ও মুখলিঙ্গ শিবলিঙ্গের এই দুই রূপের পরিচয়ই বাঙলা দেশে পাওয় যাইতেছে। ৫নং দামোদরপুর-লিপিতে দেখিতেছি, পঞ্চম শতকে উত্তর-বঙ্গের এক দুর্গম প্রান্তে লিঙ্গরূপী শিবের পূজা প্রবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় শৈবধর্ম মহাদেব-পাদানুধ্যাত মহারাজ বৈন্যগুপ্তের রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া পূর্ব-বাঙলায় বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। সপ্তম শতকে গৌড়-রাজ শশাঙ্ক ও কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্মা দুইজনই পরম শৈব। শশাঙ্কের মুদ্রায় মহাদেবের এবং নন্দীবৃষের প্রতিকৃতি; তিনি যে শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন তাহার পরোক্ষ একটু ইঙ্গিত যুয়ান-চোয়াঙও রাখিয়া গিয়াছেন। ষষ্ঠ শতকের সমাচারদেবের মুদ্রায়ও নন্দীবৃষের শৈব-লাঞ্ছন, অনুমান হয় ফরিদপুরের এই প্রাচীন রাজপরিবারটিও শৈব। আস্রফপুর-পট্টোলীর সাক্ষ্যে মনে হয় খড়্গ-বংশীয় রাজারা বৌদ্ধ হইলেও শৈবধর্মের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, তাঁহাদের রাজকীয় পট্ট ও মুদ্রায় বৃষলাঞ্ছন। তাহা ছাড়া রাজা দেবখড়্গের পট্টমহিষী রাণী প্রভাবতী একটি অষ্টধাতুনির্মিত সর্বাণীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এ-তথ্যও সুপরিজ্ঞাত। এই শতকেরই অন্যতম ব্রাহ্মণ নরপতি ভরদ্বাজ গোত্রীয় করণ লোকনাথও বোধ হয় ছিলেন শৈব। রাজবংশীয় রাজারা যে ব্রাহ্মণ ছিলেন এ-সম্বন্ধে তো সন্দেহের অবকাশই নাই, তাঁহারা বোধ হয় ছিলেন পরম বৈষ্ণব। রাণী প্রভাবতী প্রতিষ্ঠিত প্রতিমাটির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিতে দেবীকে বলা হইয়াছে সর্বাণী বা সর্বের শক্তি, এবং সর্ব হইতেছেন অথর্ববেদীয় রুদ্রদেবতার অষ্টরূপের অন্যতম রূপ। কিন্তু এই সর্বাণী প্রতিমাটির লক্ষণ ও লাঞ্ছন ইত্যাদির সঙ্গে পরবর্তী-কালের শারদাতিলক গ্রন্থবর্ণিত ভদ্রকালী, অম্বিকা, ভদ্র-দুর্গা, ক্ষেমংকরী প্রভৃতি দেবী বা শক্তি-মূর্তির কোনো পার্থক্য নাই। নাম যাহাই হউক, সর্বাণী যে শিবেরই শক্তিরূপে কল্পিতা হইয়াছেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এতগুলি রাজা ও রাজবংশের পোষকতায় বাঙলাদেশে শৈবধর্মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

শৈবধর্মের প্রসার ও প্রতিপত্তির কিছু প্রমাণ পাহাড়পুরের ফলকগুলিতেও পাইতেছি। বস্তুলিঙ্গ ও মুখলিঙ্গরূপী শিব দুইই বিদ্যমান এবং যে দুইটি ফলকে নিঃসন্দেহে শিব-লিঙ্গের প্রতিকৃতি সে দু'টিতেই ব্রহ্মসূত্রের বেষ্টনও সুস্পষ্ট। পাহাড়পুর-মন্দিরের পীঠ-প্রাচীরগাত্রের ফলকে কয়েকটি চন্দ্রশেখর-শিবের প্রতিকৃতিও আছে। তৃতীয় নেত্র, ঊর্ধ্বলিঙ্গ, জটমুকুট কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃষবাহন, ত্রিশূল, অক্ষমালা এবং কমণ্ডলু প্রভৃতি লক্ষণ দেখিলে সন্দেহ করিবার উপায় থাকে না যে, এই ধরনের প্রতিমা হইতেই ক্রমশ পাল ও

সেনপর্বের পূর্ণতর শিব-প্রতিমার উদ্ভব। চব্বিশ পরগণা জেলার জয়নগরে প্রাপ্ত সপ্তম শতকীয় একটি ধাতব প্রতিমাতেও তৃতীয় নেত্র বৃষবাহন সমপদস্থানক চন্দ্রশেখর-শিবের লক্ষণ সুস্পষ্ট।

শৈব গাণপত্য ধর্মের প্রসারের কোনো প্রমাণ অন্তত এই পর্বের বাংলাদেশে কিছু দেখা যায় না; কিন্তু গণপতি বা গণেশের প্রতিকৃতি এই পর্বে সুপ্রচুর। এক পাহাড়পুরেই পাথরের, পোড়ামাটির ও ধাতব কয়েকটি উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান গণেশ-প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিতত্ত্বের দিক হইতে ইহাদের প্রত্যেকটিই মূল্যবান। ইহাদের মধ্যে একটি নৃত্যপর গণেশের প্রতিমা, এবং এই প্রতিমাটিতে লোকায়ত চিত্তের সরল সরস কৌতুকের শিল্পময় প্রকাশ সুস্পষ্ট। গণেশের যাহা কিছু প্রধান লক্ষণ ও লাঞ্ছন তাহা তো এই প্রতিমাগুলিতে আছেই, কিন্তু একটি উপবিষ্ট গণেশের এক হাতে প্রচুর পত্রসংযুক্ত একটি মূলার লক্ষণও বিশেষ লক্ষণীয়।

শৈব কার্তিকেয়ের কোনো লিপি প্রমাণ বা মূর্তি-প্রমাণ এই পর্বে কিছু দেখা যাইতেছে না। তবে, অষ্টম শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে কার্তিকেয়ের এক মন্দিরের উল্লেখ পাইতেছি কহলনের রাজতরঙ্গিনীতে। কিন্তু গণেশ বা কার্তিকেয়, বা পরবর্তী বাংলার ইন্দ্র, অগ্নি, রেবন্ত, বৃহস্পতি, কুবের, গঙ্গা, যমুনা, বা মাতৃকাদেবী প্রভৃতি যাঁহাদের লিপি মূর্তি বা গ্রন্থ-প্রমাণ বিদ্যমান তাঁহাদের আশ্রয় করিয়া কোনো বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় বাঙলা-দেশে কখনও গড়িয়া উঠে নাই।

সৌরধর্ম

প্রাচীন ভারতবর্ষে যে সূর্যমূর্তি ও সূর্যপূজার পরিচয় আমরা পাই তাহা একান্তই উদীচ্য দেশ ও উদীচ্য সংস্কৃতির দান, এই দান বহন করিয়া আনিয়াছিলেন ঈরানী ও শক অভিযাত্রীরা এবং ভারতবর্ষ এই দান হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। বৈদিক সূর্য-ধ্যান-কল্পনার সঙ্গে যেমন এই সূর্যের কোনো যোগ নাই, তেমনই নাই লোকায়ত জীবনের সূর্যধ্যান ও ব্রতাচারের সঙ্গে। এই উদীচ্যদেশি সূর্যের সঙ্গে বাঙলাদেশের পরিচয় ঘটে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বেই। রাজসাহী জেলার কুমারপুর ও নিয়ামতপুরে প্রাপ্ত দুইটি সূর্য-মূর্তি কুষাণ-পর্বের না হইলেও অন্তত আদি গুপ্ত পর্বের। বগুড়া জেলার দেওড়া গ্রামে প্রাপ্ত সূর্যমূর্তিও প্রায় এই যুগেরই। ২৪-পরগণা জেলার কাশীপুর গ্রামের সূর্যমূর্তি এবং ঢাকা চিত্রশালার ক্ষুদ্রাকৃতি ধাতব সূর্যপ্রতিমাও গুপ্ত-পর্বেরই। ইহাদেরই পূর্ণতর বিবর্তিত মূর্তিরূপ দেখিতেছি পাল-সেন-পর্বের অসংখ্য সূর্যমূর্তিতে। মনে হয়, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বেই বাঙলাদেশে সৌরধর্ম কিছুটা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং বিশিষ্ট একটি সৌর সম্প্রদায়ও গড়িয়া উঠিয়াছিল।

জৈনধর্ম

পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার আদিতম আর্যধর্মই হইতেছে জৈনধর্ম এবং গুপ্ত পর্বের আগেই বাঙলা দেশে, বিশেষভাবে উত্তর-বঙ্গে, জৈনধর্ম বিশেষ প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু গুপ্ত পর্বে জৈনধর্মের উল্লেখ বা জৈন মূর্তি-প্রমাণ বিশেষ কিছু দেখিতেছি না। একটি মাত্র অভিজ্ঞান পাইতেছি পাহাড়পুর পট্টোলীতে; এই পট্টোলীতে দেখা যাইতেছে, পঞ্চম শতকের বটগোহালীতে (পাহাড়পুর সংলগ্ন বর্তমান গোয়ালভিটা) একটি জৈন বিহার ছিল, বারাণসীর পঞ্চস্তূপীয় শাখার নির্গ্রন্থনাথ আচার্য গুহনন্দীর শিষ্য ও শিষ্যানুশিষ্যবর্গ এই বিহারের অধিবাসী ও অধিকর্তা ছিলেন, এবং তাঁহারা প্রতিবাসী এক ব্রাহ্মণ-দম্পতির নিকট হইতে কিছু ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন, বিহারের অর্হৎদের নিত্য পূজা ও সেবার ফুল-চন্দন ধূপ ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য।

অথচ, প্রায় দেড়শত বৎসর পরই (সপ্তম শতকের দ্বিতীয় পাদে) য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ বলিতেছেন, (বৈশালী, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কলিঙ্গে) দিগম্বর নির্গ্রন্থ জৈনদের সংখ্যা ছিল সুপ্রচুর। দিগম্বর নির্গ্রন্থদের এই সুপ্রাচুর্য ব্যাখ্যা করা কঠিন। বাঙলা দেশ এক সময় আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল; এবং এ তথ্য সুপরিজ্ঞাত যে, বৌদ্ধদের চক্ষে আজীবিকদের সঙ্গে নির্গ্রন্থদের অশন-বসন-আচারানুষ্ঠানের পার্থক্য বিশেষ ছিল না। সেই হেতু দিব্যাবদান-গ্রন্থে দেখিতেছি, নির্গ্রন্থ ও আজীবিকদের নির্বিচারে একে অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া তালগোল পাকানো হইয়াছে। য়ুয়ান্-চোয়াঙের সময়ে, বোধ হয় তাঁহার আগেই, অন্তত বাঙলাদেশে আজীবিকেরা নির্গ্রন্থ-সম্প্রদায়ে একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সংখ্যা পুষ্ট করিয়াছিলেন; অথবা দিব্যাবদানের মত য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ও আজীবিক ও নির্গ্রন্থের পার্থক্য ধরিতে না পারিয়া সকলকেই নির্গ্রন্থ বলিয়াছেন। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্মর্তব্য যে, প্রাচীন বাংলায় আজীবিকদের স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্বের প্রমাণ নাই।

পাল ও সেন-পর্বে নির্গ্রন্থ জৈনদের কোনো লিপি-প্রমাণ বা গ্রন্থ-প্রমাণ দেখিতেছি না, যদিও প্রাচীন বাঙলার নানা জায়গায় কিছু কিছু জৈন মূর্তি-প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের কথা পরে যথাস্থানে বলিতেছি। নির্গ্রন্থ জৈন সম্প্রদায়ের, স্বল্পসংখ্যক হইলেও কিছু লোক নিশ্চয়ই ছিলেন; তাহা না হইলে এই সব মূর্তি-প্রমাণের ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে, মনে হয়, পাল-পর্বের শেষের দিক হইতে বীরভূম, পুরুলিয়া অঞ্চলে নানা জায়গায় নির্গ্রন্থ জৈনদের সমৃদ্ধ কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইসব অঞ্চলে দশম-একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের অনেক জৈন মূর্তি ও মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর বাঙলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার না হউক প্রভাব ও প্রতিপত্তি সকলের চেয়ে বেশি। তৃতীয় শতকের শেষপাদে বা চতুর্থ শতকের সূচনাতেই দেখিতেছি,

চীনা বৌদ্ধ শ্রমণেরা বাংলাদেশে, বিশেষভাবে উত্তর-বঙ্গে, যাতায়াত করিতেছেন। ইৎসিঙ্ বলিতেছেন, চীনা শ্রমণদের ব্যবহারের জন্য মহারাজ শ্রীগুপ্ত একটি 'চীন মন্দির' নির্মাণ করাইয়া তাহার সংরক্ষণের জন্য চব্বিশটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন; মন্দিরটি ছিল মৃগস্থাপন (মি লি-কিয়া-সি-কিয়া-পো নো) স্তূপের সন্নিকটেই এবং নালন্দা হইতে গঙ্গাতীর ধরিয়া ৪০ যোজন দূরে। এই শ্রীগুপ্ত খুব সম্ভব গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ শ্রীগুপ্ত বা গুপ্ত, এবং মৃগস্থাপন স্তূপ বরেন্দ্র বা উত্তর-বঙ্গের কোনো স্থানে। পঞ্চম শতকের গোড়ায় চীনা বৌদ্ধ শ্রমণ ফা-হিয়েন চম্পা হইতে গঙ্গা বাহিয়া বাংলাদেশেও আসিয়াছিলেন এবং তাম্রলিপ্ত বন্দরে দুই বৎসর বৌদ্ধ সূত্র ও বৌদ্ধ প্রতিমাচিত্র নকল করিয়া কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তাম্রলিপ্তিতে অসংখ্য ভিক্ষু অধ্যুষিত বাইশটি বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং বৌদ্ধ ধর্মের সমৃদ্ধিও ছিল খুব। এই সমৃদ্ধির কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় দুয় সমসাময়িক কয়েকটি বৌদ্ধ মূর্তিতে। পূর্ব-ভারতীয় গুপ্তশৈলীর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন রাজসাহীজেলার বিহারৈল গ্রামে প্রাপ্ত দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তিটি মহাযানী যোগাচারের শিল্পময় রূপ। বগুড়া জেলার মহাস্থানে বলাইধাপ-স্তূপের নিকট প্রাপ্ত ধাতব মঞ্জুশ্রী মূর্তিটিও এই যুগেরই এবং ইহাও মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই প্রমাণ আরও দৃঢ়তর হইতেছে ষষ্ঠ শতকের প্রথম দশকে উৎকীর্ণ মহারাজ বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর পট্টোলীর সাহায্যে। সামন্ত-মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য ছিল, (১) মহাযানী ভিক্ষু শান্তিদেবের জন্য রুদ্রদত্ত নির্মিত ও আর্য-অবলোকিতেশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত আশ্রম-বিহারের সংরক্ষণ, (২) এই বিহারে শান্তিদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং অবৈবর্তিক মহাযানী ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক স্থাপিত বুদ্ধমূর্তির প্রতিদিন তিনবার ধূপ, গন্ধ, পুষ্প সহকারে পূজার সংস্থান, এবং (৩) ঐ বিহারবাসী ভিক্ষুদের অশন, বসন, শয়ন, আসন এবং চিকিৎসার সংস্থান। এই পট্টোলীতেই খবর পাইতেছি, উক্ত আশ্রম-বিহার প্রতিষ্ঠার আগেই উহার নিকটেই রাজবিহার নামে আর একটি বিহার ছিল; এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা যে কে তাহা বলিবার উপায় নাই। রাজবিহার ছাড়া আরও একটি বৌদ্ধ বিহারের উল্লেখ এই লিপিতে আছে। যাহাই হউক, ষষ্ঠ শতকের গোড়াতেই বাঙলার পূর্বতম প্রান্তে ত্রিপুরা-জেলায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গুণাইঘর-লিপিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অথচ, স্মরণ রাখা প্রয়োজন, মহারাজ বৈন্যগুপ্ত নিজে ছিলেন 'মহাদেবপাদানুধ্যাত' অর্থাৎ শৈব। ত্রিপুরা-জেলারই কৈলান-পট্টোলীতে দেখিতেছি, শ্রীধারণরাতের মহাসান্ধিবিগ্রহিক জয়নাথ কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন একটি রত্নত্রয়ে অর্থাৎ বৌদ্ধবিহারে, বিহারস্থ আর্যসংঘের লিখন-পঠন, চীবর এবং আহারাদির সংস্থানের জন্য। অথচ, স্মরণ রাখা প্রয়োজন, শ্রীধারণারাত নিজে ছিলেন পরম বৈষ্ণব।

চীনা শ্রমণদের কৃপায় সপ্তম শতকে বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য

আমাদের আয়ত্তে। এঁদের মধ্যে য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণীই সব চেয়ে প্রসিদ্ধ এবং তথ্য বহুল। তিনি বাঙলাদেশে আসিয়াছিলেন আনুমানিক ৬৩৯ খ্রীষ্ট শতকে, এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও সাধনার প্রসিদ্ধ কেন্দ্রগুলি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য কজঙ্গল পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণ-সুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তি, বাঙলার এই কয়টি জনপদ পরিক্রমা করিয়াছিলেন। কজঙ্গলে তিনি ছ'সাতটি বৌদ্ধ সংঘারাম দেখিয়াছিলেন, এবং তাহাতে প্রায় ছয় শত ভিক্ষু বাস করিতেন। কজঙ্গলের উত্তর অংশে গঙ্গার অনতিদূরে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রতিমাসম্বলিত, নানা কারুকার্যখচিত ইট ও পাথরের তৈরি একটি বৃহৎ মন্দিরের কথাও তিনি বলিয়াছেন। পুণ্ড্রবর্ধনে ছিল বিশটি বিহার এবং মহাযান ও হীনযান উভয়পন্থী তিন হাজারেরও উপর ভিক্ষু এই বিহারগুলিতে বাস করিতেন। সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন বিহারটি ছিল পুণ্ড্রবর্ধন-রাজধানীর তিন মাইল পশ্চিমে এবং তাহার নাম ছিল পো সি-পো বিহার। এই বিহারে ৭০০ মহাযানী ভিক্ষু এবং পূর্ব-ভারতের বহু জ্ঞানবৃদ্ধ খ্যাত-নামা শ্রমণ বাস করিতেন; বিহারের অনতিদূরেই ছিল অবলোকিতেশ্বরের একটি মন্দির। পো-সি পো বিহার বোধ হয় মহাস্থান-সংলগ্ন ভাসু-বিহার। য়ুয়ান-চোয়াঙ সমতটে দুই হাজার স্থবিরবাদী শ্রমণাধ্যুষিত ত্রিশটি বিহার দেখিয়াছিলেন। যথার্থত ইঁহারা বোধ হয় ছিলেন মহাযানী। কর্ণসুবর্ণে দশাধিক বিহারে সম্মতীয় শাখার দুই হাজার শ্রমণ বাস করিতেন। সম্মতীয় বৌদ্ধরা ছিলেন সর্বাস্তিবাদী। কর্ণসুবর্ণ-রাজধানীর অনতিদূরে ছিল সুবিখ্যাত লো-টো-মো-চিহ্ বা রক্তমৃত্তিকা বিহার; বহু কৃতী পণ্ডিত শ্রমণ ছিলেন এই বিহারের অধিবাসী। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন, কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধ ধর্ম সুপ্রচারিত হইবার আগেই জনৈক দক্ষিণ-ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণের সম্মানার্থে দেশের রাজা কর্তৃক এই বিহার নির্মিত হইয়াছিল। তাম্রলিপ্তিতেও দশাধিক বিহার ছিল, এবং এই বিহারগুলিতে এক হাজারেরও বেশি শ্রমণ বাস করিতেন। অথচ, তাম্রলিপ্তিতে ফা-হিয়েনের কালে বিহার ছিল বাইশটি। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর ই-ৎসিঙ যখন তাম্রলিপ্তি আসেন তখন সেখানে সর্বাস্তিবাদের প্রবল প্রতাপ; য়ুয়ান-চোয়াঙের সময়ও বোধ হয় তাহাই ছিল। য়ুয়ান-চোয়াঙের সাক্ষ্যে মনে হয় তাঁহার সময়ে অধিকাংশ বাঙালী শ্রমণই ছিলেন হীনযানপন্থী; এক চতুর্থাংশের কিছু উপর ছিলেন মহাযানপন্থী। কিন্তু, স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আজ আমরা হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধ ধর্মে যে-ভাবে পার্থক্য বিচার করিয়া থাকি য়ুয়ান চোয়াঙের সময়ে সে-ধরনের বিচার ছিল না। ভারতবর্ষের বহু জায়গার শ্রমণদের কথা বলিতে গিয়া য়ুয়ান-চোয়াঙ তাঁহাদের পরিচয় দিয়াছেন, "স্থবিরশাখার মহাযানবাদী" বলিয়া। এই জন্যই তিনি পুণ্ড্রবর্ধনের অধিকাংশ শ্রমণদের পরিচয় দিয়াছেন হীনযান ও মহাযান উভয় মতাবলম্বী বলিয়া। সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রে বহু ক্ষেত্রে এই দুই মতবাদে আজিকার দিনের মত পার্থক্য কিছুই করা হয় নাই; এইসব শাস্ত্র

মতে শ্রাবকযান বা হীনযান মহাযানেরই নিম্নতর স্তর মাত্র। প্রাচীন চীনা ও জাপানী বৌদ্ধদের মত্ও তাহাই। আজ পণ্ডিত মহলে এ-তথ্য সুপরিজ্ঞাত যে বৌদ্ধ মহাযানপন্থী, সর্বাস্তিবাদী, ধর্মগুপ্তবাদী, মহাসাংঘিকবাদী প্রভৃতি শ্রমণেরা যথার্থত হীনযানবাদের বিনয়-শাসন মানিয়া চলিতেন। খুব সম্ভব, এই অর্থেই য়ুয়ান-চোয়াঙ "স্থবিরশাখার মহাযানবাদী" পদটি ব্যবহার করিয়াছেন, এবং হীনযান এবং মহাযান উভয় মতাবলম্বী বলিতেও তাহাই বুঝিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পর ই-ৎসিঙ বলিতেছেন, পূর্ব-ভারতে মহাসাংঘিক, স্থবিরবাদী, সম্মতীয়বাদী এবং সর্বাস্তিবাদী এই চারি বর্গের বৌদ্ধরাই অন্যান্য শাখার বৌদ্ধদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করিতেন। কিন্তু, মহাযানী বৌদ্ধরা ছাড়া অন্য কোন শাখাপন্থী বৌদ্ধ ছিলেন, এমন প্রমাণ নাই; অন্তত তাম্রলিপ্তিতে ছিলেন না। সপ্তম শতকের তাম্রলিপ্তিতে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে আরও কিছু চীনা সাক্ষ্য বিদ্যমান। তা-চেং-টেং নামে এক বৌদ্ধ শ্রমণ সুদীর্ঘ বারো বৎসর তাম্রলিপ্তিতে বসিয়া সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন ; চীনদেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি নিদান-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছিলেন। তৎ-লিন নামে আর এক বৌদ্ধ শ্রমণ এই তাম্রলিপ্তিতেই সর্বাস্তিবাদে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিন বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। ই-ৎসিঙ তাম্রলিপ্তি আসিয়াছিলেন ৬৭৩ খ্রীষ্ট শতকে। পো-লো-হো বা বরাহ (?)-বিহারে উপরোক্ত তা চেং-টেং'র সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তিনিও তাম্রলিপ্তিতে কিছুকাল বাস করিয়া সংস্কৃত ও শব্দবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং নাগার্জুন-বোধিসত্ত্ব-সুহৃল্লেখ নামে অন্তত একটি সংস্কৃত গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। বরাহ-বিহারে তখন রাহুলমিত্র নামে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক এক শ্রমণ বাস করিতেন ; তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ছিল অসীম। পো-লো-হো বা বরাহ-বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনযাত্রার একটি ছবি ই-ৎসিঙ্ রাখিয়া গিয়াছেন। কঠোর নিয়ম-সংযমে তাঁহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত ছিল ; সংসার-জীবন তাঁহারা পরিহার করিয়া চলিতেন এবং জীবহত্যার পাপ হইতে তাঁহারা মুক্ত ছিলেন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর দেখা হইলে তাঁহারা উভয়েই অত্যন্ত সংযত ও বিনয়-সম্মত আচরণ করিতেন। ভিক্ষুণীরা যখনই বাহিরে যাইতেন অন্তত দুই জন একসঙ্গে যাইতেন ; কোনো গৃহস্থ-উপাসকের বাড়ী যাইবার প্রয়োজন হইলে অন্যূন চারজন একত্র যাইতেন। একবার একজন শ্রমণের একটি বালকের হাত দিয়া এক গৃহস্থ-উপাসকের স্ত্রীকে কিছু চাল পাঠাইয়াছিলেন। এই ব্যাপারটি যখন সংঘের গোচরীভূত হইল তখন শ্রমণটি এত লজ্জিত হইলেন যে, চিরতরে সেই বিহার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই বিহারেরই ভিক্ষু রাহুলমিত্র মুখোমুখি কখনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলিতেন না, মাতা ও ভগিনী ছাড়া। তাঁহারাও যখন দেখা করিতে আসিতেন, সাক্ষাৎকার্যটা হইত তাঁহার ঘরের বাহিরে।

অথচ, ইহার তিন শত বৎসর পরই বৌদ্ধ সংঘে-বিহারে—এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মাষ্ঠানেও

—যে নৈতিক অনাচার এবং যৌন জীবনে যে শিথিলতা দেখা দিয়াছিল তাহার আভাস-মাত্রও এই পর্বে কোথাও দেখা যাইতেছে না।

এই ই-ৎসিঙ্-ই সংবাদ দিতেছেন, ৬৩৪ খ্রীষ্ট শতকে য়ুয়ান-চোয়াঙের ভারত ত্যাগ এবং ৬৭৩ খ্রীষ্ট শতকে ই-ৎসিঙের ভারত আগমন, এই দুই তারিখের মধ্যে বহু চীনা পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে ৫৬ জনের উল্লেখ ই-ৎসিঙ্ নিজেই করিয়াছেন।

এই ৫৬ জনের মধ্যে প্রসিদ্ধতম হইতেছেন সেঙ্-চি ; তিনি সমতটে আসিয়া কিছু-দিন বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই প্রবাসের বিবরণও তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। সপ্তম শতকের প্রথম পাদে শশাঙ্ক যখন গৌড় ও কর্ণসুবর্ণের রাজা তখন সমতটে ছিল এক ব্রাহ্মণ-বংশের রাজত্ব ; সেই রাজবংশে নালন্দার প্রধানাচার্য স্বনামখ্যাত মহাপণ্ডিত শীলভদ্রের জন্ম। শীলভদ্রের কথা পরে আর এক অধ্যায়ে বলিবার সুযোগ হইবে। আপাতত এ-কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই শীলভদ্রই ছিলেন নালন্দায় য়ুয়ান্-চোয়াঙের গুরু। শীলভদ্রের এক ভ্রাতুষ্পুত্র বোধিভদ্র নালন্দার অন্যতম আচার্য ছিলেন। যাহাই হউক, শশাঙ্কের সময়ে যে সমতটে ছিল ব্রাহ্মণ রাজবংশের রাজত্ব, সেই সমতটেই প্রায় ৫০ বৎসর পর সেঙ্চি আসিয়া দেখিলেন এক বৌদ্ধ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। রাজ-বংশের পরিবর্তন হইয়াছিল, না পুরাতন রাজবংশের সমসাময়িক প্রতিনিধি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বলা কঠিন। যাহা হউক, সেঙ্-চি বলিতেছেন, সিংহাসনাসীন রাজার নাম ছিল রাজভট। ঐতিহাসিকেরা অনেকেই মনে করেন, এই রাজভট আর খড়্গ বংশীয় তৃতীয় রাজা দেবখড়্গপুত্র রাজরাজ বা রাজরাজভট্ট একই ব্যক্তি। যাহাই হউক, সেঙ্-চি বলেন, রাজভট ছিলেন পরমোপাসক এবং ত্রিরত্নের প্রতি ভক্তিমান। তিনি প্রত্যহ বুদ্ধের এক লক্ষ মৃন্ময় মূর্তি গড়াইতেন, মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্রের এক লক্ষ শ্লোক পাঠ করিতেন এবং এক লক্ষ সদ্যচয়িত ফুলে পূজা করিতেন। দানধ্যানও ছিল তাঁহার প্রচুর। মাঝে মাঝে তিনি বুদ্ধের সম্মানার্থ শোভাযাত্রা বাহির করিতেন ; সম্মুখে থাকিত অবলোকিতেশ্বরের এক প্রতিমা, পশ্চাতে সারি সারি চলিতেন ভিক্ষু ও উপাসকেরা ; সকলের পশ্চাতে চলিতেন রাজা। সমতটের রাজ-ধানীতে তখন চার হাজার ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তির দিক হইতে সেঙ্-চি'র সমতট য়ুয়ান্-চোয়াঙের সমতট অপেক্ষা সমৃদ্ধতর, এবং মহাযানের প্রভাব উত্তরোত্তর অধিকতর সক্রিয়। তাহার কারণও আছে। এইমাত্র যে খড়্গ-রাজবংশের কথা বলিলাম, এই বংশের রাজত্ব ছিল বঙ্গ এবং সমতটে ; লিপি সাক্ষ্যে জানা যায়, এই বংশের সকল রাজাই ছিলেন বৌদ্ধ, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই ছিলেন বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের পরম পৃষ্ঠপোষক।

এই শতকেরই রাতবংশীয় রাজা শ্রীধারণের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দেখিতেছি,

সমতটের পরমবৈষ্ণব রাজা শ্রীধারণের মহাসান্ধিবিগ্রহাধিকারী বৌদ্ধ জয়নাথ তথাগত, ত্রিরত্ন এবং ব্রাহ্মণার্যগণের পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্তনের জন্য কিছু ভূমিদান করিতেছেন। সমতটে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তির ইহাও আর একটি প্রমাণ।

বাঙলার অন্যত্র কি হইতেছিল বলা যায় না, তবে চীনা শ্রমণদের বিবরণ পড়িলে মনে হয়, অন্তত তাম্রলিপ্তিতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তি ক্রমশ হ্রাস পাইতেছিল। ফা-হিয়েনের কালে তাম্রলিপ্তিতে বিহার ছিল বাইশটি; য়ুয়ান্-চোয়াঙের সময় দশটি; ই-ৎসিঙের কালে মাত্র পাঁচ-ছয়টি। বোধ হয়, বাঙলার অন্যত্রও তাহাই হইতেছিল, একমাত্র সমতট ছাড়া। মহারাজ বৈন্যগুপ্তের সময় হইতেই সমতটে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার লক্ষ্য করা যায়। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ যেখানে দেখিয়াছিলেন ত্রিশটি বিহার ও মাত্র দুই হাজার শ্রমণ, সেঙ্-চি'র কালে সেখানে শ্রমণের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল চার হাজার। সমতটে বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের এই ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তির প্রধান কারণ মহাযানী বৌদ্ধ খড়্গ বংশীয় রাজাদের সক্রিয় পোষকতা ও সমর্থন। এই খড়্গ বংশ ছাড়া পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের বাঙলাদেশে আর কোনো রাজবংশই বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। সমতটে মহাযানের প্রতিপত্তি বৈন্যগুপ্তের সময় হইতেই এবং সে-প্রতিপত্তি ত্রয়োদশ শতকের রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। য়ুয়ান চোয়াঙ্ কেন যে তৎকালীন সমতটীয় ভিক্ষুদের স্থবিরবাদী বলিয়াছেন, বুঝিতে পারা কঠিন। খুব সম্ভব স্থবিরবাদী বলিতে তিনি স্থবির বিনয়াশ্রয়ী মহাযানীদের বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

বিভিন্ন ধর্মের মিলন ও সংঘাত

আগে দেখিয়াছি, বৌদ্ধ জয়নাথ পরমবৈষ্ণব রাজা শ্রীধারণের অন্যতম প্রধান রাজকর্মচারী; তিনি ভূমিদান বৌদ্ধসংঘে যেমন করিতেছেন, ব্রাহ্মণদেরও তেমনই। য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণীতেও দেখিতেছি, বৌদ্ধ শ্রমণ ও গৃহস্থোপাসক এবং ব্রাহ্মণ্য দেবপূজক সকলেই একই সঙ্গে বাস করিতেছেন, নির্বিবাদে। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ হয়তো শশাঙ্কের মৃত্যুর কিছুকাল পরই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু বলিতেছেন, শশাঙ্ক ছিলেন নিদারুণ বৌদ্ধ বিদ্বেষী এবং তিনি বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদসাধনেও সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কি কি অপকর্ম করিয়াছিলেন তাহার একটি নাতিবৃহৎ তালিকাও দিয়াছেন। য়ুয়ান-চোয়াঙের এই বিবরণের পরিণতির—অর্থাৎ দুরারোগ্য চর্মরোগে শশাঙ্কের মৃত্যুকাহিনীর—একটু ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থেও আছে; এবং খুব আশ্চর্যের বিষয়, মধ্যযুগীয় ব্রাহ্মণকুলপঞ্জীতেও আছে। বৌদ্ধবিদ্বেষী শশাঙ্কের প্রতি বৌদ্ধ লেখকদের বিরাগ স্বাভাবিক, কিন্তু বহুযুগ পরবর্তী ব্রাহ্মণ্যকুল-পঞ্জীতে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া একটু আশ্চর্য বই কি। য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণের বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি; এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, য়ুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণ অতিরঞ্জিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়, গালগল্পের ভেজাল থাকাও কিছু

অসম্ভব নয় এবং শৈব-ব্রাহ্মণ্য রাজার প্রতি, বিশেষত যে রাজা ছিলেন হর্ষবর্ধনের শত্রু তাঁহার প্রতি, বিরাগ থাকাও কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু তাঁহার বিবরণ সর্বথা মিথ্যা এবং শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষ একেবারেই কিছু ছিল না, এ-কথা বলিয়া শশাঙ্কের কলঙ্কমুক্তির চেষ্টাও আধুনিক ব্রাহ্মণ্য-মানসের অসার্থক প্রয়াস। এ-প্রশ্ন সত্য যে, শশাঙ্ক যদি যথার্থই বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই য়ুয়ান-চোয়াঙ্ শশাঙ্কেরই রাজধানী কর্ণসুবর্ণে (এবং বাঙলা-বিহারের অন্যত্রও) এতগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বিহার দেখিলেন কিরূপে? কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বিবেচনা প্রয়োজন যে, যে কেহ এক জীবনে উচ্ছেদের যত চেষ্টাই করুন না কেন, তাঁহার পক্ষে এতদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিস্তৃত একটি ধর্মের এবং সেই ধর্মাবলম্বী লোকদের সম্পূর্ণ নির্মূল, এমন কি খুব বেশি ক্ষতি করাও সম্ভব নয়। ঔরংজীবও তাহা পারেন নাই, তাই বলিয়া ঔরংজীবের ধর্মান্ধতা ও হিন্দুবিদ্বেষ একেবারে ছিল না, এ-কথা কি জোর করিয়া বলা যায়? য়ুয়ান চোয়াঙ্ শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষের যে ক'টি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বৌদ্ধবিদ্বেষ অনস্বীকার্য, কিন্তু তাহা দ্বিগুণিত হইলেও একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সুবিস্তৃত ধর্মের উচ্ছেদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কাজেই য়ুয়ান-চোয়াঙের সময়ে বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধ অবস্থা শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষের বিপক্ষ যুক্তি বলিয়া উপস্থিত করা যায় না। এমন কি, ভারতীয় কোনো রাজা বা রাজবংশের পক্ষে পরধর্মবিদ্বেষী হওয়া অস্বাভাবিক, এ-যুক্তিও অত্যন্ত আদর্শবাদী যুক্তি, বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি তো নয়ই। অন্য কাল এবং ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তের বা দেশখণ্ডের দৃষ্টান্ত আলোচনা করিয়া লাভ নাই; প্রাচীন কালের বাঙলা দেশের কথাই বলি। বঙ্গাল-দেশের সৈন্য-সামন্তরা কি সোমপুর মহাবিহারে আগুন লাগায় নাই? বর্মণ রাজবংশের জনৈক প্রধান রাজকর্মচারী ভট্ট-ভবদেব কি বৌদ্ধ পাষণ্ড বৈতণ্ডিকদের উপর জাতক্রোধ ছিলেন না? সেন-রাজ বল্লালসেন কি 'নাস্তিক (বৌদ্ধ)-দের পদোচ্ছেদের জন্যই কলিযুগে জন্মলাভ' করেন নাই? বস্তুত, শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ অপ্রমাণ করিতে হইলে অন্য যুক্তির প্রয়োজন। বরং, অন্যদিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, সমসাময়িক পূর্ব-ভারতে সর্বত্রই নব ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রসার এবং দেব-পূজকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। রাজবংশগুলি প্রায় সমস্তই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী; গৌড়-কর্ণসুবর্ণে ব্রাহ্মণ্য রাজবংশ, কামরূপ ও মগধে তাহাই, উড়িষ্যায়ও তাহাই। অথচ বৌদ্ধ ধর্ম বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় ক্রমবিস্তারমান। যে পুষ্যভূতি বংশ ছিল ব্রাহ্মণ্য দেবপূজক সেই বংশের রাজা হর্ষবর্ধনও বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়িয়াছেন। নব ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম যেমন নববলে বলীয়ান হইয়া সীমা ও প্রতিপত্তি বিস্তারে প্রাগ্রসর, বৌদ্ধধর্মও তেমনই যোগাচারে সমৃদ্ধ হইয়া সমান প্রাগ্রসর। এই দুই ধর্মই তখন পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী; জনসাধারণের মধ্যে সীমা ও প্রতিপত্তি বিস্তার উভয়েরই লক্ষ্য। কাজেই এমন অবস্থায় কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ী রাজা বা রাজবংশের পক্ষে অন্য ধর্মের উপর

বিদ্বেষী হওয়া কিছু মাত্র অস্বাভাবিক নয়, বিশেষত যে-ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিদ্বেষের কারণ সক্রিয়। বৌদ্ধধর্মের রাজকীয় মুখপাত্র তখন হর্ষবর্ধন, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের শশাঙ্ক; রাষ্ট্রক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং উভয়েই সংগ্রামরত। এই অবস্থায় শশাঙ্কের পক্ষে গয়ার বোধিদ্রুম কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলা, বুদ্ধ-প্রতিমাকে অন্য মন্দিরে স্থানান্তরিত করা, এবং সেইস্থানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা, কুসীনারার এক বিহার হইতে ভিক্ষুদিগকে তাড়াইয়া দিয়া বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা, পাটলিপুত্রে বুদ্ধপদাঙ্কিত একটি প্রস্তরখণ্ডকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা প্রভৃতি কিছুই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু, কোনো ব্যক্তি বিশেষের, এমন কি সমস্ত সম্প্রদায় বিশেষের এই কয়েকটি অপকর্মের ফল একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সুবিস্তৃত ধর্মের শাখাগ্রও স্পর্শ করে না, মূলোৎপাটন তো দূরের কথা। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের উপর প্রাচীন ও সাম্প্রতিক কালে এ-ধরনের অভিঘাত তো কম হয় নাই, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কতটুকু হইয়াছে?

কিন্তু শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী হউন বা না হউন, জনসাধারণের ধর্মগত আচরণ-ব্যবহারের মধ্যে পরধর্মবিদ্বেষের কোনো প্রমাণ অন্তত এই পর্বে কোথাও কিছু নাই। ইতিহাস আলোচনায় সর্বত্রই সাধারণত দেখা যায়, পরধর্মবিদ্বেষ বা পরমত-অসহিষ্ণুতা শ্রেণীস্বার্থভোগী উচ্চকোটী লোকদের শ্রেণীস্তরেই সৃষ্টি লাভ এবং সেই স্তরেই পুষ্টিলাভও করে এবং তাঁহারাই নিজেদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য ক্রমশ তাহা অজ্ঞ নিরক্ষর নিম্নতর লোকস্তরে সংক্রামিত করিতে চেষ্টা করেন; সাধারণত এ-ধরনের বিদ্বেষের পশ্চাতে সক্রিয় থাকে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কোনো স্বার্থ, লাভালাভ বিবেচনা। আমাদের দেশে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল, এমন মনে করিবার কারণ নাই, প্রমাণও নাই। শ্রেণীস্বার্থ বা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক স্বার্থ যেখানে সক্রিয় নয় সেখানে বিদ্বেষের কোনো কারণও নাই। গুপ্ত-বংশ ব্রাহ্মণ্য রাজবংশ; তাঁহারা ছিলেন পরম ভাগবত। সেই বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুপ্ত চীনা শ্রমণদের জন্য চীনা মন্দির নির্মাণ এবং তাহার সংরক্ষণের জন্য ২৪টি গ্রাম দান করিয়াছিলেন; পঞ্চম শতকে পাহাড়পুর অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণ দম্পতি একটি জৈন-বিহারে ভূমিদান করিয়াছিলেন; ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে সামন্ত মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে শৈবধর্মাবলম্বী মহারাজ বৈন্যগুপ্ত ভূমিদান করিয়াছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ বিহারের সেবা, পূজা ইত্যাদির জন্য; প্রসিদ্ধ আচার্য শীলভদ্র ও বোধিভদ্রের জন্মবংশ ছিল ব্রাহ্মণ্য রাজবংশ; সপ্তম শতকের বৌদ্ধ খড়্গ-বংশীয় রাজা দেবখড়্গের স্ত্রী প্রভাবতী দেবী একটি সর্বাণী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এই শতকেই সমতটের পরম বৈষ্ণব রাজা শ্রীধারণের অন্যতম প্রধান রাজকর্মচারী বৌদ্ধ জয়নাথ একই সঙ্গে বৌদ্ধ রত্নত্রয় এবং ব্রাহ্মণ্য পঞ্চমহাযজ্ঞের জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা পাশাপাশি একই জায়গায় বাস করিতেছেন, একে অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধিত ও অনুরক্ত এবং প্রয়োজন হইলে পোষকতাও করিতেছেন,

কোথাও কাহারও ধর্মমতে কিংবা বিশ্বাসে বাধিতেছে না—ইহাই পরস্পর সম্বন্ধের মোটামুটি চিত্র। কিন্তু ব্যতিক্রম একেবারে ছিল না, এ-কথাও জোর করিয়া বলা যায় না।

বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ধর্মের বিরোধী ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে ছবগ্‌গীয় বা ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের কথা মহাস্থান-শিলাখণ্ডলিপি হইতেই জানা যায়। পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী পুণ্ড্রনগরে ইঁহাদের কিছুটা প্রতিপত্তিও ছিল বলিয়া মনে হয়। ষড়বর্গীয় সম্প্রদায় বুদ্ধপ্রবর্তিত বিনয় শাসন স্বীকার করিতেন না। কিন্তু পরবর্তী কালের বাঙলাদেশে কোথাও কোনো সূত্রেই এই ষড়বর্গীয়দের আর কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না। পরিবর্তে আর একটি ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিতেছে গুপ্তোত্তর পর্বে; এই সম্প্রদায় দেবদত্ত-সম্প্রদায় নামে খ্যাত। ইঁহারা শাক্যমুনির বুদ্ধত্ব স্বীকার করিতেন না, কিন্তু গৌতম-পূর্ববর্তী তিনজন বুদ্ধের পূজা করিতেন। দেবদত্ত-সম্প্রদায়ের ভিক্ষুরা লোকালয় হইতে দূরে বাস করিতেন, জীর্ণ চীবর ছিল তাঁহাদের পরিধেয়, ভিক্ষান্ন ছিল তাঁহাদের একমাত্র ভক্ষ্য এবং কৃচ্ছ্রসাধন ছিল তাঁহাদের সাধনার অঙ্গ। দুগ্ধজাত দ্রব্য তাঁহারা ভক্ষণ করিতেন না। ৪০৫ খ্রীষ্ট শতকে ফা-হিয়েন শ্রাবস্তীতে এই সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণের দেখা পাইয়াছিলেন। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ কর্ণসুবর্ণে এই সম্প্রদায়ের ভিক্ষুদের তিনটি সংঘারাম দেখিয়াছিলেন। ইঁহারা দেবদত্তের মত অনুসরণ করিয়া দুগ্ধজাত ক্ষীর ভক্ষণ করিতেন না। কিন্তু, য়ুয়ান-চোয়াঙের পর ইঁহাদের আর কোনো উল্লেখই আর কোথাও দেখিতেছি না। বোধ হয়, ইঁহারাও ষড়বর্গীয়দের মতই বৌদ্ধদের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন।

য়ুয়ান-চোয়াঙের কালে বাঙলায় নির্গ্রন্থ জৈনধর্মের প্রসার ছিল যথেষ্ট, অথচ পরবর্তী কালে এই ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা লিপিমালায় বা সাহিত্যে আর বিশেষ শোনা যাইতেছে না। কিন্তু পাল ও সেনপর্বে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অঞ্চলে বেশ কিছু মূর্তি-প্রমাণ বিদ্যমান। কিছু সংখ্যক জৈন ভিক্ষু ও উপাসক বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের কুক্ষিগতও হইয়া থাকিবেন; এর পর বাকী যাঁহারা রহিলেন তাঁহারা বোধ হয় পরে ক্রমশ কাপালিক-অবধূতদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিলেন।

৫

পাল ও চন্দ্রপর্ব

সপ্তম শতকের শেষার্ধ ও অষ্টম শতকের একপাদেরও অধিককাল ধরিয়া বাঙলাদেশের রাষ্ট্রক্ষেত্রে জটিল ও গভীর আবর্ত। স্থানে স্থানে ছোট ছোট রাজবংশের ক্ষণস্থায়ী রাজত্ব, ভিন্ন প্রদেশী সমরাভিযান যুদ্ধ, জয়-পরাজয়, ভোট বা তিব্বত, কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি হিমালয়ক্রোড়স্থিত দেশগুলির সঙ্গে নূতন যোগাযোগ, মাৎস্যন্যায় প্রভৃতির সম্মিলিত ক্রিয়া

সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও জটিল ও গভীর আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। আজ সেই আবর্তের আকৃতি-প্রকৃতি বুঝিবার উপায়ও নাই। অথচ, পাল ও চন্দ্র-পর্বের বাঙলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের ও শক্তিধর্মের যে তান্ত্রিক বিবর্তন, যে বিভিন্ন গুহ্য রহস্যবাদী, দেহবাদী ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি তাহার বীজ বোধ হয় এই আবর্তের ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত।

হর্ষবর্ধনই ভারতেতিহাসের সর্বশেষ "সকলোত্তরপথনাথ"; তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর-ভারতে একরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন প্রায় বিলীন হইয়া গেল, সর্বভারতীয় আদর্শ প্রায় বিদায় লইল। নানা কারণে এক একটি ভৌগোলিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন রাজবংশ গড়িয়া ওঠার সূচনা হইল, এবং সেই অঞ্চলের চতুঃসীমার মধ্যে ধীরে ধীরে এক একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, স্থানীয় ভাষা ও লিখনভঙ্গী, স্থানীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠার সূচনা দেখা দিল। ইহার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা দিতে আরম্ভ করিল অষ্টম শতক হইতে। সর্বভারতীয় ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর প্রত্যেক ভৌগোলিক সীমায় এক একটি স্থানীয় ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, এক কথায় স্থানীয় সংস্কৃতি গড়িয়া তোলা, ইহাই যেন হইল অষ্টম-শতক পরবর্তী ভারতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিত। সর্বভারতীয় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ক্ষেত্রে বাঙলার যে বিশিষ্ট চিন্তা ও কল্পনা, যে কর্মকৃতি তাহা যেন এই সময় হইতেই দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও এ কথা সমান প্রযোজ্য।

য়ুয়ান-চোয়াঙের সময়েই ভারতবর্ষ জুড়িয়া বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। ফা-হিয়েন বৌদ্ধ ধর্মের যে সমৃদ্ধ অবস্থা দেখিয়া গিয়াছিলেন, য়ুয়ান-চোয়াঙ আর তাহা দেখিতে পান নাই। তাঁহার কালে বহু বৌদ্ধ স্তূপ, মন্দির ও সংঘারাম পড়িয়াছিল ভগ্ন দশায়, বহু ছিল পরিত্যক্ত, এমন কি কপিলবাস্তু, কুসিনারা শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী প্রভৃতি বৌদ্ধ তীর্থগুলিরও সেই অতীত সমৃদ্ধি আর ছিল না। বহু সংখ্যক বৌদ্ধ দেবপূজক ও তীর্থিকদের প্রভাব স্বীকার করিয়া লন। হর্ষবর্ধনের সক্রিয় সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা কনৌজে তথা মধ্যদেশে সদ্ধর্মের কিছু সমৃদ্ধির কারণ হইলেও ভারতের অন্যত্র তাহা এই অবনতির স্রোত ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। সর্বত্রই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতাপ; বাঙলা দেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তারনাথ বলিতেছেন, পাল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের অব্যবহিত আগে এবং তাঁহার কালে বাঙলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের অত্যন্ত দুরবস্থা; অনেক বৌদ্ধ মন্দির ও বিহার ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায় অথবা তীর্থিকদের দ্বারা অধ্যুষিত; ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি ক্রমবর্ধমান। য়ুয়ান-চোয়াঙের সময়েই তো বাঙলাদেশে বৌদ্ধদের যেখানে ছিল মাত্র ৭০টি বিহার-সংঘারাম, সেখানে ব্রাহ্মণ্য দেবমন্দিরের সংখ্যা ছিল তিন শত। যাহাই হউক, অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতের অন্যত্র, অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কোথাও কোথাও বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের অস্তিত্বের

সংবাদ ও মূর্তি নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া যায়, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা অতীত ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ মাত্র, তাহার সার্থক মূল্য আর বিশেষ কিছু নাই। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই। কিন্তু, সুদীর্ঘ তিন চার শত বৎসর ধরিয়া একাধিক বৌদ্ধ রাজবংশের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে পূর্বভারত —বিশেষভাবে বঙ্গ, গৌড়, মগধ—ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল হইয়া এই ধর্মের পরমায়ু আরও চার পাঁচ শত বৎসর বাড়াইয়া দিল। তাহারই ফলে মহাযান যোগাচার-বজ্রযান বৌদ্ধ ধর্মের নূতন নূতন রূপ ও ধ্যান প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ আমাদের ঘটিল। এই নূতন নূতন রূপ ও ধ্যান একান্তই পূর্ব-ভারতের, বিশেষভাবে বাঙলাদেশের সৃষ্টি।

বৌদ্ধ ধর্মে যেমন ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও তেমনই। সর্বভারতীয় ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার বাঙলা দেশ এ-যাবৎ যাহা পাইয়াছিল এবং এই চারিশত বৎসর ধরিয়া যাহা পাইতেছিল সে-মূলধন তো তাহার ছিলই। কিন্তু এই মূলধনের উপর বাঙলাদেশ নূতন কিছু কিছু গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাও করিয়াছে, বিশেষভাবে বৈষ্ণব ধর্মে এবং শাক্ত ধর্মে। ক্রমে এ-সব কথা বিস্তৃতভাবে বলিবার সুযোগ হইবে।

বৈদিক ধর্ম

আর্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূল কথা বৈদিক ধর্ম ও শ্রৌত সংস্কার। কাজেই এই ধর্ম ও সংস্কারের কথাই আগে বলি। ইহাদের প্রসার ও প্রতিপত্তির সূচনা গুপ্ত-পর্বেই দেখিয়াছি। পাল-চন্দ্র পর্বে প্রাচীন প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ তো ছিলই, বরং পাল-পর্বের শেষের দিকে এবং সেন-বর্মণ পর্বে তাহা আরও প্রসারিত হইয়াছিল।

পাল-পর্বের অনেকগুলি ভূমিদান পট্টোলীতে দেখিতেছি, যে সব ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হইতেছে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বেদ-বেদাঙ্গ-মীমাংসা-ব্যাকরণে সুপণ্ডিত এবং বৈদিক যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকর্মে পারদর্শী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেবপালের মুঙ্গের-লিপি, নারায়ণ পালের বাদলস্তম্ভ-লিপি, এবং মহীপালের বাণগড়-লিপির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈদিক হোম, যাগযজ্ঞের কথাও অনেক লিপিতেই আছে। বাদলস্তম্ভ-লিপিতে বৌদ্ধ নরপতি প্রথম বিগ্রহপালের মন্ত্রী কেদারমিশ্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ "তাঁহার [হোম কুণ্ডোত্থিত] অবক্রভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নিশিখাকে চুম্বন করিয়া দিক্‌চক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত"। কেদারমিশ্র 'চতুর্বিদ্যা পয়োনিধি' পান করিয়াছিলেন, অর্থাৎ চারি বেদবিদ্ ছিলেন। তঁহার পিতা দর্ভপাণিও বেদবিদ্ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কেদারমিশ্রের পুত্র গুরবমিশ্র নীতি, আগম ও জ্যোতিষে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বেদার্থচিন্তাপরায়ণ ছিলেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে দেখিতেছি, বরেন্দ্রীর অন্তর্গত ভাবগ্রামের ব্রাহ্মণ ভরতের পুত্র যুধিষ্ঠির সকল পণ্ডিতের অগ্রণী বলিয়া গণ্য হইতেন। তিনি "শাস্ত্রজ্ঞান পরিশুদ্ধবুদ্ধি এবং শ্রোত্রিয়ত্বের সমুজ্জ্বল যশোনিধি" ছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের পুত্র ছিলেন দ্বিজাধীশ-পূজ্য শ্রীধর। তীর্থ-ভ্রমণে, বেদাধ্যয়নে দানাধ্যাপনায়, যজ্ঞানুষ্ঠানে, ব্রতাচরণে সর্বশ্রোত্রীয়শ্রেষ্ঠ শ্রীধর প্রাতঃ, নক্ত, অযাচিত এবং উপবসন করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন, এবং কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডবিৎ পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য সর্বাকার-তপোনিধি এবং শ্রৌতস্মার্তশাস্ত্রের গুপ্তার্থবিৎবাগীশ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মহীপালের বাণগড়-লিপিতে যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতা, মীমাংসা, ব্যাকরণ এবং তর্কশাস্ত্র-চর্চার উল্লেখ আছে। বেদ বেদান্ত, প্রমাণ এবং সামবেদের কোঠুমশাখার চর্চার উল্লেখ আছে দেব ালের মুঙ্গের-লিপি, বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপি এব মদনপালের মনহলিলিপিতে।

বৈদিক ধর্মকর্ম যাগযজ্ঞের এই আবহাওয়া চন্দ্র-পর্বেও সমান সক্রিয়। বিভিন্ন বেদের বিভিন্ন শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদের কথা বৈদিক হোম-যাগযজ্ঞের কথা একাধিক চন্দ্র-লিপিতে সুস্পষ্ট। বৌদ্ধ চন্দ্র ও কম্বোজ রাষ্ট্রে ঋত্বিক নামে যে-রাজপুরুষটির দেখা মিলিতেছে তিনি তো একান্তই বৈদিক হোম-যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্মের কাণ্ডারী বলিয়া মনে হইতেছে। হরিচরিতগ্রন্থের লেখক চতুর্ভুজ বলিতেছেন, তাঁহার পূর্বপুরুষেরা বরেন্দ্রান্তর্গত করঞ্জগ্রাম ধর্মপালের নিকট হইতে দানস্বরূপ পাইয়াছিলেন ; সেই গ্রামের ব্রাহ্মণেরা বেদ, স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এই ধর্মপাল পাল-নরপতি ধর্মপাল হওয়াই সম্ভব।

পাল-চন্দ্র পর্বের কয়েকটি লিপিতেই (খালিমপুর লিপি ; দ্বিতীয় গোপালদেবের জজিলপুর-লিপি; প্রথম মহীপালের বাণগড়-লিপি; তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপি; কম্বোজরাজ নয়পালের ইর্দা-লিপি ইত্যাদি) দেখিতেছি, ভারতবর্ষের নানা জায়গা, (যেমন লাটদেশ, মধ্যদেশ, কোড়ঞ্জ, মুক্তাবাস্তু প্রভৃতি) বিশেষভাবে মধ্যদেশ হইতে, বিভিন্ন গোত্র-প্রবরাশ্রয়ী, বিভিন্ন বৈদিক শাখাধ্যায়ী, বিভিন্ন শ্রৌত সংস্কারানুসারী ব্রাহ্মণেরা বাঙলা দেশে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। ইঁহাদের আশ্রয় করিয়া এবং এই ভাবেই পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক হইতে বৈদিক ধর্মের স্রোত বাঙলাদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে ; পাল-চন্দ্র-কম্বোজ-পর্বেও এই সব আগন্তুক ব্রাহ্মণদের সমর্থন ও আনুকূল্যের ফলে সেই স্রোত ক্রমশ আরও প্রবল হয়।

পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য জগতের বিস্তার

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ-পর্বের লিপিমালা পাঠ করিলে এ-তথ্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এই সব লিপির রচনা আগাগোড়া ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প, ভাবকল্পনা এবং উপমালঙ্কার দ্বারা আচ্ছন্ন ; ইহাদের রচিত ভাবাকাশ একান্তই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারের আকাশ। মদনপালের মনহলি-লিপিতে ব্রাহ্মণ বটেশ্বর স্বামী-শর্মা কর্তৃক বেদব্যাস-প্রোক্ত মহাভারত পাঠের উল্লেখ আছে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণপাঠ বোধ হয় অনেক ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি ছিল এবং তাঁহাদেরই বোধ

হয় বলা হইত নীতি-পাঠক। যাহাই হউক, যে ভাবেই হউক, এই পর্বের বাঙলা দেশের আকাশে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই বিস্তার ; এই পৌরাণিক মহিমাই বৈদিক ধর্ম ও শ্রৌত সংস্কারের মহিমাকে যেন আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল।

সমসাময়িক উচ্চকোটী বাঙালীর এবং তাঁহাদের রাষ্ট্র-নায়কদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত এবং শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করিতেন পৃথু, ধনঞ্জয়, অম্বরীশ, সগর, নল, যযাতি প্রভৃতি পৌরাণিক বীরেরা (ধর্মপালের বুদ্ধগয়া-লিপি, দেবপালের মুঙ্গের-লিপি, কোটালিপাড়া-লিপি); সত্যযুগের দৈত্যরাজ বলি, ত্রেতাযুগের ভার্গব এবং দ্বাপর যুগের কর্ণের মত দাতারা (দেবপালের মুঙ্গের-লিপি); দেবরাজ বৃহস্পতির মত জ্ঞানীরা (বাদলস্তম্ভ-লিপি, বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপি)। অগস্ত্যের এক গণ্ডূষে সমুদ্র পান (বাদলস্তম্ভ-লিপি), পরশুরামের ক্ষত্রিয়াভিযান (বাদলস্তম্ভ-লিপি), রামেশ্বরে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন (দেবপালের মুঙ্গের-লিপি), শুম্ভনিশুম্ভ ও স্বাহার গল্প, ধনপতি ও ভদ্রার গল্প, বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম এবং ব্রহ্মাপত্নী সরস্বতীর গল্প (খালিমপুর-লিপি) প্রভৃতি এই পর্বের সুপরিচিত ও সুআদৃত পুরাণ ও কাব্যকাহিনী। এই পর্বের ইন্দ্র হইতেছেন দেবরাজ এবং তাঁহার পত্নী পৌলোমী পাতিব্রত্যের আদর্শ (খালিমপুর-লিপি, নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপি ও বাদলস্তম্ভ-লিপি)। ইন্দ্রের আর এক নাম পুরন্দর এবং তিনি দৈত্যরাজ বলির নিকট পরাজিত (মুঙ্গের ও ভাগলপুর-লিপি)। পৌরাণিক শিব-কাহিনীও অজ্ঞাত নয়। পতির অপমানে দক্ষযজ্ঞে অপুত্রক সতীর অকালে প্রাণত্যাগ (বাদলস্তম্ভ-লিপি) ও শিবপত্নী উমা বা সর্বাণীর পাতিব্রত্যও সে-কাহিনী হইতে বাদ পড়ে নাই। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে সপ্তাশ্বরথবাহিত সূর্য-দেবতাকে বলা হইয়াছে হরির দক্ষিণ চক্ষু। সমুদ্রগর্ভোত্থিত, শশধর-লাঞ্ছন চন্দ্রের উল্লেখও পাওয়া যাইতেছে ; তাঁহাকে কোথাও কোথাও বলা হইয়াছে সীতাংশু, এবং কান্তি ও রোহিণী যে তাঁহার দুই পত্নী, তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ধর্মপালের খালিমপুর-লিপি এবং বাদল স্তম্ভ-লিপিতে চন্দ্রকে বলা হইয়াছে অত্রির বংশধর।

পুরাণ-কথায় ঐশ্বর্য সকলের চেয়ে বেশি আশ্রয় করিয়াছে বিষ্ণু-কৃষ্ণ কথাকে। বিষ্ণু এখন আর ভাগবদ্ধর্মের বাসুদেব নহেন, এখন তিনি কৃষ্ণ, এবং শ্রীপতি, ক্ষমাপতি, জনার্দন, হরি, মুরারী প্রভৃতি তাঁহার নাম। এই সব নামের প্রত্যেকটির সঙ্গেই কাব্য ও পুরাণ-কাহিনী জড়িত। হরি-ক্ষমাপতি সমুদ্রগর্ভজাত এবং লক্ষ্মী তাঁহার সাধ্বী পত্নী ; লক্ষ্মীর সপত্নী হইতেছেন বসুধরা বা পৃথিবী এবং স্বামী মুরারীর সঙ্গে লক্ষ্মী গরুড়ারূঢ় (খালিমপুর-লিপি, মুঙ্গের-লিপি, ভাগলপুর-লিপি, বাদলস্তম্ভ-লিপি, জয়পালের গয়া নরসিংহ মন্দির-লিপি এবং কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দির-লিপি)। দেবকীগর্ভজাত বালগোপাল কৃষ্ণের যশোদাভবনে গমন এবং কৃষ্ণের বাল্যজীবন-কাহিনীও অজ্ঞাত নয় (বাদলস্তম্ভ-লিপি), তবে এই বালকৃষ্ণ যে লক্ষ্মীর পতি এবং বিষ্ণুর অন্যতম অবতার তাহাও

একই লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণের অন্যান্য অবতাররূপের (যেমন, কৃষ্ণ, নরসিংহ, পরশুরাম, বামন) সঙ্গেও এই পর্বের পরিচয় ঘনিষ্ঠ।

উপরোক্ত পৌরাণিক দেবদেবীরা এবং তাঁহাদের কাহিনী যে শুধু লিপিমালায় উদ্দিষ্ট ও উল্লিখিত তাহাই নয়; ইঁহাদের প্রতিমারূপ আশ্রয় করিয়াই নানা ধর্মসম্প্রদায় এবং নানা ধর্মানুষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিচিত্র লক্ষণ ও লাঞ্ছনযুক্ত, বিচিত্র ধ্যান ও কল্পনার, বিচিত্রতর রূপ ও আকৃতির এই সব অগণিত প্রতিমার অবশেষ এখনও বাঙলাদেশের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অথবা নানা চিত্রশালায় রক্ষিত। সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত মূর্তিতত্ত্বের বা বিশেষ বিশেষ প্রতিমার রূপ ও লক্ষণের আলোচনার স্থান এই গ্রন্থ নয়। তবু, সাধারণভাবে প্রতিমাগুলির স্বরূপ জানা প্রয়োজন, কারণ প্রত্যেক ধর্মের বিশিষ্ট ধ্যান ও কল্পনা ইহাদের সঙ্গে জড়িত।

বৈষ্ণব ধর্ম

ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে নন্ন নারায়ণের এক দেউলের (দেবকুলের) উল্লেখ আছে। এই নন্ন-নারায়ণ বোধ হয় নন্দ নারায়ণেরই অপভ্রংশ, অর্থাৎ এই মন্দিরে যে-দেবতাটির অর্চনা হইত তিনি নন্দদুলাল কৃষ্ণরূপী নারায়ণ। নারায়ণপালের রাজত্বকালে একটি গরুড়স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল বর্তমান দিনাজপুর জেলার একটি গ্রামে: এই স্তম্ভগাত্রেই বাদল-প্রশস্তিটি উৎকীর্ণ, এবং সে-স্তম্ভ এখনও দণ্ডায়মান। খালিমপুর-লিপিতে একটি কাদম্বরী দেবকুলিকা বা সরস্বতী মন্দিরের উল্লেখ আছে। স্থানক, অর্থাৎ সমপদ দণ্ডায়মান বিষ্ণুর দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর (শ্রী ও পুষ্টি) অধিষ্ঠান; সেই ভাবে তাঁহাদের সম্মিলিত পূজা তো হইতই; এই ধরনের প্রতিমা বাঙলার নানা অঞ্চল হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু সরস্বতী স্বাধীন স্বতন্ত্র মর্যাদায়ও পূজিতা হইতেন, খালিমপুর লিপিই তাহার প্রমাণ। সরস্বতীর স্বাধীন স্বতন্ত্র মূর্তিও কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে: ইঁহাদের প্রতিমা-লক্ষণ সরস্বতীর সাধারণ লক্ষণ। সরস্বতীর বাহন অন্যত্র যেমন বাঙলা দেশেও তাহাই, অর্থাৎ হংস: কিন্তু একটি প্রতিমায় তাঁহার বাহন দেখিতেছি ভেড়া। সরস্বতীর সঙ্গে ভেড়ার সম্বন্ধ অত্যন্ত প্রাচীন এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তাহার সুন্দর ব্যাখ্যাও রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙলাদেশের কোথাও কোথাও সরস্বতী পূজার দিনে এখনও ভেড়া বলি এবং ভেড়ার লড়াই সুপরিচিত। বাদল গরুড়-স্তম্ভের কথা একটু আগেই বলিয়াছি। বিষ্ণু মন্দিরের সম্মুখে একটি করিয়া গরুড়-স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করা ছিল সাধারণ রীতি; স্তম্ভের শীর্ষে থাকিত বদ্ধাঞ্জলিমুদ্রা গরুড়ের একটি মূর্তি। এই ধরনের স্তম্ভশীর্ষ গরুড়-প্রতিমা বাঙলাদেশের নানা জায়গায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজসাহী-চিত্রশালায় রক্ষিত এই ধরনের একটি গরুড়-মূর্তি দশম শতকীয় বাঙলার ভাস্কর শিল্পের সুন্দর নিদর্শন।

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পর্বের বাংলাদেশে যত প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে বৈষ্ণব পরিবারের মূর্তির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি ; এবং পরিবারটিও সুবৃহৎ। পরিবারের প্রধান হইতেছেন বিষ্ণু স্বয়ং ; তাঁহার দুই পত্নী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী , কোথাও কোথাও দেবী বসুমতী , নিম্নে বাহন গরুড় ; বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ লোকের দুই দ্বারী, জয় এবং বিজয় ; বিষ্ণু-কৃষ্ণের দ্বাদশ অবতার ; এবং ব্রহ্মা স্বয়ং। এই বৃহৎ পরিবারের প্রত্যেকটি দেবদেবীর বিশেষ বিশেষ ভঙ্গ ও ভঙ্গী, লক্ষণ ও লাঞ্ছন ভারতের অন্যত্র যেমন বাঙলাদেশেও মোটামুটি তাহাই। তবু বাঙলা দেশ এই যুগের সর্বভারতীয় পৌরাণিক ধ্যান-কল্পনা সমূহের সব কিছুই সমান আদরে ও মর্যাদায় গ্রহণ করে নাই ; তাহাদের মধ্যেই কিছু বর্জন-নির্বাচন-সংযোজনও করিয়াছে।

আসন শয়ান ও (সমপদ) স্থানক, এই তিন ভঙ্গীর বিষ্ণুমূর্তির মধ্যে বাঙলাদেশের পক্ষপাত যেন, অন্তত এই পর্বে, স্থানকমূর্তির দিকেই বেশি। বস্তুত এই পর্বের অধিকাংশ বিষ্ণুমূর্তিই স্থানক, অর্থাৎ দণ্ডায়মান মূর্তি ; আসন ও শয়ান মূর্তি বাঙলাদেশে কমই পাওয়া গিয়াছে। গরুড়াসীন এবং যোগাসীন, সাধারণত এই দুই প্রকারের আসনমূর্তিই এ যাবৎ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। বরিশাল জেলার লক্ষ্মণকাটি গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা চিত্রশালা) বিষ্ণু, সাগরদীঘির হৃষিকেশ-বিষ্ণু (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চিত্রশালা) প্রভৃতি গরুড়াসীন এবং সাধারণ আসন-বিষ্ণুর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দিনাজপুর জেলার ইটাহার গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির ভগ্নাবশেষ যোগাসন-বিষ্ণুর প্রতিকৃতি, সন্দেহ নাই। এই সব ক'টি মূর্তিই এই পর্বের যোগাসন-বিষ্ণুর আরও একাধিক প্রমাণ বিদ্যমান এবং তাহারাও এই পর্বের বলিয়াই মনে হয়, অন্তত ভাস্কর্য-শৈলীর ইঙ্গিত তাহাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঢাকা-সোনারঙ্গে প্রাপ্ত কাষ্ঠফলকের যোগাসন-বিষ্ণু এবং বোস্টন-চিত্রশালার ধাতব যোগাসন-বিষ্ণুর কথা উল্লেখ করা যায়।

স্থানক-বিষ্ণুমূর্তিগুলি সাধারণত সপরিবার বিষ্ণু। বিষ্ণু মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান ; তাঁহার দক্ষিণে ও বামে, উপরে ও নীচে পরিবারস্থ অন্যান্য দেবদেবী, বাহন, প্রহরী ইত্যাদি। ইঁহাদের সকলেরই লক্ষণ ও লাঞ্ছন সর্বভারতীয় প্রতিমাশাস্ত্রই অনুসরণ করে। বাঙলার বিষ্ণুমূর্তি সাধারণত দুই প্রকরণের। ত্রিবিক্রম প্রকরণের মূর্তিই বেশি, বাসুদেব-প্রকরণের প্রতিমাও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকরণ পার্থক্য নির্ভর করে বিষ্ণুর চারি হস্তের শঙ্খচক্রগদাপদ্ম এই চারিটি লক্ষণের সন্নিবেশের উপর। এই চার লক্ষণের বিভিন্ন রীতির সন্নিবেশ বাঙলাদেশের প্রতিমাগুলিতেও দেখা যায়, কিন্তু বাঙলা শিল্পী ও পুরোহিতেরা সর্বত্রই প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্রের এবং পঞ্চরাত্রীয় ব্যূহবাদের এই প্রকরণ-নির্দেশ মানিয়া চলিতেন নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন। প্রথম মহীপালের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে ত্রিপুরা জেলার বাঘাউড়া গ্রাম বা নিকটবর্তী কোনো স্থানে একটি বিষ্ণুমূর্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ; পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হইয়াছে, মূর্তিটি "নারায়ণভট্টারকস্য"। কিন্তু ইঁহার চারি হস্তের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মের সন্নিবেশ ত্রিবিক্রম-

বিষ্ণুর সন্নিবেশানুযায়ী, নারায়ণের নহে। কোনো কোনো মূর্তিতে দেখা যায়, শঙ্খ, চক্র ও গদা যথাক্রমে শঙ্খ-পুরুষ, চক্র-পুরুষ ও গদা-দেবীতে রূপায়িত। এ-ক্ষেত্রেও সর্ব-ভারতীয় প্রতিমা নির্দেশ সক্রিয়।

বিষ্ণুর অন্যান্য বিচিত্র রূপের মধ্যে অভিচারিক স্থানক-বিষ্ণুর একটি নিদর্শন বাঙলা দেশে পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটি কালো পাথরের, পাওয়া গিয়াছিল বর্ধমান জেলার চৈতনপুর গ্রামে। লক্ষণ ও লাঞ্ছন মিলাইলে দেখা যায়, প্রতিমাটি দক্ষিণ ভারতীয় প্রতিমা শাস্ত্র বৈখানসাগম-কথিত অভিচারিক স্থানক-বিষ্ণুর প্রতিকৃতি। সাগরদীঘিতে প্রাপ্ত আসন-বিষ্ণু এবং বর্ধমানে প্রাপ্ত (রাজসাহী চিত্রশালা) আর একটি বিষ্ণুমূর্তি উভয়ই শ্রীধর বা হৃষিকেশ-বিষ্ণুর প্রতিমা। রংপুর জেলায় প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিত্রশালা) ধাতুনির্মিত স্থানক-বিষ্ণুর একটি প্রতিমায় বিষ্ণুর বামে যেখানে পুষ্টি বা সরস্বতীর স্থান সেখানে দেখিতেছি দেবী বসুমতীকে। কোনো কোনো বিষ্ণু-প্রতিমার পৃষ্ঠফলকে বিষ্ণুর দশাবতারের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়: দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাঁকুড়া জেলায় প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিত্রশালা) একটি প্রতিমা এবং ঢাকা-চিত্রশালায় রক্ষিত আর একটি প্রতিমার উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজসাহী-চিত্রশালায় বিশহস্ত সমপদস্থানক একটি বিষ্ণুমূর্তি আছে; মূর্তিটি বোধ হয় রূপমণ্ডন-গ্রন্থোক্ত বিশ্বরূপ-বিষ্ণুর। রংপুরের টেপা-সংগ্রহে একটি চতুর্মুখ বিষ্ণুর প্রতিমা আছে, ইঁহার সম্মুখের মুখটি মানুষের মুখের অনুরূপ, দক্ষিণে বরাহের, বামে সিংহের এবং পশ্চাতে ভৈরবের। কলিকাতা-চিত্রশালায় ব্রহ্মা-বিষ্ণুর একটি যুগ্ম মূর্তি আছে; প্রতিমাটিতে উভয় দেবতারই লক্ষণ ও লাঞ্ছন বিদ্যমান। ব্রহ্মার স্বাধীন স্বতন্ত্র-মূর্তিও বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। এই ব্রহ্মা স্ফীতোদর, চতুর্মুখ, চতুর্হস্ত, ললিতাসনোপবিষ্ট; তাঁহার বাহন হংস। দিনাজপুর-জেলার ঘাটনগরে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) প্রতিমাটি এই ধরনের প্রতিমাগুলির প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে।

সরস্বতীর কথা আগেই বলিয়াছি। লক্ষ্মীরও স্বাধীন স্বতন্ত্র মূর্তি বিদ্যমান। ইঁহাদের মধ্যে দেবীর গজলক্ষ্মী রূপই প্রধান। কিন্তু বিশুদ্ধ লক্ষ্মী প্রতিমা নাই, এমন নয়। বগুড়া জেলায় প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) একটি চতুর্হস্ত স্থানক-লক্ষ্মী প্রতিমা একাদশ শতকের তক্ষণ-শিল্পের এবং এই ধরনের প্রতিমার চমৎকার নিদর্শন। এই চিত্রশালারই একটি দ্বিহস্ত ধাতব লক্ষ্মীর প্রতিমাও আছে। বগুড়ার চতুর্হস্ত লক্ষ্মীর এক হস্তে বাঙলাদেশে সুপরিচিত লক্ষ্মীর ঝাঁপিটি লোকায়ত ধর্মের ক্ষীণ একটি প্রতিধ্বনি রূপে বিদ্যমান।

অবতাররূপী বিষ্ণুর প্রতিমা এই পর্বের বাঙলা দেশে সুপ্রচুর। প্রস্তর ও ধাতব বিষ্ণুপট্টের পশ্চাদ্ভাগে অথবা প্রস্তর ফলকে বিষ্ণুর দশাবতারের প্রতিকৃতি প্রাচীন বাঙলার নানা স্থান হইতেই পাওয়া গিয়াছে। এই পর্বের বাঙলা দেশে বিষ্ণুর দশটি অবতারের মধ্যে প্রধানত বরাহ, নরসিংহ এবং বামন বা ত্রিবিক্রম এই

তিনজনই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পূজা লাভ করিতেন। মৎস্য ও পরশুরামাবতারের স্বতন্ত্র মূর্তিও বাঙলা দেশে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্য তিনটির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ইঁহারা বোধ হয় লাভ করিতে পারেন নাই। অবতারের মধ্যে সিলিমপুর গ্রামে প্রাপ্ত বরাহ-মূর্তি, বিক্রমপুরে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিত্রশালা) বরাহমূর্তি, ঢাকা-চিত্রশালার নরসিংহ মূর্তি, জোড়াদেউলে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিত্রশালা) বামন মূর্তি এবং বজ্রযোগিনীর মৎস্যাবতার মূর্তি উল্লেখযোগ্য। অষ্টমাবতার হলধর বা বলরামের যে কয়েকটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ঢাকা জেলার বাঘ্‌ড়া গ্রামে প্রাপ্ত একটি প্রতিমা, পাহাড়পুর-মন্দিরের পীঠ-গাত্রের প্রতিমাটি এবং রাজসাহী-চিত্রশালার একটি প্রতিমাই প্রধান।

মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম এবং তাহার দেবায়তন বাঙলা দেশে ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাহার প্রতিমালক্ষণ ও সাধন সুঅভ্যস্ত। এই পর্বের কয়েকটি বিষ্ণু-প্রতিমায় তাহার প্রভাব অনস্বীকার্য। বরিশাল-জেলার লক্ষ্মণকাটির সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণু মূর্তির কথা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি; এই প্রতিমার পশ্চাতের দুই হাতের উপর আসীনা শ্রী ও পুষ্টির প্রতিকৃতি এবং মুকুটে চতুর্হস্ত ধ্যানী বুদ্ধপ্রতিম প্রতিমাটি মূর্তিতত্ত্বের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য। উভয় লক্ষণেই মহাযানী বৌদ্ধ প্রতিমার রূপ কল্পনা নিঃসন্দেহে সক্রিয়। কালন্দপুরে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণুপ্রতিমাতেও শেষোক্ত মহাযানী লক্ষণটি উপস্থিত। পূর্বোক্ত সাগর-দীঘির আসন-বিষ্ণু প্রতিমাটিতে শঙ্খ, চক্র ও গদা সনাল পদ্মের উপর স্থিত; এ-ক্ষেত্রেও সমসাময়িক মহাযানী বৌদ্ধ প্রতিমালক্ষণ ও সাধন সক্রিয়, সন্দেহ নাই।

শৈবধর্ম

শৈবধর্মেরও লিপি এবং মূর্তিপ্রমাণ সুপ্রচুর, যদিও বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে তাহা তুলনীয় নয়। খালিমপুর-লিপিতে এক চতুর্মুখ মহাদেবের চতুর্মুখ লিঙ্গের (?) প্রতিমা প্রতিষ্ঠার সংবাদ আছে। নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতে রাজা কর্তৃক শিব-ভট্টারক ও তাঁহার পূজক ও সেবক পাশুপতদের উদ্দেশ্যে কিছু ভূমিদানের উল্লেখ দেখা যায়। এই নারায়ণপাল এক সহস্র শিব (?) মন্দির প্রতিষ্ঠার দাবি করিয়াছেন। রামপাল রামাবতীতে শিবের তিনটি মন্দির, একাদশ রুদ্রের একটি মন্দির এবং সূর্য, স্কন্দ ও গণপতির মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। এই পর্বের বাঙলার শৈবধর্ম বোধ হয় শিব-শ্রীকণ্ঠ ও তাঁহার শিষ্য লাকুলীশ (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক)-প্রবর্তিত পাশুপত ধর্ম, এবং এ-তথ্য আজ সুবিদিত যে, উত্তর-ভারতে পাশুপত ধর্মই আদি শৈবধর্ম। প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, আগমান্ত শৈবধর্ম গুপ্ত-পর্বেই পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং পাশুপত ধর্মের ধ্যান-কল্পনার মধ্যেই এই ধর্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা গিয়াছিল। আঠারটি আগম এবং তাহাদের কিছু পরবর্তী কালে রচিত ছয়টি যামল ও ছয়টির অন্যতম ব্রহ্মযামলের পরিশিষ্টরূপী পিঙ্গলা-মত-গ্রন্থে এই ধর্মের ধ্যান-কল্পনার বিস্তৃত পরিচয় নিবদ্ধ। এই সব গ্রন্থের মতে

আর্যাবর্তই শিব-সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র, কামরূপ, কলিঙ্গ, কঙ্কন, কাঞ্চী, কাবেরী, কোশল ও কাশ্মীর এই ক্ষেত্রের বাহিরে। গৌড়দেশ এই ক্ষেত্রের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকৃত, তবে গৌড়ীয় সাধন-গুরুরা আর্যাবর্তের গুরুদের চেয়ে নিকৃষ্ট এ কথাও বলা হইয়াছে। সে যাহা হউক, সন্দেহ নাই যে, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর কালে আর্যাবর্তের পাশুপতধর্মী ব্রাহ্মণ গুরু ও তাঁহাদের শিষ্যবর্গ ক্রমাগতই বাঙলা দেশে আসিতেছিলেন এবং তাঁহারাই এই দেশে পাশুপতধর্ম প্রচার করিতেছিলেন।

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পর্বেও লিঙ্গরূপী শিবের পূজাই সমধিক প্রচলিত এবং এই লিঙ্গ সাধারণত একমুখলিঙ্গ। একমুখলিঙ্গ শিব-প্রতিমা বাঙলার নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাদারীগঞ্জ গ্রামে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) প্রতিমাটি এই জাতীয় লিঙ্গের সুন্দর নিদর্শন। চতুর্মুখলিঙ্গও বিরল নয়। মুর্শিদাবাদে প্রাপ্ত (আশুতোষ-চিত্রশালা) ধাতব চতুর্মুখলিঙ্গটি দশম-একাদশ শতকের ভাস্কর-শিল্পের একটি সুউজ্জ্বল নিদর্শন; ইহার চারিদিকের চারিমুখের একটি মুখ শিবের বিরূপাক্ষ বা অঘোর-রূপের প্রতিকৃতি। নবম শতকের কয়েকটি চতুর্মুখলিঙ্গ উল্লেখযোগ্য; এই ধরনের লিঙ্গ-প্রতিমার চারিদিকে চারিটি উপবিষ্ট শান্ত মূর্তি রূপায়িত। লক্ষ্যণীয় যে, এই ধরনের প্রতিমাগুলি সবই উত্তরবঙ্গের নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ত্রিপুরার ঊনকোটি শিবলিঙ্গও এই প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে।

শিবের অন্যান্য রূপ-কল্পনার প্রতিকৃতি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে চন্দ্রশেখর, নৃত্যপর, সদাশিব, উমা-মহেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর, এবং কল্যাণ-সুন্দর বা শিব-বিবাহ এই কয়টি সৌম্যমূর্তির শিব-প্রতিমাই প্রধান। রুদ্র রূপ-কল্পনার প্রতিকৃতির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে অঘোররুদ্রের প্রতিমা। পাহাড়পুর মন্দিরের পীঠ গাত্রে চন্দ্রশেখর-শিবের একাধিক প্রতিকৃতির কথা আগেই বলিয়াছি। শিবের দ্বিহস্ত ও চতুর্হস্ত ঈশান মূর্তির উভয় রূপই বাঙলাদেশে সুপরিচিত ছিল। রাজসাহী জেলার চৌরাকসবা গ্রামে প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিত্রশালা) দ্বিহস্ত প্রতিমা এবং ঐ জেলারই গণেশপুর গ্রামে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) চতুর্হস্ত প্রতিমাটি এই দুই রূপের নিদর্শন। বরিশাল জেলার কাশীপুর-গ্রামে একটি চতুর্হস্ত স্থানক-শিব প্রতিমার পূজা এখনও প্রচলিত: স্থানীয় লোকেরা ইঁহাকে শিবের বিরূপাক্ষ রূপ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শারদাতিলক-গ্রন্থের বর্ণনা অনুসরণ করিয়া নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলিয়াছেন, এই রূপটি নীলকণ্ঠ শিবের, বিরূপাক্ষের নয়।

নটরাজ শিবের প্রতিমা বাঙলাদেশে সুপ্রচুর; কিন্তু বাঙলার নটরাজ-রূপকল্পনা দাক্ষিণী রূপ কল্পনাকে অনুসরণ করে নাই। দশ ও দ্বাদশহস্ত এই ধরনের নটরাজ-শিবের প্রতিমা এ-পর্যন্ত বাঙলা দেশের বাহিরে আর কোথাও বড় একটা পাওয়া যায় নাই, অথচ বাঙলা দেশে নৃত্যমূর্তি-শিবের দ্বিতীয় রূপ-কল্পনা আর কিছু দেখাও যায় না। পূর্ব-দক্ষিণ বাঙলায় নৃত্যপর-শিবের যত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে সবই দশহস্ত এবং তাঁহার

লক্ষণ ও লাঞ্ছন-সন্নিবেশ পুরাপুরি মৎস্য-পুরাণের বর্ণানুযায়ী ; দক্ষিণ-ভারতীয় চতুর্হস্ত নটরাজ শিব-প্রতিমায় শিবের পদতলে যে অপস্মার-পুরুষটিকে দেখা যায় বাঙলা দেশে তাঁহার চিহ্নও নাই। এই ধরনের দশহস্ত, মৎস্যপুরাণ-অনুসারী নটরাজ শিবের মূর্তিগুলির একটির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিতে মূর্তিটিকে বলা হইয়াছে 'নটেশ্বর'। দ্বাদশহস্ত নটরাজ-শিবের যে ক'টি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের হস্তধৃত লক্ষণ ও লাঞ্ছন একটু পৃথক এবং সন্নিবেশও ভিন্ন প্রকারের ; এই ধরনের মূর্তিগুলিতে এক হাতে বীণা, এবং দুই হাতে করতালে নৃত্যের তাল রাখা হইতেছে। শিব যে নৃত্য ও সঙ্গীতরাজ ইহা দেখানও যেন এই প্রতিমাগুলির উদ্দেশ্য।

শিবের সদাশিব মূর্তিও বাঙলাদেশে সুপ্রচুর। রুদ্র-যামল গ্রন্থের মতে শিবের ছয় রূপের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, পরাশিব) মধ্যে একরূপ সদাশিব। সদাশিবের রূপ-কল্পনা মহানির্বাণতন্ত্র, উত্তর-কামিকাগম এবং গরুড় পুরাণ গ্রন্থে বিধৃত, এবং শেষের দু'টি গ্রন্থ বাঙলা দেশে অধিকতর প্রচলিত। বাঙলাদেশে যে ক'টি সদাশিব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে প্রতিমা-লক্ষণের দিক হইতে তাঁহারা প্রায় পুরাপুরি এই দু'টি গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী। তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালে এই ধরনের একটি সদাশিব মূর্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, মূর্তিটি এখন কলিকাতা-চিত্রশালায় রক্ষিত। দক্ষিণ-ভারতের সদাশিব মূর্তির সঙ্গে বাঙলার সদাশিব মূর্তির রূপ-কল্পনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। দক্ষিণাগত সেন-বংশীয় রাজারাও ছিলেন সদাশিবের পরমভক্ত। এই সব কারণে কেহ কেহ মনে করেন, কর্ণাটাগত সেনবংশ এবং দক্ষিণাগত সৈন্য-সামন্তরাই সদাশিবের এই রূপ-কল্পনা বাঙলাদেশে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, সদাশিব রূপ-কল্পনা একান্তই উত্তর-ভারতীয় আগমান্ত শৈবধর্মের সৃষ্টি। তবে মনে হয়, উত্তর-ভারতীয় সদাশিব দক্ষিণ-ভারতে যে-রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাই কালক্রমে দক্ষিণাগত রাজবংশ ও সৈন্য-সামন্তরা বাঙলাদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন।

পাল পর্বের বাঙলাদেশে উমা-মহেশ্বরের যুগলমূর্তিরূপ বাঙালীর চিত্তহরণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আজ এইসব মূর্তির অবশেষ বাঙলায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ; বস্তুতই ইঁহাদের সংখ্যার ইয়ত্তা নাই। তন্ত্রপরায়ণ শক্তি বাঙালীর চিত্তে শিব-উমার আলিঙ্গন-মূর্তি আনন্দ ও সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ রূপ বলিয়া মনে হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। শিবক্রোড়োপবিষ্টা, সুখাসীনা, আলিঙ্গনবদ্ধা, হাস্যানন্দময়ী উমাই তো শিবশক্তির তান্ত্রিক সাধকদের ত্রিপুর-সুন্দরী এবং তাঁহার রূপধ্যানই ধ্যানযোগের শ্রেষ্ঠ ধ্যান।

উমা-মহেশ্বর মূর্তিতে উমা এবং মহেশ্বর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেও উভয়েই পৃথক পৃথক রূপকল্পিত, কিন্তু অর্ধনারীশ্বর কল্পনায় তাঁহারা দুইএ মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছেন ; দক্ষিণার্ধে শিব, বামার্ধে উমা। বাঙলাদেশে অর্ধনারীশ্বর প্রতিমা সুপ্রচুর নয়, বরং তাহার

নিদর্শন কমই পাওয়া গিয়াছে। পুরাপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) প্রতিমাটি এই ধরনের প্রতিমার এবং একাদশ শতাব্দীর বাঙলা ভাস্কর্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

শিবের বৈবাহিক বা কল্যাণ-সুন্দর যুগলমূর্তিও বাঙলাদেশে (ঢাকা ও বগুড়া জেলা, ব-সা-প চিত্রশালা) কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে ; দক্ষিণ-ভারতের সুপরিচিত বৈবাহিক রূপের সঙ্গে ইহাদের সাদৃশ্য স্বল্প। বাঙলার প্রতিমাগুলিতে বিবাহ-ব্যাপারে বাঙালীর রীতি ও আচার পদ্ধতির কয়েকটি সুস্পষ্ট অভিজ্ঞান বিদ্যমান ; সপ্তপদী গমন, বরের হাতে কাঁত্র বহন প্রভৃতি দক্ষিণী প্রতিমাতে দেখা যায় না, কিন্তু বাঙলার প্রতিমাগুলিতে এই সব স্থানীয় আচার ও রীতিগুলি রূপায়িত হইয়াছে।

রুদ্র-শিবের বটুক-ভৈরব এবং অঘোর-রুদ্র রূপের সঙ্গেও এই পর্বের বাঙালীর পরিচয় ছিল। অঘোর-রুদ্রের মূর্তিপ্রমাণ বাঙলাদেশে খুব বেশি নাই ; ঢাকা ও রাজসাহীর চিত্রশালায় দুইটি মূর্তি রক্ষিত আছে মাত্র, এবং দু'টিই এই পর্বের বলিয়া মনে হয়। শৈবাগম অনুসারে রুদ্র-শিবের পঞ্চরূপের (বামদেব, তৎপুরুষ, সদ্যোজাত, অঘোর ও ঈশান পঞ্চব্রহ্মা) মধ্যে অঘোর-রূপ অন্যতম, এবং এই রূপের একটি বিশিষ্ট ভক্ত সম্প্রদায় বোধ হয় পাল-সেন পর্বেই গড়িয়া উঠিয়াছিল ; অন্তত কিছু পরবর্তী কালের বাঙলায় অঘোর-পন্থী নামে একটি শৈব সম্প্রদায়ের পরিচয় সমসাময়িক সাহিত্যে নিবদ্ধ। বটুক-ভৈরবের কয়েকটি মূর্তিও বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। নগ্ন সর্বাঙ্গ, কাষ্ঠ পাদুকা, কুকুর সঙ্গী, অগ্নিপ্রভা, নরমুণ্ড ও নরমুণ্ডমালা, বিকট হাস্যব্যাদিত মুখ প্রভৃতি দেখিলে ভুল করিবার কারণ নাই যে, এই ধরনের প্রতিমা আগমান্ত তান্ত্রিক মশৈবধর্মের ধ্যান ও কল্পনার সৃষ্টি।

শিবপুত্র গণপতি এবং কার্তিকেয়ের স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রতিমাও বাঙলাদেশে কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। তবে গণপতি বা গণেশের তুলনায় কার্তিকেয়ের প্রসার বোধ হয় তত বেশি ছিল না। এই পর্বে গণেশের সব প্রতিমাই মুষিক-বাহনোপরি নৃত্যপরায়ণ। তাঁহার একটি হাতে একটি ফল ; এই ফল সিদ্ধির প্রতীক, এবং গণেশ বাঙলাদেশের সকল সম্প্রদায়ে, বিশেষ ভাবে বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীতে সিদ্ধফলদাতা বলিয়াই পূজিত ও আদৃত। শৈব গাণপত্য সম্প্রদায়ের অন্তত একটি গণেশ-প্রতিমা বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে, রামপাল গ্রামের ধ্বংসাবশেষ হইতে। মূর্তিটির লক্ষণ ও লাঞ্ছন একান্তই দক্ষিণ ভারতীয় প্রতিমাশাস্ত্র অনুযায়ী ; জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, দক্ষিণী কোনো প্রবাসী ভক্তের প্রয়োজনে মূর্তিটির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা। কার্তিকেয়ের স্বতন্ত্র প্রতিমা যে দু'একটি এ-যাবৎ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে উত্তর-বঙ্গের কোনো স্থানে প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিত্রশালা) ময়ূরবাহনের উপর মহারাজলীলায় উপবিষ্ট কার্তিকেয়ের মূর্তিটি দ্বাদশ শতকীয় ভাস্কর-শিল্পের সুন্দর নিদর্শন।

পার্বত্য ত্রিপুরায় উনকোটি এবং রাজসাহী জেলার দেওপাড়া, পালপর্বের এই শৈব

তীর্থ দুইটির কথা না বলিয়া পাল-পর্বের শিবায়ন শেষ করা যায় না। পূর্ব-ভারতে বোধ হয় বারাণসীর কোটি তীর্থের পরই ছিল উনকোটির স্থান। বস্তুত, এখনও উনকোটি পাহাড়ের ইতস্তত যত মূর্তির ধ্বংসাবশেষ ছড়াইয়া আছে তাহাতে উনকোটি নামের সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নয়। পাহাড়ের গায়ে একাধিক বৃহদাকৃতি শৈব-প্রতিমা ও প্রতিমার শির এখনও উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। শিব ও গণেশ ছাড়া পরিবার-দেবতাদের মধ্যে হর, গৌরী, হরিহর, নরসিংহ, হনুমান, একমুখ ও চতুর্মুখলিঙ্গ প্রভৃতিও আছেন।

দক্ষিণ-ভারতের চোল রাজাদের দু'টি লিপিপ্রমাণ হইতে বাঙলার বাহিরে বাঙালী শৈবগুরুদের সমসাময়িক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির কতকটা ধারণা করা যায়। একটি লিপিতে জানা যায়, রাজেন্দ্রচোল রাজরাজেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করিয়া সর্বশিব পণ্ডিত শিবাচার্যকে সেই মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং সর্বকালের জন্য তাঁহার আর্যদেশ ও গৌড়দেশবাসী শিষ্য ও শিষ্যানুশিষ্যরাই মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হইবেন, এই নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন। ত্রিলোচন শিবাচার্যের সিদ্ধান্তসারবলী-গ্রন্থের একটি টীকায় আরও বলা হইয়াছে যে, রাজেন্দ্রচোল গঙ্গাতীর হইতে শৈব আচার্যদের চোলদেশে লইয়া যাইতেন। পরকেশরীবর্মা রাজাধিরাজ-চোলের একটি লিপিতে জানা যায়, গৌড়দেশান্তর্গত দক্ষিণ-রাঢ়ের শৈবাচার্য উমাপতিদেব বা জ্ঞান-শিবদেবের পূজাপুণ্যের বলেই সিংহলী এক অভিযাত্রী সৈন্যদলকে রাজাধিরাজ যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তিনি শিবদেবকে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন; শিবদেব সেই গ্রামলব্ধ আয় তাঁহার আত্মীয়বর্গের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন।

শাক্তধর্ম

শৈব-ধর্ম ও শৈব-দেবতাদের সঙ্গেই শাক্তধর্ম ও শাক্ত দেবী-প্রতিমার কথা বলিতে হয়। দেবীপুরাণে (খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম-অষ্টম শতক) বলা হইয়াছে, রাঢ়া-বরেন্দ্র-কামরূপ-কামাখ্যা-ভোট্টদেশে (তিব্বতের) বামাচারী শাক্তমতে দেবীর পূজা হইত। এই উক্তি সত্য হইলে স্বীকার করিতেই হয়, খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম-অষ্টম শতকের পূর্বেই বাঙলাদেশের নানা জায়গায় শক্তিপূজা প্রবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। ইহার কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় গুপ্তোত্তর পর্বে এবং মধ্য-ভারতে রচিত জয়দ্রথ-যামল গ্রন্থে। এই গ্রন্থে ঈশান-কালী, রক্ষা-কালী, বীর্যকালী, প্রজ্ঞাকালী প্রভৃতি কালীর নানা রূপের সাধনা বর্ণিত আছে। তাহা ছাড়া ঘোরতারা, যোগিনীচক্র, চক্রেশ্বরী প্রভৃতির উল্লেখও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। আর্যাবর্তে শাক্তধর্ম যে গুপ্ত-গুপ্তোত্তর পর্বেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল আগম ও যামল গ্রন্থগুলিই তাহার প্রমাণ। খুব সম্ভব ব্রাহ্মণ্য অন্যান্য ধর্মের স্রোত-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই শক্তিধর্মের স্রোতও বাঙলাদেশে প্রবাহিত হইয়াছিল এবং এই দেশ পরবর্তী শক্তিধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র রূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সব আগম ও যামল গ্রন্থের

ধ্যান ও কল্পনাই, অন্তত আংশিকত, পরবর্তী কালে সুবিস্তৃত তন্ত্র সাহিত্যের ও তন্ত্রধর্মের মূলে, এবং এই তন্ত্র-সাহিত্যের প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থই রচিত হইয়াছিল বাঙলাদেশে। তন্ত্রধর্মের পরিপূর্ণ ও বিস্তৃত বিকাশও এই দেশেই। দ্বাদশ শতকের আগেকার রচিত কোনো তন্ত্র-গ্রন্থ আজও আমরা জানি না, এবং পাল-চন্দ্র-কাম্বোজ লিপিমালা অথবা সেন-বর্মণ লিপিমালায়ও কোথাও এই গুহ্য সাধনার নিঃসংশয় কোনো উল্লেখ পাইতেছি না, এ-কথা সত্য। কিন্তু পাল-পর্বের শাক্ত দেবীদের রূপ-কল্পনায়, এক কথায় শক্তিধর্মের ধ্যানধারণায় তান্ত্রিক ব্যঞ্জনা নাই, এ-কথা জোর করিয়া বলা যায় না। জয়পালের গয়া-লিপিতে মহানীল সরস্বতী নামে যে দেবীটির উল্লেখ আছে তাঁহাকে তো তান্ত্রিক দেবী বলিয়াই মনে হইতেছে। তবু, স্বীকার করিতেই হয় যে, পাল-পর্বের অসংখ্য দেবী মূর্তিতে শাক্তধর্মের যে রূপ-কল্পনার পরিচয় আমরা পাইতেছি তাহা আগম ও যামলগ্রন্থ-বিধৃত ও ব্যাখ্যাত শৈবধর্ম হইতেই উদ্ভূত, এবং শাক্তধর্মের প্রাক্-তান্ত্রিক রূপ। এ-তথ্য লক্ষ্যণীয় যে, পুরাণকথানুযায়ী সকল দেবীমূর্তিই শিবের সঙ্গে যুক্ত, শিবেরই বিভিন্নরূপিণী শক্তি, কিন্তু তাঁহাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল এবং সেই ভাবেই তাঁহারা পূজিতাও হইতেন। শাক্তধর্ম ও সাম্প্রদায়ের পৃথক অস্তিত্ব ও মর্যাদা সর্বত্র স্বীকৃত ছিল।

বাঙলাদেশে যত দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে চতুর্ভুজা ও দণ্ডায়মানা মূর্তির সংখ্যাই বেশি। কোনো কোনো প্রতিমায় তিনি একক, কোথাও কোথাও তিনি সপরিবারে ও সমণ্ডলে বিদ্যমানা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, উপস্থিত; অন্যত্র গণেশ, কার্তিকেয়, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। বিভিন্ন প্রতিমায় দেবীর চারি হস্তের লক্ষণ বিভিন্ন; পার্শ্ব-দেবতারাও বিভিন্ন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য হইতেছে অধিকাংশ প্রতিমার পাদপীঠে উৎকীর্ণ একটি গোধিকার মূর্তি এবং কোনো কোনো প্রতিমায় দুই পাশে দুইটি কদলীবৃক্ষ। এই দুইটি লক্ষণই লোকায়ত ধর্মের প্রতিধ্বনি হিসাবে বিদ্যমান। গোধিকাটি তো অনিবার্য ভাবে মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের চণ্ডী ও কালকেতুর উপাখ্যান এবং কদলীবৃক্ষ দুইটি হয়তো পরবর্তী কালের দুর্গা-প্রতিমার কলা-বউ'র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তবে, কলাগাছ দু'টি আবার বিশুদ্ধ মঙ্গল-সূচক লক্ষণ হওয়াও বিচিত্র নয়। যাহা হউক, এই ধরনের চতুর্ভুজা ও পাদপীঠোপরি দণ্ডায়মানা দেবী মূর্তিগুলিকে কেহ বলিয়াছেন চণ্ডী, কেহ বলিয়াছেন গৌরী-পার্বতী। নাম যাহাই হউক, এই জাতীয় দেবী প্রতিমা বাঙলাদেশের নানা জায়গা হইতে সুপ্রচুর আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং মূর্তিতত্ত্বের দিক হইতে তাঁহাদের মর্যাদাও কম নয়। দিনাজপুর জেলায় মঙ্গলবাড়ী গ্রামে প্রাপ্ত দেবী প্রতিমা, রাজসাহী-চিত্রশালার দ্বিহস্ত একটি প্রতিমা, রাজসাহীর মান্দৈল গ্রামে প্রাপ্ত নবগ্রহের মূর্তি সংযুক্ত সুবৃহৎ একটি প্রতিমা, খুলনা জেলার মহেশ্বরপাশা গ্রামে প্রাপ্ত একটি প্রতিমা, বাঁকুড়া জেলার দেওলি গ্রামের একটি প্রতিমা প্রভৃতি পাল-পর্বের এই ধরনের প্রতিমার বিশিষ্ট নিদর্শন।

দেবীর উপবিষ্ট মূর্তি অপেক্ষাকৃত বিরল। আসীনা দেবীর যে ক'টি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও চার হাত, কাহারও ছয়, কাহারও বিশ, কাহারও পরিচয় সর্বমঙ্গলা, কাহারও অপরাজিতা, কাহারও পার্বতী বা ভুবনেশ্বরী, কাহারও বা মহালক্ষ্মী। হাতের সংখ্যা, হস্তধৃত লক্ষণ ও মুদ্রা, আসন-ভঙ্গী, বাহন পরিবার-দেবতা প্রভৃতির উপরই এই সব পরিচয়ের নির্ভর। নওগাঁর রাজসাহী চিত্রশালে) সর্বমঙ্গলা, নিয়ামৎপুরে প্রাপ্ত অপরাজিতা, যশোহর জেলার শাঁখহাটি গ্রামের ভুবনেশ্বরী, রাজসাহী জেলার শিমলা গ্রামের মহালক্ষ্মী প্রভৃতি পাল-পর্বের এই ধরনের মূর্তির এবং তক্ষণ শিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন। বিক্রমপুরের কাগজীপাড়া গ্রামে লিঙ্গোদ্ভবা চতুর্ভুজা (সম্মুখের দুই হাত ধ্যান-মুদ্রায়, পশ্চাতের দুই হাতে অক্ষমালা ও পুস্তক) একটি দেবী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে; ভট্টশালী মহাশয় বলেন, মূর্তিটি মহামায়া বা ত্রিপুর ভৈরবীর।

রুদ্র বা উগ্রতন্ত্রের দেবী মূর্তির মধ্যে সুপরিচিতা মহিষমর্দিনী-দুর্গাই প্রধান এবং তাঁহার প্রতিমা ভারতের অন্যান্য প্রান্তের মতো বাঙলা দেশেও সুপ্রতুল। বাঙলার প্রাচীনতম মহিষমর্দিনী প্রতিমাগুলি অষ্টভুজা বা দশভুজা। ঢাকা জেলার শান্তগ্রামে একটি দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তির পাদপীঠে "শ্রী-মাসিক-চণ্ডী" এই লিপিটি উৎকীর্ণ আছে; এই মূর্তিটির সঙ্গে মানভূম জেলার দুলমি গ্রামে প্রাপ্ত একটি দশভুজা মহিষমর্দিনীর সাদৃশ্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভবিষ্যপুরাণ-কথিত মহিষমর্দিনীর নবদুর্গা-রূপও বাঙলা দেশে অজ্ঞাত ছিল না। দিনাজপুর জেলার পোরষ গ্রামে প্রাপ্ত এই ধরনের একটি নবদুর্গা-প্রতিমার মধ্যস্থলে বৃহদাকৃতি মহিষমর্দিনী এবং বাকী চারদিক ঘিরিয়া আটটি ক্ষুদ্রাকৃতি অনুরূপ মূর্তি। মধ্যস্থলের মূর্তিটির আঠারটি হাত, বাকী আটটির প্রত্যেকটির ষোলটি। ভবিষ্য-পুরাণে মধ্য-মূর্তিটির নামকরণ উগ্রচণ্ডী, অন্যগুলির কাহারও নাম চণ্ডা, কাহারও চণ্ডনায়িকা, কাহারও চণ্ডবতী বা চণ্ডরূপা ইত্যাদি। বারোটি এবং ষোলটি হাতযুক্ত দুটি মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে যথাক্রমে দিনাজপুর জেলার কেশবপুর গ্রামে এবং বীরভূম জেলার বক্রেশ্বরে। দিনাজপুর জেলার বেতনা গ্রামে একটি বত্রিশহস্ত চণ্ডিকা মহিষমর্দিনী প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে; প্রধান মূর্তিটির উপরে শিব, গণপতি, সূর্য, বিষ্ণু ও ব্রহ্মার মূর্তি উৎকীর্ণ। বরিশাল জেলার শিকারপুর গ্রামের মন্দিরে এখনও একটি দেব মূর্তির পূজা হইয়া থাকে; মূর্তিটি শবোপরি দণ্ডায়মান এবং তাঁহার চারহাতে খেটক, খড়্গ, নীলপদ্ম এবং নরমুণ্ডের কঙ্কাল, মাথার উপর ক্ষুদ্রাকৃতি কার্তিকেয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও গণপতি। প্রতিমা-শাস্ত্র মতে মূর্তিটি খুব সম্ভব উগ্রতারার। এই উগ্রতারার মূর্তিটিতে এবং মহিষমর্দিনীর একাধিক প্রতিমায় মধ্যমূর্তির উপরে ক্ষুদ্রাকৃতি পঞ্চমূর্তির সন্নিবেশ নিঃসংশয়ে মহাযানী প্রতিমার পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের সন্নিবেশ স্মরণ করাইয়া দেয়। নবদুর্গা-প্রতিমার কেন্দ্রমূর্তির চারপাশে যে বাকী আটটি ক্ষুদ্রাকৃতি পুনরুক্তি তাহাও অরপচন-মঞ্জুশ্রীর প্রতিমা-বিন্যাসের কথা স্মরণ না করাইয়া পারে না। এই সব মূর্তি-কল্পনায় মহাযানী-বজ্রযানী প্রভাব অনস্বীকার্য।

এই পর্বের বাঙলাদেশে অন্তত দুই তিনটি চতুর্ভুজা ষড়ভুজা বাগীশ্বরী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের কাহারও চার হাত, কাহারও বা ছয়। বাগীশ্বরী ছাড়া আরও কয়েকটি মাতৃকা মূর্তির সঙ্গে এই পর্বের বাঙলার পরিচয় ছিল। মাতৃকা মূর্তি সাতটি: ব্রাহ্মণী, মহেশ্বরী, কৌমারী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, বরাহী ও চামুণ্ডী, এবং ইঁহারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ব্রাহ্মণ্য দেবতার শক্তিরূপে কল্পিতা। ইঁহাদের মধ্যে চামুণ্ডা বা চামুণ্ডীই ছিলেন বাঙালীর প্রিয়; এবং তাঁহার সিদ্ধ-যোগেশ্বরী, দন্তুরা, রূপবিদ্যা, ক্ষমা, রুদ্রচর্চিকা, রুদ্রচামুণ্ডা, সিদ্ধচামুণ্ডা প্রভৃতি বিভিন্ন ধ্যান-কল্পনার প্রতিকৃতি বাঙলার নানা জায়গা হইতে পাওয়া গিয়াছে। রূপবিদ্যার একটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে দিনাজপুর জেলার বেতনা গ্রামে; দ্বিহস্ত দন্তুরার একটি মূর্তি উদ্ধার করা হইয়াছে বর্ধমান জেলায়, একান্ন শাক্তপীঠের অন্যতম পীঠস্থান অট্টহাস গ্রাম হইতে। রাজসাহী-চিত্রশালায় দন্তুরার আরও বয়েকটি প্রতিমা রক্ষিত আছে। দ্বাদশভুজা সিদ্ধ-যোগেশ্বরীর দণ্ডায়মান ও নৃত্যপরায়ণা একাধিক প্রতিমা রক্ষিত আছে ঢাকা-চিত্রশালায়। রাজসাহী-চিত্রশালায় আরও দুইটি মূর্তি আছে; একটির পাদপীঠে উৎকীর্ণ "পিসিতাসনা" (পিশিতাসনা), এবং আরও একটির পাদপীঠে "চর্চিকা"। শেষোক্তটিতে দেবী শবাসনের উপর এক বৃক্ষের নীচে উপবিষ্টা; প্রথমোক্তটিতে দেবী গর্দভের উপর আসীনা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ চিত্রশালার একটি চতুর্ভুজা ব্রাহ্মণী মূর্তি (নদীয়া জেলার দেবগ্রামে প্রাপ্ত), রাজসাহী-চিত্রশালার কয়েকটি বরাহী এবং একটি ইন্দ্রাণী প্রতিমা প্রত্যেকটিই এই পর্বের মাতৃকা মূর্তির সুপরিচিত নিদর্শন। ক্ষমা-চামুণ্ডার একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে যশোহর জেলার অমাদি গ্রামে; রুদ্রচামুণ্ডার এবং সিদ্ধচামুণ্ডার দুইটি প্রতিমার পরিচয় দিয়েছেন বীরভূম-বিবরণের লেখক।

মন্দির-দ্বারের দুইপাশে গঙ্গা ও যমুনার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করা তো গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বের স্থাপত্যরীতির অন্যতম লক্ষণ। যমুনার স্বতন্ত্র মূর্তি বাঙলাদেশে বড় একটা পাওয়া যায় নাই; কিন্তু মকরবাহিনী গঙ্গার একাধিক মূর্তি বিদ্যমান। রাজসাহী-চিত্রশালার মূর্তি দুইটি সুন্দর। খুলনা জেলার যশোরেশ্বরী মন্দিরে একটি গঙ্গা-মূর্তি আছে। দিনাজপুর জেলার ভদ্রশিলা গ্রামে এখনও একটি গঙ্গা-প্রতিমার পূজা হইয়া থাকে, দক্ষিণা-কালিকা নামে। হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে একটি চতুর্ভুজা গঙ্গামূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

সৌরধর্ম

সাম্প্রতিক বাঙলায় এমন কি মধ্যযুগীয় বাঙলায়ও সূর্য-প্রতিমার স্বাধীন স্বতন্ত্র পূজার প্রমাণ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ গুপ্ত-পর্ব হইতেই উদীচ্যবেশী ঈরাণী ধ্যান-কল্পনার সূর্যপূজা বাঙলাদেশে সুপ্রচারিত হইয়াছিল এবং আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত

তাহার প্রচার ও প্রসার বাড়িয়াই গিয়াছিল। বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত অসংখ্য সূর্য-প্রতিমাই তাহার প্রমাণ। সেন-পর্বে তো এই ধর্ম রাজবংশের পোষকতাই লাভ করিয়াছিল, বিশ্বরূপ ও কেশবসেন ছিলেন পরমসৌর। সূর্য-প্রতিমা পূজার এত প্রসারের কারণ বোধ হয়, সূর্যদেব সকল প্রকার রোগের আরোগ্যকর্তা বলিয়া গণ্য হইতেন। দিনাজপুর জেলার বৈরহাট্টা গ্রামে প্রাপ্ত একটি আসীন সূর্য-প্রতিমার (একাদশ-দ্বাদশ শতক) পাদপীঠে সুস্পষ্ট উৎকীর্ণ আছে ঃ "সমস্ত রোগানাম্ হর্তা"। পাল ও সেন-পর্বের সূর্য প্রতিমায় উদীচ্য-ঈরাণী ধ্যান-কল্পনা অবিচল, কিন্তু সূর্য-দেবতার ধ্যানে ও ব্যাখ্যায় বোধ হয় বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধ্যান-কল্পনা মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল। সেন-লিপিতে সূর্যের যে ব্যাখ্যা আছে তাহাতে দেখিতেছি, তিনি কমলবনের সখা, তিমিরকারাবদ্ধ ত্রিলোকের মুক্তিদাতা, এবং বেদবৃক্ষের আশ্চর্য পক্ষী।

পাল-পর্বের সূর্য-প্রতিমা সপরিবারে বিদ্যমান, এবং সমস্ত লক্ষণ ও লাঞ্ছনা সুপরিস্ফুট। আসীন সূর্যমূর্তি দুর্লভ ; বৈরহাট্টার উপবিষ্ট প্রতিমাটির কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। বাঙলাদেশে প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত সূর্যমূর্তিই স্থানক বা দণ্ডায়মান মূর্তি। লণ্ডন সাউথ-কেনসিংটন -চিত্রশালার সূর্যমূর্তিটি ও ফরিদপুর-কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ চিত্রশালা) একটি প্রতিমা সূর্যমূর্তির দ্বিহস্ত দণ্ডায়মান সূর্যমূর্তির বিশিষ্ট উদাহরণ। দিনাজপুর জেলার মহেন্দ্রগ্রামে একটি ষড়ভুজ সূর্যমূর্তি পাওয়া গিয়াছে ; এ ধরনের মূর্তি দুর্লভ। রাজসাহী জেলার মান্দা গ্রামে একটি ত্রিমুণ্ড, দশহস্ত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটির প্রায় সমস্ত লক্ষণই সূর্যের ; কিন্তু ইঁহার তিনটি মুখ, দশটি হাত, উগ্রমূর্তির পার্শ্ব দেবতারা এবং কেন্দ্র মূর্তিটির হস্তধৃত আয়ুধগুলি সূর্যের লক্ষণ বলিয়া মনে হইতেছে না। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন, মূর্তিটি মার্তণ্ড-ভৈরবের। বাঙলার সমস্ত সূর্যমূর্তিই উদীচ্য পদাবরণ পরিহিত ; কিন্তু মালদহ-চিত্রশালায় দুইটি প্রস্তর ফলকে যে সূর্যমূর্তি উৎকীর্ণ তাঁহাদের কোনো পদাবরণ নাই। এ-ক্ষেত্রে দাক্ষিণী প্রতিমা-শাস্ত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য।

পুরাণ-কাহিনী অনুসারে অশ্বারূঢ় এবং পরিজনসহ মৃগয়াবিহারী রেবন্ত দেবতার সঙ্গে সূর্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। এই রেবন্ত-দেবতার কয়েকটি মূর্তি বাঙলার নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দিনাজপুর জেলার ঘাটনগরে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) রেবন্ত মূর্তিটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিমাটিতে পরিজনসহ মৃগয়ারত রেবন্ত তো আছেনই, কিন্তু দুইজন দস্যুর প্রতিকৃতিও দেখা যাইতেছে ; একজন বৃক্ষশীর্ষে লুক্কায়িত থাকিয়া রেবন্তকে প্রহারোদ্যত। পাদপীঠে একটি নারী দণ্ডায়মানা ও একটি পুরুষ বঁটিতে মৎস্যকর্তনরতা একটি নারীকে প্রহারে উদ্যত। ফলকটির উপরের দক্ষিণ কোণে একটি বাড়ী এবং তাহার ভিতরে একটি নারী ও পুরুষ। এই ফলকটির সমগ্র রূপ বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, রেবন্ত আদিতে পশুজীবী শিকারী কোমের লোকায়ত দেবতা ছিলেন, এবং লোকায়ত জীবনের সঙ্গেই ছিল তাঁহার সম্বন্ধ। কিন্তু পরবর্তী কালে কোনো সময়ে

তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং অশ্বারূঢ় বলিয়া সূর্যের সঙ্গে আত্মীয়তাবদ্ধ হন।

বাঙলাদেশে প্রাপ্ত অসংখ্য নবগ্রহ প্রতিমাগুলিও সৌরধর্মের সঙ্গেই যুক্ত। বাঙলার শিল্পে নয়টি গ্রহের প্রতিকৃতি সর্বদাই একত্র পাশাপাশি রূপায়িত হইয়াছে, হয় কোনো মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের উপরে, না হয় কোনো প্রতিমা-ফলকের ঊর্ধ্বভাগে। ২৪ পরগণা জেলার কঙ্কনদীঘিতে প্রাপ্ত সুন্দর নবগ্রহ-প্রতিমাটি বোধ হয় গ্রহযাগ বা স্বস্ত্যয়নোদ্দেশ্যে স্বাধীন স্বতন্ত্র পূজালাভ করিত। নবগ্রহের কোনো একটি গ্রহের পৃথক স্বতন্ত্র মূর্তি সুদুর্লভ। এ পর্যন্ত যে-দু'টি মূর্তির পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহা পাহাড়পুর মন্দিরের ভিত্তিগাত্রের দুইটি ফলকে; একটি চন্দ্রের ও অপরটি বৃহস্পতির।

বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর সম্প্রদায়ের দেবদেবী ছাড়া আরও নানাপ্রকারের এমন দেবদেবী প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে যাঁহারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধ্যান-কল্পনার সৃষ্টি নহেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইঁহারা লোকায়ত ধর্মেরই সৃষ্টি, কিন্তু পরবর্তী কালে ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মনসার কথা আগেই বলিয়াছি। গঙ্গা-যমুনার রূপ-কল্পনার মূলেও লোকায়ত ধর্মের প্রভাব সক্রিয়। বৌদ্ধ হারিতী এবং ব্রাহ্মণ্য ষষ্ঠী সম্বন্ধেও একই উক্তি প্রযোজ্য। রাজসাহী জেলার ক্ষীরহর গ্রামে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) একটি চতুর্ভুজা উপবিষ্টা দেবী-প্রতিমার ক্রোড়ে একটি শিশু, দেবীর দোল্যমান দক্ষিণ পদটি ঊর্ধ্বমুখী একটা বিড়ালের উপর স্থাপিত। মূর্তিটি ষষ্ঠী দেবীর, সন্দেহ নাই, এবং বোধ হয় ইহাই ষষ্ঠীর প্রাচীনতম প্রতিমা। হারিতী দেবীর অন্তত দুইটি প্রতিমার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, একটি ঢাকা-চিত্রশালায় (বিক্রমপুর-পাইকপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত) এবং আর একটি সুন্দরবনের এক গ্রামে এখনও অন্য নামে পূজা পাইতেছেন। দুইটি মূর্তিরই ক্রোড়ে মানবশিশু এবং চারিহস্তের দুই হস্তে মাছ ও ভাণ্ড। পাল-পর্বের বাঙলার অনেকগুলি মনসামূর্তি ঢাকা, রাজসাহী ও কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

বাঙলার নানাস্থান হইতে এক ধরনের মাতা-পুত্র যুগ্মমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শয্যায় শায়িতা একটি নারীর প্রায় বক্ষলগ্ন হইয়া একটি শিশুপুত্র শয়ান; একাধিক পরিচারিকা শায়িতা নারীর পরিচর্যায় নিযুক্তা। শয্যার একপাশে উপরের দিকে গণেশ, কার্তিকেয়, শিবলিঙ্গ এবং নবগ্রহের মূর্তি উৎকীর্ণ। ভট্টশালী মহাশয় বলিয়াছেন, এই প্রতিমাগুলি শিবের সদ্যোজাত রূপের অভিব্যক্তি। এরূপ মনে করিবার খুব সংগত কারণ কিছু নাই, এবং কেহ কেহ যে বলিয়াছেন, কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত এই ফলকগুলিতে রূপায়িত তাহাই যেন অধিকতর যুক্তিসহ।

ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম কুবের প্রভৃতি দিক্‌পাল দেবতাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র মূর্তিও বাঙলাদেশে কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। আদিতে ইঁহারা অনেকেই ছিলেন মর্যাদাসম্পন্ন বৈদিক

দেবতা কিন্তু সাম্প্রদায়িক ধর্মের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা কমিতে আরম্ভ করে এবং স্বতন্ত্র পূজা প্রায় উঠিয়াই যায়। পাহাড়পুর মন্দিরের ভিত্তি-গাত্রে ইন্দ্র, অগ্নি বরুণ এবং কুবেরের একাধিক প্রতিমা-প্রমাণ বিদ্যমান। বৃষবাহন যম, নরবাহন নিরঋতি এবং মকরবাহন, ললিতাসনোপবিষ্ট বরুণের তিনটি সুন্দর প্রতিমা রাজসাহী চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। বাঙলার নানা জায়গা হইতেই এই ধরনের দিক্‌পাল প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৬

পাল-পর্বের বৌদ্ধ ধর্ম ও দেবদেবী

পাল-চন্দ্র পর্বের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা অর্থবহ তথ্য এই যে, এই পর্বের প্রত্যেকটি রাজবংশ মহাযানী বৌদ্ধ। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বাঙলার অনুরাগ কিছুদিন আগে হইতেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সপ্তম শতকের খড়্গ বংশীয় রাজারা ছিলেন "সর্বলোকবন্দ্য ত্রৈলোক্যখ্যাতকীর্তি ভগবান সুগত এবং তাঁহার শান্ত, ভববিভবভেদকারী যোগীগণের যোগগম্য ধর্ম এবং অপ্রমেয় বিবিধ গুণসম্পন্ন সঙ্ঘের পরম ভক্তিমান উপাসক।" মহাযানী বৌদ্ধ অর্হৎদের বাহন বৃষ ছিল এই বংশের রাজাদের লাঞ্ছন। পাল-রাজারা সকলেই ছিলেন পরম সৌগত। অধিকাংশ পাল-লিপির প্রারম্ভেই যে বন্দনা-শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এইরূপ ঃ "যিনি কারুণারত্ন প্রমুদিত হৃদয়ে মৈত্রীকে প্রিয়তমা রূপে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি তত্ত্বজ্ঞানতরঙ্গিনীর সুবিমল সলিলধারায় অজ্ঞানপঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন, যিনি কামক অরির পরাক্রমসঞ্জাত আক্রমণ পরাভূত করিয়া শাশ্বতী শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান্ দশবল লোকনাথের জয় হোক।" ধর্মপালের খালিমপুর-লিপির প্রথম শ্লোকেই আছে ঃ "যিনি সর্বজ্ঞতাকেই রাজশ্রীর ন্যায় স্থিরভাবে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বজ্রাসনের (বুদ্ধদেবের) বিপুল-করুণা-প্রতিপালিত বহুমারসেনা-সমাকুল-দিঙ্‌মণ্ডল-বিজয়সাধনকারী দশবল তোমাদিগকে রক্ষা করুন।" দেবপালের নালন্দা ও মুঙ্গের লিপিদ্বয়ের প্রথমেই যে বুদ্ধ-ধ্যান আছে তাহা এইরূপ ঃ "যে সর্বার্থভূমীশ্বর সুগত (বুদ্ধদেব) প্রবল (অধ্যাত্ম) শক্তি সমূহের আবির্ভাব-প্রভাবে ত্রিলোকনিবাসী প্রাণীবর্গের (সুপরিচিত) সিদ্ধিপথ অতিক্রম করিয়া নবৃতি (নির্বাণলোক) লাভ করিয়াছিলেন, সেই পরপ্রয়োজন-সম্পাদন-স্থিরচেতা সৎপথপ্রবর্তক ভগবান সিদ্ধার্থদেবের সিদ্ধি "প্রজাবর্গের সর্বোত্তম সিদ্ধিবিধান করুক।" দশম শতকের পূর্বার্ধে পূর্ব-বঙ্গে মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব নামে এক নরপতির রাজত্বের খবর পাওয়া যায়; তিনিও ছিলেন বৌদ্ধ। এই শতকেরই শেষার্ধে পূর্ব-বঙ্গেই আর একটি বৌদ্ধ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এই চন্দ্র-বংশীয় নৃপতিরাও সকলেই

ছিলেন বৌদ্ধ, পরমসৌগত। পাল-রাজাদের মত ইঁহাদেরও শাসনাবলীতে যুগল মৃগমূর্তি এবং ধর্মচক্র-লাঞ্ছন উৎকীর্ণ। এই বংশের অন্যতম রাজা শ্রীচন্দ্রের পট্টোলী তিনটির প্রত্যেকটিতেই প্রথম শ্লোকেই বুদ্ধ-বন্দনা : "করুণার একমাত্র আধার, বন্দনার্হ সেই ভগবান জিন (বুদ্ধ) এবং জগতের একমাত্র দীপসদৃশ তাঁহার ধর্ম (উভয়েই) জয়লাভ করুন। সকল মহানুভব ভিক্ষুসংঘই বুদ্ধ ও ধর্মের সেবা করিয়া সংসার (সাগর) পারে উপস্থিত হন।" এই শতকেরই কাম্বোজান্বয় গৌড়পতিরাও ছিলেন পরম সৌগত এবং ইঁহাদেরও রাজকীয় পট্টে মৃগমূর্তিলাঞ্ছিত ধর্মচক্র। বস্তুত, অষ্টম হইতে একাদশ শতক পর্যন্ত বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের জয়জয়কার এবং তাহার প্রভাব শুধু বাঙলা-বিহারেই সীমাবদ্ধ নয়; সমসাময়িক বৌদ্ধ ধর্মের আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা এই সব রাজবংশের সক্রিয় পোষকতার ফলেই।

উপরে যে ধ্যান ও বন্দনা শ্লোকগুলি উদ্ধার করা হইয়াছে তাহা হইতে পূর্ণ বিবর্তিত মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের ধ্যান-কল্পনার রূপ কতকটা ধরিতে পারা কঠিন নয়, কিন্তু এই পর্বে বাঙলাদেশে মহাযান ধর্ম ধ্যান-ধারণায় ও আচারানুষ্ঠানে কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি তাহার দৃষ্টি ও মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সে-পরিচয় কতকটা পাওয়া যায় সমসাময়িক বৌদ্ধ রাজাদের সামাজিক ও ধর্মকর্মগত ব্যবহারে, অসংখ্য বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিতে, বজ্রযান-মন্ত্রযান কালচক্রযান-সহজযান প্রভৃতি মতবাদে, সিদ্ধাচার্যদের গানে ও দোহায়, বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থাদিতে।

বৌদ্ধ রাজাদের সামাজিক ব্যবহার

পাল-বংশীয় নরপতিরা অনেকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ্য রাজবংশীয়া রাজকুমারীদের। রাজা কান্তিদেবের পিতা বৌদ্ধ-ধনদত্ত বিবাহ করিয়াছিলেন একটি শৈব রাজকুমারীকে; এই রাজপুত্রী রামায়ণ-মহাভারত পুরাণে ছিলেন পারংগম। পরম সৌগত কান্তিদেবের এই জননী ছিলেন 'শিবপ্রিয়া'। কম্বোজান্বয় গৌড়পতি রাজপালের প্রথম পুত্র নারায়ণপাল 'বাসুদেব-পাদাব্জ পূজা-নিরত মানসঃ,' এবং দ্বিতীয় পুত্র নয়পাল এক পুণ্য নবমী তিথিতে স্নানাদিপূর্বক শঙ্কর-ভট্টারকের (মহাদেবের) উদ্দেশ্যে তাঁহার বৌদ্ধ পিতামাতার ও নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য ধর্মচক্রমুদ্রা দ্বারা পট্টীকৃত করিয়া ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। প্রায় অড়াই শত তিন শত বৎসর আগে বৌদ্ধ দেবখড়্গের মহিষী রাণী প্রভাবতী একটি সর্বাণী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরস্পর সম্বন্ধের ইঙ্গিত এই সব দৃষ্টান্তের মধ্যে পাওয়া যাইবে। পাল-রাজারা তো সকলেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য মূর্তি ও মন্দিরের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; রাজা কর্তৃক ভূমিদান সব তো ইঁহাদেরই উদ্দেশ্যে। ধর্মপাল তাঁহার মহাসামন্তাধিপতি

নারায়ণবর্মা প্রতিষ্ঠিত নারায়ণমন্দিরের জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন, নারায়ণপাল শুধু এক সহস্র দেবায়তন প্রতিষ্ঠার দাবিই করেন নাই, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলসপোতের শিবমন্দিরে পূজা, বলি, চরু সত্র প্রভৃতির জন্য এবং মন্দিরের পশুপত-আচার্যপরিষদের শয়নাসন-ভৈষজ্যের জন্য 'ভগবন্তং শিবভট্টারকমুদ্দিশ্য' ভূমিদানও করিয়াছিলেন। বিষুব-সংক্রান্তি উপলক্ষে মহীপাল গঙ্গাস্নান করিয়া এক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। রামপাল রামাবতী নগরীতে শিবের তিনটি মন্দির, একাদশ রুদ্রের একটি দেউল এবং সূর্য, স্কন্দ ও গণপতির তিনটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মদনপালের মহিষী চিত্রমতিকা বেদব্যাস-প্রোক্ত মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইবার দক্ষিণাস্বরূপ রাজাকে দিয়া ব্রাহ্মণ বটেশ্বর শর্মাকে কিছু ভূমিদান করাইয়াছিলেন এবং দানকার্য সমাপন করা হইয়াছিল "বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য'। সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিতে মদনপালকে বলা হইয়াছে 'চণ্ডীচরণসরোজ-প্রসাদ সম্পন্ন বিগ্রহশ্রী"। প্রথম বিগ্রহপাল তাঁহার মন্ত্রী কেদারমিশ্রের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকিয়া অনেকবার শ্রদ্ধা সলিলাপ্লুত হৃদয়ে নতশিরে পবিত্র শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রদেবও ভগবান বুদ্ধ-ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া ধর্মচক্রমুদ্রাদ্বারা পট্টীকৃত করিয়া কোটি-হোম-সম্পাদনকারী শান্তিবারিক শ্রীপীতবাসগুপ্ত শর্মাকে এবং অন্য এক উপলক্ষ্যে অদ্ভুতশান্তি হোমসম্পাদনকারী শান্তিবারিক ব্যাসগঙ্গা-শর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। ধর্মপালের ভ্রাতা বাক্‌পালের মৃত্যুর পর পুত্র জয়পাল যে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা তো ব্রাহ্মণ্যধর্মানুমোদিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বলিয়াই মনে হইতেছে; সেই শ্রাদ্ধে মহাদান লাভ করিয়াছিলেন উমাপতি নামে এক ব্রাহ্মণ। মাতুল মথনের মৃত্যুসংবাদে রামপাল ব্রাহ্মণদের প্রচুর ধনৈশ্বর্য দান করিয়া গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। ধর্মপালকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া গোপালদেব স্বর্গত পিতৃপুরুষদের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই সব ক্রিয়া-কর্মের পশ্চাতে যে ধ্যান-কল্পনার আকাশ বিস্তৃত তাহা তো ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই আকাশ। ধর্মপাল এবং পরবর্তী আর একজন পালরাজ শাস্ত্রশাসন হইতে বিচলিত বর্ণসমূহকে নিজ নিজ ধর্ম ও বর্ণসীমায় প্রতিস্থাপিত করিয়া ব্রাহ্মণ্য-সমাজ সংস্কারেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কাম্বোজবংশীয় রাজ্যপাল ছিলেন সৌগত বা বৌদ্ধ, কিন্তু তাঁহার এক পুত্র নারায়ণপাল ছিলেন বাসুদেবভক্ত এবং আর একপুত্র নয়পাল ছিলেন শৈব।

অথচ, পাল, চন্দ্র ও কাম্বোজ-বংশীয় নরপতিরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একাগ্রচিত্তে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের সেবায় ও প্রভাব বিস্তারে যে পরম প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম ও ধ্যানধারণাকে যেভাবে দিগ্বিদিকে প্রসারিত করিয়াছিলেন তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল। ধর্মপালের সময়ে তাঁহারই চেষ্টায় প্রাচীন নালন্দা-মহাবিহারের নূতনতর সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছিল। সোমপুর-মহাবিহারের প্রতিষ্ঠা তাঁহারই সক্রিয় আনুকূল্যে এবং এই মহা-

বিহারের নামই ছিল শ্রীধর্মপালদেব-মহাবিহার। ধর্মপালেরই আনুকূল্যে ত্রৈকূটক-বিহারের নিভৃতকক্ষে বসিয়া আচার্য হরিভদ্র তাঁহার অভিসময়ালংকারের সুপ্রসিদ্ধ টীকা রচনা করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের কেলুরক-লিপিতে জানা যায়, শৈলেন্দ্ররাজ শ্রীসংগ্রাম-ধনঞ্জয়ের গুরু ছিলেন গৌড়ীয় কুমার ঘোষ। এই "গৌড়ীদ্বীপগুরু' ৭৭৮ খ্রীষ্ট শতকে একটি মঞ্জুশ্রী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; ধর্মপাল বোধ হয় তখনও গৌড়েশ্বর। অষ্টম শতকের দ্বিতীয় পাদে শৈলেন্দ্রবংশসম্ভূত বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে পাল-সম্রাট দেবপাল ঐ বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। নগরাহারের অধিবাসী ব্রাহ্মণ ইন্দ্রদেবের পুত্র বীরদেব বেদাদি শাস্ত্র পাঠ শেষ করিয়া বৌদ্ধমতের অনুরাগী হইয়া প্রথম কনিষ্ক-বিহারে গমন করেন এবং আচার্য সর্বজ্ঞশান্তির নিকট শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া পরে বুদ্ধগয়ার যশোধর্মপুর বিহারে আসেন। সেইখানে তিনি দেবপালের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মাননা লাভ করেন। দেবপাল তাঁহাকে নালন্দার অন্যতম আচার্যরূপেও নিয়োগ করিয়াছিলেন। বোধ হয় দেবপালের রাজত্বকালেই (৮৫১ খ্রী) গোমিন্ অবিঘ্নাকর নামে গৌড়ের একজন বৌদ্ধ শিলাহার-রাজ কপর্দিনের রাজত্বে কঙ্কনদেশে গিয়া সেখানে কৃষ্ণগিরি-মহাবিহারের ভিক্ষুদের জন্য একটি বিরাট উপাসনাগৃহ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং ভিক্ষুদের চীবর সংস্থানের জন্য একশত দ্রক্ষ দান করিয়াছিলেন। মহীপাল ও জয়পালের কালে বিক্রমশীল ও সোমপুর-মহাবিহার ভারতবর্ষে ও ভারতের বাহিরে জ্ঞানমর্যাদায় বৌদ্ধ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। কাশ্মীর, তিব্বত ও ভারতের অন্যান্য স্থানের বৌদ্ধ শ্রমণ ও অন্যান্য জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরা এই সময়ই এই দুই মহাবিহারে বসিয়া বহু গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অতীশ-দীপঙ্কর, রত্নাকর শান্তি প্রভৃতি আচার্যদের আবির্ভাবও এই সময়েই। ১০২৬ খ্রীষ্ট শতকে পো-সি বা কো-লিন-নৈ নামে জনৈক বাঙালী শ্রমণ অনেক সংস্কৃত পুঁথি লইয়া গিয়াছিলেন চীনদেশে। বরেন্দ্রীর জগদ্দল মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা বোধ হয় ছিলেন রামপাল নিজের।

বস্তুত, এই পর্বের বৌদ্ধধর্মের এবং বৌদ্ধজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বহুখ্যাত বৌদ্ধ মহাবিহারগুলি। এই বিহারগুলির বিস্তৃত সংবাদ তিব্বতী সাহিত্যে এবং কিছু কিছু তথ্য সমসাময়িক লিপিতে বিধৃত। তিব্বতী ঐতিহ্যে বিক্রমশীল-মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা ধর্মপাল। মগধের উত্তরে গঙ্গার তীরবর্তী এবং সীমাপ্রাচীরবদ্ধ এই বিহারে ১০৮টি মন্দির ছিল, ছয়টি ছিল বিদ্যায়তন এবং ১১৪ ছিলেন জ্ঞান ও বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রের আচার্য। তিব্বত হইতে অগণিত বৌদ্ধ জ্ঞানপিপাসুরা আসিতেন এই মহাবিহারে। এখানে যত সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ রচিত হইয়াছিল তাহার তালিকা সুদীর্ঘ। ধর্মপালের অন্য একটি নামই ছিল শ্রীবিক্রমশীলদেব এবং এই নাম হইতে বিহারটির

নামকরণ হইয়াছিল শ্রীমদ্ বিক্রমশীলদেব-মহাবিহার। তিব্বতী ঐতিহ্যে ওদন্তপুরী-বিহারও ধর্মপালেরই সৃষ্টি, যদিও তা নাথ বলেন, এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেবপাল। এই বিহার ছিল নালন্দার সন্নিকটেই, বর্তমান বিহার-শরিফের অনতিদূরে।

সোমপুর (পাহাড়পুর) মহাবিহারের কথা তো আগেই বলিয়াছি। মহাপণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র (অন্য দুই নাম, ভিক্ষু আরণ্যক এবং কালম্বলপাদ) এই বিহারেই বাস করিতেন। তাঁহার অনেক গ্রন্থ তিব্বতীতে অনূদিত হইয়াছিল; একটি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন (১০০১ খ্রী) অদ্বয়বজ্র বা অতুল্যপাদ। আচার্য অতীশ-দীপঙ্করও কিছুকাল এই বিহারে বাস করিয়াছিলেন এবং ভাববিবেকের মধ্যমকরত্নপ্রদীপ নামে একটি গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। সমতটবাসী এবং এই বিহারের আবাসিক, মহাযানী এবং বিনয়পারংগম. বীর্যেন্দ্র নামে জনৈক বৃদ্ধ স্থবির খ্রীষ্ট দশম শতকে বুদ্ধগয়ায় একটি সুবৃহৎ বুদ্ধ-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সোমপুর-মহাবিহারের পরিণতির কিছু উল্লেখ একটি লিপিতে আছে! একাদশ শতকের শেষপাদ বা দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে উৎকীর্ণ, নালন্দায় প্রাপ্ত, 'বিপুল-বিমল-কীর্তি, সজ্জন-আনন্দকন্দ' বৌদ্ধযতি বিপুলশ্রীমিত্রের একটি প্রশস্তিলিপি হইতে জানা যায়, বিপুলশ্রীমিত্রের পরম গুরুর গুরু করুণাশ্রীমিত্র নামক আচার্য সোমপুর-বিহারে বাস করিতেন, বঙ্গাল-সৈন্যরা আসিয়া সোমপুর অগ্নিদগ্ধ করে এবং সেই আগুনে করুণাশ্রীমিত্র জীবন্ত দগ্ধ হইয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করেন। জগতের অষ্টমহাভয় নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে বিপুলশ্রীমিত্র সোমপুরে এক তারা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং অগ্নিদাহে বিনষ্ট মহাবিহারের সংস্কার সাধন করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি সোমপুরের বুদ্ধমূর্তির জন্য বিচিত্র হেমাভরণ দান করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল সোমপুরীতে বশীর মত বাস করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ বিহার-মহাবিহার

তারনাথের মতে ধর্মপাল ৫০টি ধর্মবিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্যে এই পর্বের বাঙলাদেশে আরও অনেকগুলি বৌদ্ধবিহারের সংবাদ জানা যায়। ত্রৈকূটক-বিহার, দেবীকোট-বিহার, পণ্ডিত-বিহার, সন্নগর-বিহার, ফুল্লহরি বিহার, পট্টিকেরক-বিহার, বিক্রমপুরী-বিহার ও জগদ্দল-মহাবিহার প্রভৃতির সম্বন্ধে সংবাদ তিব্বতী প্রাচীন সাহিত্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। ত্রৈকূটক-বিহার বোধ হয় ছিল পশ্চিমবঙ্গে, রাঢ়া দেশের ত্রৈকূটক-দেবালয়ের সন্নিকটেই। দেবীকোট-বিহার নিশ্চয়ই ছিল উত্তর-বঙ্গে, দিনাজপুর জেলার বানগড়ের অদূরবর্তী। আচার্য অদ্বয়বজ্র. উধিলিপা, ভিক্ষুণী মেখলা প্রভৃতি এই বিহারেই বাস করিতেন। পণ্ডিত-বিহার ছিল চট্টগ্রামে। ফুল্লহরি-বিহার ছিল বোধ হয় বিহারে; এই বিহারে অনেক বৌদ্ধ আচার্য বাস করিতেন, এবং তিব্বতী পণ্ডিতদের সঙ্গে একযোগে তাঁহারা অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ রচনা করিয়া-

ছিলেন। পট্টিকেরক ও সন্নগর মহাবিহার দুইই ছিল পূর্ববঙ্গে এবং বোধ হয় উভয়ই ত্রিপুরা জেলায়। ময়নামতী পাহাড়ের উপর পট্টিকেরক-বিহারের ধ্বংসাবশেষ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজা হরিকালদেব রণবঙ্কমল্লের (১২২০ খ্রীষ্ট শতক) লিপিতে দুর্গোত্তারাব নামে উৎসর্গীকৃত যে-বিহারের উল্লেখ আছে তাহারও অবস্থান ছিল পট্টিকেরক নগরীতে। বনরত্ন নামে জনৈক বৌদ্ধ আচার্য বাস করিতেন সন্নগর-বিহারে এবং সেইখানে বসিয়া তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরী-বিহার তো বিক্রমপুরেই ছিল, এই বিহারে বসিয়া অবধূতাচার্য কুমারচন্দ্র একটি তান্ত্রিক টীকা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রভূতির কন্যা লীলাবজ্র ও তিব্বতী শ্রমণ পুণ্যধ্বজ ঐ টীকা তিব্বতীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। জগদ্দল-মহাবিহারের কথা আগেও বলিয়াছি। এই মহাবিহার ছিল উত্তর-বঙ্গের বরেন্দ্রীতে এবং বিহারের অধিষ্ঠাতা দেবতা ছিলেন অবলোকিতেশ্বর, অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন মহত্তারা। এই বিহারের কক্ষে কক্ষে বসিয়াই বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, শুভাকর গুপ্ত, মোক্ষাকর গুপ্ত ধর্মাকর প্রভৃতি আচার্যরা বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন

এই সব প্রসিদ্ধ মহাবিহার ছাড়া আরও কয়েকটি ছোট ছোট বিহার বাঙলা ও বিহারের ইতস্তত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিব্বতী গ্রন্থাদি এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হইতে এই জাতীয় দু'চারিটি বিহারের নামও জানা যায়। পাহাড়পুরের ২৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দীপগঞ্জে হলুদ-বিহার নামে একটি স্তূপ এখনও বর্তমান। পট্টিকেরক নগরীতে আর একটি বিহারের নাম ছিল কনকস্তূপ-বিহার, এই বিহারে আচার্য বিনয়শ্রীমিত্র এবং আরও কয়েকজন কাশ্মীরী ভিক্ষু বাস করিতেন। ইঁহাদেরই অনুরোধে সিদ্ধাচার্য নাড়পাদ বজ্রপাদ-সারসংগ্রহ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। নাড়পাদের গুরু ছিলেন প্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য তৈলপাদ, তিনি বাস করিতেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের পণ্ডিত-বিহারে। এই বিহার ছিল বৌদ্ধ তান্ত্রিক জ্ঞান ও সাধনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। বগুড়ার নিকটে শীলবর্ষে একটি বিহারের এবং নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের নিকটে সুবর্ণ-বিহারের ধ্বংসাবশেষও হয়তো এই পর্বেরই বৌদ্ধ সাধনার অন্য দুইটি কেন্দ্রের স্মৃতি বহন করে। বালাণ্ডা নামক স্থানে অনুলিখিত একটি অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগারে এখনও রক্ষিত; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বালাণ্ডায় একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। আচার্য প্রজ্ঞাবর্মা ও তাঁহার গুরু বোধিবর্মা তিব্বতী ঐতিহ্যে কাপট্য-নিবাসী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; ইঁহাদের রচিত কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিতও হইয়াছিল। এই 'কাপট্য' কি কোনো বৌদ্ধ বিহারের নাম?

এই সব মহাবিহারে বসিয়া অগণিত খ্যাত ও বিস্মৃতনামা আচার্যরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে অক্লান্ত-জ্ঞান সাধনা করিয়াছিলেন, অসংখ্য যে-সব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার কিছু আভাস পরবর্তী এক অধ্যায়ে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু

ধর্মের যে-সাধনা ছিল এই জ্ঞান-সাধনার আশ্রয় তাহার স্বরূপের পরিচয় পাল-চন্দ্র-কম্বোজ লিপিমালায় ধরিতে পারা যায় না ; তাহা বিধৃত হইয়া আছে সদ্যোক্ত গ্রন্থরাজির মধ্যে এবং এই পর্বের অসংখ্য নয়নাভিরাম প্রস্তর ও ধাতব দেবদেবী-মূর্তির অবহেলিত আয়তনে। এই সব গ্রন্থের সংস্কৃত মূল কমই পাওয়া গিয়াছে ; অধিকাংশই তিব্বতী অনুবাদ। কিছুই বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিবার কথা নয় ; তিব্বতী পণ্ডিতেরা ও ভারতীয় গুরুরা যে-সব গ্রন্থের অনুলিপি ও অনুবাদ তিব্বত, কাশ্মীর, নেপাল, চীন প্রভৃতি দেশে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং মুসলমান অভিযাত্রীদের আগমনে ও বিহারগুলি ধ্বংস হইবার অব্যবহিত আগে যে অল্পসংখ্যক ভিক্ষু আপনাপন স্কন্ধে ঝুলাইয়া যে ক'টি পুঁথি ঝুলিতে ভরিয়া নেপালে, তিব্বতে, চীনে, কাশ্মীরে, আসামে, ব্রহ্মদেশে পলাইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন তাহারই কিছু কিছু অংশ শতাব্দী অতিক্রম করিয়া আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই সব গ্রন্থলব্ধ জ্ঞান আজও খুব সুস্পষ্ট নয়। মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের যে বৈপ্লবিক বিবর্তন এবং বিভিন্ন ধারায় তাহার যে বিস্তার এই গ্রন্থরাজির মধ্যে অনুসরণ করা যায় তাহা লইয়া সাম্প্রতিক কালে আলোচনা-গবেষণা কিছু কিছু হইয়াছে এবং প্রধানত ভারতীয় পণ্ডিতেরাই তাহা করিয়াছেন। এই আলোচনা-গবেষণার সার-সংগ্রহ ছাড়া এখানে আর কিছু করা সম্ভব নয়।

মহাযানের বিবর্তন

সম্মতীয়বাদ, সর্বাস্তিবাদ, মহাসাংঘিকবাদ প্রভৃতি লইয়া যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রসার সপ্তম শতকীয় বাঙলায় য়ুয়ান-চোয়াঙ্, ইৎ-সিঙ প্রভৃতি চীনা শ্রমণেরা দেখিয়া গিয়াছিলেন, কিংবা এই পর্বের লিপিমালার পূর্বোদ্ধৃত ধ্যান ও বন্দনা শ্লোকে যে মহাযানাদর্শের পরিচয় আমরা পাই তাহার সঙ্গে অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতক এই চারি শত বৎসরের বাঙলার বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণ ও শিথিল। অষ্টম ও নবম শতকে মহাযান বৌদ্ধধর্মে নূতনতর তান্ত্রিক ধ্যান-কল্পনার স্পর্শ লাগিয়াছিল এবং তাহার ফলে দশম শতক হইতেই বৌদ্ধ ধর্মে গুহ্য সাধনতত্ত্ব, নীতিপদ্ধতি ও পূজাচারের প্রসার দেখা দিয়াছিল। এই গুহ্য সাধনার ধ্যান-কল্পনা কোথা হইতে কি করিয়া মহাযান-দেহে প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তর ঘটাইল এবং বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি করিল, বলা কঠিন। মহাযানের মধ্যে তাহার বীজ সুপ্ত ছিল কিনা তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে আচার্য অসঙ্গ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, পর্বত-কান্তারবাসী সুবৃহৎ কৌম-সমাজকে বৌদ্ধধর্মের সীমার মধ্যে আকর্ষণ করিবার জন্য ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, যোগিনী, ডাকিনী, পিশাচ ও মাতৃকাতন্ত্রের নানা দেবী প্রভৃতিকে অসঙ্গ মহাযান-দেবায়তনে স্থান দান করিয়াছিলেন। নানা গুহ্য মন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী (গূঢ়ার্থক অক্ষর) প্রভৃতিও প্রবেশ করিয়াছিল মহাযান ধ্যান-কল্পনায়, পূজাচারে, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে, এবং তাহাও অসঙ্গেরই অনুমোদনে। এই ঐতিহ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য, বলা কঠিন। তবে, বলা

বাহুল্য, এই সব গুহ্য, রহস্যময়, গূঢ়ার্থক মন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী বীজ, মণ্ডল প্রভৃতি সমস্তই আদিম কৌমসমাজের যাদুশক্তিতে বিশ্বাস হইতেই উদ্ভূত। সহজ সমাজতাত্ত্বিক যুক্তিতেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম উভয়েরই ভাব-কল্পনায় ও ধর্মগত আচারানুষ্ঠানে ইহাদের প্রবেশ লাভ কিছু অস্বাভাবিক নয়। উভয়কেই নিজ নিজ প্রভাবের সীমা বিস্তৃত করিবার চেষ্টায় আদিম কৌম-সমাজের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহা ছাড়া উভয় ধর্ম সম্প্রদায়েরই নিম্নতর স্তরগুলিতে যে সুবৃহৎ মানবগোষ্ঠী ক্রমশ আসিয়া ভিড় করিতেছিল তাঁহারা তো ক্রমহ্রস্বায়মান আদিবাসী সমাজেরই জনসাধারণ। তাঁহারা তো নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস, ধ্যান ধারণা, দেবদেবী লইয়াই বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আসিয়া আশ্রয় লইতেছিলেন। অন্যদিকে, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও চেষ্টা ছিল নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা ও ভাব কল্পনা অনুযায়ী, নিজ নিজ শক্তি ও প্রয়োজনানুযায়ী সদ্যোক্ত আদিম ধর্মবিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, দেবদেবী ইত্যাদির রূপ ও মর্ম কিছু রাখিয়া কিছু ছাড়িয়া, শোধিত ও রূপান্তরিত করিয়া লওয়া। অসঙ্গের সময় হইতেই হয়তো বৌদ্ধধর্মে এই রূপান্তরের সূচনা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাহা হউক বা না হউক, সন্দেহ নাই যে, বাঙলা-বিহারের, এক কথায় পূর্ব-ভারতের বৌদ্ধ ধর্মে এই ধরনের রূপান্তরের একটা গতি অষ্টম-নবম শতকেই ধরা পড়িয়াছিল। ইহার মূলে ঐতিহাসিক একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ নিশ্চয়ই ছিল; সে-কারণ এখনও আমরা খুঁজিয়া পাই নাই, এই মাত্র। তবু এই পর্বের বাঙলা বিহারে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্মেরই এই বিরাট বিবর্তনের (যাহাকে সাধারণ কথায় তান্ত্রিক বিবর্তন বলা চলে) কারণ সম্বন্ধে একটু অনুমান বোধ হয় করা চলে।

খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতকের মাঝামাঝি হইতেই হিমালয়ক্রোড়স্থিত পার্বত্য-কান্তারময় দেশগুলির সঙ্গে গাঙ্গেয় প্রদেশের প্রথম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, ভোটান প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে মধ্য ও পূর্ব-ভারতের আদান-প্রদান বাড়িয়া যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় দৌত্যবিনিময়, সমরাভিযান প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া এই সব পার্বত্য দেশের আদিম সংস্কার ও সংস্কৃতির স্রোত বাঙলা-বিহারে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। তাহার কিছু কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণও বিদ্যমান। সপ্তম শতকের পূর্ব-বাঙলার খড়্গ-রাজবংশ বোধ হয় এই স্রোতেরই দান। ধর্মপাল ও দেবপালের কালে এই যোগাযোগ আরও বাড়িয়াই গিয়াছিল। পরবর্তীকালে আমরা যাহাকে বলিয়াছি তান্ত্রিক ধর্ম তাহার একটা দিক এই যোগাযোগের ফল হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক হয়তো নয়। তন্ত্রধর্মের প্রসারের ভৌগোলিক লীলাক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে এ-অনুমান একেবারে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।

মন্ত্রযান

যাহাই হোক, এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ, যোগাচার ও মধ্যমিক বাদ প্রভৃতি প্রাচীনতর মহাযানী ধ্যান ও চিন্তা একেবারে বিদায় না লইলেও স্বল্পসংখ্যক

পণ্ডিতদের চর্চার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল ; সর্বাস্তিবাদ বা মহাসাংঘিক-বাদের বিনয় শাসনের স্থান ও সুযোগ দীক্ষা-গ্রহণের সময় ছাড়া আর কোথাও ছিল না। বৌদ্ধ জনসাধারণ শূন্যবাদ বা বিজ্ঞানবাদ, যোগাচার বা মধ্যমিকবাদের গভীর পরমার্থিক তত্ত্ব ও সাধনমার্গের বিচিত্র স্তরের কিছুই বুঝিত না বুঝিতে পারা সহজও ছিল না। তাঁহাদের কাছে যাদুশক্তিমূল মন্ত্র ও মণ্ডল, ধরণী ও বীজ অনেক বেশি সত্য ও সহজ বলিয়া ধরা দিল এবং ক্রমবর্ধমান ধর্ম-সমাজের জন্য এক শ্রেণীর বৌদ্ধ আচার্যরা মহাযানের নূতন ধ্যান-কল্পনা গড়িয়া তুলিবার দিকে মনোনিবেশ করিলেন। মন্ত্রই হইল তাঁহাদের মূল প্রেরণা এবং মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ধারণী ও বীজ। ইঁহাদের রচিত নয়ই মন্ত্র-নয়, ইঁহাদের প্রদর্শিত যান বা পথই মন্ত্র-যান। এই মন্ত্রযানই মহাযানের বিবর্তনের প্রথম স্তর।

বজ্রযান

দ্বিতীয় স্তরে বজ্রযান। বজ্রযানের ধ্যান-কল্পনা গভীর ও জটিল। বজ্রযানীদের মতে নির্বাণের পর তিন অবস্থা : শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ। শূন্যতত্ত্বের সৃষ্টিকর্তা নাগার্জুন ; তাঁহার মতে দুঃখ, কর্ম, কর্মফল, সংসার সমস্তই শূন্য, শূন্যতার এই পরম জ্ঞানই নির্বাণ। বজ্রযানীরা এই নির্বিকল্প জ্ঞানের নামকরণ করিলেন নিরাত্মা ; বলিলেন, জীবের আত্মা নির্বাণ লাভ করিলে এই নিরাত্মাতেই বিলীন হয়। নিরাত্মা কল্পিতা হইলেন দেবীরূপে, এবং বলা হইল, বোধিচিত্ত যখন নিরাত্মার আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া নিরাত্মাতেই বিলীন হন তখনই উৎপত্তি হয় মহাসুখের। বোধিচিত্তের অর্থ হইতেছে চিত্তের এক বিশেষ বৃত্তি বা অবস্থা যাহাতে সম্যক জ্ঞান বা বোধিলাভের সংকল্প বর্তমান। বজ্রযানীরা বলেন, মৈথুনযোগে চিত্তের যে পরম আনন্দময় ভাব, যে এককেন্দ্রিক ধ্যান তাহাই বোধিচিত্ত। এই বোধিচিত্তই বজ্র, কারণ কঠোর যোগসাধনার ফলে ইন্দ্রিয়-শক্তি সম্পূর্ণ দমিত হইয়া চিত্তবজ্রের মত দৃঢ় ও কঠিন হয়। বোধিচিত্তের বজ্রভাব লাভ ঘটিলে তবে বোধিজ্ঞান লাভ হয়। চিত্তের এই বজ্রভাবকে আশ্রয় করিয়া সাধনার যে পথ তাহাই বজ্রযান। ইন্দ্রিয়শক্তিকে, কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণ দমিত করিবার কথা এইমাত্র বলা হইল। বজ্রযানীরা বলেন, ইন্দ্রিয় দমন করিতে হইলে আগে সেগুলিকে জাগরিত করিতে হয় ; মিথুন সেই জাগরণের উপায়। মিথুনজাত আনন্দকে অর্থাৎ বোধিচিত্তকে স্থায়ী করা যায় মন্ত্রশক্তির সাহায্যে এবং সেই অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়শক্তি দমিত হয়। সাধকের সাধনার শক্তিতে মন্ত্র বা ধ্যান অর্থাৎ তাহার ধ্বনি রূপমূর্তি লাভ করে ; এই রূপ-মূর্তিরাই বিভিন্ন দেবদেবী। মিথুনাবস্থার আনন্দোদ্ভূত বিভিন্ন দেবদেবী সাধকের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে নিজ নিজ স্থানে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়া এক একটি মণ্ডল সৃষ্টি করেন। এই মণ্ডলের নিঃশব্দ ধ্যান করিতে করিতেই বোধিচিত্ত স্থায়ী ও স্থির হইয়া

বজ্রের মত কঠিন হয় এবং ক্রমে বোধিজ্ঞান লাভ ঘটে। বলা বাহুল্য, অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই বজ্রযানের এই সমস্ত সাধন-পদ্ধতিটাই অত্যন্ত গুহ্য, এবং যে-ভাষায় ও শব্দে এই পদ্ধতি ব্যাখ্যাত হয় তাহাও গুহ্য। গুরুদীক্ষিত সাধক ছাড়া সে শব্দ ও ভাষার গূঢ়ার্থ আর কেহ বুঝিতে পারেন না, এবং গুরুর নির্দেশ ও উপদেশ ছাড়া আর কাহারও পক্ষে এই সাধন-পদ্ধতি অনুসরণ করাও প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। বজ্রযানে গুরু অপরিহার্য। বজ্রযানে প্রজ্ঞার সার যে বোধিচিত্ত, ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের ভাষায় তাহাই শক্তি।

সহজযান

বজ্রযান গুহ্য সাধনারই সূক্ষ্মতর স্তর সহজযান নামে খ্যাত। বজ্রযানে মন্ত্রের মূর্তিরূপের ছড়াছড়ি, সুতরাং তাহার দেবায়তনও সুপ্রশস্ত; মন্ত্র-মুদ্রা-পূজা-আচার-অনুষ্ঠানে বজ্রযানের সাধনমার্গ আকীর্ণ। সহজযানে দেবদেবীর স্বীকৃতি যেমন নাই, তেমনই নাই মন্ত্র-মুদ্রা-পূজা-আচার-অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি। সহজযানীরা বলেন, কাঠ, মাটি বা পাথরের তৈরি দেবদেবীর কাছে প্রণত হওয়া বৃথা। বাহ্যানুষ্ঠানের কোনো মূল্যই তাঁহাদের কাছে ছিল না। ব্রাহ্মণদের নিন্দা তো তাঁহারা করিতেনই; যে-সব বৌদ্ধ মন্ত্রজপ, পূজার্চনা, কৃচ্ছ্রসাধন, প্রব্রজ্যা ইত্যাদি করিতেন তাঁহাদেরও নিন্দা করিতেন; বলিতেন, সিদ্ধিলাভ, বৌদ্ধত্বলাভ তাঁহাদের ঘটে না। সহজযানী সিদ্ধাচার্যদের ধ্যান-ধারণা ও মতবাদ দোহাকোষের অনেকগুলি দোহায় স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। দুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিতেছি।

কিং তো দীবেঁ কিং তো
কিং তো কিজ্জই মন্তহ্ সেব।
কিং তো তিত্থ তপোবন জাই
মোক্‌খ কি লব্‌ভই পানী হ্নাই॥

কি (হইবে) তোর দীপে, কি (হইবে) তোর নৈবেদ্যে, কি করা হইবে তোর মন্ত্রের সেবায়, কি তোর (হইবে) তীর্থ-তপোবনে যাইয়া! জলে নাহিলেই কি মোক্ষলাভ হয়?

এস জপহোমে মণ্ডল কম্মে
অনুদিন আচ্ছসি বাহিউ ধম্মে।
তো বিনু তরুণি নিরন্তর ণেহে
বোধি কি লব্‌ভই প্রণ বি দেহেঁ॥

এই জপ-হোম-মণ্ডল কর্ম লইয়া অনুদিন বাহ্যধর্মে (লিপ্ত) আছিস্। তোর নিরন্তর স্নেহ বিনা, হে তরুণি, এই দেহে কি বোধিলাভ হয়?

সহজযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গূঢ় সাধন-পদ্ধতি ও ধ্যান-ধারণার সূক্ষ্ম গভীর পরিচয়

দোহাকোষের দোহা এবং চর্যাগীতির গীতগুলিতে বিধৃত হইয়া আছে। সহজযানীরা বলেন, বোধি বা পরমজ্ঞান লাভের খবর অন্য সাধারণ লোকের তো দূরের কথা, বুদ্ধদেবও জানিতেন না—বুদ্ধোঽপি ন তথা বেত্তি যথাহমিমং বো নরঃ। ঐতিহাসিক বা লৌকিক বুদ্ধের স্থানই বা কোথায়? সকলেই তো বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী এবং এই বুদ্ধত্বের অধিষ্ঠান দেহের মধ্যে—দেহস্থিতং বুদ্ধত্ব; দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই। কোথায় কত-দূরে গেল শূন্যতাবাদ, কতদূরে সরিয়া গেল বিজ্ঞানবাদ! জাগিয়া রহিল শুধু দেহবাদ, শুধু কায়সাধন। সহজিয়াদের মতে শূন্যতা হইল প্রকৃতি, করুণা হইল পুরুষ; শূন্যতা ও করুণা, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে, অর্থাৎ নারী ও নরের মিথুন-মিলনযোগে বোধিচিত্তের যে পরমানন্দময় অবস্থার সৃষ্টি লাভ হয় তাহাই মহাসুখ। এই মহাসুখই ধ্রুবসত্য; এই ধ্রুবসত্যের উপলব্ধি ঘটিলে ইন্দ্রিয়গ্রাম বিলুপ্ত হইয়া যায়, সংসারজ্ঞান তিরোহিত হয়, আত্মপরভেদ লোপ পায়, সংস্কার বিনষ্ট হয়। ইহাই সহজ অবস্থা। রাজা হরিকালদেব রণবঙ্কমল্লের ত্রয়োদশ শতকীয় একটি লিপিতে দেখিয়াছি, জনৈক প্রধান রাজকর্মচারী পট্টিকেরক নগরীতে সহজধর্মকর্মে লিপ্ত ছিলেন।

কালচক্রযান

বজ্রযানেরই অপর আর এক সাধনপন্থার নাম কালচক্রযান। কালচক্রযানীদের মতে শূন্যতা ও কালচক্র এক এবং অভিন্ন। ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ লইয়া অবিরাম প্রবহমান কালস্রোত চক্রাকারে ঘূর্ণমান। এই কালচক্র সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ; এই কালচক্রই আদিবুদ্ধ ও সকল বুদ্ধের জন্মদাতা। কালচক্র প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হইয়া এই জন্মদান কার্যটি সম্পন্ন করেন। কালচক্রযানীদের উদ্দেশ্যই হইতেছে কালচক্রের এই অবিরাম গতিকে নিরস্ত করা অর্থাৎ নিজদেরকে সেই কাল-প্রভাবের উর্ধ্বে উন্নীত করা। কিন্তু কালকে নিরস্ত করা যায় কিরূপে? কালের গতির লক্ষণ হইতেছে একের পর এক কার্যের মালা; কার্যপরম্পরা অর্থাৎ গতির বিবর্তন দেখিয়াই আমরা কালের ধারণায় উপনীত হই। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই কার্যপরম্পরা মূলত প্রাণক্রিয়ার পরম্পরা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই, প্রাণক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই কালকে নিরস্ত করা যায়। কাল-চক্রযানীরা বলেন, যোগসাধনার বলে দেহাভ্যন্তরস্থ নাড়ী ও নাড়ীকেন্দ্রগুলিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই, পঞ্চবায়ুকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই প্রাণক্রিয়া নিরুদ্ধ করা যায়, এবং তাহাতেই কাল নিরস্ত হয়। কাল নিরস্ত করাই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে কালচক্রযানী-দের সাধন-পদ্ধতিতে তিথি, বার, নক্ষত্র, রাশি, যোগ প্রভৃতি একটা বড় স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে ইহা কিছু বিচিত্র নয়। এই জন্যই কালচক্রযানীদের মধ্যে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রচলন ছিল খুব বেশি। তিব্বতী ঐতিহ্যানুসারে কালচক্রযানের উদ্ভব ভারতবর্ষের বাহিরে, সম্ভল নামক কোনো স্থানে। পাল-পর্বের কোনো সময়ে নাকি তাহা

বাঙলাদেশে প্রবেশ লাভ করে। প্রসিদ্ধ কালচক্রযানী অভয়াকরগুপ্ত এই মতবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ছিলেন রামপালের সমসাময়িক।

বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান সকলেরই নির্ভর যোগ-সাধনার উপর। বলা বাহুল্য, ইহাদের সকলেরই মূল যোগাচার ও মাধ্যমিক দর্শনে। এই তিন যান একই ধ্যান-কল্পনা হইতে উদ্ভূত ব্যবহারিক সাধনার ক্ষেত্রে এই তিন যানের মধ্যে পার্থক্যও খুব বেশি ছিল না। ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম সীমারেখা টানা বস্তুতই কঠিন। একই সিদ্ধাচার্য একাধিক যানের উপর পুস্তক রচনা করিয়াছেন, এমন প্রমাণও দুর্লভ নয়। এই তিন যানের উদ্ভব যেখানেই হউক, বাঙলাদেশেই ইহারা লালিত ও বর্ধিত হইয়াছিল; প্রধানত এই ত্রিযানপন্থী বাঙালী সিদ্ধাচার্যরাই এই বিভিন্ন গুহ্য সাধনার গ্রন্থাদি রচনা ও দেবদেবীর ধ্যান-কল্পনা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বস্তুত, এই তিন যানের ইতিহাসই পাল-চন্দ্র-কম্বোজ-পর্বের বাঙলার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস।

যে-যোগের উপর এই তিন যানের নির্ভর সেই যোগ হঠযোগ নামে পরিচিত এবং মানবদেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শারীর-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। শরীরের নাড়ীপ্রবাহ ও তাহাদের ঊর্ধ্বমুখী গতি, বিভিন্ন নাড়ীর সংযোগ কেন্দ্র, তাহাদের উৎপত্তিস্থল, নাড়ীচক্র প্রভৃতি সমস্তই এই শারীর-জ্ঞানের অন্তর্গত। ললনা, রসনা ও অবধূতী এই তিনটিই প্রধান নাড়ীপ্রবাহ; ইহাদের মধ্যে অবধূতীর ঊর্ধ্বমুখী গতি ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত। নাড়ী-প্রবাহের গতিকে সাধক স্বেচ্ছায় চালনা করিতে পারেন এবং সেই চালনার শক্তি অনুযায়ী বোধিচিত্তের জ্ঞান-দৃষ্টি উন্মীলিত ও প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রের যোগ সাধনায় উপরোক্ত ললনা-রসনা-অবধূতীই ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নাতে বিবর্তিত।

পূর্বেই বলিয়াছি, বজ্রযান সাধন-পদ্ধতিতে গুরু অপরিহার্য। কিন্তু গুরুর পক্ষে শিষ্য নির্বাচন এবং তাহাকে যথার্থ সাধনপন্থায় চালনা করিয়া লইয়া যাওয়া খুব সহজ ছিল না। সাধনমার্গের কোন্ পথে শিষ্যের স্বাভাবিক প্রবণতা গভীর বিচার করিয়া তাহা স্থির করিতে হইত। এই বিচার-বিশ্লেষণের অভিনব একটি পদ্ধতি তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন; এই পদ্ধতির নাম ছিল কুলনির্ণয়-পদ্ধতি। ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী, এই পাঁচ রকমের কুল। এই পাঁচটি কুল প্রজ্ঞার পাঁচটি রূপ। যে পঞ্চ স্কন্ধ বা পঞ্চবায়ুর সারোত্তম দ্বারা এই ভৌতিক মানবদেহ গঠিত, ব্যক্তি বিশেষের দেহে তাহাদের মধ্যে যে স্কন্ধটি অধিকতর সক্রিয়, সেই অনুযায়ী তাহার কুল নির্ণীত হয়, এবং তদনুযায়ী সাধনপন্থাও স্থিরীকৃত হয়। বৈষ্ণব পদকর্তা ও সাধক চণ্ডীদাসের রজকী বা রজকিনী বজ্রযান-সহজযান মতে চণ্ডীদাসের কুলেরই সূচক, আর কিছুর নহে।

বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যকুল

মহাযান ধর্মের যে বিরাট বিবর্তনের কথা এতক্ষণ বলিলাম এই বিবর্তনের নেতৃত্ব যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সমসাময়িক বৌদ্ধ ঐতিহ্যে তাঁহাদের বলা হইয়াছে সিদ্ধ বা সিদ্ধাচার্য। চৌরাশি জন সিদ্ধাচার্যের সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা বলা কঠিন, তবে ইঁহাদের অনেকেই যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং নবম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ইঁহারা জীবিত ছিলেন সে-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই। অনেকে অনেক গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাদের তিব্বতী অনুবাদ আজও বিদ্যমান। ইঁহাদের মধ্যে সরহপাদ বা সরহবজ্র, নাগার্জুন, লুইপাদ, তিল্লোপাদ, নাড়োপাদ, শবরপাদ, অদ্বয়বজ্র, কাহ্নপাদ, ভুসুকু, কুক্কুরিপাদ প্রভৃতি সিদ্ধাচার্যেরাই প্রধান। বৌদ্ধ ঐতিহ্যানুযায়ী সরহের বাড়ি ছিল পূর্ব-ভারতের রাজ্ঞী-সহরে ; তিনি ছিলেন ধর্মপালের সমসাময়িক। উড্ডিয়ানে তাঁহার তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা, এবং আচার্যের পদ অধিকার করিয়াছিলেন নালন্দা-মহাবিহারে। নাগার্জুন ছিলেন সরহপাদের শিষ্য এবং নালন্দায় তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল। তিল্লোপাদের বা তৈলিকপাদের বাড়ি ছিল চট্টগ্রামে, তাঁহার বংশ ব্রাহ্মণ বংশ ; তিনি ছিলেন মহীপালের সমসাময়িক এবং পণ্ডিত-বিহারের অধিবাসী। নাড়োপাদ জয়পালের সমসাময়িক ছিলেন, বাড়ি ছিল বরেন্দ্রীতে, এবং প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জেতারির তিনি শিষ্য ছিলেন। নাড়োপাদ প্রথমে ছিলেন ফুল্লহরি-বিহারে ; পরে বিক্রমশীল বিহারের অধিবাসী হন। ভুসুকুর বাড়ি ছিল বিক্রমপুরে এবং তিনি ছিলেন অতীশ-দীপঙ্করের শিষ্য। লুইপাদও বোধ হয় বাঙালী ছিলেন, যদিও পাগ-সাম-জোন-জাং-গ্রন্থে তাঁহাকে বলা হইয়াছে 'উড্ডিয়ান-বিনির্গত'। অবধূতপাদ অদ্বয়বজ্র সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। কুক্কুরিপাদ ছিলেন বাঙলার এক ব্রাহ্মণ-পরিবার হইতে উদ্ভূত, পরে বৌদ্ধতন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ডাকিনীদের দেশ হইতে মহাযানতন্ত্র উদ্ধার করিয়া আনেন। শবরপাদ ছিলেন সরহপাদের শিষ্য, সিদ্ধপূর্বজীবনে তিনি ছিলেন বঙ্গাল-দেশের পার্বত্যভূমির একজন শবর। ত্যাঙ্গুরে অবশ্য শবরীপাদের বাড়ি যেন ইঙ্গিত করা হইয়াছে মগধে। এই সব সিদ্ধাচার্যদের এবং আরও অনেক বজ্রযান-সহজযান-কালচক্রযানপন্থী পণ্ডিতদের বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে ; এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

পরিণতি

বজ্রযান ও কালচক্রযানে ব্যবহারিক ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্ষীণ হইলেও শ্রাবকযান ও মহাযান বৌদ্ধধর্মের কিছু আভাস তবু বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ক্রমশ এই ধর্মের ব্যবহারিক অনুষ্ঠান কমিয়া আসিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে গুহ্য সাধনা বাড়িতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে গুহ্য সাধনাটাই প্রবল ও প্রধান হইয়া দেখা দিল। তাহার উপর, সহজযান আবার

লৌকিক বা লোকোত্তর কোনো বুদ্ধকেই স্বীকার করিল না ; প্রব্রজা, বিনয়-শাসন, বজ্রযানের দেবদেবী প্রভৃতি সমস্ত কিছুই হইল নিন্দিত ও পরিত্যক্ত। রহিল শুধু কায়সাধন এবং দেহাশ্রয়ী হঠযোগ। বাঙলার ব্রাহ্মণ্য শক্তি-ধর্মেও অনুরূপ এক বিবর্তন ঘটিতেছিল, এবং সেখানেও ক্রমশ'শক্তিধর্মের বাহ্য আচারানুষ্ঠান পরিত্যক্ত হইয়া সূক্ষ্ম মিথুনযোগের গুহ্য সাধনাপন্থাই প্রধান হইয়া উঠিল। উভয় ক্ষেত্রেই অবস্থাটা যখন এক তখন বৌদ্ধ মহাসুখবাদ ও গুহ্য সাধনপন্থার সঙ্গে শক্তি বা ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক মোক্ষ ও গুহ্য সাধনপন্থার পার্থক্য আর বিশেষ কিছু রহিল না, দু'য়ের মিলনও খুব সহজ হইয়া উঠিল। এই মিলন পাল-পর্বের শেষের দিকেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং চতুর্দশ শতক নাগাদ পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম একেবারে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শক্তিধর্মের কুক্ষিগত হইয়া গেল।

কৌলমার্গ

তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ও শক্তি ধর্ম এবং নব বৌদ্ধ ধর্মের গুহ্য সাধনবাদের একত্র মিলনে শক্তিধর্মের যে সব নূতন রূপ দেখা দিল তাহার মধ্যে কৌলধর্মই প্রধান। কৌলধর্মের কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থ কিছুদিন হইল নেপাল রাজকীয় গ্রন্থসংগ্রহে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কৌলধর্মীরা বলেন, তাঁহাদের ধর্মের মূল সূত্রগুলি গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের শিক্ষা হইতে পাওয়া। মৎস্যেন্দ্রনাথকে অনেকে চৌরাশি সিদ্ধাচার্যের অন্যতম লুইপাদের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কৌলধর্ম নব বৌদ্ধ গুহ্য সাধনবাদ হইতেই উদ্ভূত, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। তাহা ছাড়া পূর্বেই দেখিয়াছি, কুল বৌদ্ধ গুহ্য সাধনপন্থার একটি বিশেষ অঙ্গ ; পঞ্চকুল প্রজ্ঞা বা শক্তির পাঁচটি রূপ ; তাঁহাদের কর্তা হইতেছেন পঞ্চতথাগত। এই কুলতত্ত্ব যাঁহারা মানিয়া চলেন তাঁহারাই কৌল বা কুলপুত্র। কৌলমার্গীদের মতে কুল হইতেছেন শক্তি, কুলের বিপরীত অকুল হইতেছেন শিব, এবং দেহের অভ্যন্তরে যে শক্তি কুণ্ডলাকারে সুপ্ত তিনি হইতেছেন কুল-কুণ্ডলিনী। এই কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া শিবের সঙ্গে পরিপূর্ণ এক করাই কৌলমার্গীর সাধনা।

কৌলমার্গীরা ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম স্বীকার করিতেন। কিন্তু একই গুহ্য সাধনবাদ হইতে উদ্ভূত নাথধর্ম, অবধূত ধর্ম ও সহজিয়া ধর্ম বৌদ্ধ সহজযানীদের মত বর্ণাশ্রমকে একেবারে অস্বীকার করিত। প্রথমোক্ত দুইটি ধর্ম ও সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পাল-পর্বেই জানা যায়, আর সহজিয়া ধর্মের প্রথম সংবাদ পাওয়া যায় ত্রয়োদশ শতকে রাজা হরিকালদেবের একটি লিপিতে ; হরিকালদেবের এক প্রধান রাজপুরুষ পট্টিকেরক নগরে সহজ-ধর্ম-কর্মে লিপ্ত ছিলেন। এই সব ধর্ম ও সম্প্রদায় কখন কি ভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল আজ তাহা বলা কঠিন ; সূচনায় এই সব মতবাদের মধ্যে পার্থক্যও কিছু ছিল না। তবে মনে

হয়, দ্বাদশ শতকের মধ্যেই নিজস্ব মতামত ধ্যান-ধারণা লইয়া প্রত্যেকটি ধর্ম ও সম্প্রদায় নিজস্ব সীমারেখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল।

নাথধর্ম

নাথধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। তিব্বতীরা মৎস্যেন্দ্রনাথকে লুই বলিয়া মানিতেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ ও লুইপাদ যদি এক এবং অভিন্ন হন তাহা হইলে নাথধর্মও সিদ্ধাচার্যদেরই প্রবর্তিত ধর্মের অন্যতম। নাথধর্মীদের গুরুদের মধ্যে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, জালন্ধরীপাদ প্রভৃতি নাথযোগীরা প্রসিদ্ধ। ত্যাঙ্গুর-গ্রন্থ অনুযায়ী মীননাথ ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথের পিতা। তাঁহার অন্য নাম বজ্রপাদ ও অচিন্ত্য। মৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের একজন ধীবর। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে পাঁচখানি নেপালে পাওয়া গিয়াছে; তাহারই একখানির নাম কৌলজ্ঞাননির্ণয়। এই গ্রন্থের মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধ বা সিদ্ধামৃত সম্প্রদায়ভুক্ত। মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ ছিলেন ময়নামতীর রাজা গোপীচন্দ্রের (বঙ্গাল-দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের ?) সমসাময়িক। গোপীচাঁদ বা গোপীচন্দ্রের মাতা সিদ্ধ গোরক্ষনাথের শিষ্যা মদনাবতী বা ময়নামতীর যোগশক্তি সম্বন্ধে নানা কাহিনী আজও বাঙলাদেশে প্রচলিত। ত্যাঙ্গুরে জালন্ধরীপাদকে বলা হইয়াছে আদিনাথ। এই জালন্ধরীপাদই বোধ হয় রাজা গোপীচাঁদের গুরু হাড়িপা বা হাড়িপাদ. হাড়িপাদ ছিলেন গোরক্ষনাথের শিষ্য। নাথপন্থা যে সূচনায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল এ-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। বস্তুত, কোনো কোনো সিদ্ধাচার্যকে নাথপন্থীরা নিজেদের আচার্য বলিয়া স্বীকার করিতেন। নানাপ্রকার যোগে, বিশেষ ভাবে হঠযোগে, নাথপন্থীদের প্রসিদ্ধি ছিল। মানুষের যত দুঃখ শোক তাহার হেতু এই অপক্ক দেহ; যোগরূপ অগ্নিদ্বারা এই দেহকে পক্ক করিয়া সিদ্ধদেহ বা দিব্যদেহের অধিকারী হইয়া সিদ্ধি বা শিবত্ব বা অমরত্ব লাভ করাই নাথ-পন্থার উদ্দেশ্য। উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গে নাথপন্থীদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট; ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক শক্তিধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে নাথধর্ম ও সম্প্রদায় টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই। ক্রমশ ব্রাহ্মণ-সমাজের নিম্নস্তরে কোনো রকমে তাঁহারা নিজের স্থান করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নাথ-যোগীদের জাত্ হইল 'যুগী' (!); বৃত্তি হইল কাপড় বোনা এবং নাথপন্থার শেষ চিহ্ন বাঁচিয়া রহিল শুধু নামের পদবীতে বা অন্ত্যনামে।

অবধূত মার্গ

অবধূত-মার্গীদের সাধনপন্থাও সিদ্ধাচার্যদের গুহ্য সাধনা হইতে উদ্ভূত। যে তিনটি প্রধান নাড়ীর উপর সিদ্ধাচার্যদের যোগ-সাধন প্রক্রিয়ার নির্ভর, তাহার প্রধানতমটির নাম অবধূতী, এ-কথা আগেই বলিয়াছি। অবধূত-যোগ এই অবধূতী নাড়ীর গতি-প্রকৃতির

সম্যক জ্ঞানের উপর নির্ভর করিত। অবধূত-মার্গীরা সকলেই কঠোর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতেন ; এ-বিষয়েও প্রাচীনতর বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সন্ন্যাসাদর্শের সঙ্গে ইঁহাদের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুদের যে সব ধূতাঙ্গ আচরণ করিবার কথা অবধূতরাও তাহাই করিতেন। এই ধূত বা ধূতাঙ্গ আচরণের জন্যও হয়তো তাঁহাদের নামকরণ হইয়াছিল অবধূত। লোকালয় হইতে দূরে বনের মধ্যে গাছের নীচে তাঁহারা বাস করিতেন, ভিক্ষান্নে জীবন-ধারণ করিতেন, জীর্ণ চীবর পরিধান করিতেন। জৈনদের ধূতাচরণের তালিকাও ঠিক এইরূপ ; দেবদত্ত ও আজীবিক সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাহাই করিতেন। বহু শতাব্দী পর অবধূত-মার্গীরা আবার এই সব ধূতসাধন পুনঃপ্রবর্তিত করেন। তাঁহারা বর্ণাশ্রম স্বীকার করিতেন না, শাস্ত্র, তীর্থ, কিছুই মানিতেন না। কোনো বস্তুতেই তাঁহাদের কোন আসক্তি ছিল না ; উন্মাদের মত ছিল তাঁহাদের আচরণ। প্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য অদ্বয়বজ্রের আর এক নাম ছিল অবধূতী-পাদ ; নিঃসংশয়ে তিনি অবধূত-মার্গী ছিলেন। চৈতন্য-সহচর নিত্যানন্দও ছিলেন অবধূত ; চৈতন্য-ভাগবতে অবধূতদের জীবনাচরণের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে।

সহজিয়া ধর্ম

সহজযানের কথা আগেই বলিয়াছি। বলা বাহুল্য, পরবর্তী বাঙলার সহজিয়া-ধর্ম সিদ্ধাচার্যদের সহজযান হইতেই উদ্ভূত। মধ্যযুগীয় বাঙলার সহজিয়া ধর্মের আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক হইতেছেন বড়ু চণ্ডীদাস। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বৌদ্ধ সহজযানের মূলসূত্রগুলি ধরিতে পারা কঠিন নয়।

বাউল-মার্গ

প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় মনে করেন, বাঙলার বাউলরা নাথধর্মী বা অবধূতমার্গী বা সহজিয়াদের চেয়ে অনেক বেশি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদেব ধ্যান কল্পনা ও সাধনপন্থা বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। বাঙলাদেশে নাথধর্ম বিলুপ্ত, অবধূতবাদও তাই ; আর, বৈষ্ণবধর্ম ও চিন্তার প্রভাবে পড়িয়া সহজিয়াদের ধ্যান-কল্পনা অনেক গিয়াছে বদলাইয়া ; কিন্তু বাউলরা কাহারও প্রভাবে পড়েন নাই ; শাক্ত প্রকৃতি-পুরুষ কল্পনা বা বৈষ্ণব কৃষ্ণ রাধা কল্পনা তাঁহাদের নিকট কোনো অর্থই বহন করে না। অথচ, বজ্রযানী-সহজযানীদের নাড়ী, শক্তি প্রভৃতি বাউল ধর্মে অপরিহার্য। সহজযানীদের মত সহজসুখ বা মহাসুখ ইঁহাদেরও উদ্দেশ্য।

বৌদ্ধ দেবদেবী

বজ্রযানের দেবদেবীর আয়তন বহু বিস্তৃত, এ-কথা আগেই বলিয়াছি। নবম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাঙালী সিদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা যে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন

তাহার স্বল্পমাত্র অংশই আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাঁহারা বহু দেবদেবীর স্তুতি ও অর্চনা করিয়া এই সব গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বজ্রসত্ত্ব, হেবজ্র, হেরুক, মহামায়া, ত্রৈলোক্যবশংকর, নীলাম্বরধর-বজ্রপাণি, যমারি, কৃষ্ণযমারি, জম্ভল, হয়গ্রীব, সম্বর, চক্রসম্বর, চক্রেশ্বরানী, কালি, মহামায়া,- বজ্র-যোগিনী, সিদ্ধবজ্রযোগিনী, কুরুকুল্লা, বজ্রভৈরব, বজ্রধর, হেবজ্রোদ্ভব কুরুকুল্লা, সিতাতপত্রা-অপরাজিতা, উষ্ণীষ-বিজয়া প্রভৃতিরাই প্রধান। উল্লিখিত সকল দেবদেবীর মূর্তিপ্রমাণ যেমন বাঙলাদেশে পাওয়া যায় নাই তেমনই আবার এমন অনেক বজ্রযানী দেবদেবীদের প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে যাঁহাদের উল্লেখ এই সব গ্রন্থে দেখিতেছি না। যাহা হউক যথার্থ বজ্রযানী দেবদেবীদের কথা বলিবার আগে মহাযানী ও সাধারণভাবে বুদ্ধযানী দুই চারিটি মূর্তি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাদের কথা বলিয়া লই।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বের বিহারৈলে (রাজসাহী) প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি এবং মহাস্থানের বলাইধাপ স্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত মঞ্জুশ্রী মূর্তির কথা আগেই বলিয়াছি।

এই পর্বের প্রায় সব বৌদ্ধ-প্রতিমাই মহাযান-বজ্রযান তন্ত্রের, সন্দেহ নাই; তবে সাধারণ বুদ্ধযানী প্রতিমাও কয়েকটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ধরনের প্রতিমার কেন্দ্রে অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া শাক্যসিংহ বা বোধিসত্ত্ব গৌতম বা বুদ্ধ ভূমিস্পর্শ বা ধ্যান বা ধর্মচক্র-প্রবর্তন মুদ্রায় উপবিষ্ট; এবং তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বুদ্ধায়নের (অর্থাৎ বুদ্ধের জীবনের) প্রধান প্রধান কয়েকটি কাহিনীর প্রতিকৃতি রূপায়িত। খুলনা জেলার শিববাটি গ্রামে ভূমিস্পর্শমুদ্রায় উপবিষ্ট একটি বুদ্ধমূর্তি আজো শিবের নামে পূজা পাইতেছেন। ভূমিস্পর্শ-মুদ্রা বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুমের নীচে বজ্রাসনে বসিয়া ধ্যানরত বুদ্ধের উপর মার-সৈন্যের আক্রমণ, বুদ্ধদেব কর্তৃক পৃথিবী মাতাকে সাক্ষীরূপে আহ্বান এবং বোধিলাভের দ্যোতক। বোধিলাভের এই ঘটনাটি ছাড়া মূর্তিটির প্রভাবলীর উপর সিদ্ধার্থ বোধিসত্ত্বের জন্ম, ধর্মচক্রমুদ্রায় ধর্মচক্র-প্রবর্তন, মহাপরিনির্বাণ, রাজগৃহে অভয়-মুদ্রায় নালগিরি বা রত্নপাল নামীয় হস্তীর বশীকরণ, শাংকাস্য নামক স্থানে বরদ-মুদ্রায় ত্রয়স্ত্রিংশ-স্বর্গ হইতে অবতরণ, ব্যাখ্যান-মুদ্রায় শ্রাবস্তীতে অলৌকিক সংঘটন, এবং বৈশালীতে বানর কর্তৃক মধু অর্ঘ্যদান, এই সাতটি ঘটনার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। এই ধরনের বুদ্ধায়ন-স্তবক সম্বলিত প্রতিমা বাংলাদেশে পাওয়া যায় নাই। সদ্যোক্ত কাহিনীগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি কাহিনীর স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন প্রতিকৃতি সম্বলিত বুদ্ধায়নী প্রতিমাও বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রাচীন বাঙলায় এই ধরনের মূর্তির প্রচলন খুব বেশি ছিল বলিয়া মনে হয় না। যতগুলি বুদ্ধমূর্তি বাঙলায় পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে অভয়, ব্যাখ্যান, ভূমিস্পর্শ ও ধর্মচক্র-মুদ্রায় উপবিষ্ট প্রতিমাই বেশি। ফরিদপুর জেলার উজানী গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিত্রশালা) একাদশ শতকীয় একটি ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধপ্রতিমার পাদপীঠে বজ্র ও সপ্তরত্ন উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়; এই দুইটি লক্ষণই যেন গভীর অর্থবহ।

মহাযানী দেবায়তন আদিবুদ্ধ ও তাঁহার শক্তি (?) আদিপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতার ধ্যান-কল্পনায় পর প্রতিষ্ঠিত। বৈরোচন অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ এবং অমোঘসিদ্ধি এই পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধ বা পঞ্চ তথাগত এবং ষষ্ঠ আর একটি দেবতা বজ্রসত্ত্ব এই আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত। ধ্যানীবুদ্ধরা সকলেই যোগরত, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একজন সক্রিয় বোধিসত্ত্ব এবং এক একজন মানুষীবুদ্ধ বিরাজমান। মহাযানীদের মতে বর্তমান কাল ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের কাল; তাঁহার বোধিসত্ত্ব হইতেছেন অবলোকিতেশ্বর লোকনাথ এবং মানুষীবুদ্ধ হইতেছেন বুদ্ধ গৌতম। অবলোকিতেশ্বর ছাড়া মহাযান দেবায়তনে পঞ্চ বোধিসত্ত্বের মধ্যে আরও দুইটি বোধিসত্ত্বের—মঞ্জুশ্রী এবং মৈত্রেয়ের প্রতিপত্তি প্রবল। তাঁহাদের প্রত্যেকের এক একটি শক্তি, এই শক্তিময়ীরা সকলেই তারা নামে খ্যাত এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই দেশকাল-প্রভেদে বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি। বোধিসত্ত্বদের সম্বন্ধেও একই উক্তি প্রযোজ্য, বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন তাঁহাদের নাম।

ধ্যানীবুদ্ধদের দুই একটি মূর্তি বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল বিক্রমপুরে, এখন তাহা রাজসাহী-চিত্রশালায়। ঢাকা জেলার সুখবাসপুর গ্রামে একটি লিপি উৎকীর্ণ দশম-শতকীয় বজ্রধারী বজ্রসত্ত্ব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দুইটি প্রতিমাই উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ধ্যানীবুদ্ধের প্রতিমা খুব সহজলভ্য নয়। আদিবুদ্ধের কোনো প্রতিমাও এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, কিন্তু দুই একটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে যাহাদের আদিপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতার প্রতিমা বলা যাইতে পারে; একটি ঢাকা চিত্রশালায় ও আর একটি রাজসাহী-চিত্রশালায় রক্ষিত। ধর্মশ্রীপাল নামক এক ভিক্ষু বনবাসী (কর্ণাট-দেশ) হইতে উত্তর-বঙ্গে আসিয়া একটি প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এই মূর্তিটি এখন কলিকাতা-চিত্রশালায়।

বাঙলাদেশে যত মহাযানী-বজ্রযানী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে নানা রূপের অবলোকিতেশ্বর লোকনাথের প্রতিমাই সবচেয়ে বেশি। প্রতিমা-প্রমাণ হইতে মনে হয়, বৌদ্ধ বাঙালীর তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রিয় দেবতা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের এবং সূর্যের রূপ ও গুণ লইয়া বৌদ্ধ অবলোকিতেশ্বর-লোকনাথ, এবং তাঁহার বিচিত্র রূপ ও গুণাবলী লইয়া অসংখ্য, বিচিত্র তাঁহার প্রতিমারূপ। কিন্তু বাঙলাদেশে তাঁহার যত রূপ দেখিতেছি তাহার মধ্যে পদ্মপাণি, সিংহনাদ, ষড়ক্ষরী ও খসর্পণ রূপই প্রধান। আসন ও স্থানক দুই রকমের পদ্মপাণি মূর্তিই গোচর। চট্টগ্রামের একটি লিপিযুক্ত ধাতব আসন-পদ্মপাণি প্রতিমা, পাহাড়পুর-মন্দিরের একাধিক প্রতিমা, বোস্টন-চিত্রশালার ললিতাসনোপবিষ্ট একটি প্রতিমা, রাজসাহী-চিত্রশালার তিন-চারিটি প্রতিমা, এবং কলিকাতা-আলিপুরে প্রাপ্ত একটি প্রতিমা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কুষ্ঠব্যাধির আরোগ্যকর্তা সিংহনাদ-লোকেশ্বরের দুইটি মূর্তি আছে রাজসাহী চিত্র-

শালায় ; একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল বীরভূম জেলায়। ঢাকা এবং কলিকাতা চিত্রশালায়ও দুই একটি করিয়া সিংহনাদ-অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমা বিদ্যমান। খসর্পণ-লোকনাথের, আনুমানিক একাদশ শতকীয়, সবচেয়ে সুন্দর একটি প্রতিমা গিয়াছে ঢাকা জেলার মহাকালী গ্রামে। সপ্তরথ পাদপীঠের উপর ললিতাসনোপবিষ্ট সনালপদ্মধৃত সপরিবার এই দেব-প্রতিমাটি পাল-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ঢাকা, ত্রিপুরা ও রাজসাহী অঞ্চল হইতে এই দেবতার আরও কয়েকটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। খসর্পণ-লোকনাথের আদি রূপ কল্পনা না হোক, অন্তত খসর্পণ-লোকনাথ এই নামকরণটি বোধ হয় হইয়াছিল দক্ষিণ-বঙ্গে, চব্বিশ পরগণা জেলার খসর্পণ নামক স্থান হইতে, অথবা এমন হইতে পারে যে, খসর্পণ লোকনাথের পূজার সমধিক প্রচলন এই স্থানে ছিল বলিয়াই স্থানটির নাম হইয়াছিল খসর্পণ। মালদহ জেলার রাণীপুর গ্রামে একটি একাদশ শতকীয় ষড়ক্ষরী-লোকেশ্বরের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এ ধরনের মূর্তি অত্যন্ত বিরল। রাজসাহী-চিত্রশালায় আর একটি বিরলরূপ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি রক্ষিত আছে, মূর্তিতাত্ত্বিকেরা মনে করেন এই রূপটি সুগতিসন্দর্শনরূপী অবলোকিতেশ্বরের। দ্বাদশভুজ লোকনাথ অবলোকিতেশ্বরের আসন ও স্থানক উভয় রূপের প্রতিমার একাধিক দৃষ্টান্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও রাজসাহী চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ঘিয়াসবাদে প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিত্রশালা) একটি প্রতিমা, রাজসাহী-চিত্রশালায় রক্ষিত একটি প্রতিমা এবং ঢাকা জেলার সোনারঙ্গে প্রাপ্ত আর একটি প্রতিমা এই অবলোকিতেশ্বর-প্রসঙ্গে আলোচ্য। ঘিয়াসবাদের মূর্তিটি বিস্তৃত এক সর্পফনাছত্রের নীচে সমপদস্থানক ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান এবং তাঁহার দ্বাদশ হস্তের সাতটিতে গরুড়, মূষিক, লাঙ্গল, শঙ্খ, পুস্তক, বৃষ এবং পাত্র লক্ষণ; ইহাদের প্রত্যেকটিই সনাল নীলোৎপলের উপর স্থাপিত; মূর্তিটির কণ্ঠে জানু পর্যন্ত লম্বিত বৈজয়ন্তী বা বনমালা। অন্য দুইটি হাত বিষ্ণুর আয়ুধপুরুষের মত দুইটি মূর্তির উপর স্থাপিত। রাজসাহী-চিত্রশালার মূর্তিটি প্রায় অবিকল এইরূপ, অধিকন্তু ইহার পাদপীঠে অবলোকিতেশ্বরের অনুচর প্রেত সূচীমুখের মূর্তি উৎকীর্ণ। সোনারঙ্গে প্রাপ্ত মূর্তিটিও একই লক্ষণযুক্ত এবং একই প্রকারের ; এ-ক্ষেত্রে প্রভাবলীর উপরের অংশটি অক্ষত থাকায় সেখানে দেখিতেছি বোধিসত্ত্ব অমিতাভের মূর্তি উৎকীর্ণ। সন্দেহ নাই যে, এই তিনটি প্রতিমাই অবলোকিতেশ্বরের বিশিষ্ট এক রূপ। দিনাজপুর জেলার সাগরদীঘি গ্রামে প্রাপ্ত ছয়হাতযুক্ত একটি মূর্তিও (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চিত্রশালা) তাহাই। সঙ্গে সঙ্গে এ-তথ্যও অনস্বীকার্য যে, এই প্রত্যেকটি মূর্তিতেই ব্রাহ্মণ্য দেবতা বিষ্ণুর ধ্যান-কল্পনাও সক্রিয়; কয়েকটি লক্ষণই স্থানক বিষ্ণুমূর্তির লক্ষণ। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, এই প্রতিমাগুলিতে ভাগবত বিষ্ণুমূর্তির সঙ্গে মহাযানী লোকেশ্বরের ধ্যান কল্পনার একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে।

অবলোকিতেশ্বরের পরই যে-বোধিসত্ত্ব বাঙালীর প্রিয় ছিলেন তিনি ধ্যানীবুদ্ধ

অক্ষোভ্যের অধ্যাত্মপুত্র, জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভার দেবতা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী। মঞ্জুশ্রীরও বিচিত্র রূপ। গর্জমান সিংহের উপর ললিতাসনোপবিষ্ট তাঁহার মঞ্জুবর-রূপের কয়েকটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে; তাহাদের মধ্যে রাজসাহী-চিত্রশালার একটি প্রতিমা অতি সুদর্শন। নাগধৃতপদ্মের উপর বজ্রপর্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট অরপচন-মঞ্জুশ্রীর একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে ঢাকা জেলার জালকুণ্ডি গ্রামে (ঢাকা-চিত্রশালা)। মালদহ জেলায় প্রাপ্ত, অধুনা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-চিত্রশালায় রক্ষিত স্থিরচক্র-মঞ্জুশ্রীর একটি মূর্তিও উল্লেখযোগ্য। যে কোনো রূপের মঞ্জুশ্রী-প্রতিমার প্রধান লক্ষণ হস্তধৃত পুস্তক ও তরবারী। শক্তি ও বৃষ্টির দেবতা বজ্রপাণির মূর্তি বাঙলাদেশে একটিও এ-যাবৎ পাওয়া যায় নাই, ত্রিপুরা জেলার শুভপুরে প্রাপ্ত মাত্র একটি মূর্তি-প্রমাণ ছাড়া। বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের মূর্তি পাওয়া যায় নাই বলিলেই চলে।

মহাযান-বজ্রযানের আরও যে কয়েকটি নিম্নস্তরের দেবতা বাঙলাদেশে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে জম্ভল, হেরুক ও হেবজ্রই প্রধান। জম্ভল ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের সঙ্গে যুক্ত, হেরুক অক্ষোভ্য হইতে উদ্ভূত এবং হেবজ্র স্পষ্টতই তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবতা। জম্ভল ব্রাহ্মণ্য কুবেরের বৌদ্ধ প্রতিরূপ এবং তাঁহার প্রতিমা বাঙলা দেশের, বিশেষত পূর্ব ও উত্তর-বাঙলার, নানা জায়গা হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধন ও ঐশ্বর্যের এই দেবতা যে জনসাধারণের খুব প্রিয় ছিলেন, অসংখ্য মূর্তি-প্রমাণেই তাহা সুস্পষ্ট। জম্ভলের দক্ষিণ হস্তে বীজপূরক, বাম হস্তে ধনরত্ন উদ্‌গীরণরত একটি নকুলের গ্রীবাদেশ। জম্ভলের তুলনায় হেরুকের মূর্তি কিন্তু কমই পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপুরা জেলার বড়কামতায় প্রাপ্ত, মুণ্ডমালা-পরিহিত, বজ্রকপালধৃত, নৃত্যপরায়ণ হেরুক মূর্তিটি সুপরিচিত। উত্তর-বাঙলায় প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিত্রশালা) একটি হেরুক মূর্তির বিচিত্র লক্ষণ হইতে মূর্তি-তাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন, মূর্তিটি সম্বররূপী হেরুক। শক্তির দৃঢ়ালিঙ্গনবদ্ধ হেবজ্রের মূর্তি একাধিক পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি ও মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রাপ্ত আর একটি মূর্তি এই ধরনের হেবজ্রের সুন্দর নিদর্শন। শক্তি-বিরহিত হেবজ্রের একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে। বজ্রযানী কৃষ্ণ-যমারীর একটি প্রতিমা রাজসাহী-চিত্রশালায় (বিক্রমপুরে প্রাপ্ত) রক্ষিত। ত্রিমুখ, চতুর্ভুজ, করালদর্শন ত্রৈলোক্য-বশংকরের অন্তত একটি মূর্তি বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে ঢাকা জেলার পশ্চিমপাড়া গ্রামে (রাজসাহী-চিত্রশালায়)। মূর্তিটি দেখিলে স্বতই মনে হয়, বৌদ্ধ ত্রৈলোক্যবশংকর এবং ব্রাহ্মণ্য ভৈরব একই ধ্যান-কল্পনার সৃষ্টি।

দেবতাদের কথা শেষ হইল; এইবার মহাযান-বজ্রযান আয়তনের দেবীদের কথা বলা যাইতে পারে। এই দেবীদের মধ্যে তারা সর্বশ্রেষ্ঠা। তারার অনেক রূপভেদ; বিভিন্নরূপ বিভিন্ন ধ্যানীবুদ্ধ হইতে উৎপন্ন। বাঙলাদেশে যত প্রকারের তারামূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে খদিরবনী-তারা (খয়ের বনের তারা?) বজ্র-তারা এবং

ভৃকুটীতারাই প্রধান। খদিরবনী-তারার অপর নাম শ্যাম-তারা ; তাঁহার ধ্যানীবুদ্ধ হইতেছেন অমোঘসিদ্ধি ; বজ্র-তারার ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভব এবং ভৃকুটী-তারার, অমিতাভ। অশোককান্তা (মারীচী) ও একজটাসহ খদিরবনী বা শ্যাম-তারার মূর্তিই সবচেয়ে বেশি পাওয়া গিয়াছে। নীলোৎপলধৃতা এই দেবী কখনও উপবিষ্টা, কখনও দণ্ডায়মানা। ঢাকা জেলার সোমপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিত্রশালা) একটি মূর্তি, বগুড়া জেলার গুর্ণী-গ্রামে প্রাপ্ত অপর একটি মূর্তি (রাজশাহী-চিত্রশালা) এবং ঢাকা-চিত্রশালার আরও একটি শ্যামতারা-প্রতিমা এই ধরনের প্রতিমার নিদর্শন। ফরিদপুর জেলার মাঝবাড়ী গ্রামে একটি ধাতব বজ্র-তারার মূর্তি পাওয়া গিয়াছে (ঢাকা-চিত্রশালা)। ঢাকা জেলার ভবানী-পুর গ্রামে ত্রি-শির, অষ্টহস্ত, বীরাসনোপবিষ্ট, পাদপীঠে গণেশের মূর্তি উৎকীর্ণ এবং মৌলিতে অমিতাভ মূর্তিযুক্ত একটি দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ভট্টশালী-মহাশয় বলিয়াছেন, প্রতিমাটি ভৃকুটী-তারার। কিন্তু এই প্রতিমাটির সঙ্গে ঢাকা-চিত্রশালার আর একটি প্রতিমার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এবং জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, শেষোক্ত প্রতিমাটি পঞ্চরক্ষামণ্ডলভুক্ত দেবী মহাপ্রতিসরার। প্রথমোক্ত প্রতিমাটির বাম দিকে ঝাটা ও কুলা হস্তে যে দেবীটি দাঁড়াইয়া আছেন তিনি তো একটি গ্রাম্য দেবী (বোধ হয় শীতলা বলিয়াই মনে হইতেছে)। ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত (ঢাকা-চিত্রশালা) একটি অষ্টভুজা বজ্রযানী দেবী-প্রতিমাকে সিতাতপত্রা বা সিততারা বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অষ্টভুজা সিতাতপত্রার একটি ধাতব মূর্তি ঢাকা-চিত্রশালারও আছে। পাহাড়-পুরে প্রাপ্ত একটি মাটির ফলকে উৎকীর্ণ অষ্টভুজা একটি তারা-প্রতিমা, বগুড়ায় প্রাপ্ত (রাজসাহী চিত্রশালা) একটি ধাতব তারা-প্রতিমা (সপ্তম-অষ্টম শতক), এবং দিনাজ-পুর জেলার অগ্রাদিগুণে প্রাপ্ত (আশুতোষ-চিত্রশালা) একাদশ শতকীয় আর একটি প্রতিমা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বজ্রযানী অন্যান্য দেবী মূর্তির মধ্যে মারীচী, পর্ণশবরী, হারীতী এবং চুণ্ডাই প্রধান। ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচন-সম্ভূত মারীচীর কয়েকটি প্রতিমা বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। ত্রিমুখ (বাম মুখ শূকরীর), সপ্তশূকরবাহিত এবং রাহুসারথি, রথে প্রত্যালীঢ়ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা এই দেবীটি ব্রাহ্মণ্য সূর্যেরই বৌদ্ধ প্রতিরূপ। ফরিদপুরের উজানী গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিত্রশালা) মারীচী প্রতিমাটি এই ধরনের মূর্তি এবং পালোত্তরপর্বের ভাস্কর শিল্পের সুন্দর নিদর্শন। পর্ণশবরী তাঁহার অন্যতম অনুচর। ইঁহার কথা অধ্যায়ারম্ভে বিশদভাবে বলিয়াছি। পর্ণশবরীর ধ্যানীবুদ্ধ বোধ হয় অমোঘসিদ্ধি। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে দুইটি ত্রি-শির, ষড়ভুজা, পর্ণাচ্ছাদন-পরিহিতা পর্ণশবরী প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। ধ্যানে তাঁহাকে বলা হইয়াছে 'পিশাচী'। রাজশাহী জেলার নিয়ামৎপুরে অষ্টাদশভুজা চুণ্ডা দেবীর একটি নবম-শতকীয় প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে (রাজসাহী-চিত্রশালা)। ত্রিপুরা জেলায় পট্টিকেরক রাজ্যে চুণ্ডাবর ভবনে যে একটি ষোড়শভুজা চুণ্ডা-

দেবী প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। বজ্রযানী দেবী উষ্ণীষ-বিজয়ার একটি ভগ্ন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বীরভূম জেলায়। হারীতী এবং তাঁর শক্তি তিনি ধনৈশ্বর্যের দেবী এবং ব্রাহ্মণ্য ষষ্ঠীর বৌদ্ধ প্রতিরূপ। ঢাকা ও রাজসাহী-চিত্রশালায় চার পাঁচটি হারীতীর প্রতিমা রক্ষিত আছে।

এই সব অসংখ্য মহাযানী দেবদেবীদের পূজার্চনার জন্য মন্দিরও অবশ্যই অসংখ্য রচিত হইয়াছিল বাঙলার নানা জায়গায়। বিভিন্ন বিহারগুলির সঙ্গে সঙ্গেও মন্দির নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু বাঙলার কোন্ প্রান্তে কোথায় কোন্ দেবদেবীর মন্দির ছিল, কোথায় কে পূজা পাইতেন, আজ আর তাহা বলিবার উপায় নাই। তবে, একাদশ শতকের অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার একটি পাণ্ডুলিপিতে বাঙলাদেশের কয়েকটি মহাযানী বজ্রযানী বৌদ্ধ মন্দিরের এবং কোন্ মন্দিরে কাহার পূজা হইত তাহার একটু ইঙ্গিত আছে। তাহা হইতে বুঝা যায়, চন্দ্রদ্বীপে (নিম্নবঙ্গের খুলনা-বরিশাল অঞ্চলে) ভগবতী তারার একটি মন্দির, সমতটে লোকনাথের দুইটি এবং বুদ্ধার্ধি-তারার একটি, পট্টিকেরক রাজ্যে চুণ্ডাবরভবনে চুণ্ডা-দেবীর একটি, এবং হরিকেলদেশে লোকনাথের একটি মন্দির ছিল।

এ পর্যন্ত যত মূর্তি ও মন্দির ইত্যাদির কথা বলিলাম সে-গুলির প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, উত্তর ও পূর্ব-বাঙলা (গঙ্গার পূর্বতীর হইতে), বিশেষভাবে রাজসাহী-দিনাজপুর-বগুড়া জেলায় এবং ফরিদপুর-ঢাকা-ত্রিপুরা জেলায় যত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বাঙলার অন্যত্র কোথাও তেমন নয়। গঙ্গার পশ্চিম তীরে বজ্রযানী-তন্ত্রের প্রতিমা পাওয়া প্রায় যায় নাই বলিলেই চলে, এক বাঁকুড়া-বীরভূমের কিয়দংশ ছাড়া। মনে হয়, মহাযান-বজ্রযান তন্ত্রের প্রসার ও প্রতিপত্তি উত্তর ও পূর্ব-বাঙলায় যতটা ছিল ভাগীরথীর পশ্চিমে ততটা ছিল না, দক্ষিণ-রাঢ়ে তো নয়ই। প্রায় দশম শতক হইতেই নালন্দার প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধি হ্রাস পাইতে থাকে এবং বিক্রমশীল-সোমপুর প্রভৃতি তাহার স্থান অধিকার করে। বিক্রমশীল-বিহার এবং ফুল্লহরি-বিহার বাঙলাদেশে না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু সোমপুর, জগদ্দল এবং দেবীকোট বিহার ছিল নিঃসংশয়ে উত্তর-বঙ্গে; পণ্ডিত-বিহার, পট্টিকেরক-বিহার ও বিক্রমপুরী-বিহার নিঃসংশয়ে পূর্ব-বঙ্গে। রাঢ়দেশের একটি মাত্র বিহারের নাম পাইতেছি, ত্রৈকূটক বিহার, কিন্তু তাহাও নিঃসংশয়ে রাঢ়দেশে কিনা বলা যায় না। সিদ্ধাচার্যদের জন্মস্থান ও আদি পরিবেশ বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায়, তাঁহারা অধিকাংশই উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গের লোক। অথচ, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ-রাঢ়ে সর্বত্রই ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রতিমা মিলিতেছে প্রচুর। মনে হয়, এক বাঁকুড়া-বীরভূমের কিয়দংশ ছাড়া রাঢ়ের অন্যত্র বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি তেমন ছিল না। এই তথ্য সমসাময়িক ও মধ্যযুগীয় বাঙলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিক হইতে গভীর অর্থবহ। ইহাও লক্ষণীয় যে, বাঁকুড়া-বীরভূমের যে অংশে

মহাযান-বজ্রযান সক্রিয় সেই অংশেই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সহজিয়া এবং তান্ত্রিক শক্তি-ধর্মের প্রসার, প্রভাব ও প্রতিপত্তি।

লিপি-প্রমাণ ও শৈলী-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বৌদ্ধ প্রতিমাগুলির তারিখ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, পাল-পূর্ব যুগের বৌদ্ধ মূর্তি খুব বেশি পাওয়া যায় নাই; যত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই—দুই চারিটি বিক্ষিপ্ত মূর্তি ছাড়া—মোটামুটি নবম হইতে একাদশ শতকের, এবং এই তিনশত বৎসরই বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের সুবর্ণযুগ। কিন্তু সংখ্যায় ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রতিমার সঙ্গে বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রতিমার তুলনাই চলিতে পারেনা, এবং এই ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মধ্যে আবার বিষ্ণু ও সৌর দেবায়তনের মূর্তিই বেশি। মহাযানী-বজ্রযানী দেবদেবীর যে-পরিচয় মূর্তি প্রমাণের সাহায্যে পাওয়া যায় সে-তুলনায় সমসাময়িক সিদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থমালায় উল্লিখিত দেবদেবীর পরিচয় অনেক বেশি বিস্তৃত। এমন অনেক দেবদেবীর পরিচয় সেখানে পাওয়া যায় যাঁহাদের একটি প্রতিমা-প্রমাণও বাঙলাদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই। তাহার কারণ হয়তো এই যে, বজ্রযানীদের সাধনপন্থা ছিল গুহ্য এবং সেই গুহ্যসাধনার ধ্যান-কল্পনায় যে মূর্তি-মণ্ডল রচিত হইত তাঁহাদের সকলেরই মূর্তিরূপ প্রতিমায় রূপায়িত করা প্রয়োজন হইত না। বেশ কিছু রচিত হইত চিত্রে, অর্থাৎ রঙ ও রেখায়। সেগুলির উল্লেখ এখানে করিতেছিনা।

এইমাত্র বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সংখ্যা ছিল এই পর্বে বৌদ্ধ প্রতিমার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু ধর্মগত ধ্যান-কল্পনায় বোধ হয় মহাযানী-বজ্রযানী প্রভাবই ছিল অধিকতর সক্রিয়, এবং তাহার কারণ বোধ হয় মহাযান-বজ্রযানের সাধন দর্শন। এই সাধন-দর্শন সমসাময়িক ও পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে—বৈষ্ণব ও শৈব, উভয় ধর্মকেই—গভীর-ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল।

জৈনধর্ম

য়ুয়ান্ চোয়াঙের পর বাঙলায় জৈন বা নির্গ্রন্থ ধর্মের অবস্থা জানিবার ও বুঝিবার মত কোনো গ্রন্থ-প্রমাণ বা লিপি-প্রমাণ কিছু উপস্থিত নাই। তবে পূর্বোক্ত মূর্তি-প্রমাণ কিছু আছে, এবং তাহা সমস্তই পাল ও সেন-পর্বের। য়ুয়ান্-চোয়াঙের পর হইতেই নির্গ্রন্থ ধর্ম যে বাঙলাদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, এই জৈন-প্রতিমাগুলিই তাহার প্রমাণ। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এক সুন্দরবন অঞ্চল হইতেই প্রায় দশ-বারোটি জৈন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে; বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া অঞ্চল হইতেও কিছু জৈন মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্তিগুলি সাধারণত ঋষভনাথ, আদিনাথ, নেমিনাথ, শান্তিনাথ, এবং পার্শ্বনাথের; পার্শ্বনাথের প্রতিমাই সকলের চেয়ে বেশি। মূর্তিগুলি প্রায় সমস্তই দিগম্বর জৈন-সম্প্রদায়ের। ইহাদের মধ্যে দিনাজপুর জেলার সুরহোর গ্রামে প্রাপ্ত ঋষভনাথের মূর্তিটি এই ধরনের মূর্তির প্রতিনিধি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। মূর্তিটি ধ্যানাসনে

উপবিষ্ট, বৃক্ষ-লাঞ্ছনটি বিদ্যমান এবং ২৪ জন জৈন্য তীর্থংকর ঋষভনাথকে শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্য উপস্থিত। বসন্তবিলাস-গ্রন্থের দশম সর্গে দেখিতেছি, চালুক্যরাজ বীরধবলের মন্ত্রী বস্তুপাল (১২১৯-১২৩৩ খ্রী) যখন একবার জৈন তীর্থ-পরিক্রমায় বাহির হন তখন তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন লাট, গৌড়, মরু, ধারা, অবন্তি এবং বঙ্গের সংঘপতিগণ। মনে হয়, ত্রয়োদশ-দ্বাদশ শতকেও গৌড়ে, বঙ্গে এবং পশ্চিম রাঢ়ে নির্গ্রন্থ সংঘের কিছু অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তবে, পাল-পর্বেই তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতেছিল ; স্বল্পসংখ্যক মূর্তিই তাহার প্রমাণ।

মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের দীর্ঘ ও গভীর রূপান্তর বর্ণনা-প্রসঙ্গে সহজযান ধর্ম এবং মহাযানী সিদ্ধাচার্যদের মতামত কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইঁহাদের সম্বন্ধে একটু বিশদতর ভাবে বলা প্রয়োজন, কারণ ইঁহাদের ধর্মগত ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির মানবিক আবেদনের সঙ্গে মধ্যযুগীয় বাঙলা ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতির অন্তত একটি ধারার আত্মীয়তা অত্যন্ত গভীর সেইজন পৃথকভাবে ইঁহাদের কথা আবার বলিতেছি।

প্রাচীন বাঙলায় কায়সাধন : সহজযান

একাদশ-দ্বাদশ শতকের সহজযানী সাহিত্যে, অর্থাৎ চর্যাগীতি ও দোহাকোষের অনেক গান ও শ্লোকে সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মমত ও পথ সম্বন্ধে খবরাখবর যেমন পাওয়া যায়, তেমনই সিদ্ধাচার্যদের স্বকীয় ধর্মমত সম্বন্ধে পাঠকের ধারণাও স্পষ্টতর হয়। আগেই বলিয়াছি, ইঁহারা বেদ-বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যে বেদ-আগমের কথা বলিয়াছেন তাহা শুধু বেদ বা আগম মাত্র নয়, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রামাণিক শাস্ত্র মাত্রই ইঁহাদের দৃষ্টিতে বেদ, আগম প্রভৃতি। বাঙলা দেশে যে যথার্থ বেদচর্চা, বৈদিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি খুব বেশি প্রচলিত ছিল না সে-কথা খুব বিশদ ভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। সেন-বর্মণ আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার যখন খুব বেশি, তখনও হলায়ুধ, জীমূতবাহন প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা বেদচর্চার অবহেলা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ; সে-কথা পরে বলিবার সুযোগ হইবে, আগেও বলিয়াছি অন্য প্রসঙ্গে। তবু, উচ্চকোটির বর্ণ-হিন্দুরা বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান কিছু কিছু করাইতেন, বেদপাঠ যে করাইতেন, সন্দেহ নাই, এবং তাহা প্রধানত পশ্চিমাগত ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণদেরই সাহায্যে ও প্রেরণায়। ইঁহাদেরই লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধাচার্য সরহপাদ বলিয়াছেন,

> বহ্মণো হি ম জানন্ত হি ভেউ।
> এবই পড়িঅউ এ চউ বেউ ॥
> মট্টী (পাণী কুস লই পড়ন্ত
> ঘরহিঁ [বইসী] অগ্‌গি হুণন্ত' ॥
> কজ্জে বিরহিঅ হুঅবহ হোমে'।
> অক্‌খি উহাবিঅ কুড়ু এ' ধূমে' ॥.

ব্রাহ্মণেরা তো যথার্থ ভেদ জানেনা ; চতুর্বেদ এই ভাবেই পড়া হয়। তাঁহারা মাটি, জল, কুশ লইয়া (মন্ত্র) পড়ে, ঘরে বসিয়া আগুনে আহুতি দেয় ; কার্যবিরহিত (অর্থাৎ ফলহীন) অগ্নিহোমের কটু ধোঁয়ায় চোখ শুধু পীড়িত হয়।

সরহপাদ অন্যত্র বলিতেছেন দণ্ডী সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে,

একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী ভঅবঁবেসেঁ।
বিণুআ হোই অই হংসউএসেঁ ॥
মিচ্ছেহিঁ জগে বাহিঅ ভুল্লে।
ধম্মাধম্ম ণ জানিঅ তুল্লে ॥

একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী প্রভৃতি ভগবানের বেশে (সকলেই) ঘুরিয়া বেড়ায়, হংসের উপদেশে জ্ঞানী হয়। মিথ্যাই জগৎ ভুলে বহিয়া চলে ; তাহারা ধর্মাধর্ম তুল্যরূপেই জানেনা (অর্থাৎ, ধর্মাধর্মের মূল্য তাহাদের কাছে সমান)।

দোহাকোষে শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রাভিমানী এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবপূজক ব্রাহ্মণদের উল্লেখ সুপ্রচুর, কিন্তু সহজযানী সিদ্ধাচার্যেরা ইঁহাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন না।

জাহের বাণচিহ্ন রুব ণ জানী।
সে কোইসে আগম বেএঁ বখাণী ॥

যাঁহার বর্ণ, চিহ্ন ও রূপ কিছুই জানা যায়না, তাহা আগমে বেদে কিরূপে ব্যাখ্যাত হইবে ?

সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মের ভিতর থেরবাদী, মহাযানী, কালচক্রযানী ও বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম, দিগম্বর জৈনধর্ম, কাপালিকধর্ম, রসসিদ্ধ তথা নাথসিদ্ধ ধর্ম প্রভৃতির কিছু কিছু উল্লেখ চর্যাগীতি ও দোহাকোষে পাওয়া যায়। সহজযানীরা প্রাচীনতর থেরবাদ বা সমসাময়িক বাঙলাদেশে সুপ্রচলিত মহাযান ও তদোদ্ভূত অন্যান্য বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও খুব শ্রদ্ধিত ছিলেন না, অন্যান্য ধর্মের প্রতি তো নয়ই। থেরব.দীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

চেল্লু ভিক্খু জে স্থবির-উএসেঁ।
বন্দেহিঅ পব্বজিউ বেসে ॥
কোই সুত্তন্তবক্খাণ বইটঠো।
কোবি চিন্তে কর সোসই দিটঠো ॥

চেল্ল (চেলা বা সমণের, অর্থাৎ শিক্ষার্থী) এবং ভিক্ষু যাঁহারা স্থবির বা আচার্যের উপদেশে প্রব্রজ্যার বেশ বন্দনা করে (বা গ্রহণ করে) ; কেহ কেহ বসিয়া বসিয়া (শুধু) সূত্রের ব্যাখ্যা করে ; কেহ কেহ বা দেখিয়া দেখিয়া সর্ব ধর্ম চিন্তা করে।

চর্যাগীতিতে মহাযানীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,

সঅল সমাহিঅ কাহি করি অই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরি অই ॥

সরল (ধ্যান) সমাধি দ্বারা কি করিবে ? সুখ দুঃখের হাত হইতে তাহাতে মুক্তি পাওয়া যায় না।

মহাযানী-বজ্রযানী-কালচক্রযানী প্রভৃতিদেব সম্বন্ধে দোহাকোষে আছে,

অন্ন তহি মহাজাণহিঁ ধাবই।
তহিঁ সুতন্তু তক্কসত্থ হই ॥
কোই মণ্ডলচর্ক্ক ভাবই।
অন্ন চউত্থতত্ত দীসই ॥

অন্যেরা ধাবিত হইতেছে মহাযানের দিকে, সেখানে আছে সূত্রান্ত ও তর্কশাস্ত্র। কেহ কেহ ভাবিতেছে মণ্ডল ও চক্র ; দিশা দিতেছে চতুর্থ তত্ত্বে।

ছবির মতন বর্ণনা পড়িতেছি দোহাকোষে জৈন-সন্ন্যাসীদের ; সরহপাদ বলিতেছেন :

দীহণক্‌খ জই মলিণেঁ বেসেঁ।
ণগ্‌গল হোই উপাড়িঅ কেসেঁ ॥
খবণেহি জাণ বিড়ংবিঅ বেসেঁ।
অপ্পণ বাহিঅ মোকখ উবেসেঁ ॥

দীর্ঘনখ যোগী মলিন বেশে নগ্ন হইয়া কেশ উপড়ায়। ক্ষপণকেরা (জৈন-সন্ন্যাসীরা) বিড়ম্বিত বেশে মোক্ষের উদ্দেশ্যে নিজদের বাহিয়া লইয়া চলে।

জই নগ্‌গা বিঅ হোই মুক্তি তা সুণহ সিআলহ।
লোমুপাড়ণে অত্থি সিদ্ধি তা জুবই নিতম্বহ ॥
পিচ্ছী গহণে দিঠ্‌ঠ মোক্‌খ [তা মোরহ চমরহ]।
উঞ্ছেঁ ভো অণেঁ হোই জাণ তা করিহ তুরঙ্গাহ ॥

নগ্ন হইলেই যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে কুকুর-শেয়ালেরও হইত ; লোম উপড়াইলেই যদি সিদ্ধি আসিত তাহা হইলে যুবতীর নিতম্বেরও সিদ্ধিলাভ ঘটিত ; পুচ্ছ গ্রহণেই যদি মোক্ষ দেখা যাইত, তাহা হইলে ময়ূর-চামরেরও মোক্ষ দেখা হইত ; উচ্ছিষ্ট ভোজনে যদি জ্ঞান হইত, তাহা হইলে হাতি ঘোড়ারও হইত।

চর্যাগীতিতে সমসাময়িক কাপালিকদের কথাও আছে ; ইঁহাদের সঙ্গে সহজযানী সিদ্ধাচার্যদের একটু আত্মিক যোগও ছিল। সহজিয়ারা কেহ কেহ কাপালী যোগী হইতে চাহিয়াছেন ; কহ্নপাদ তো নিজকেই কাপালী যোগী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আ লো ডোম্বী তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাগ ॥
*　　*　　*
তুলো ডোম্বী হাউঁ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী ॥

ওলো ডোম্বী, তোর সহিত আমি করিব সঙ্গ, (সেই জন্য) নিঘৃণ কাহ্ন নগ্ন কাপালী যোগী (হইয়াছে)। * * * তুই (হইয়াছিস) ডোম্বী, আমি (হইয়াছি) কাপালী ; তোকে অন্তরে (লইয়া) আমি গ্রহণ করিয়াছি হাড়ের মালা।

কাপালী যোগীরা নগ্ন থাকিতেন, হাড়ের মালাও পরিতেন ; অধিকন্তু বীরনাদে ডমরু বাজাইতেন, একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেন, পায়ে বাঁধিতেন ঘণ্টা নূপুর, কানে পরিতেন কুণ্ডল, গায়ে মাখিতেন ছাই : শ্বাশুড়ী, ননদ, শালী, মাতা, আত্মীয়-পরিজন সকলকে ত্যাগ করিয়া কাপালী যোগী হইতেন। পুরুষ ও নারী কাহারও কোনো বাধা ছিলনা যোগী হইবার পথে। চর্যাগীতিতে কাহ্ন পাদের একটি গীতে এই সব আছে :

নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খট্টে।
অনহা ডমরু বাজই বীরনাদে ॥
কাহ্ন কাপালী যোগী পইঠ অচারে।
দেহ নঅরী বিহরই একাকারে॰।
আলিকালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥
রাগদ্বেষ মোহ লাইঅ ছার।
পরম মোখ লব এ মুক্তহার ॥
মারিঅ সাসু নন্দন ঘরে শালী।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইল কবালী ॥

প্রাচীন বাঙলায় দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকে এক শ্রেণীর সাধক ছিলেন যাঁহারা মৃত্যুর পর মুক্তি লাভে বিশ্বাস করিতেন না ; তাঁহারা ছিলেন জীবন্মুক্তির সাধক। রস-রসায়নের সাহায্যে কায়সিদ্ধি লাভ করিয়া এই স্থূল জড়দেহকেই সিদ্ধদেহ এবং সিদ্ধদেহকে দিব্যদেহে রূপান্তরিত করা সম্ভব, এবং তাহা হইলেই শিবত্ব লাভ ঘটে—এই মতে ইঁহারা বিশ্বাস করিতেন। ইঁহাদের বলা হইত রসসিদ্ধ যোগী। শশীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই রসসিদ্ধ সম্প্রদায়ই পরবর্তী নাথসিদ্ধ যোগী সম্প্রদায়ের প্রাচীনতর রূপ। যাহা হউক, ইঁহাদের সম্বন্ধেও সহজযানী সিদ্ধাচার্যরা শ্রদ্ধিতচিত্ত ছিলেন না, বরং কঠোর সমালোচনাই করিতেন। সরহপাদ বলিতেছেন,

অম্হে ণ জাণহু অচিন্ত জোই।
জামমরণভব কইসণ হোই॥
জাইসো জাম মরণ বি তোইসো।
জীবন্তে মইলে' নাহি বিশেসো॥
জা এথু জাম মরণে বিসঙ্কা
সো করউ রস রসানেরে কঙ্ক্ষা॥

'অচিন্ত্যযোগী আমরা, জানিনা জন্ম মরণ সংসার কিরূপে হয়। জন্ম যেমন মরণও তেমনই; জীবিতে ও মৃতে বিশেষ (কোনো) পার্থক্য নাই। এখানে (এই সংসারে) যাহারা জন্ম-মরণে বিশঙ্কিত (ভীত), তাহারাই রস রসায়ণের আকাঙ্ক্ষা করুন।

সাধারণ যোগী-সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধেও সহজযানীদের ছিল নিদারুণ অবজ্ঞা। সরহপাদের একটি দোহায় আছে;

অহ্ঁরি এহি' উদ্দূলিঅ চ্ছারে'।
সীসসু বাহিঅ এ জড়ভারে'॥
ঘরহী বইসী দীবা জালী।
কোনহি' বইসী ঘণ্টা চালী॥
অক্‌খি ণিবেসী আসণ বন্ধী।
কণ্ণেহি' খুসুখুসাই জণ ধন্ধী॥

আর্য যোগীরা ছাই মাখে দেহে, শিরে বহন করে জটাভার; ঘরে বসিয়া দীপ জ্বালে, কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে; চোখ বুঁজিয়া আসন বাঁধে, আর কান খুসখুস করিয়া জনসাধারণকে ধাঁধাঁ লাগায়।

সহজ সমরস, অর্থাৎ সাম্যভাবনা, আর 'খসম' অর্থাৎ আকাশের মত শূন্য চিত্ত, ইহাই সহজযানের আদর্শ। তীর্থ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পূজা, আশ্রম সমস্তই ব্যর্থ। ধ্যানের মধ্যে মোক্ষ নাই, সহজ ছাড়া নির্বাণ নাই, কায়সাধন ছাড়া পথ নাই। যেখানে মন-পবন সঞ্চারিত হয় না, রবিশশীর প্রবেশ নাই সেইখানেই চিত্তের একমাত্র বিশ্রাম, সহজের মধ্যেই পরমানন্দ। শরীরের মধ্যেই অশরীরীর গুপ্তলীলা—অসরির কোই সরীরহি লুক্কো। ঘরেও থাকিও না, বনেও যাইওনা—ঘরহি মা থক্কু ম জাহি বণে। আগম, বেদ, পুরাণ সবই বৃথা নিষ্কলুষ নিস্তরঙ্গ হইতেছে সহজের রূপ, তাহার মধ্যে পাপ পুণ্যের প্রবেশ নাই। সহজে মন নিশ্চল করিয়া যে সমরসসিদ্ধ হইয়াছে সেই তো একমাত্র সিদ্ধ; তাঁহার জরামরণ দূর হইয়াছে। শূন্য নিরঞ্জনই পরম মহাসুখ, সেখানে না আছে পাপ, না আছে পুণ্য—সুন্ন নিরঞ্জন পরম মহাসুহ তহি পুণ ন পাব। সরহপাদ, কাহ্নপাদ প্রভৃতি আচার্যরা দোহার পর দোহায় এই সব মত কীর্তন

করিয়াছেন। বৈরাগ্য তাঁহারা সাধন করিতেন না, বলিতেন, বিরাগাপেক্ষা পাপ আর কিছু নাই, সুখ অপেক্ষা পুণ্য কিছু নাই।

উদ্ধৃত গীত ও দোহাগুলি হইতে সহজযানী সাধকদের ধর্মমতের যে আভাস পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণ্য ও অন্যান্য ধর্মের বাহ্য আচারানুষ্ঠানের প্রতি যে অবজ্ঞা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইতে একটি তথ্য সুস্পষ্ট। সে-তথ্যটি এই যে, মধ্যযুগে উত্তর-ভারতে ও বাঙলাদেশে যে মানবধর্মী মরমীয়া সাধক-কবিদের সাক্ষাৎ আমরা পাই—বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস হইতে আরম্ভ করিয়া কবীর, দাদু, রজ্জব, তুলসীদাস সুরদাস, মীরাবাই, হরিদাস প্রভৃতি পর্যন্ত—ইঁহারা সকলেই ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে একাদশ-দ্বাদশ শতকের এই সহজযানী সাধক কবিদেরই বংশধর। প্রাচীন সহজযানী সাধকেরা এবং মধ্যযুগীয় মরমীয়া সাধকেরা তাঁহাদের ধ্যান-ধারণাগুলি জনসাধারণের কাছে প্রচার করিবার জন্য যে মাধ্যম অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাও এক; সে মাধ্যম হইতেছে গীত ও দোহার মাধ্যম।

৭

সেন-বর্মণ দেবপর্ব

পাল-পর্বের অব্যবহিত আগেকার সমতটের খড়্গ বংশ বা চট্টগ্রামের কান্তিদেবের বংশ, পাল-পর্বে পাল, চন্দ্র ও কাম্বোজ রাজবংশ এঁরা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ; আর সেন-পর্বে সেন, বর্মণ ও দেববংশ এঁরা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রয়ী। এই দুই তথ্যের মধ্যে বাঙলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির গভীরতর অর্থ নিহিত। সেন-পর্বে ধর্ম ও সমাজচক্র কোনদিকে ঘুরিতেছে, এই দুই তথ্যের মধ্যে তাহার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। সে-ইঙ্গিত বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে সবিস্তারে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি, এখানে আর পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই। আশা করি, কৌতূহলী পাঠক তাহা এই প্রসঙ্গে পাঠ করিয়া লইবেন। এইখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই পর্বের বাঙলার সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী ধর্মই হইতেছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং সেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বেদ ও পুরাণ, শ্রুতি ও স্মৃতিদ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত এবং তন্ত্রদ্বারা উদ্বুদ্ধ। এই দেড়শত বৎসরের বাঙলার আকাশ একান্তই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আকাশ। জৈনধর্মের কোনো চিহ্নমাত্র কোথাও দেখা যাইতেছে না একমাত্র বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চল ছাড়া। বজ্রযানী-সহজযানী-কালচক্রযানী বৌদ্ধরা নাই, কিংবা তাঁহাদের ধর্মাচরণানুষ্ঠান তাঁহারা করিতেছেন না, এমন নয়, কিন্তু তাঁহাদের কণ্ঠ ক্ষীণ, শিথিল এবং কোথাও কোথাও নিরুদ্ধপ্রায়। বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি বিরল। সিদ্ধাচার্যদের খবর কোথাও কোথাও শুনা যাইতেছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাদের গুহ্য সাধনা গুহ্যতর পথ অনুসন্ধান করিতেছে, অথবা ব্রাহ্মণ্যধর্মের গুহ্য সাম্প্রদায়িক সাধনায়

আত্মগোপন করিতেছে। বৌদ্ধ বিহার ইত্যাদির খবরও দু'চার জায়গায় পাইতেছি, কিন্তু তাঁহাদের সেই অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধি আর নাই। অন্যদিকে বৈদিক যাগযজ্ঞের আকাশ বিস্তৃত হইতেছে, পৌরাণিক দেবদেবী ও বিশেষ বিশেষ তিথি-নক্ষত্রে স্নান-দান-ধ্যান ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতির ভিড় বাড়িতেছে, মধ্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণাভিযান বাড়িতেছে, রাষ্ট্রে ও সমাজে ব্রাহ্মণাধিপত্য বিস্তৃত হইতেছে। কেন হইতেছে, কি ভাবে হইতেছে তাহা পূর্ববর্তী অনেক অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে বর্ণ-বিন্যাস শ্রেণী-বিন্যাস ও রাজবৃত্ত অধ্যায়ে বারবার বলিয়াছি।

যাহা হউক, এই বিবর্তনের সূচনা পাল-বংশের এবং কাম্বোজ-বংশের শেষের দিকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক তো সমস্ত বাঙ্গালী বৌদ্ধ-রাজারাই ছিলেন, কথাটা তাহা নয়; লক্ষ্যণীয় হইল এই যে, বৌদ্ধ রাজার বংশধরেরাও (একাদশ শতকের শেষার্ধ হইতেই) ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় লইতেছেন। সে-সব কথা বর্ণ বিন্যাস অধ্যায়ে বলিয়াছি এবং দৃষ্টান্তও উদ্ধার করিয়াছি।

বর্মণ, সেন ও দেব-বংশের ধর্মগত আদর্শের কিছু ইঙ্গিত এখানে রাখা যাইতে পারে। বর্মণ-বংশের রাজারা সকলেই পরমবিষ্ণুভক্ত। এই রাজবংশের যে বংশাবলী ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে পাওয়া যাইতেছে তাহার গোড়াতেই ঋষি অত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈদিক ও পৌরাণিক নামের ছড়াছড়ি; ইঁহাদেরই বংশে বর্মণ পরিবারের জন্ম! রাজা সামলবর্মার পুত্র ভোজবর্মা সাবর্ণ গোত্রীয়, ভৃগু-চ্যবন-আপ্নবান্‌-ঔর্ব-জমদগ্নি প্রবর, বাজসনেয় চরণ এবং যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখ ব্রাহ্মণ রামদেব-শর্মাকে পুণ্ড্রবর্ধনে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। রামদেব শর্মার দেবজ্ঞ পূর্বপুরুষেরা মধ্যদেশ হইতে আসিয়া উত্তর-রাঢ়ার সিদ্ধল গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বর্মণ রাষ্ট্রেরই অন্যতম মন্ত্রী স্মার্ত ভট্ট-ভবদেব অগস্ত্যের মত বৌদ্ধ সমুদ্রকে গ্রাস করিয়াছিলেন এবং পাষণ্ড-বৈতণ্ডিকদের যুক্তিতর্ক খণ্ডনে অতিশয় দক্ষ ছিলেন বলিয়া গর্ব অনুভব করিয়াছেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মবিদ্যাবিদ, সিদ্ধান্ত-তন্ত্র-গণিত-ফলসংহিতায় সুপণ্ডিত, হোরাশাস্ত্রের একটি গ্রন্থের লেখক, কুমারিল-ভট্টের মীমাংসা-গ্রন্থের টীকাকার, স্মৃতিগ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, আগমশাস্ত্র এবং অস্ত্রবেদে সুপণ্ডিত। রাঢ়দেশে তিনি একটি নারায়ণ-মন্দির স্থাপন করিয়া তাহাতে নারায়ণ, অনন্ত এবং নৃসিংহের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভট্ট-ভবদেবের লিপিতে সাবর্ণগোত্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণাধ্যুষিত একশত গ্রামের খবর পাওয়া যাইতেছে। ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে বলা হইয়াছে, মানুষের অজ্ঞতার উলঙ্গতাকে ঢাকিবার একমাত্র উপায় হইতেছে ত্রি-বেদের চর্চা; এই চর্চার প্রসারের জন্য বর্মণ-পরিবারের চেষ্টার সীমা ছিল না। বর্মণ-রাষ্ট্রে যাহার সূচনা সেন-রাষ্ট্রে তাহার বিস্তার। বস্তুত, বাংলার স্মৃতি ও ব্যবহার শাসন সেন-পর্বেরই সৃষ্টি। এই যুগে রচিত অসংখ্য স্মৃতি ও ব্যবহার-গ্রন্থাদিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অমোঘ ও সুনির্দিষ্ট

আদর্শ সক্রিয়। বিজয়সেন ও বল্লালসেন উভয়েই ছিলেন পরম-মাহেশ্বর অর্থাৎ শৈব, লক্ষ্মণসেন পরম-বৈষ্ণব, পরম-নারসিংহ; লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও কেশবসেন উভয়েই নারায়ণ এবং সূর্যভক্ত। সেন-বংশের আদিপুরুষ সামন্তসেন শেষ বয়সে গঙ্গা-তীরস্থ আশ্রমে বানপ্রস্থে কাটাইয়াছিলেন। এই সব আশ্রম-তপোবন ঋষি-সন্ন্যাসী দ্বারা অধ্যুষিত এবং যজ্ঞাগ্নিসেবিত ঘৃত-ধূপের সুগন্ধে পরিপূরিত থাকিত; সেখানে মৃগশিশুরা তপোবন-নারীদের স্তন্যদুগ্ধ পান করিত এবং শুকপাখীরা সমস্ত বেদ, আবৃত্তি করিত।। সামন্তসেনের পৌত্র বিজয়সেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উপর প্রচুর কৃপাবর্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাঁহার প্রচুর ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। একবার তাঁহার মহিষী বিলাসদেবী চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষে কনকতুলাপুরুষ অনুষ্ঠানের হোমকার্যের দক্ষিণাস্বরূপ মধ্যদেশাগত, বৎসগোত্রীয়, ভার্গব-চ্যবন-আপ্নবান-ঔর্ব-জামদগ্ন্য প্রবর, ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখার ষড়ঙ্গধ্যায়ী ব্রাহ্মণ উদয়কর দেবশর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন। বল্লালসেনের নৈহাটি-লিপি আরম্ভ হইয়াছে অর্ধনারীকে বন্দনা করিয়া। তাঁহার মাতা বিলাসদেবী একবার সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাতীরে হেমাশ্বমহাদান অনুষ্ঠানের দক্ষিণাস্বরূপ ভরদ্বাজ গোত্রীয়, ভরদ্বাজ-আঙ্গিরস-বার্হস্পত্য প্রবর, সামবেদীয় কৌঠুমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণ শ্রীওবাসু দেবশর্মাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া-লিপির দানগ্রহীতা হইতেছেন কৌশিক গোত্রীয়, বিশ্বামিত্র-বন্ধুল কৌশিক প্রবর, যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রঘুদেবশর্মা। এই রাজারই গোবিন্দপুর-পট্টোলীর ভূমিদান-গ্রহীতাও একজন ব্রাহ্মণ, উপাধ্যায় ব্যাসদেব শর্মা বৎসগোত্রীয় এবং কৌঠুম-শাখাচরণানুষ্ঠায়ী। সামবেদীয় কৌঠুমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী, ভরদ্বাজগোত্রীয় আর এক ব্রাহ্মণ ঈশ্বর দেবশর্মাও কিছু ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন রাজা কর্তৃক হেমাশ্বরথমহাদান যজ্ঞানুষ্ঠানে আচার্য-ক্রিয়ার দক্ষিণাস্বরূপ। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-লিপি হইতে জানা যায়, রাজা তাঁহার মূল অভিষেকের সময় ঐন্দ্রীমহাশান্তি যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে কৌশিক গোত্রীয়, অথর্ববেদীয় পৈপ্পলাদশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞাগ্নির ধূম চারিদিকে এমন বিকীর্ণ হইত যেন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যাইত। তিনি একবার তাঁহার জন্মদিনে দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া একটি গ্রাম বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ঈশ্বর দেবশর্মাকে দান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের আর এক পুত্র বিশ্বরূপ সেন শিবপুরাণোক্ত ভূমিদানের ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় বাৎস্যগোত্রীয় নীতি-পাঠক ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপ দেবশর্মাকে কিছু ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই রাজারই অন্য আর একটি লিপিতে দেখিতেছি, হলায়ুধ নামে বাৎস্যগোত্রীয় যজুর্বেদীয়, কাণ্বশাখাধ্যায়ী জনৈক ব্রাহ্মণ আবল্লিক পণ্ডিত রাজপরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদের নিকট হইতে প্রচুর ভূমিদান লাভ করিতেছেন—উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, চন্দ্র-গ্রহণ, উত্থানদ্বাদশী তিথি, জন্মতিথি ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলের দেব-বংশের লিপিতেও অনুরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী এবং বিষ্ণুভক্ত। এই বংশের অন্যতম রাজা দামোদর একবার একজন যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ পৃথ্বীধর শর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন।

বস্তুত, এই তিন রাজবংশের সচেতন চেষ্টাই যেন ছিল বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আকাশ বাঙলাদেশে বিস্তৃত করা। রামায়ণ-মহাভারত-পুরা·-কালিদাস যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য আদর্শের কথা বলিয়াছেন সেই ব্রাহ্মণ্য আদর্শ সমাজ ও ধর্মজীবনে সঞ্চার করিবার প্রয়াস লিপিগুলিতে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে সুস্পষ্ট। লিপিগুলিতে কনকতুলাপুরুষ মহাদান, ঐন্দ্রীমহাশান্তি, হেমাশ্বমহাদান, হেমাশ্বরথদান প্রভৃতি যাগযজ্ঞ; সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, উত্থানদ্বাদশীতিথি, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি প্রভৃতি উপলক্ষে স্নান, তর্পণ, পূজানুষ্ঠান; শিবপুরাণোক্ত ভূমিদানের ফলাকাঙ্ক্ষা; বিভিন্ন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ প্রভৃতিই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এই যুগের ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রতিনিধি হলায়ুধ, সন্দেহ নাই। তাঁহার ব্রাহ্মণসর্বস্ব-গ্রন্থের গোড়াতেই আত্মপ্রশস্তিমূলক কয়েকটি শ্লোক আছে; তাহার অর্থ এইরূপ: "(হলায়ুধের নিজের গৃহে) কোথাও কাঠের (যজ্ঞ) পাত্র (ছড়াইয়া আছে); কোথাও বা স্বর্ণপাত্র (ইত্যাদি)। কোথাও ইন্দুধবল দুকুলবস্ত্র; কোথাও কৃষ্ণমৃগচর্ম। কোথাও ধূপের (গন্ধময় ধূম); বষট্‌কার ধ্বনিময় আহুতির ধূম। (এই ভাবে তাঁহার গৃহে) অগ্নির এবং (তাঁহার নিজের) কর্মফল যুগপৎ জাগ্রত।" ইহাই ব্রাহ্মণ্য সেন-পর্বের ভাবপরিমণ্ডল; হলায়ুধ গৃহের ভাব-কল্পনাই সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভাব-কল্পনা।

বৈদিক ধর্ম ও সংস্কারের বিস্তার

হলায়ুধের ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব হইতে যে শ্লোকটির অনুবাদ উল্লেখ করিলাম তাহার ইঙ্গিত যে ঔপনিষদিক তপোবনাদর্শের দিকে, এ-কথা বোধ হয় আর স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সামন্তসেনের বানপ্রস্থ্য যে-আশ্রমে কাটিয়াছিল সে-আশ্রমের আকাশ-পরিবেশও ঔপনিষদিক। কবিকল্পনা সন্দেহ নাই, তবু, যে-দেশের কল্পনাশ্রমে শুক-পাখীরাও বেদ আবৃত্তি করে সে-দেশে বেদের চর্চা ছিল, বৈদিক যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাহা তো সহজেই অনুমেয়। বর্মণ ও সেন-রাজাদের লিপিগুলিতে সমানেই দেখিতেছি চতুর্বেদের বিভিন্ন শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণেরাই হোমযাগযজ্ঞ ইত্যাদি করাইতেছেন এবং ভূমিদক্ষিণা লাভ করিতেছেন। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ এই চারিবেদই ব্রাহ্মণদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল, এবং ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখার ষড়ঙ্গ, যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখা, সামবেদীয় কৌথুমশাখা, এবং অথর্ববেদীয় পৈপ্পলাদ

শাখার চর্চাই ছিল বেশি, বিশেষভাবে যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখা এবং সামবেদীয় কৌথুমশাখা। ভট্ট-ভবদেব ছিলেন ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্। ছান্দোগ্য মন্ত্রভাষ্য-রচয়িতা গুণবিষ্ণুও তো এই যুগেরই লোক। বিজয়সেনের অজস্র কৃপা বর্ষিত হইয়াছিল যাঁহাদের উপর তাঁহারা তো অনেকেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। দামোদরদেবের নিকট হইতে যে-ব্রাহ্মণ পৃথ্বীধরশর্মা কিছু ভূমিদান গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন যজুর্বেদীয়। এই পর্বে বৈদিক ধর্ম, ক্রিয়া-কর্ম, যাগযজ্ঞ, সংস্কার প্রভৃতি যে আরও বিস্তারিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কনকতুলা-পুরুষ দান, ঐন্দ্রীমহাশান্তি, হেমাশ্বমহাদান, হেমাশ্বরথদান প্রভৃতি যাগযজ্ঞ তো শ্রৌত-সংস্কারের জয়জয়কারই ঘোষণা করে।

অথচ, হলায়ুধ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন (ব্রাহ্মণসর্বস্ব-গ্রন্থ), রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা যথার্থ বেদবিদ্ ছিলেন না ; তাঁহার মতে, ব্রাহ্মণদের বেদচর্চার সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল নাকি উৎকল ও পাশ্চাত্য দেশ সমূহে। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা নাকি বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের রীতিপদ্ধতিও জানিতেন না। হলায়ুধের আগে বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ-ভট্টও তাঁহার পিতৃদয়িতা-গ্রন্থে বাঙলাদেশে বেদচর্চার অবহেলা দেখিয়া দুঃখ করিয়াছেন। এই অবস্থারই বোধ হয় দূর প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে কুলজী-গ্রন্থমালা-কথিত পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের বাংলায় আগমন-কাহিনীতে। সেন-বর্মণ পর্বে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কারের ক্রমবর্ধমান প্রসার দেখিয়া মনে হয়, বাহির হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিয়া বেদচর্চা, বৈদিকানুষ্ঠান প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার একটা সচেতন চেষ্টা বোধ হয় সত্যই করা হইয়াছিল। অনিরুদ্ধ-ভট্ট ও হলায়ুধ 'যে-অবস্থাটা দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের ভাল লাগে নাই। কাজেই, ব্রাহ্মণ্য এবং দক্ষিণাগত সেন-বর্মণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এ-ধরনের একটা চেষ্টা হওয়া কিছু বিচিত্র নয়, অস্বাভাবিকও নয়। বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, সেন বর্মণ আমলেই বাঙলায় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের উদ্ভব দেখা দেয়।

আগেই বলিয়াছি, বাঙলার শ্রৌত ও স্মৃতিশাসন এই পর্বেরই সৃষ্টি। ভট্ট-ভবদেব, জীমূতবাহন, অনিরুদ্ধ-ভট্ট, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, হলায়ুধ প্রভৃতি সকলেই এই পর্বেরই লোক এবং ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বনামখ্যাত শ্রৌত ও স্মৃতিপণ্ডিত। এই পর্বেই বাঙলার ব্রাহ্মণ্য জীবন সর্বভারতীয় শ্রৌত ও স্মৃতিবন্ধনে সম্পূর্ণ বাঁধা পড়িল। সদ্যোক্ত শ্রৌত ও স্মৃতিকারদের গ্রন্থে শ্রৌত ও গৃহ্য সংস্কারগুলির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া কঠিন নয়। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমান্তোন্নয়ন, শোষ্যন্তীহোম, জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, নামকরণ, পৌষ্টিককর্ম, অন্নপ্রাশন, নৈমিত্তিক-পুত্র-মূর্দ্ধাভিঘ্রাণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সাবিত্র-চরু হোম, সমাবর্তন, বিবাহ, শালাকর্ম (গৃহপ্রবেশ) প্রভৃতি দ্বিজবর্ণের যত কিছু সংস্কার প্রত্যেকটি এই সব গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সব সংস্কার পালনের অপরিহার্য অঙ্গ হইতেছে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুশণ্ডিকানুষ্ঠান এবং মহাব্যাহৃতি বা শাট্যায়ন বা

সমিধহোম বা অন্য কোন হোমানুষ্ঠানপূর্বক গৃহাগ্নি শোধন বা প্রতিষ্ঠা। এই সব হোমানুষ্ঠান কি করিয়া করিতে হয় তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাও দেওয়া হইয়াছে। অনিরুদ্ধ-ভট্টের পিতৃদয়িতা ও হারলতা-গ্রন্থে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মেরও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। এই সব বিবরণ ও ব্যাখ্যান পাঠ করিলে বুঝিতে দেরী হয় না যে, শ্রৌত ও স্মার্ত সংস্কার এই পর্বের বাঙালী ব্রাহ্মণ্য সমাজে সুবিস্তার লাভ করিয়াছিল। রাষ্ট্রের সহায়তায় এই বিস্তারের ভার লইয়াছিলেন ব্রাহ্মণেরা।

পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কারের বিস্তৃতি

পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কারের বিস্তার তো পালপর্বেই দেখিয়াছি। এই পর্বে তাহা বর্ধমান। পুরাণ-কাহিনীর পরিচয় এই পর্বের লিপিগুলিতে সমানেই পাওয়া যাইতেছে। বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের কথা শুনিতেছি ভোজবর্মার বেলাব ও লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি-শাসনে। বামনাবতারের কথা বলিতে গিয়া বিষ্ণু কি করিয়া দৈত্যরাজ এবং ইন্দ্রজয়ী বলিকে পরাভূত করিয়াছিলেন, বলিরাজার অপরিমেয় ত্যাগের খ্যাতি কতদূর ছিল তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কৃষ্ণের প্রেমলীলা, এবং বিষ্ণুর কৃষ্ণ, নরসিংহ এবং পরশুরামাবতারের কথাও বাদ পড়ে নাই। বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপিতে সূর্যদেব অগস্ত্যের সাহায্যে কি করিয়া বিন্ধ্যকে অবনত করিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত আছে। বেলাব-লিপিতে চন্দ্রকে বলা হইয়াছে অত্রির অন্যতম বংশধর। শিব যে অর্ধনারীশ্বর এবং শম্ভু, ধূর্জটী ও মহেশ্বর যে তাঁহার অন্য তিনটি নাম এবং কার্তিকেয় ও গণেশ যে তাঁহার দুই পুত্র, এ-কথার উল্লেখ আছে দেওপাড়া, নৈহাটি ও বারাকপুর লিপিতে। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, উত্থানদ্বাদশী তিথি, উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি প্রভৃতি উপলক্ষে স্নান, তর্পণ ও পূজা, শিবপুরাণোক্ত ভূমিদানের ফলাকাঙ্ক্ষা, দূর্বাতৃণ জলসিক্ত করিয়া দানকার্য সমাপন, নীতিপাঠের অনুষ্ঠান, লিপি-উল্লিখিত এই সব ক্রিয়াকর্ম সমস্তই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের জয়ঘোষণা করে। সুখরাত্রি ব্রত, শক্রুত্থান পূজা, কামমহোৎসব, হোলাক উৎসব, পাষাণ-চতুর্দশী, দ্যূত-প্রতিপদ, কোজাগর-পূর্ণিমা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, আকাশ প্রদীপ, দীপান্বিতা, জন্মাষ্টমী, অশোকাষ্টমী, অক্ষয়-তৃতীয়া, অগস্ত্যার্ঘ্য, মাঘীসপ্তমী স্নান প্রভৃতি পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মানুমোদিত যে-সব ক্রিয়াকর্মের বিস্তৃত উল্লেখ ও বিবরণ এই পর্বের কালবিবেক, দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যেও একই ইঙ্গিত।

এই পর্বের বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও দেবদেবী সম্বন্ধে বিশদ ভাবে বলিবার কিছু নাই। পাল-চন্দ্র পর্বে এই সব ধর্ম ও দেবায়তনের যে রূপ ও প্রকৃতি আমরা দেখিয়াছি, এ-পর্বে তাহা আরও বিস্তৃত হইয়াছে, প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়াছে। কাজেই একই কথা আবার বলিয়া লাভ নাই; যে-সব ক্ষেত্রে নূতন তথ্যের, নূতন রূপ ও প্রকৃতির ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে শুধু তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

বৈষ্ণব ধর্ম

পাল-পর্বের কোনো কোনো স্থানক বিষ্ণুমূর্তিতে মহাযানী মূর্তি কল্পনার প্রভাবের কথা আগেই বলিয়াছি। এই পর্বেও তেমন দুই একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুর জেলার সুরোহর গ্রামে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) একটি ত্রিবিক্রম-প্রকরণের বিষ্ণুব স্থানক প্রতিমায় এই মহাযানী প্রভাব সুস্পষ্ট। পাল-পর্বের মহাযানী লোকেশ্বর-বিষ্ণু প্রতিমাগুলির (ঘিয়াসবাদ, সোনারঙ্গ ও সাগরদীঘিতে প্রাপ্ত) মত এ ক্ষেত্রেও বিষ্ণু একটি নাগের ফণাছত্রের নীচে দণ্ডায়মান ; তাঁহার চক্র ও গদা এবং দুই পার্শ্বের চক্র ও শঙ্খপুরুষ নীলোৎপলের উপবে স্থিত , ফণাছত্রের উপরেই অমিতাভসদৃশ একটি উপবিষ্ট মূর্তি, এবং পাদপীঠে ষড়্ভুজ নৃত্যপরায়ণ এক শিব-প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। কালন্দরপুরে প্রাপ্ত একটি স্থানক বিষ্ণুমূর্তিতেও অনুরূপ লক্ষণ দৃষ্টি গোচর। বিষ্ণুর গরুড়াসন প্রতিমার একটি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে বগুড়া জেলার দেওড়া গ্রামে। কিন্তু বিষ্ণুর লক্ষ্মী-নাবায়ণ রূপই বোধ হয় এই পর্বে বৈষ্ণব দেবদেবী রূপ-কল্পনার অন্যতম প্রধান দান। পূর্ব-বাঙলা ও উত্তর-বাঙলার কোনো কোনো স্থান হইতে লক্ষ্মী-নারায়ণের কয়েকটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে ; তন্মধ্যে ঢাকা জেলার বাস্তা গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিত্রশালা) একটি এবং দিনাজপুর জেলার এক্‌াইল গ্রামে প্রাপ্ত আর একটি প্রতিমা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুর বাম উরুর উপর উপবিষ্টা লক্ষ্মীকে দেখিলে সহজেই সম-সাময়িক শৈব উমা-মহেশ্বরের প্রতিমার কথা মনে পড়ে। লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা ও রূপ-কল্পনার প্রসার দক্ষিণ-ভারতেই ছিল বেশি,এবং খুব সম্ভব সেন-বর্মণ পর্বে দক্ষিণদেশ হইতেই এই পূজা ও রূপ-কল্পনা বাঙলাদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কবি ধোয়ী তাঁহার পবনদূত-কাব্যে যেন ইঙ্গিত করিয়াছেন, লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন সেন-রাজাদের কুলদেবতা, বাররামাদের নৃত্যগীত সহযোগে তাঁহার অর্চনা হইত।

অস্মিন সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ সুহ্মে বসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ।
পাণৌ লীলাকমলমসকৃৎ যৎসমীপে বহন্ত্যো
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতিসুভগাঃ কুর্বতে বাররামঃ ॥

এই পর্বের কয়েকটি অবতার-মূর্তিও বাঙলাদেশের নানা জায়গায় পাওয়া গিয়াছে, ইহা-দের মধ্যে বরাহ ও নরসিংহ অবতারই প্রধান। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, লক্ষ্মণসেন নিজের পরিচয় দিতেন পরমনারসিংহ বলিয়া। তিনি ছিলেন পরমবৈষ্ণব। বর্মণ-বংশের রাজারা তো সকলেই পরমবৈষ্ণব ; দেব-বংশের রাজারাও তাহাই। বিজয়সেন যদিও ছিলেন সদাশিবের ভক্ত, তবু প্রদ্যুম্নেশ্বরের এক মন্দিরে ভূমিদান করিতে তাঁহার বাধে নাই। প্রদ্যুম্নেশ্বর তো হরিহরেরই এক বিশিষ্ট রূপ। বিশ্বরূপ ও কেশবসেন তাঁহাদের রাজপট্ট আরম্ভ করিয়াছিলেন নারায়ণকে আবাহন করিয়া। কামদেবের একাধিক প্রতিমা এ-পর্যন্ত

পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহা উত্তর-বঙ্গ হইতে। তাঁহার হাতে ইক্ষুদণ্ডের ধনু এবং বাণ, মুখে চতুর হাসি, গলায় ফুলের মালা ; ত্রিভঙ্গ হইয়া তিনি দণ্ডায়মান। রাজসাহী-চিত্রশালার দুইটি প্রতিমাই বোধ হয় এই পর্বের।

সেন-বর্মণ পর্বের বাঙলাদেশ বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসকে দুইটি দিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়, একটি বিষ্ণুর দশাবতারের সমন্বিত ও রীতিবদ্ধ রূপ, আর একটি রাধা-কৃষ্ণের ধ্যান ও রূপ-কল্পনা। বরাহ, বামন ইত্যাদি দুই চারিটি অবতারের নাম গুপ্ত-লিপিমালাতেই দেখা যায়, পুরাণমালায় এবং মহাভারতেও বিষ্ণুর নানা অবতাররূপের পরিচয় বিধৃত। কিন্তু বিধিবদ্ধ সমন্বিত রূপের চেষ্টা বোধ হয় প্রথম দেখিতেছি ভাগবত পুরাণে। এই পুরাণে অবতাররূপের তিনটি তালিকা আছে, একটিতে বিষ্ণুর তেইশটি অবতার, একটিতে বাইশটি, একটিতে ষোলটি ; দেখা যাইতেছে, তখনও দশাবতাররূপ সমন্বিত ও বিধিবদ্ধ হয় নাই। পাল-পর্ব ও সেন-পর্বের লিপিমালায়ও কয়েকজন অবতারের খবর পাইতেছি। কিন্তু মধ্যযুগের এবং আজিকার ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র যে দশাবতারের ঐতিহ্য সুপরিচিত, সেই দশাবতারের (মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি) প্রথম বিধিবদ্ধ সমন্বিত উল্লেখ পাইতেছি কবি জয়-দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে। শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থেও অবতার-বিষয়ক শ্লোকাবলীর মধ্যে দশাবতারের উল্লেখই প্রধান, এবং তাহার মধ্যে আবার কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধেই ষাটটি শ্লোক। পরবর্তী কালে চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর বাঙলায় বিষ্ণু-কৃষ্ণধর্মের যে-রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহার আদি সংস্কৃতিপূত রূপ এই শ্লোকগুলির মধ্যেই নিবদ্ধ, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এ-অনুমানও অনৈতিহাসিক নয় যে, এই শ্লোকাবলীর অধিকাংশই পরমভাগবত বিষ্ণুকৃষ্ণভক্ত কবি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভায় রচিত ও গীত হইয়াছিল। উপরোক্ত দশাবতারের তালিকা দীর্ঘতর তালিকার সঙ্গে সঙ্গে মহাভারত এবং বিষ্ণুপুরাণেও আছে, কিন্তু এই দুই গ্রন্থেই সংক্ষিপ্ত তালিকাটি দশাবতারের স্বীকৃতির পরবর্তীকালের সংযোজন। শেষোক্ত অবতার দুইটি—বুদ্ধ ও কল্কি—তো বৌদ্ধদের ঐতিহ্য হইতেই গৃহীত।

হরিভক্তি বা স্তুতি সম্বন্ধে সদুক্তিকর্ণামৃতে অনেকগুলি শ্লোক আছে ; একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধার করিতেছি শ্লোকটি অজ্ঞাতনামা কোনো কবির রচনা। ইনি বাঙালী ছিলেন কিনা বলা কঠিন ; তবে এই শ্লোকটি, কবি কুলশেখর-রচিত একটি শ্লোক এবং আরও দুই একটি শ্লোকে বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম ও হৃদয়াবেগের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয়, ইহাদের মধ্যে যেন চৈতন্যোত্তর বাঙলার একান্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তি ও হৃদয়াবেগ প্রত্যক্ষ করিতেছি।

যানি ত্বচ্চরিতামৃতানি রশনা লেহ্যানি ধন্যাত্মনাং
যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধানুবন্ধোন্মুখাঃ

যা বা ভাবিতবেণুগীত গতয়ো লীলসুখাম্ভোরুহে
ধারাবাহিতয়া বহন্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে ॥

রাধাকৃষ্ণের ধ্যান কল্পনাও বোধ হয় এই পর্বের বাঙলা দেশেরই সৃষ্টি, এবং কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ-গ্রন্থেই বোধ হয় প্রথম এই ধ্যান-কল্পনার সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত রূপ আমরা দেখিতেছি। হালের সপ্তশতীর একটি শ্লোকে রাধার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার তারিখ সঠিক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ভাসের বালচরিতে, ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও ভাগবত-পুরাণে গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমলীলার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে রাধার উল্লেখ কোথাও নাই। ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতেও শত গোপিনীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিচিত্র লীলার ইঙ্গিত আছে কিন্তু সেখানেও রাধা নাই। সেন-পর্বের কোনো সময়ে বোধ হয় অন্যতমা গোপিনী রাধা কল্পিতা হইয়া থাকিবেন, এবং খুব সম্ভব তাহা ক্রমবর্ধমান শক্তি-ধর্মের প্রভাবে। এই শক্তিধর্মের প্রভাব বৈষ্ণবধর্মেও লাগিয়াছিল, সন্দেহ নাই। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বৈষ্ণবের কৃষ্ণ শাক্তের শিব, সাংখ্যের পুরুষ, আরও শিথিল ভাবে বলা যায়, বজ্রযানীর বোধিচিত্ত, সহজযানীর করুণা, কালচক্রযানীর কালচক্র ; আর রাধা হইতেছেন শাক্তের শক্তি, সাংখ্যের প্রকৃতি, শিথিল ভাবে বজ্রযানীর নিরাত্মা, সহজ-যানীর শূন্যতা, কালচক্রযানীর প্রজ্ঞা। সমসাময়িক কালের এই চেতনার স্পর্শ বৈষ্ণব-ধর্মেও লাগিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। পরবর্তী সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের কৃষ্ণ-রাধা যে পুরুষ প্রকৃতি ও শিব-শক্তি ধ্যান-কল্পনার এক পরিবারভুক্ত, এ সম্বন্ধে তো কোনোই সন্দেহ নাই।

শৈব ধর্ম ও শাক্ত ধর্ম

সেন-বংশের পারিবারিক দেবতা বোধ হয় ছিলেন সদাশিব। বিজয়সেন শিবের আবাহন করিয়াছিলেন শম্ভু নামে, বল্লালসেন করিয়াছেন ধূর্জটী এবং অর্ধনারীশ্বর নামে। লক্ষ্মণসেন এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় লিপিতে নারায়ণের আবাহন করিলেও সদাশিবকে শ্রদ্ধা জানাইতে ভোলেন নাই। সেন-বর্মণ লিপিমালায় তন্ত্রোক্ত শিব-শক্তি ধ্যান-কল্পনার পরিচয় কিছু নাই, আগমান্ত শৈব-শাক্ত ধর্মেরও নয়। কিন্তু শেষোক্ত ধর্মের ধ্যান-কল্পনা যে গুপ্তোত্তর এবং পাল-পর্বের বাঙলায় সুপ্রচারিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তাহার কিছু কিছু প্রমাণ আগেই উল্লেখ করিয়াছি। মধ্যযুগে যে সুবিস্তৃত তন্ত্র-সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেই তন্ত্র-সাহিত্যের কোনো গ্রন্থই বোধ হয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের আগে রচিত হয় নাই ; তবে এ-কথা অনস্বীকার্য যে,অধিকাংশ তন্ত্রগ্রন্থই রচিত হইয়াছিল বাঙলাদেশে এবং এই দেশেই তান্ত্রিক ধ্যান-কল্পনার এক সমন্বিত রূপ গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহা ছাড়া, এই সেন-বর্মন পর্বের লিপিতে ও সমসাময়িক সাহিত্যে আগম ও তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চার কিছু কিছু উল্লেখ বর্তমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ভবদেব-

ভট্ট দাবি করিয়াছেন, অন্যান্য অনেক শাস্ত্রের সঙ্গে তিনি তন্ত্র ও আগম-শাস্ত্রেও অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। আগমশাস্ত্রের প্রচলন পাল-পর্বেই দেখিতেছি ; কেদার মিশ্রের পুত্র মন্ত্রী গুরবমিশ্র আগমশাস্ত্রে পরম ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্ত্রের উল্লেখ এ-ক্ষেত্রে দেখিতেছি না। আগমশাস্ত্রের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং তাহা সর্বভারতীয় ; কিন্তু তন্ত্র বলিতে পরবর্তীকালে আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহা বোধ হয় পূর্ব-ভারত, বিশেষ ভাবে বাংলা দেশেই সৃষ্টি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। আগেই দেখিয়াছি, দেবীপুরাণ মতে বামাচারী দেবী-পূজার প্রচলন ছিল রাঢ়, কামরূপ, কামাখ্যা ও ভোট্টদেশে। তন্ত্রোক্ত দেবদেবীর লিপি-উল্লেখ বোধ হয় দুইটি ক্ষেত্রে আমরা পাইতেছি ; একটি নয়পালের গয়ালিপিতে মহানীল-সরস্বতীর আর একটি হরিকালদেবের লিপিতে দুর্গোত্তারা নামে এক দেবীর উল্লেখ। বৌদ্ধ বজ্রযানী-সহজযানী-কালচক্রযানী সাধনার মতই তন্ত্রোক্ত বামা সাধনা একান্ত গুহ্য ব্যক্তিগত সাধনা ; সেই জন্যই লিপিমালায় তাহার উল্লেখ বা আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্য প্রতিমাপূজায় তাহার মূর্তি-প্রতীকের প্রমাণ না থাকা কিছু বিচিত্র নয়। তবে, পাল-পর্বের বৌদ্ধ গুহ্যসাধনা এবং ব্রাহ্মণ্য শক্তিসাধনা একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল এবং উভয়েই তান্ত্রিক ধ্যান-কল্পনার গভীর স্পর্শ লাভ করিয়াছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কোথাও নাই।

শিবের ঈশানরূপের চতুর্ভুজ ত্রিভঙ্গ একটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে রাজসাহী জেলার গণেশপুর গ্রামে (রাজসাহী-চিত্রশালা)। সাধারণত ঈশানরূপী স্থানক-শিবের যে ধরনের প্রতিমা বাংলাদেশে সুপ্রাপ্য তাহা হইতে এক মূর্তিটি একটু ভিন্ন। কিন্তু এই ভিন্নতা এই পর্বেরই সৃষ্টি কিনা, নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। কিন্তু নৃত্যপর শিবের যে দুই রূপ কল্পনার প্রতিমা বাংলা দেশে পাওয়া গিয়াছে তাহার একটি নিঃসন্দেহে এই পর্বের সৃষ্টি এবং তাহা দক্ষিণ-ভারতীয় প্রভাবের ফল। পাল-পর্বে একটি রূপের কথা আগেই বলিয়াছি ; এই রূপটি অবিকল মৎস্যপুরাণের ধ্যান-কল্পনানুযায়ী। এই রূপটি দশ ভুজ। আর একটি রূপ দ্বাদশভুজ ; দুই ভুজে একটি বীণা ধৃত, দুই ভুজে একটি নাগফণাছত্র এবং দুই ভুজে করতাল লক্ষণ। এই নটরাজ শিব যথার্থ নৃত্যগীতপটু এবং প্রতিমায় তাহাই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে বীণাধরা দাক্ষিণ্যমূর্তি শিবের যে ধ্যান-কল্পনা সুপরিচিত, তাহার সঙ্গে এই প্রতিমাগুলির আত্মীয়তা সুস্পষ্ট।

শিবের সদাশিব রূপ-কল্পনাও বোধ হয় দক্ষিণ-ভারতের দান। বাংলাদেশে সদাশিব মূর্তি নানা জায়গা হইতেই পাওয়া গিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন মূর্তি বোধ হয় তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালের (কলিকাতা-চিত্রশালা)। কিন্তু তৃতীয় গোপালদেবের রাজ্যকালের হইলেও এই রূপ-কল্পনা মোটামুটি সেন-পর্বেরই রচনা এবং তাহাও কতকটা বোধ হয় দক্ষিণ-ভারতীয় প্রভাবে। বাংলার সদাশিব প্রতিমাগুলির

সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের সদাশিব রূপ-কল্পনার আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ। সেন-বংশের পারিবারিক দেবতা ছিলেন সদাশিব, এবং তাঁহারা হয়ত উত্তর-ভারতীয় আগমান্ত সদাশিব ধ্যান-কল্পনার দক্ষিণ-ভারতীয় রূপ বাঙলাদেশে প্রবর্তিত করিয়া থাকিবে।

শিবের উমা-মহেশ্বরের মূর্তিও এই পর্বে সুপ্রচুর। তন্ত্রধর্মের কেন্দ্র বাঙলাদেশে শিবউরুতে সুখাসীনা, শিবকণ্ঠবিলগ্না উমার এবং মহেশ্বরের যুগল মূর্তির ধ্যান-কল্পনা সমাদৃত হইবে, বিচিত্র কি! উত্তর-বঙ্গে প্রাপ্ত (কলিকাতা-চিত্রশালা) উমা-মহেশ্বরের একটি প্রতিমা দ্বাদশ শতকীয় ভাস্কর-শিল্পের একটি সুন্দর নিদর্শন।

বাঙলাদেশে গাণপত্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রসারের কোনো প্রমাণ এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই; তবে, ঢাকা জেলায় মুন্সীগঞ্জের একটি পঞ্চমুখ, দশভুজ, গর্জমান সিংহোপরি উপবিষ্ট গণেশের প্রতিমা পূজিত হয়। মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছিল রামপালের ধ্বংসা শেষের মধ্যে। এই মূর্তিটি বোধ হয় গাণপত্য সম্প্রদায়-কল্পিত ধ্যানানুযায়ী রচিত এবং ইহার রূপ একান্তই দক্ষিণ-ভারতীয় প্রতিমা শাস্ত্রের অনুমোদিত। প্রতিমাটির প্রভাবলীতে ছয়টি ছোট ছোট মূর্তি রূপায়িত; এই ছয়টি মূর্তি গাণপত্য সম্প্রদায়ের ছয়টি শাখার প্রতীক।

কার্তিকেয়ের স্বতন্ত্রমূর্তি দুর্লভ; কিন্তু এই পর্বের একটি স্বতন্ত্র কার্তিকেয় প্রতিমা কলিকাতা-চিত্রশালায় রক্ষিত আছে (উত্তর-বঙ্গে প্রাপ্ত); ময়ূর-বাহনের উপর মহারাজ লীলায় কার্তিকেয় উপবিষ্ট, দুই পাশে দেবসেনা ও বল্লীনামে পত্নীদ্বয়। এই প্রতিমাটি দ্বাদশ শতকীয় ভাস্করশিল্পের সুন্দর অভিজ্ঞান।

শক্তি প্রতিমার মধ্যে এই পর্বের কয়েকটি প্রতিমা খুব উল্লেখযোগ্য। উত্তর-বঙ্গে প্রাপ্ত এবং বর্তমানে কলিকাতা-চিত্রশালায় রক্ষিত একটি চতুর্ভুজা দেবীপ্রতিমার এক হাতে পদ্ম, এক হাতে দর্পণ; তাঁহার দক্ষিণে গণেশ,বামে পদ্মকলিধৃতা একটি নারী; প্রতিমার পাদপীঠে গোধিকার প্রতিকৃতি। লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একটি দেবীপ্রতিমাকে উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হইয়াছে চণ্ডী। দেবী চতুর্ভুজা এবং সিংহবাহিনী। প্রতিমাটিতে চণ্ডী যে কেন বলা হইয়াছে, বলা কঠিন, কারণ চণ্ডীর যে রূপ-বর্ণনা প্রতিমাশাস্ত্রে সচরাচর দেখা যায় তাহার সঙ্গে এই প্রতিমাটির কোনো মিল নাই। শারদাতিলকতন্ত্রে এই ধরনের প্রতিমার নামকরণ করা হইয়াছে ভুবনেশ্বরী। পাল-পর্বের শক্তি-প্রতিমা প্রসঙ্গে ঢাকা জেলার শক্ত গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিত্রশালা) একটি মহিষমর্দিনা প্রতিমার কথা বলিয়াছি; মূর্তিটি দ্বাদশ শতকীয় শিল্পের নিদর্শন এবং সেই হেতু সেন-পর্বের বলাই সংগত। কিন্তু লক্ষ্যণীয় হইতেছে এই যে, পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিটিতে প্রতিমাটিকে বলা হইয়াছে "শ্রী-মাসিক-চণ্ডী।" এই যুগে সব দেবী মূর্তিকেই কি চণ্ডী বলা হইত? পাল-পর্বে আলোচিত, বাখরগঞ্জ জেলার শিকারপুর গ্রামের উগ্রতারার প্রতিমাটিও বোধ হয় এই পর্বেরই, এবং তান্ত্রিক শক্তিধর্মের নিদর্শন।

দেবীর চামুণ্ডারূপের দুই চারিটি প্রতিমাও পাওয়া গিয়াছে এই পর্বের বাঙলাদেশে। কিন্তু ইহাদের নূতন করিয়া উল্লেখের কিছু নাই।

একাধিকবার বলিয়াছি, বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন ছিলেন সূর্যভক্ত, পরমসৌর। সূর্যদেবের পূজা আরও প্রসার লাভ করিয়াছিল এই পর্বে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কুলজীগ্রন্থমালার ঐতিহ্য স্বীকার করিলে মানিতে হয়, বাঙলাদেশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা শশাঙ্কের আমলেই আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু গয়া-জেলার গোবিন্দপুর লিপি এবং বৃহদ্ধর্মপুরানের সাক্ষ্য একত্র করিলে মনে হয়, তাঁহাদের প্রসার ঘটিয়াছিল সেন-বর্মণ পর্বেই। কিন্তু যখনই হউক, এ তথ্য সুবিদিত যে, শাকদ্বীপী মগ ব্রাহ্মণেরাই উদীচ্যবেশী সূর্য-প্রতিমা ও তাহার পূজা ভারতবর্ষে প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এবং ক্রমশ পূর্ব-ভারতে তাহা প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছিল। এই পর্বের একাধিক সূর্য-প্রতিমা বিদ্যমান, কিন্তু একটি প্রতিমা ছাড়া অন্যগুলি সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। এই ত্রি-শির দশভুজ সূর্য-প্রতিমাটি পাওয়া গিয়াছে রাজসাহী জেলার মান্দা গ্রামে। তিনটি মুখের দুই পাশের দু'টি উগ্ররূপের, এবং দশ হাতের আটটিতে পদ্ম, শক্তি, খট্বাঙ্গ, নীলোৎপল এবং ডমরু। সারদাতিলকতন্ত্র-মতে এই ধরনের সূর্যমূর্তিকে বলা হয় মার্তণ্ড-ভৈরব, অর্থাৎ সূর্য এবং ভৈরবের মিশ্ররূপ। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই উদীচ্যবেশী সূর্য-প্রতিমা ও তাহার পূজা বোধ হয় সেন-বর্মণ পর্বের পর বেশি দিন আর প্রচলিত থাকে নাই; অন্তত মধ্যযুগীয় সুবিস্তৃত সাহিত্যে তাহার পরিচয় কিছু পাইতেছি না। পদ্মোপরি স্থানক ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ সূর্যদেব, দুইপাশে ঊষা ও প্রত্যূষা দুই স্ত্রী, এবং পায়ের কাছে সম্মুখেই অরুণ-সারথি; রূপ কল্পনার দিকে হইতে এই প্রতিমার সঙ্গে স্থানক ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ বিষ্ণু, দুই পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী নামে দুই স্ত্রী এবং পায়ের কাছে সম্মুখেই বাহন গরুড়, এই প্রতিমার পার্থক্য কিছু বিশেষ নাই। তাহা ছাড়া বিষ্ণুর সঙ্গে সূর্যের একটা সুপ্রাচীন বৈদিক সম্পর্ক তো ছিলই। কাজেই, অন্তত বাঙলাদেশে বিষ্ণুর পক্ষে সূর্যকে গ্রাস করিয়া ফেলা কিছু কঠিন হয় নাই।

অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিমার মধ্যে মনসার কথা আগেই বলিয়াছি। হারিতী ও ষষ্ঠী দেবীর কথাও বলা হইয়াছে। রাজসাহী জেলার মীরপুর গ্রামে একটি এবং বগুড়া জেলার সান্ত গ্রামে একটি ষষ্ঠী-প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে; উভয় ক্ষেত্রেই দেবীর ক্রোড়ে একটি মানবশিশু এবং দোলায়মান দক্ষিণপদের নীচেই একটি মার্জার। দিকপালদের দুই চারিটি প্রতিমার খবরও পাওয়া যায়।

গীতগোবিন্দ-রচয়িতা কবি ও সঙ্গীতকার জয়দেবের বিষ্ণু বা হরিভক্তি বিষয়ক কয়েকটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে উদ্ধার করা হইয়াছে; কবি শরণদেব-রচিত শ্লোকও আছে। কিন্তু জয়দেব শুধু রাধা-মাধব স্তুতিই রচনা করেন নাই; তিনি নিজে একান্ত-ভাবে বৈষ্ণবও ছিলেন না, ছিলেন পঞ্চদেবতার উপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ গৃহস্থ। তাঁহার

রচিত মহাদেব-স্তুতি বিষয়ক শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত আছে (১।৪।৪)। শিব-গৌরীর বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে যে ধরনের চিত্র ও কল্পনা বিস্তৃত ঠিক সেই ধরনের চিত্র ও কল্পনার সাক্ষাৎ পাইতেছি এক অজ্ঞাতনামা কবি রচিত সদুক্তিকর্ণামৃত-ধৃত নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে ঃ

ব্রহ্মায়ং—বিস্ফুরেষ—ত্রিদশপতিরসৌ-লোকপালাস্তুথৈতে
জামাতা কোহত্র ? সোঽসৌ ভুজগপরিবৃতো ভস্মরূক্ষঃ কপালী !
হা বৎসে বঞ্চিতাসীত্যনভিমতবর প্রার্থনাব্রীড়িভিব্
দেবীভিঃ শোষ্যমানাপ্যুপচিত পুলকা শ্রেয়সে বোঽস্তু গৌরী ॥

শ্লোকটি পড়িলে মনে হয়, ভারতচন্দ্রের শিব-গৌরীর বিবাহ-বর্ণনা পড়িতেছি। এই অজ্ঞাতনামা কবিটি কি বাঙালী ছিলেন ?

সদুক্তিকর্ণামৃতে কালী সম্বন্ধেও কয়েকটি শ্লোক আছে, এবং ইহাদের কয়েকটি বাঙালী কবি বিরচিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সব শ্লোকে কালীর যে চিত্র বা ধ্যান, তাহা আমাদের মধ্যযুগীয় বা বর্তমান ধ্যান-কল্পনা হইতে পৃথক। মুসলমানাধিকারের পর বাঙালীর কালী ধ্যান-কল্পনায় পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে ; বলিয়া মনে হইতেছে। কি কারণে কি উপায়ে তাহা হইয়াছে তাহা অনুসন্ধানের বস্তু।

উমাপতি-ধরের একটি শ্লোকে কার্তিকের শিশুলীলার বর্ণনা আছে ; পিতা শিবের বেশভূষা অনুকরণ করিয়া শিশু কার্তিক খুব কৌতুক অনুভব করিতেছেন। জলচন্দ্র নামে আর একজন কবি (বোধ হয় বাঙালীই হইবেন) অন্য আর একটি শ্লোকে শিশু কার্তিকের একটি ছবি আঁকিয়াছেন , সে-চিত্রে কার্তিক পিতা শিবের জটাজুট লইয়া ক্রীড়ারত।

সদুক্তিকর্ণামৃতের অনেকগুলি শ্লোকে দরিদ্র ভিখারী শিবের গৃহস্থালীর বর্ণনা আছে। এই সব ছবি মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে এত সুপ্রচুর এবং সাধারণ পল্লীবাসী গৃহস্থ বাঙালীর চিত্তের এত নিকট যে, মনে হয়, ইহাদের রচয়িতারা বুঝি বা বাঙালীই ছিলেন। যাহা হউক, এ-তথ্য নিঃসংশয় যে, এই ধরনের কার্তিক বা শিব-কল্পনার সূচনা মুসলমানাধিকারের আগেই দেখা গিয়াছিল।

গঙ্গাভক্তি বাঙালীর সুপ্রাচীন , সদুক্তিকর্ণামৃতে গঙ্গা সম্বন্ধে অনেকগুলি শ্লোক আছে। তাহার মধ্যে একটি বাঙালী কেবট বা কেওট কবি পপীপের রচনা ঃ

বদ্ধাঞ্জলি নৌমি—কুরু প্রসাদম্, অপূর্বমাতা ভব, দেবি গঙ্গে !
অন্তে বয়স্যাঙ্কগতায় মহ্যম অদেয়বন্ধায় পয়ঃ প্রযচ্ছ।

আর একটি বঙ্গালদেশীয় অজ্ঞাতনামা এক কবির রচনা ; তিনি নিজের বাণী বা ভাষাকে গঙ্গার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। প্রচুর জল বিশিষ্ট, গভীর, বঙ্কিম, মনোহর এবং কবিদের দ্বারা কীর্তিত বা উপজীবিত গঙ্গায় অবগাহন করিলে (দেহ মন) যেমন পবিত্র হয়, তেমনই ঘনরসময়, গভীর অর্থবহ, ব্যঞ্জনাযুক্ত, মনোহর এবং কবিদের দ্বারা

উপজীবিত বঙ্গালবাণী বা ভাষায় অবগাহন করিলে পবিত্র হওয়া যায়। শ্লোকটি অন্যত্র উদ্ধার করিয়াছি, পুনরুক্তিভয়ে এখানে আর করিলাম না।

৮

সেন-বর্মণ পর্বের বাংলায় বৌদ্ধ দেবদেবী প্রতিমাও যে দুই চারিটি পাওয়া যায় নাই, এমন নয়, তবে ইহাদের সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই। এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, ইতিহাসের পর্বে বৌদ্ধধর্ম ও দেবদেবীর প্রভাব-প্রতিপত্তি কমিয়া আসিতেছিল। দুই চারিটি বিহার ছিল, অভয়াকরগুপ্তের মত দুই চারিজন ধর্মাচার্যও ছিলেন; কিন্তু এই সব বিহার ও আচার্যদের সেই প্রভাব-প্রতিপত্তি আর ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের কথা ছাড়িয়া দিলেও উত্তর ও পূর্ববঙ্গে যেখানে সাড়ে তিন শত বৎসর ধরিয়া সর্বত্র নব বৌদ্ধধর্মের নিঃসংশয় প্রভাব সক্রিয় ছিল সেখানেও দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকীয় বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রতিমা বিরল। বস্তুত, রামপালের পর বৌদ্ধ ধর্মে উৎসাহী কোনো নামও বিশেষ শোনা যাইতেছেনা। দুই চারিখানা পুঁথি এখানে ওখানে লেখা হইতেছিল, সন্দেহ নাই, যেমন, হরিবর্মার রাজত্বকালে লিখিত দুইখানা পুঁথি কিছুদিন আগে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সাধারণভাবে সেন ও বর্মণ রাজবংশ বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের উপর খুব শ্রদ্ধিত ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, এবং প্রত্যক্ষ অত্যাচারে না হউক পরোক্ষ নিন্দায় এবং অশ্রদ্ধায় বৌদ্ধদের উৎপীড়িত করিবার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে বলা হইয়াছে, ত্রয়ী বা তিন বেদবিদ্যাই হইতেছে পুরুষের আবরণ এবং তাহার অভাবে পুরুষেরা নগ্ন। এই উক্তিতে বেদবাহ্য বা বেদবিরোধী বৌদ্ধ, নাথ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের প্রতি যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ তাহা আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে হরিবর্মার মন্ত্রী ভট্ট-ভবদেবকে যখন বলা হইয়াছে "বৌদ্ধাম্ভোনিধি-কুম্ভ-সম্ভব-মুনিঃ" এবং "পাষণ্ড-বৈতণ্ডিক-প্রজ্ঞা-খণ্ডন-পণ্ডিতঃ"। বেদবাহ্য বৌদ্ধদের পাষণ্ড বলিয়া অভিহিত করা যেন এই পর্ব হইতেই ক্রমশ রীতি হইয়া দাঁড়াইল। বল্লালসেন তাঁহার দানসাগর-গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বলিতেছেন, পাষণ্ড (অর্থাৎ বৌদ্ধ) কর্তৃক প্রক্ষিপ্তদোষে দুষ্ট বলিয়া বিষ্ণু ও শিবপুরাণ দানসাগর-গ্রন্থে উপেক্ষিত হইয়াছে। অন্য আর একটি শ্লোকে তিনি বলিতেছেন, এই একই কারণে দেবীপুরাণও ঐ-গ্রন্থে নিবদ্ধ হয় নাই। এই গ্রন্থেরই উপসংহারে একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে, কলিযুগে বল্লালসেন-নামা, শ্রী ও সরস্বতী পরিবৃত প্রত্যক্ষ নারায়ণের আবির্ভাবই হইয়াছিল ধর্মের অভ্যুদয়ের জন্য এবং নাস্তিকদের (বৌদ্ধদের, নাথপন্থী প্রভৃতিদের) পদোচ্ছেদের জন্য। লক্ষ্মণসেন হয়তো বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট এতটা ছিলেন না। তাঁহার তর্পণদীঘি-শাসনে এক বৌদ্ধ-বিহারের খবর পাওয়া যাইতেছে, এবং তাঁহারই আদেশে বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেব

পাণিনি-ব্যাকরণ আশ্রয় করিয়া লঘুবৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাধারণ ভাবে সেন-বর্মণ রাষ্ট্র বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধিত ছিলেন না, এমন অনুমান কঠিন নয়। বৌদ্ধ দেবদেবীর বিরলতাই তার অন্যতম যুক্তি।

জীবজগতের বিবর্তনের নিয়ম মানব-সমাজের ইতিহাসেও সক্রিয়। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধর্মে একটা সংঘর্ষ যেমন বহু যুগ হইতে চলিতেছিল তেমনই সঙ্গে সঙ্গে নানাস্তরে নানা ক্ষেত্রে নানা উপায়ে একটা সমন্বয়ও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। ইহাই বস্তুর স্ব-ভাব। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ইতিহাসেও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। কিন্তু প্রাচীনতর কালের কিংবা সর্বভারতের কথা এখানে বলিয়া লাভ নাই ; বাংলা দেশের অষ্টম-নবম হইতে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ এই চার পাঁচশত বৎসরের কথাই বলি। পাল-চন্দ্র পর্বে রাষ্ট্রের আনুকূল্যের ফলে এবং নানা সাময়িক ও রাষ্ট্রীয় কারণে মহাযানী-বজ্রযানী সহজযানী-কালচক্রযানী বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রসার ও প্রতিপত্তি দেখা গিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রয়ী লোকের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী এবং সেই ধর্মের দেবদেবীদের প্রভাব প্রতিপত্তিও কিছু কম ছিল না। দুই ধর্মের লোকদের সাধারণ লোকায়ত স্তরে ধর্ম লইয়া দ্বন্দ্ব কোলাহল খুব যে ছিল, মনে হয় না, কিন্তু উপরের স্তরে ধর্ম ও সংস্কৃতির নায়কদের মধ্যে একদিকে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ যেমন ছিল তেমনই অন্য দিকে একটা সমন্বয়ের সচেতন চেষ্টাও ছিল। নিম্নস্তরে ক্রিয়াকর্মের অবিরাম সাযুজ্য ও সারূপ্য এই সমন্বয়ের কাজটা সহজও করিয়া দিয়াছিল। সদ্যোক্ত দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ, ধ্যান ও রূপ-কল্পনা উভয় ক্ষেত্রেই ছিল সক্রিয়।

এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান। চীনা শ্রমণ-পরিব্রাজকদের বিবরণীতে, শীলভদ্রের জীবনকাহিনীতে তিব্বতী ঐতিহ্যে, ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাসে এই সব প্রমাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের নায়কদের তর্কবিতর্কের ইতিহাসই তো প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাস, এক কথায় ভারতীয় ধ্যান-ধারণার ইতিহাস। প্রত্যেকেই চেষ্টা করিতেন বিপরীত ধর্মকে আঘাত করিয়া নিজের ধর্মমতটি প্রতিষ্ঠা করিতে, এবং সর্বত্র যে তাহা খুব মার্জিত ভাষায় করা হইত তাহাও নয়। তর্কে পরাজয়ের অর্থই তো ছিল লজ্জা ও অপমান এবং প্রতিপক্ষের মতে ও ধর্মে দীক্ষা। এ-সব তথ্য এত সুবিদিত যে, বিস্তৃত ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন রাখে না। আলোচ্য পর্বের বাংলাদেশের দু'টি মাত্র প্রমাণ উদ্ধার করিলেই যথেষ্ট হইবে। সহজযানী সরহপাদ সহজযান মতবাদকে সমর্থন করিতে গিয়া অন্য সকল ধর্মমতকেই কঠোর ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন ; বর্ণাশ্রমকে অস্বীকার করিয়াছেন, বেদের কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, যাগ-যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছেন, কৃচ্ছ্রসাধনকেন্দ্রিক সন্ন্যাসধর্মকে আঘাত করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তিতে মহাযানীরা সূত্রের অর্থ না বুঝিয়া তাহার অপব্যাখ্যা করেন, শ্রমণেরা ভক্তশিষ্যদের ঠকাইয়া জীবিকানির্বাহ করেন, আর তর্ক তোলেন যে জৈনদের মত উলঙ্গ থাকিলেই যদি

সিদ্ধিলাভ ঘটে তাহা হইলে শৃগাল-কুকুরও সিদ্ধির অধিকারী। ভট্ট-ভবদেবের কথা তো আগেই বলিয়াছি ; তিনি তো সমগ্র বৌদ্ধজ্ঞান-সমুদ্র অগস্ত্যের মত নিঃশেষে পান করিয়াছিলেন এবং পাষণ্ড-বৈতণ্ডিকদের মত ও যুক্তি খণ্ডনে সিদ্ধ ছিলেন। আর, বল্লালসেনের জন্মই তো হইয়াছিল বৌদ্ধ-জৈনদের মত নাস্তিকদের পদোচ্ছেদের জন্য। অন্য দিকে মহাযানী-বজ্রযানী সকল বৌদ্ধরা, নাথপন্থীরা, জৈনেরা সকলেই বেদের নিন্দা করিতেন। সহজযানীরা তো ব্রাহ্মণ্য এবং বজ্রযানী দেবদেবী পূজার কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে করিতেন না, নিন্দা-বিদ্রূপও করিতেন। পাল এবং চন্দ্র রাজাদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা সুবিদিত, কিন্তু বৌদ্ধ এমন রাজা বা জননায়ক ছিলেন যাঁহারা ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সমসাময়িক কালের বাতাসে এই ধরনের পারস্পরিক অশ্রদ্ধার বিষ ছড়ানো না থাকিলে কিছুতেই তাহা সম্ভব হইত না। আচার্য করুণাশ্রীমিত্রের শিষ্যানুশিষ্য বিপুলশ্রীমিত্রের নালন্দা-লিপিতে আছে, বিপুলশ্রীমিত্রের যে-কীর্তির দ্বারা বসুমতী অলংকৃত হইয়াছিলেন সেই কীর্তি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল, (যেন) হরির (উচ্চ) পদ হইতে তাঁহাকে অপসারিত করিবার জন্যই! আর, রণবঙ্কমল্ল-হরিকালদেবের ময়নামতী লিপিতে আছে, হরিকালদেবের শুভ্র যশদ্বারা ত্রিজগত ইতস্তত আক্রান্ত হওয়ায় সহস্রলোচন ইন্দ্র নিজের প্রসাদ হইতে অবনীতে অবনমিত হইয়াছিলেন॥

এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কিছু প্রমাণ এক ধরনের বজ্রযানী দেবদেবী-কল্পনার মধ্যেও আছে। বজ্রযানী প্রসন্নতারা, বজ্রজ্বালাকরালী প্রভৃতি দেবতার সাধনমন্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতিকে বলা হইয়াছে মার। শিব দশভুজামারীচীর পদতলে পিষ্ট ; তাঁহাকে এবং গৌরীকে একত্র পদদলিত করিতেছেন ত্রৈলোক্যবিজয়। ইন্দ্র অপরাজিতার ছত্রধর ; ইন্দ্রানী পরমশ্বদ্বারা অপদস্থ। ইন্দ্র আবার উভয়বরাহানন-মারীচীর কৃপা-প্রার্থী ; তিনি আবার অষ্টভুজা মারীচী, পরমশ্ব ও প্রসন্নতারার পদতলে পিষ্ট। সিদ্ধিদাতা গণেশ অপরাজিতা, পর্ণশবরী এবং মহাপ্রতিসরার পদদলিত। অবলোকিতেশ্বরের অন্যতম রূপ হরিহরিহরিবাহনোদ্ভব-অবলোকিতেশ্বর গরুড়োপরি আসীন বিষ্ণুর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের উপর জয়ঘোষণা করিয়াছেন। সন্দেহ নাই, ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবদেবীদের কিছুটা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবার জন্যই এরূপ করা হইয়াছিল, তবে লক্ষণীয় এই যে, সাধনে যাহাই থাকুক, এবং অন্যত্র এই ধরনের রূপ-কল্পনার প্রতিমা-প্রমাণ যাহাই থাকুক, বাংলায় প্রাপ্ত মূর্তিগুলিতে সে-প্রমাণ নাই বলিলেই চলে। এখানে বজ্রযানী বৌদ্ধরা এতটা সম্মুখ সমরে বোধ হয় সাহসী হন নাই। বাংলার পর্ণশবরীর পদতলে গণেশ দলিত হইতেছেন না ; বাংলার সম্বরও ব্রহ্মাকে পদতলে পিষ্ট না করিয়া তাঁহাকে হস্তে ধারণ করিয়াছেন। রমাই-পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ অর্বাচীন গ্রন্থ, ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে নির্ভরযোগ্যও নয় ; কিন্তু ইহার মূল প্রেরণা যে বৌদ্ধ

ধর্মের এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে গণেশ হইতেছেন কাজী, ব্রহ্মা মহম্মদ, বিষ্ণু পয়গম্বর, শিব আদম, নারদ শেখ, এবং ইন্দ্র মওলানা। উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিদ্রূপ, সন্দেহ কি!

কিন্তু দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কথা যদি বলিলাম, মিলন-সমন্বয়ের কথাটাও বলি। আগে, গুপ্ত ও পাল-পর্বে, একাধিক প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, উচ্চকোটির স্তরে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ যাহাই থাকুক লোকায়ত দৈনন্দিন জীবনের স্তরে কিন্তু একটা মিলন-সমন্বয় ধীরে ধীরে চলিতেইছিল। খড়্গ, পাল ও চন্দ্র-বংশের রাজারা তো সজ্ঞানে ও সচেতন ভাবেই এই মিলন-সমন্বয়ের সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের রূপ-কল্পনায়ও তাহা প্রতিফলিত হইতেছিল। বৌদ্ধ দেবায়তনে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীরা যেমন স্থান পাইতেছিলেন তেমনই ব্রাহ্মণ্য আয়তনে বৌদ্ধ দেবদেবীরাও ঢুকিয়া পড়িতেছিলেন। বৌদ্ধ আয়তনের সরস্বতী বিঘ্ননাটক প্রভৃতি তো স্পষ্টতই ব্রাহ্মণ্য আয়তন হইতে গৃহীত; চর্চিকা ও মহাকাল দুই আয়তনেই বিদ্যমান। যোগাসন এবং লোকেশ্বর-বিষ্ণু ও ধ্যানী-শিব তো ধ্যানীবুদ্ধের আদর্শেই পরিকল্পিত। ব্রাহ্মণ্য বিষ্ণু ও শিবের প্রভামণ্ডলের উপরিভাগে উৎকীর্ণ ক্ষুদ্রাকৃতি দেবমূর্তির পরিকল্পনা একান্তই বৌদ্ধ-প্রতিমা ধ্যানীবুদ্ধের রূপ-কল্পনানুযায়ী। বৌদ্ধ তারাদেবী তো ব্রাহ্মণ্য আয়তনে কালী এবং দুর্গারই অন্য নাম। রুদ্রযামল ও ব্রহ্মযামল-গ্রন্থের একটি কাহিনীতে বশিষ্ঠকে আদেশ করা হইয়াছে, চীনদেশে গিয়া তারা ও তারাদেবীর সাধনার গুহ্য রহস্য শিখিয়া আসিবার জন্য। নিম্নে সাধনমালা হইতে বৌদ্ধ তারাদেবীর যে স্তোত্রটি উদ্ধার করিতেছি, তাহাতে দেখা যাইবে, তারাদেবী, উমা, পদ্মাবতী এবং বেদমাতা সকলে একই দেবীরূপে কল্পিতা হইয়াছেন। বস্তুত, লোকায়ত স্তরে ইঁহাদের মধ্যে পার্থক্য কিছু আর ছিল না।

দেবী ত্বমেব গিরিজা কুশলা ত্বমেব
পদ্মাবতী ত্বমসি [ত্বং হি চ] বেদমাতা।
ব্যাপ্তং ত্বয়া ত্রিভুবনে জগতৈকরূপা
তুভ্যং নমোঽস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ ॥

যানাত্রয়েষু দশপারমিতেতি গীতা
বিস্তীর্ণ যানিকজনা কক্ষশূন্যতেতি।
প্রজ্ঞাপ্রসঙ্গ চটুলামৃতপূর্ণধাত্রী
তুভ্যং নমোঽস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ ॥

আনন্দনন্দ বিরসা সহজ স্বভাবা
চক্রত্রয়াদ পরিবর্তিত বিশ্বমাতা।
বিদ্যুৎপ্রভা হৃদয়বর্জিত জ্ঞানগম্যা
তুভ্যং নমোঽস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ ॥

কিন্তু, এই মিলন-সমন্বয় সত্ত্বেও ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের দেবায়তন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুক্ষিগত হইয়া পড়িতেছিল। নালন্দার বৌদ্ধ বিহারে মন্দিরে দেখিতেছি, শিব, বিষ্ণু, পার্বতী, গণেশ, মনসা প্রভৃতিরা বৌদ্ধ দেবদেবীদের সঙ্গে সঙ্গেই পূজা পাইতেছেন। বাঙলার সোমপুর ও অন্যান্য বিহারের অবস্থাও এইরূপই ছিল, এ-অনুমানে কিছু বাধা নাই। ইহার পশ্চাতে সমসাময়িক বৌদ্ধধর্মের ঔদার্য এবং বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমন্বয়-ভাবনা বেশ কিছুটা সক্রিয় ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্বীকার করিতে হয়, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীরা ক্রমশ বৌদ্ধ দেবায়তন গ্রাস করিতেছিলেন এবং বৌদ্ধ গৃহী সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিতেছিলেন। সংখ্যা-গণনায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের লোকায়তন চিরকালই অনেক বেশি সমৃদ্ধতর। তাহা ছাড়া, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বাঙ্গীকরণ শক্তিও বৌদ্ধধর্মের চেয়ে বরাবরই ছিল বেশি। অন্য দিকে, পাল-আমলের শেষের দিক হইতেই, নালন্দা-মহাবিহারের অবস্থা ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল; জন-সাধারণের ভিতর, বিশেষভাবে উচ্চ ও মধ্যস্তরে, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাইতেছিল। বিহার ও বাঙলাদেশের অন্যান্য বিহারে-সংঘারামেও বোধ হয় তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বিশেষভাবে সেন-বর্মণ আমলে বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাজকীয় বিরাগ ও উচ্চ ও মধ্যকোটির লোকদের অনুদার দৃষ্টি, এবং অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সক্রিয় পোষকতা, এই দু'য়ের ফলে বৌদ্ধধর্মের ক্রমসংকুচীয়মান অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। সংঘে-বিহারে সিদ্ধাচার্য ও তাঁহাদের ভক্ত-শিষ্য প্রভৃতি যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহাদের সাধন-আরাধনা ক্রমশ গুহ্য হইতে গুহ্যতর পথে বিবর্তিত হইতে লাগিল। গৃহী-শিষ্যরা তাহার গূঢ় গুহ্য রহস্য যে খুব বুঝিতেন, এমন মনে হয় না; তাঁহাদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক লোক যাঁহারা এই পথ আঁকড়াইয়া রহিলেন তাঁহারা ইহার দেহমার্গী কায়সাধনাকে ক্রমশ পঙ্কের মধ্যে টানিয়া নামাইলেন। তাহা ছাড়া, পূজা, প্রতিমা ও অনুষ্ঠানের দিকটায়, অন্তত দৃশ্যত, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ ঘুচিয়া যাইতেছিল। লৌকিক মনের প্রতিমা-তৃষ্ণা মিটাইবার পক্ষে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের কোনো বাধা ছিল না; বস্তুত লোকায়ত মনে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিমায় রূপ ও অর্থের পার্থক্য তো ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। তন্ত্রের দিক হইতেও তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও আদর্শ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সাধনা উভয়কেই একই পর্যায়ে আনিয়া দাঁড় করাইতেছিল। কাজেই লোকায়ত সমাজে বৌদ্ধধর্ম ও সাধনার প্রভাব ক্রমশ কমিয়া আসিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। আজও বাঙলা-দেশে মেয়েরা মাটির তৈরি যে-শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন তাহার মাথায় একটি মাটির গুলি দেওয়া হয়; তাহার নাম বজ্র। বেলপাতা দিয়া তাহা সরাইয়া দিলে তবে তিনি শিবে পরিণত হইয়া পূজার যোগ্য হন।

অন্য দিকে, সমসাময়িক বৌদ্ধধর্ম ও দেবায়তনের প্রতি ব্রাহ্মণ্য জন-সমাজের

বিরাগানুরাগ যাহাই থাকুক, বুদ্ধদেবের প্রতি কিন্তু প্রাগ্রসর ব্রাহ্মণ্যচিন্তার প্রীতি ও অনুরাগ ক্রমশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল ; শুধু বাঙলাদেশেই নয়, সমগ্র উত্তর-ভারতেই। বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অনাতম অবতার বলিয়া স্বীকৃতি লাভ বহুদিন আগেই করিয়াছিলেন ; ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়ার প্রকৃতিই এইরূপ। এই স্বীকৃতি ক্রমশ অনুরক্তিতে পরিণত হইতে খুব দেরি হয় নাই। অষ্টম শতকে ব্রাহ্মণ কবি মাঘ তাঁহার শিশুপালবধ-কাব্যে বুদ্ধের প্রতি তাঁহার সপ্রশংস শ্রদ্ধা গোপন করিতে পারেন নাই। মারের সকল ভীতি ও প্রলোভনের মধ্যেও বুদ্ধের অবিকৃত চিত্তই তাঁহার প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল। একাদশ শতকে কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার অবদান-কল্পলতায় বলিতেছেন, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ ও অন্যান্য মুনিশ্রেষ্ঠগণ যে-কামসুখের জন্য বিকৃতচিত্ত হন সেই কামসুখকে যিনি তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিতে পারেন তিনি কাহার বিস্ময়ের পাত্র নহেন? এক সময়ে মৎস্য, বিষ্ণু, অগ্নি প্রভৃতি পুরাণে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাঁহার জন্মই হইয়াছিল অসুরগণকে মোহাবিষ্ট করিয়া দেবমার্গ হইতে তাহাদিগকে ভ্রষ্ট করিবার জন্য! কিন্তু সেদিন বহুদিন বিগত। আজ কিন্তু পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসারে দশাবতার স্তুতিতে বুদ্ধাবতার বেদবিরোধী বলিয়াই তাঁহাকে নমস্কার জানান হইতেছে! 'তুমি পশুহত্যা অবলোকন করিয়া কৃপাযুক্ত হইয়া বুদ্ধশরীর গ্রহণপূর্বক বেদ সকলের নিন্দা করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি যজ্ঞনিন্দা করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার।' বাঙলাদেশের কবি জয়দেবের কণ্ঠেও তাহার প্রতিধ্বনিই যেন শুনিতেছি ; গীতগোবিন্দের দশাবতার স্তোত্রে পাইতেছি :

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্
কেশবধৃত বুদ্ধ শরীরে জয় জগদীশ হরে।

আর, নৈষধ-রচয়িতা শ্রীহর্ষ যদি বাঙালী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিও সমসাময়িক বাঙালীর মনকেই ব্যক্ত করিতেছেন, যখন তিনি নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছেন মারজয়ী জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধের কথা, তাঁহার ক্ষমাশীলতা ও সৌন্দর্যের কথা। এইভাবে ধীরে ধীরে বেদবিরোধী, যজ্ঞবিরোধী বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ্য-ধ্যানের স্বাঙ্গীকৃত হইয়া গেলেন। বৌদ্ধধর্মের তন্ত্রমার্গী সাধনা ও ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রমার্গী সাধনার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া প্রায় এক হইয়া গেল। বৌদ্ধ দেবায়তন আর ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে প্রতিমার রূপ-কল্পনার পার্থক্য প্রায় আর রহিল না। ইহার পর লোকায়ত সমাজে ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম সক্রিয় সচেতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের কুক্ষিগত হইয়া পড়িতে আর দেরি হইল না।

তবু, বিহারে-সংঘারামে একটা বৃহৎ যতিগোষ্ঠি তো ছিলেনই ; তাঁহাদের মধ্যে তখনও স্বধর্মচেতনা সক্রিয়ও ছিল, যদিও সেন-বর্মণ আমলে তাহার পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ। কিন্তু, ইতিহাসের চক্রাবর্তে পড়িয়া সে-চেতনাও যেন দেখিতে দেখিতে ধূলায় পড়িল

লুটাইয়া। দেখিতে দেখিতে নালন্দা-বিক্রমশীল-ওদন্তপুরীর মহাবিহার তুর্কীসেনার তরবারী ও অশ্বক্ষুরে চূর্ণবিচূর্ণ হইল, হাজার হাজার পুঁথি বিনষ্ট হইল, শত শত শ্রমণ অসিমুখে বিগতপ্রাণ হইলেন। তাহার পর সর্বভুক্ অগ্নি শেষকৃত্য সম্পন্ন করিল। যাঁহারা কোনোমতে প্রাণ বাঁচাইতে পারিলেন তাঁহারা অতিকষ্টে যাহা পারিলেন, যে ক'টি পুঁথি, ক্ষুদ্র মূর্তি ও প্রতিমা ও সূত্রোৎকীর্ণ মাটির ফলক সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহা ঝুলিতে ভরিয়া পলাইয়া গেলেন তিব্বতে-নেপালে, কামরূপে-ওড়িষ্যায়, আরাকানে-পেগু-পাগানে এবং আরও দূরদেশে। আজ সেই সব গ্রন্থেরই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খণ্ডগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করিয়া আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এ সব তথ্য সুবিদিত, কাজেই সবিস্তারে বলিয়া লাভ নাই। মিনহাজ, তারনাথ, বুদ্ধগুপ্ত, পাগ-সাম-জোন-জাং-গ্রন্থের সংকলয়িতা সকলেই ইতিহাসের এই আবর্তের অল্পবিস্তর বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। নালন্দা-বিক্রমশীল-ওদন্তপুরীর শ্রমণেরা যাহা করিয়াছিলেন, বিশেষত মগধের বিহারগুলির ধ্বংসলীলার কথা শুনিয়া, বাঙলার সোমপুর, জগদ্দল প্রভৃতি বিহারের শ্রমণেরাও তাহাই করিলেন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই। সমসাময়িক বাঙলার ভাবাকাশ তো এমনিতেই তাঁহাদের প্রতি খুব অনুকূল ছিল না।

ব্রাহ্মণ্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পর সম্বন্ধ

সেন-বর্মণপর্বে বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্মের যত বিরাগই থাকুক না কেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ ছিল বলিয়া একেবারেই মনে হয় না। বরং এক সাম্প্রদায়িক ধর্মের সঙ্গে আর এক ধর্মের একটা নিবুক্ত অথচ গভীর সহৃদয় চেতনা বোধ হয় এই পর্বে বেশ সক্রিয় ছিল। বস্তুত, ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের দৃষ্টান্ত প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসে নাই বলিলেই চলে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও হরিহরের যুগলমূর্তি এই সহৃদয় চেতনার প্রকাশ বলিয়াই মনে হইতেছে; পাল-চন্দ্র ও সেন-বর্মণ পর্বে এই ধরনের বহু যুগলমূর্তি বিদ্যমান। এই দুই পর্বেই বিষ্ণুমূর্তির প্রাচুর্য অন্য যে কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিমার চেয়ে বেশি এবং বিষ্ণুভক্তরাই যে সংখ্যায় বেশি ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিষ্ণুভক্তের পক্ষেও শিব বা সূর্যপূজার কোনো বাধা ছিল না, অথবা শৈব বা সৌর হইলেই যে কেহ বিষ্ণু আরাধনা করিতেন না, এমনও নয়। ঊনকোটি এবং দেওপাড়া দুইই পরম শৈবতীর্থ, কিন্তু সেখানেও বিষ্ণু বিদ্যমান, এবং তিনিও শিবের সঙ্গে সঙ্গেই পূজা লাভ করিতেন। কমৌলি-লিপির বৈদ্যদেবের সম্প্রদায়গত পরিচয় পরম-মাহেশ্বর ও পরম-বৈষ্ণব উভয় রূপেই; ডোম্মনপাল পরম-মাহেশ্বর কিন্তু ভগবান নারায়ণকে শ্রদ্ধা জানাইতে তাঁহার কিছুমাত্র দ্বিধা জাগে নাই; লক্ষ্মণসেন পরম-বৈষ্ণব, তিনি, কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন তিনজনই তাঁহাদের লিপি আরম্ভ করিয়াছেন নারায়ণকে প্রণতি জানাইয়া, কিন্তু ইঁহাদের

প্রত্যেকেরই রাজকীয় শীলমোহরে যাঁহার প্রতিমা উৎকীর্ণ তিনি সদাশিব। ইঁহাদের পূর্বপুরুষেরা সকলেই কিন্তু আবার পরম শৈব। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন আবার সূর্যভক্তও এবং সূর্যদেবকেও প্রণতি জানাইতে তাঁহারা ভুলেন নাই; বস্তুত দুই জনই আত্মপরিচয় দিতেছেন পরমসৌর বলিয়া। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব সর্বসাধারণ্যে পরিচিত পরম-বৈষ্ণব বলিয়া, কিন্তু যথার্থত তিনি ছিলেন পঞ্চদেবতার উপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ। বস্তুত, জয়দেব যে যোগমার্গী পদও রচনা করিয়াছিলেন আচার্য সুনীতিকুমার সম্প্রতি তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। আচার্য হরপ্রসাদ দেখাইয়াছেন যে, কবি বিদ্যাপতি বৈষ্ণব মহাজন বলিতে আমরা যে সম্প্রদায়িক সাধক বুঝি, তাহা মোটেই ছিলেন না, সহজিয়া সাধক ও ছিলেন না, তিনি পঞ্চদেবতার উপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং শিবের, গঙ্গার ও উমার উপাসক ছিলেন। গীতগোবিন্দকার জয়দেব সম্বন্ধেও এই কথাই বলা চলে। বস্তুত সাম্প্রদায়িক ধর্মের এই পারস্পর সম্বন্ধই বাঙলার ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন পরিবার বৈষ্ণব বা শাক্ত বলিয়া পরিচিত, কিন্তু শাক্ত বা বৈষ্ণব বলিয়াই পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট কেহ নহেন। একই পরিবারে কেহ শাক্ত, কেহ বা বৈষ্ণব, কেহ বা তারার আরাধনায় রত, কেহ বা শিবের, কিন্তু তাহাতে অন্য দেবতার পূজারাধনায় কোনো বাধা নাই। ব্রাহ্মণ্য বাঙালী আজও একই সঙ্গে সমান উৎসাহে ও উদ্দীপনায় বিষ্ণু ও শিব, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, সূর্য ও কার্তিক এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে, অসংগতি কোথাও কিছু আছে বলিয়া মনে করে না। সেন-বর্মণ আমলেও অবস্থা প্রায় আজিকার দিনের মতই ছিল। এই সব স্মার্ত পৌরাণিক দেবদেবীদের সঙ্গে সঙ্গেই আবার সমান প্রচলিত ছিল নানা লৌকিক ব্রত, নানা লৌকিক, অ-স্মার্ত, অ-পৌরাণিক গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা।

৯

বৌদ্ধধর্মের অবশেষ

সেন-রাজবংশের অবশেষ যখন পূর্ববঙ্গে অধিষ্ঠিত তখনও বৌদ্ধধর্ম একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। ১২২০ খ্রীষ্ট শতকের পট্টিকের-রাজ্যাধিপ মহারাজ রণবঙ্কমল্ল-হরিকালদেবের রাজত্বকালে তাঁহার সহজধর্মী প্রধানমন্ত্রী দুর্গোত্তারার এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মাধবকরের নিদানের মধুকোষ নামীয় টীকার রচয়িতা বিজয়-রক্ষিতের উপাধি ছিল আরোগ্যশালীয়। আরোগ্যশালী ছিল বুদ্ধদেব এবং অবলোকিতেশ্বরের অন্যতম উপাধি; সেই হিসাবে বিজয়-রক্ষিতের বৌদ্ধ হওয়া বিচিত্র নয়। বিজয়-রক্ষিতের কাল ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ। ইহার কিছুকাল পরই বিশ্রুতকীর্তি গৌড়ীয় কবিভারতী রামচন্দ্রের আবির্ভাব। শ্রুতি, স্মৃতি, আগম, জ্যোতিষ, তর্ক, ব্যাকরণ প্রভৃতিতে সুপণ্ডিত রামচন্দ্র ক্রমে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন, এবং তাহার

ফলে নিগৃহীত ও অপমানিত হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১২৪৫ খ্রীষ্ট শতকের কিছু আগে তিনি সিংহলে চলিয়া যান, এবং সেই খানেই বাকী জীবন যাপন করেন। এই সিংহলে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সাধুতার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, এবং সমসাময়িক সিংহলরাজ পরাক্রমবাহু তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া বৌদ্ধাগমচক্রবর্তী উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বৃত্তরত্নাকরের একটি টীকা (বৃত্তরত্নাকর-পঞ্জিকা) রচনা করেন। ১২৮৯ খ্রীষ্ট শতকে অনুলিখিত পঞ্চরক্ষার একটি পাণ্ডুলিপিতে গৌড়েশ্বর পরমরাজাধিরাজ মধুসেন নামে এক নরপতির উল্লেখ আছে। এই মধুসেন কোন বংশোদ্ভব বা তাঁহার রাজত্ব কোথায় ছিল বলা কঠিন, কিন্তু এ-তথ্য নিঃসংশয় যে, তিনি ছিলেন পরমসৌগত বা বৌদ্ধ। সন্নগর বা বড়-নগরীর অধিবাসী মহাপণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর বনরত্ন (১৩৮৪-১৪৬৮) বাঙালী ছিলেন কিনা বলা কঠিন। বনরত্ন নেপালের ললিতপত্তনের গোবিন্দচন্দ্র-মহাবিহারে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছিলেন এবং সেখানে বসিয়া অনেক বৌদ্ধ-তন্ত্রগ্রন্থ, স্তোত্র ও টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন, অনেক গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদও করিয়াছিলেন। বনরত্ন কিছুকাল শ্রীজম্ভল-মহাবিহারেও ছিলেন। কিন্তু সন্নগর বা শ্রীজম্ভল যে কোথায় নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন। ১৪৩৬ খ্রীষ্ট শতকে জনৈক সদ্বৌদ্ধ করণ-কায়স্থ ঠক্কুর শ্রীঅমিতাভ বেণুগ্রামে বসিয়া সমসাময়িক বাঙলা অক্ষরে (শান্তিদেব রচিত) বোধিচর্যাবতার-পুঁথিটি নকল করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতকেও তাহা হইলে বাঙলাদেশে ইতস্তত দুই চারিজন বৌদ্ধ ছিলেন, এবং শান্তিদেবের পুঁথির চাহিদাও ছিল। তারনাথ বলিতেছেন, এই শতকেরই দ্বিতীয়পাদে ছগল বা চঙ্গলরাজ নামে জনৈক বাঙালী নরপতি রাণীর প্রভাবে পড়িয়া বৌদ্ধ হইয়া বুদ্ধগয়ার মঠগুলির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। এ-তথ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। এই শতকে যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কিছু লোক নবদ্বীপ অঞ্চলে বাস করিতেন, তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় জনৈক চূড়ামণি দাস লিখিত একখানা চৈতন্য-চরিতে এবং বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভগবতে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন, চূড়ামণিদাসের চৈতন্য-চরিতে নাকি চৈতন্যের জন্ম হওয়ায় বৌদ্ধদেরও উৎফুল্ল হইবার কথা লেখা আছে। কিন্তু বৌদ্ধরা উৎফুল্ল কেন হইয়াছিলেন, জানি না, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতের উক্তি সত্য হইলে স্বীকার করিতে হয়, বৌদ্ধদের প্রতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা অত্যন্ত বিদ্বিষ্টই ছিলেন। অবধূত নিত্যানন্দের তীর্থভ্রমণ'উপলক্ষে প্রভু যে সকল বৌদ্ধ দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি 'ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে'। যে চূড়ান্ত অবমাননাটুকু বাকি ছিল এইবার তাহা হইল। লাথি মারা সত্য সত্যই হউক বা না হউক, মনোভাবটা এইরূপই ছিল। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ কালে ত্রিপতি (তিরুপতি) ও বেঙ্কটগিরিতে যে-সব বৌদ্ধদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল তাঁহাদের কথা বলিতে গিয়া বৃদ্ধ

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চৈতন্য-চরিতামৃতে সেই সব বৌদ্ধদের বলিয়াছেন পাষণ্ডী, পাষণ্ডীগণ, এবং এই গ্রন্থেরই অন্যত্র বৌদ্ধদিগকে শবর, ম্লেচ্ছ ও পুলিন্দদের সঙ্গে এক পর্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ উল্লেখ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের অন্যত্রও আছে। বস্তুত, যুগমনোভাবটাই ছিল এইরূপ। কবি কর্ণপুরও চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধদিগকে পাষণ্ড বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বুদ্ধাবতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'ধরিয়া পাষণ্ড মত, নিন্দা করি বেদপথ, বৌদ্ধরূপী লেখে নারায়ণ'। বেশ বুঝা যাইতেছে, পঞ্চদশ শতক নাগাদ বাঙলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সম্প্রদায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল ; দুই চারিজন যাঁহারা তখনও এই ধর্ম আঁকড়াইয়া ছিলেন, ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বীরা তাঁহাদের খুব নীচুস্তরের জীব বলিয়াই মনে করিতেন।

বস্তুত, বৌদ্ধ ধর্ম তাহার স্ব-স্বতন্ত্র রূপে আর বাঙলাদেশে বাঁচিয়া নাই। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, বজ্রযান-মন্ত্রযান-কালচক্রযান-সহজযান বৌদ্ধধর্ম যথার্থত বহুদিন বাঁচিয়া ছিল সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মে, নাথপন্থী ধর্মে, অবধূতমার্গীদের ধ্যান ধারণায় ও অভ্যাসে, কৌল-মার্গীদের ধর্মে ও ধ্যান-ধারণায়, এবং আজও বহুলাংশে বাঁচিয়া আছে আউল-বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে। নাথপন্থীরা নিজেদের ক্রমে ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক শৈবধর্মে আত্মবিলীন করিয়া দিয়াছেন ; সহজিয়া তান্ত্রিক বৈষ্ণবধর্ম আজও কিছু কিছু বাঁচিয়া আছে এখানে সেখানে আনাচে কানাচে, এবং বঙ্গীয় কবিকুলের ধ্যান-কল্পনায় ; অবধূতমার্গীদের কিছু কিছু আচরণ বাঙলার লোকায়ত সমাজের সন্ন্যাসাচরণের মধ্যে এখনও লক্ষ্য করা যায় (যেমন, চড়কের গাজন-সন্ন্যাসের মধ্যে) ; কৌলমার্গীরা আত্মবিলীন হইয়াছেন ব্রাহ্মণ্য শাক্তধর্মে।

আর, বৌদ্ধধর্মের কথঞ্চিৎ অবশেষ যে লুকাইয়া আছে বাঙলার ও বাঙালীর কিছু কিছু স্থান-নাম ও লোক-নামের মধ্যে, তাহা আচার্য সুনীতিকুমার সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'বুদ্ধ' চলিত বাঙলার 'বুদ্ধু'তে রূপান্তরিত এবং 'বুদ্ধু' বলিতে আমরা বোকা বা মূর্খ'ই বুঝি ; বাঙলা রূপকথার 'বুদ্ধুভুতুম' আমাদের মনেরই পরিচয়। 'সংঘ' বর্তমান বাঙলার 'সাঙ্গাত' বা হিন্দী সংঘত (অর্থ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু) বা সংঘাতী বা সংঘাতিতে রূপান্তরিত। 'ধর্ম' কথাটির অর্থরূপান্তর ঘটিয়াছে প্রচুর ; কিন্তু বর্তমান বাঙলার ধামরাই (ঢাকা জেলা), পাঁচথুপী, বাজাসন, নবাসন, উয়ারী প্রভৃতি স্থান-নাম যথাক্রমে প্রাচীন ধর্মরথ, পঞ্চস্তূপী, বজ্রাসন, নবাসন, উপকারিকা (= সুসজ্জিত অস্থায়ী মণ্ডপ) প্রভৃতি বৌদ্ধ স্মৃতিবহ (বার শব্দটি ফার্সী, অর্থ দেশ, দেয়াল, মণ্ডপ, প্রাচীনতর উয়ারী বা উপকারিকা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বারোয়ারী)। নেড়ানেড়ী কথাটিও ইসলামোত্তর বাঙলায় প্রথমত বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদেরই বুঝাইত ; আর বৈষ্ণবের 'ভেক্' কথাটি এখন আমরা বিদ্রূপার্থে ব্যবহার করিলেও মূলত বৌদ্ধ 'ভিক্ষু' শব্দেরই ভ্রষ্ট রূপ। বাঙালীর

পালিত, ধর, রক্ষিত, কর, ভূতি, গুঁই, দাম বা দাঁ, পান বা পাইন প্রভৃতি অন্ত্যনামও বোধ হয় বৌদ্ধস্মৃতিবহ, যেমন চন্দ, চন্দ্র, আদিত্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যস্মৃতিবহ।

আজিকার বাঙালীর হিন্দুধর্মে তান্ত্রিকধর্মের টানাপোড়েন কি করিয়া বিস্তৃত হইয়াছে তাহার কিছু আভাস আগে দিতে চেষ্টা করিয়াছি। বৌদ্ধ বজ্রযান-মন্ত্রযান-কালচক্রযান-সহজযান এবং নাথযোগধর্ম, অবধূতমার্গ, কাপালিকমার্গ ও বাউল ধর্মের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কোথায়, তাহারও ইঙ্গিত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ-সম্বন্ধে আচার্য সুনীতিকুমারের নিম্নোক্ত মন্তব্য গভীর অর্থবহ ও ইঙ্গিতময়।

The present day Tantric leaven in Bengal Hinduism largely came to it *via* the Buddhistic *Kalacakrayana*, the *Vajrayana* and the *Sahajayana* school of *Tantrayana*. One matter in which there has been a very subtle influence from Tantric Buddhism upon Bengal Brahmanism would seem to be this : the rather exaggerated importance of the *guru* from whom Tantric initiation is received. The Brahmana has his proper Vedic initiation when he is invested with the sacred thread by the *upanayana* rite ; theoretically he does not require any other initiation. But, in practice, all good Hindus in Bengal should have a *guru* who will give him the *mantra* and the *guru* becomes almost as a god to him after his initiation. This mentality has become so throughly ingrained in the Bengali mind .. Now, the *guru* has always had an honoured place in Brahmana society ; but he was never an object of divine honours in Vedism Whereas, as we see in Nepal where the Tantric Buddhism as in Bengal of the 10th.—13th. centuries still survives among the Newars, although the strong Saiva or Sakta cult of the Gurkhas has been profoundly modfiying it, a Buddhist is known as a *Gubhaju* or a 'Guru-worshipper', and a Brahmanical Hindu as a *Debhaju* or a 'Deva worshipper'.

শেষ কথা

আদিপর্বের শেষ অধ্যায়ে সর্বত্র স্মার্ত ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই জয়জয়কার। লোকস্তরে লোকায়ত ধর্মের প্রবাহ সদাবহমান, সন্দেহ নাই ; কিন্তু উচ্চ ও মধ্যকোটি স্তরে, ব্রাহ্মণ্য বর্ণসমাজবদ্ধ স্তরে সুবিস্তৃত পৌরাণিক দেবায়তনের অসংখ্য দেবদেবীদেরই অপ্রতিহত প্রভাব। স্মৃতিশাসিত বর্ণসমাজ সেই প্রভাবকে আরও সংহত ও সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বৈদিক যাগযজ্ঞের এবং ধ্যান-কল্পনার কিছুটা প্রভাব যে নাই, এমন নয়, কিন্তু তাহা একান্তই কতকগুলি ব্রাহ্মণ বংশে সীমাবদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিলীয়মান ;

যেটুকু আছে তাহা গোষ্ঠীগত এবং বিহারে সংঘারামে অথবা ছোট ছোট কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ। তাহার সমস্ত সাধনপন্থাটাই গুহ্য এবং দেহযোগাশ্রয়ী। ব্রাহ্মণ্য শৈব এবং শক্তিধর্মও তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাসাচরণ দ্বারা স্পৃষ্ট। বস্তুত, জ্যোতিষ-আগম নিগম-তন্ত্রবিধৃত ধ্যান ধারণা-কল্পনাই এই যুগের প্রধান মানসাশ্রয়। তিথি-গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করিয়া স্নানাহার, বিভিন্ন তিথি-নক্ষত্রোপলক্ষে তীর্থস্নান দান, পূজা, হোম, যজ্ঞ, ব্রতাচরণ, এই সব তো ছিলই; তাহারই সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে ছিল নানা ভয়-বিশ্বাসের লৌকিক দেবদেবীর পূজা, প্রতীকের পূজা, ব্রতোৎসব, পার্বণ নানা প্রকারের যাত্রা উৎসব, ইত্যাদি। দেবদেবী, ভয়-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানের যেমন বিচিত্র স্তর, ধ্যান-ধারণারও তেমনই বিচিত্র স্তরে। এক প্রান্তে এক এবং অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের ধ্যান, আর এক প্রান্তে গাছ-পাথর-সাপ-কুমীরের ধ্যানে বিশ্বাস; এক প্রান্তে দেহকে অস্বীকার করিয়া তাহাকে নিপীড়িত করিয়া একমাত্র আত্মার শক্তি ও মহিমা প্রচার আর এক প্রান্তে একান্ত দেহগত সাধনারই জয়জয়কার, দেহযোগের শক্তি ও মহিমা প্রচার, দেহের বাইরে আত্মার কোনো অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার, এক প্রান্তে বেদের অপৌরুষেয়ত্বে এবং অমোঘত্বে বিশ্বাস, আর এক প্রান্তে বেদ-বেদাঙ্গ একেবারে অগ্রাহ্য; এক প্রান্তে সমস্ত পূজাচার, সমস্ত অনুষ্ঠান, সমস্ত তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্র সাধনে অকুণ্ঠ বিশ্বাস, আর এক প্রান্তে একান্ত অস্বীকৃতি ও বিদ্রূপ এবং বস্তুপ্রকৃতির জয় ঘোষণা; এক প্রান্তে বেদ-স্মৃতি পুরাণ, আর এক প্রান্তে প্রাগৈতিহাসিক আদিম মানবমনের ধ্যান কল্পনা। মাঝখানে বিচিত্র জীবনোপায় লইয়া বিচিত্রতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর। প্রত্যেকটি স্তরের অসংখ্য লোকের চিত্তে ও আচরণে সদ্যোক্ত ধ্যান ও ধারণ সমূহের বিচিত্র স্তবের অদ্ভুত জটিল বুনট।

দ্বাদশ অধ্যায়ের পাঠ-পঞ্জী

এ-অধ্যায়ের পাঠ-পঞ্জী দীর্ঘ। নানা বিভিন্ন সূত্রে নানা উৎস থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, কিছু প্রাচীন লিপিখানা থেকেও। এই সব বিচিত্র উৎসের যে-গুলি প্রধান ও অধিকতর অর্থবহ মাত্র সে-গুলিরই উল্লেখ করা হ'চ্ছে এই পঞ্জীতে।

প্রাচীন লিপিমালার তালিকা পরিশিষ্ট "খ"-এ পাওয়া যাবে; এখানে সে-সব লিপি বা লিপির সংকলনগ্রন্থ উল্লেখ করছিনা।

কিন্তু আধুনিক যে-সব রচনার দুয়ারে আমার বিশেষ ঋণ তার উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত; নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম; প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য; সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর ও খুলনার ইতিহাস; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, "শ্রীজয়দেব কবি," ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৫০; সুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড; শরৎচন্দ্র রায়, ভারতবর্ষের মানব ও মানব সমাজ, বঙ্গীয় সা-প-প, ১৩৪১, ৪র্থ সংখ্যা; যতীন্দ্র মোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, বানী চক্রবর্তী, সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন, কলিকাতা ১৯৬৪; দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, প্রাচীন বঙ্গে বেদ-চর্চা, হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ১ম খণ্ড, ২০২ পৃঃ; বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ, বিষ্ণুমূর্তি পরিচয়, ১৩১৭।

প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে যে সব গ্রন্থ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আমার কাজে লেগেছে, তার ও উল্লেখ করতে হয়।

অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সং, Gaekward Or. Ser.); বিষ্ণু, মৎস্য, মার্কন্ডেয়, স্কন্দ, গরুড়, ভবিষ্য, দেবী, পদ্ম, ভাগবত ও কালিকাপুরাণ (বঙ্গবাসী সং); বৃহদ্ধর্মপুরাণ (পঞ্চানন তর্করত্ন সং); ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সং, Bib. Ind. Ser.); জয়দেব, গীতগোবিন্দ, জীমূতবাহনের দায়ভাগ (কোলব্রুক সং), কালবিবেক (প্রমথনাথ তর্কভূষণ সং) কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্যচরিতামৃত; বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা (শরৎচন্দ্রদাস কৃত অনুবাদ); ভবদেব ভট্ট, কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি (অপ্রকাশিত), প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ (গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ সং); সাধনমালা (বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সং, Gaekwad Or. Ser.); শারদাতিলকতন্ত্র; সন্ধ্যাকরনন্দী, রামচরিত (বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি সং) প্রভৃতি। অন্যান্য যে-সব উৎস আমি ব্যবহার করেছি, গ্রন্থমধ্যেই তার উল্লেখ আছে।

Asiatic Society of Bengal, Calcutta, Descriptive Catalogue of Sanskrit manuscripts ..Buddhist Mss. Vol. I; Barua, B. M., "The Ajivikas", Journal of the Department of Letters, Vol. II, University

of Calcutta ; Bose, Nirmalkumar, The Spring festival of India", Man in India, VIII, 1927, pp. 112-85 ; Bagchi, P. C., Pre-Aryan and pre-Dravidian in India, University of Calcutta (ed. and trans.) ; Le Canon bouddhique in China, 2 Vols., Paris ; Materials for a Critical edition of the Bengali Caryapadas, Calcutta University ; Studies in the Tantras, Calcutta ; Banerji, R. D., Catalogue of Sculptures in the Vangiya Sahitya Parishad, Calcutta; Eastern Indian School of Mediaeval Sculptures, ASI Memoir ; Banerjee, J. N. Development of Hindu. Iconography, Vol. I, Ist. edn., Calcutta University ; Beal, S. (ed. and trans.), Si.yu-ki : Buddhist Records of the Western World, Vol. II, The Life of Hiuen Tsang ; Bhattasali, N. K., Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, Dacca ; Bhattacharya, Benoytosh, Buddhist Iconography, Ist. edn. Oxford ; Cambridge University Library, Catalogue of Buddhist Sanskrit Mss. in the , Introduction ; Chanda, R. P., Indo-Aryan Races, Vol. I. Ist. edn ; Archaeology and Vaishnava tradition, ASI. Memoir ; Chatterjee, Sunitikumar, Indo-Aryan and Hindi ; Origin and Development of the Bengali language, Vol. I, Introduction, Calcutta University ; "Buddhist Survivals in Bengal", in B. C. Law, Festschrift Volume, I, to. 75 ff. Chattopadhya, K. P., "Dharma Worship", Journal of the Asiatic Society of Bengal, Letters, VIII, 1942, p. 99 ; ff., "The Cadak festi val in Bengal, ibid, I. p. .97 ff. ; Cordier, P., Catalogue de fonde Tibetain de la Bibliotheque Nationale ; Dacca University, History of Bengal, I, ed. by R. C. Majumdar, Dacca, chaps XIII & XV ; Das, Sudhirranjan, Folk religion of Bengal, en unpublished disserta-tion, Calcutta University; Dasgupta, S. B., Obscure Religions Cults as background of Bengali Literature, Calcutta University ; Dikshit, K. N, Excavations at Paharpur, ASI. Memoir, Calcutta ; Fa-Hien, A Record of Buddhistic Kingdoms (trans. by Legge) ; Foucher, A., Etude sur l' Iconographie Bouddhique l' Inde, Paris ; Geiger, W. ed., Mahavamsa, P. T. S. edn. ; I-Tsing, A Record of the Buddhist Religion (tr. Takakusu) ; Paul, P. C., Early History of Bengal, II, Chaps. X & XI ; Ramachandran, T. N. "Recent archaeolrgical discoveries along the Mainamati and Lalmai ranges", B. C. Law Festschrift, II, p. 213 ff. ; Raychaudhuri, H. C., Early History of the

Vaishnava Sect, Calcutta University; Saraswati, S. K. Early Sculpture of Bengal, Calcutta ; Sastri, H. P., Discovery of Living Buddhism in Bengal, Calcutta ; Sen, Sukumar, "Is the cutt of Dharma a living relic of Buddhism in Bengal ?", B. C. Law Festchrift, I, p. 663 ff. ; Sumpa, Pag Sam Jon Zang (ed. by S. C. Das) ; Yuan Chwang, Vol. II (ed. by F. W. Watters) ; Chattopadhyaya ' Alaka, Atisa and Tibet, Calcutta ; Chattopadhyaya, Debiprasad, Taranath's History of Buddhism in India (ed. and trans)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভাষা-সাহিত্য : জ্ঞান-বিজ্ঞান : শিক্ষা-দীক্ষা

১

প্রাচীন বাঙলার, তথা প্রাচীন ভারতবর্ষের জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার ইতিহাস সাধারণত আমরা আরম্ভ করিয়া থাকি বেদ ব্রাহ্মণ-উপনিষদ লইয়া। উপাদানের অভাবে প্রাক্-বৈদিক কাল সম্বন্ধে আজও কিছু বলিবার উপায় নাই। কিন্তু বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদে, এমন কি ধর্মশাস্ত্র-ধর্মসূত্রে এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা প্রতিফলিত, বাঙলাদেশ বহুদিন তাহার স্পর্শও পায় নাই। ব্রহ্মাবর্ত ও আর্যাবর্তের হৃদয়দেশ হইতে বহুদূরে, আর্যাবর্তের প্রাচ্য প্রত্যন্তে অবস্থিত এই দেশে আর্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার ঘটিয়াছিল বহু বিলম্বে। কিন্তু তাহারও আগে এ-দেশে গৃহবদ্ধ, পরিবারবদ্ধ, সমাজবদ্ধ জনমানুষ বাস করিত; এবং তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং শিক্ষা-দীক্ষার একটা সংস্কারও ছিল, শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের একটা সংস্কৃতিও ছিল। এই সংস্কার ও সংস্কৃতিকে অনাগত কালের জন্য ধারণ করিয়া রাখে প্রত্যেক জন ও গোষ্ঠীর বিশিষ্ট লিপিবদ্ধ ভাষা। বস্তুত, লিপিবদ্ধ ভাষাই সেই বাহন যাহা এক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কার-সংস্কৃতিকে বহন করিয়া লইয়া যায় ভবিষ্যৎ যুগের দুয়ারে। কিন্তু সেই প্রাক্-আর্য নরনারীদের ভাষার লিপি কিছু ছিল না, থাকিলেও এ-পর্যন্ত আমাদের জানা নাই। কাজেই তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য আজ আমাদের দুয়ারে আসিয়া পৌঁছে নাই। তবে, তাঁহাদের শিল্প-সাহিত্য নৃত্যগীতের, অর্থাৎ চলমান সংস্কৃতির কিছুটা ধরিতে পারা সম্ভব আদিম কৌমসমাজের যে-সব নরগোষ্ঠী আজও আমাদের মধ্যে বিচরমান তাঁহাদের শিল্প-সাহিত্য-নৃত্যগীতে, এক কথায় তাঁহাদের সামগ্রিক জীবনচর্যায়।

প্রাক্-আর্য ভাষার কথা

প্রাক্-আর্য প্রাচ্য ভারতীয় নরনারীর ভাষা লইয়া আলোচনা গবেষণা হইয়াছে প্রচুর, আজও হইতেছে। ভাষাতাত্ত্বিকদের সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত গবেষণার ফলে আজ আমরা জানি, প্রাচ্য ভারতের, তথা বাঙলার সর্বপ্রাচীন ভাষা ছিল (যতটুকু নির্ণয় করা যায়) অস্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষা, এবং সেই ভাষার ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা ছিল মন্-খ্মের ভাষা-পরিবারের সঙ্গে; কিছুটা আত্মীয়তা কোল-মুণ্ডা ভাষ-পরিবারের সঙ্গেও ছিল। এই মুণ্ডা-মন্-খ্মের ভাষা-ভিত্তির উপর নূতন পলি রচনা করিয়াছিল দ্রাবিড় ভাষা-পরিবারের স্রোত, বিশেষভাবে বাঙলার পশ্চিমাঞ্চলে এবং কিছুটা মধ্য-বাঙলায়ও। পূর্ব ও উত্তর-বাঙলায় দ্রাবিড় ভাষার পলি বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই, মোটামুটি এ-কথা বলা

চলে। পশ্চিম ও মধ্য-বাঙলায়ও দ্রবিড় ভাষার প্রভাবের বিস্তৃতি ও গভীরতা কতটা ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় আজও নাই। পূর্ব ও উত্তর-বাঙলায় প্রাচীনতর মুণ্ডা-মন্‌খ্‌মেরমূল ভাষার উপর তৃতীয় একটি ভাষাস্রোত আপন প্রবাহ মিশাইয়াছিল; সে-ভাষা ভোটব্রহ্ম নরগোষ্ঠীর ভাষা, প্রাচীন কিরাতজনদের ভাষা। নানা নরগোষ্ঠীকে আশ্রয় করিয়া নানা ভাষার এই জটিল সংমিশ্রণের সূচনা বাঙলাদেশে, তথা প্রাচ্য-ভারতে আরম্ভ হইয়াছিল খ্রীষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী আগে হইতেই।

বেদ ব্রাহ্মণের আর্য ঋষিরা প্রাচ্য ভারতকে খুব সুনজরে দেখিতেন না, এ-কথা তো আগেই একাধিক প্রসঙ্গে বলিয়াছি। তাহার অন্যতম প্রধান কারণ প্রাচ্য নরনারীর ভাষা ছিল তাঁহাদের নিকট দুর্বোধ্য, অর্থহীন। অথর্ববেদের ঋষিদের কাছে প্রাচ্যদেশ বহু দূরদেশ; শতপথ-ব্রাহ্মণে এ-দেশের লোকেরা 'আসুর্য' অর্থাৎ অসুরপ্রকৃতি বিশিষ্ট; ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এ-দেশ দস্যুদের দেশ; বৌধায়ন-ধর্মসূত্র রচনাকালেও এ দেশ অস্পৃশ্যদের দেশ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে প্রাচ্য ভারতে আর্যভাষার প্রসার ঘটিতে আরম্ভ করিল এবং বোধ হয় কিছু কিছু আর্য-সংস্কৃতিরও; তবে, যতটুকু জানা যায়, এই আর্যভাষা ও সংস্কৃতি, দীর্ঘমুণ্ড ঋগ্বেদীয় আর্যভাষা ও সংস্কৃতি নয়, হ্রস্বমুণ্ড অ্যালপীয় আর্যদের ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রীয়ার্সন যাঁহাদের বলিয়াছেন 'বহিরার্য'। এই অ্যালপীয় (বা অ্যালপো দীনারীয়) আর্যরা ছিলেন অবৈদিক এবং সেই-হেতু 'অযজ্ঞ্য' অর্থাৎ যজ্ঞধর্মবিরোধী। অথর্ববেদের এবং পাণিনি-ব্যাকরণের সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, প্রাচ্য-ভারতীয় ব্রাত্যদের ভাষা আর্যপরিবারের হইলেও সে-ভাষা ঋগ্বেদীয় আর্যভাষা হইতে পৃথক এবং তাহার 'প্রাকৃত'-লক্ষণ সুস্পষ্ট। এ-তথ্য লক্ষণীয় যে, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী এবং অন্যান্য বীরগাথা যাঁহারা গাহিয়া বেড়াইতেন তাঁহাদের বলা হয় 'সূত' এবং 'মাগধ', এবং বাজসনেয়ী-সংহিতায় মগধের লোকদের বলা হইয়াছে 'তীক্ষ্ণ বা উচ্চস্বর বিশিষ্ট' (অতিক্রুষ্টায় মাগধম্)। যাহাই হউক, এ-পর্যন্ত যে সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের গোচর তাহাতে অনুমান করা চলে, ভারতের পূর্বাঞ্চলের আর্যভাষা উত্তর-ভারতীয় আর্যভাষা হইতে ছিল পৃথক, এবং তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও কিছু কিছু ছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী পাণিনি সেই জন্যই তাঁহার ব্যাকরণে বিশেষভাবে প্রাচ্য 'সংস্কৃত' ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গির বিশেষ উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন, এবং প্রাচ্য বৈয়াকরণিকদের বিশিষ্ট মতামত উল্লেখ করিতেও ভুলেন নাই। প্রসঙ্গত এ-কথা বলা উচিত, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে গৌড় এবং গণপাঠে বঙ্গের উল্লেখ আছে। এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, পাণিনি উদীচ্য বা উত্তরাখণ্ডের ভাষাকেই আর্যভাষার মাপকাঠি বলিয়া মনে করিতেন এবং প্রাচ্য ভাষার বিচারও সেই ভাবেই করিয়াছেন। কৌষীতকি-ব্রাহ্মণেও সুস্পষ্ট বলা হইয়াছে, 'উদীচ্যখণ্ডের ভাষাই শুদ্ধ ও মার্জিততর; লোকেরা সেইজন্যই ভাষা শিখিবার জন্য উত্তরে গিয়া থাকে, এবং সেখান হইতে যিনি আসেন তাঁহার ভাষা

শুনিতে ভালবাসে।' উত্তর ও মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার সঙ্গে প্রাচ্য-ভারতের ভাষার পার্থক্য পতঞ্জলিরও দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, পূর্বাঞ্চলের লোকেরা বিশেষ অর্থে কতকগুলি অদ্ভুত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে, এবং 'র' স্থানে 'ল' ব্যবহার করা তাহাদের ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য; সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ-কথাও বলিয়াছেন যে, এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য 'আসুর' বা অসুর নরগোষ্ঠীর। আমরা জানি, 'র' স্থানে 'ল' ব্যবহার পরবর্তী মাগধী প্রাকৃতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য; এবং আচার্য লেভি প্রমাণ করিয়াছেন, এই বৈশিষ্ট্য মুণ্ডা-মন্‌খ্‌মের ভাষা-পরিবারের। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে (আর্যদের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে), অসুরদের ভাষা ছিল 'র' ও 'ল' কার বহুল, অব্যক্ত, অস্পষ্ট, নিষ্ঠুর (রূঢ়) ইত্যাদি। আগেই দেখিয়াছি, শতপথ-ব্রাহ্মণে প্রাচ্য-ভারতের লোকদের বলা হইয়াছে 'আসুর্য' এবং পতঞ্জলি যখন 'র' স্থানে 'ল'-বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন 'আসুর' তখন বুঝিতে দেরি হয় না যে, বাংলা ও প্রাচ্যখণ্ডের প্রাক্-আর্য আদিভাষা ছিল মুণ্ডা-মন্‌খ্‌মের পরিবারের ভাষা, এবং তাহারই প্রভাব পড়িয়া অবৈদিক আর্যভাষার যে-সব বিশিষ্ট লক্ষণ গড়িয়া উঠিয়াছিল তন্মধ্যে 'র'—'ল' রূপান্তর একটি। হয়তো আরও ছিল, কিন্তু পতঞ্জলি তাহাদের উল্লেখ করেন নাই। তিনি যে বিশেষ বিশেষ অর্থে কতকগুলি অদ্ভুত ক্রিয়াপদের ব্যবহারের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও যে 'অসুর' ভাষার প্রভাবে নয়, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না।

পাণিনি প্রাচ্যখণ্ডের বৈয়াকরণিকদের বিশিষ্ট মতামতের কথা বলিয়াছেন। ইহা তো সুস্পষ্ট যে, এই সব বৈয়াকরণিকদের মতামত যথেষ্ট শক্তি ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছিল; তাহা না হইলে পাণিনি তাহা উল্লেখ করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতেন না। কিন্তু সাহিত্য রচিত ও গ্রথিত না হইলে ব্যাকরণ রচিত হয় না, রচনার প্রয়োজনও হয় না, বৈয়াকরণিকদের বিশিষ্ট মতামতও গড়িয়া উঠে না। সুতরাং অনুমান করা চলে, প্রাচ্য অ-বৈদিক আর্যভাষায় কিছু কিছু সাহিত্য রচিত ও গ্রথিত হইয়াছিল, ভাষার রীতি পদ্ধতি লইয়া আলোচনা-গবেষণাও হইয়াছিল; কিন্তু কি ছিল সেই সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের রূপ ও প্রকৃতি তাহা বলিবার মত কোনো উপাদানই আমাদের হাতে নাই।

অবৈদিক প্রাচ্য আর্যভাষা ও সংস্কৃতির পদানুসরণ করিয়া ক্রমশ উত্তর ও মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা প্রাচ্যদেশে বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করিল; এবং প্রাচ্য প্রাকৃত এবং উত্তর ও মধ্য ভারতীয় সংস্কৃতির স্রোত বাংলাদেশে সবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল খ্রীষ্টীয় শতকের কিছু আগে হইতেই, বোধ হয়, মৌর্য-আমল হইতে—গোড়ার দিকে বাংলার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে এবং পরে ক্রমশ পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলেও। এই স্রোতের বাহক হইলেন মধ্য-ভারতীয় নানাধর্মী যতি-সন্ন্যাসীরা, বণিক-সার্থবাহরা, সৈনিক-রাজপুরুষেরা। প্রাক্-আর্য ও অনার্য নরনারীরা ক্রমশ বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আশ্রয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে আর্য-ভাষা ও সংস্কৃতির নিকট মাথা নুয়াইতে বাধ্য হইলেন। উত্তর-বাংলা (এবং সম্ভবত-

পশ্চিমবাংলাও) মৌর্য-সাম্রাজ্যান্তর্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্যভাষা ও সংস্কৃতির প্রসার প্রতিপত্তি বিস্তার আরও সহজ হইয়া গেল। মহাস্থানের ব্রাহ্মী লিপিখণ্ডই সমসাময়িক বাংলায় প্রচলিত আর্যভাষার একমাত্র অভিজ্ঞান।

> "—নেন সবগীয [া] নং [গলদনস] দুম্রদিন [মহা-] মাতে সুলখিতে পুডনগলতে এ [ত] ং [নি] বহিপয়িসতি। সংবগীয়ানং [চ দি] নে [তথা] [ধা] নিয়ং নিবহিসতি। দ [ং] গ [া] তিয়া [ি] য়া [ি] য় [ে] ক [ে] দ [বা-] [তিয়ায়ি] কপি। সুঅতিয়ায়িক [সি] পি গংডি [কেহি] [ধানিয়ি] কেহি এস কোঠাগালে কোসং [ভর-] [নীয়ে]।

বলা বাহুল্য, এই ভাষা প্রাচীন মাগধী বা প্রাচ্য প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত। যাহাই হউক এই ভাবে প্রাক্-আর্য ও অনার্য ভাষাগুলি আর্যভাষার পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল; এবং বিগত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডে আর্যভাষা অনার্য ও প্রাক্-আর্য ভাষাকে গ্রাস করিয়া করিয়া অগ্রসর হইতেছে। সে-ক্রিয়া আজও চলিতেছে এবং যতদিন মুণ্ডা-কোল-মন্‌খ্‌মেব, দ্রাবিড় ও ভোট-ব্রহ্ম ভাষা ও বুলিগুলির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি না ঘটিবে ততদিন চলিতেই থাকিবে।

২

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্ব

মহাস্থান-লিপির কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলায় গুপ্তাধিকার বিস্তৃতির কাল পর্যন্ত আর্য ভাষার রূপ ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল, এবং সে-ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার কিরূপ হইয়াছিল তাহা জানিবার কোনো উপায় নাই। অনুমান করা চলে, আর্য-ভাষার প্রাচ্য মাগধী-প্রাকৃত রূপই ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছিল, কিন্তু এ কথাও বোধ হয় সত্য যে, পোষাকী ভাষা হিসাবে অর্থাৎ পণ্ডিত-সমাজে এবং রাজকীয় ক্রিয়াকর্মে সেই ভাষা স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। কারণ, পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে যে ক'টি গুপ্তবংশীয় রাজকীয় পট্টোলী আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার একটিরও ভাষা প্রাচ্য প্রাকৃত নয়, মধ্য ভারতীয় বিশুদ্ধ সংস্কৃত। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের নিকট পোখরণা বা পুষ্করণ গ্রামে প্রাপ্ত চতুর্থ শতকের চন্দ্রবর্মার লিপির ভাষাও সংস্কৃত। লক্ষ্যণীয় এই যে, এই প্রত্যেকটি লিপিই রচিত গদ্যে এবং সাহিত্যরসের কোনো আভাসও এই রচনাগুলিতে নাই। বস্তুত, সপ্তম শতকীয় লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলী বা কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার নিধনপুর পট্টোলীর আগে সমসাময়িক মধ্য-ভারতীয় অলংকারবহুল কাব্যরীতির কোনো পরিচয়ই বাংলাদেশে পাইতেছি না। মনে হয়, ষষ্ঠ-

সপ্তম শতকের আগে বাঙালী পণ্ডিত-সমাজ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণধারার সঙ্গে ভাল করিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করিতেই পারেন নাই। চেষ্টাটা বোধ হয় আরম্ভ হইয়াছিল আরও কয়েক শতাব্দী আগে হইতেই, এবং বৌদ্ধ সংঘারাম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেন্দ্রগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ শিক্ষায়তন হইয়া গড়িয়াও উঠিতেছিল। নহিলে পঞ্চম শতকে তাম্রলিপ্তিতে বসিয়া অধ্যয়ন ও পুঁথি নকল করিয়া চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ সুদীর্ঘ দুই বৎসর কাটাইতেন না। সপ্তম শতকে যখন য়ুয়ান-চোয়াঙ্ কযঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি এবং কর্ণসুবর্ণ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন তখন বৌদ্ধ, নির্গ্রন্থ ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এই সব জনপদের লোকদের জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানচর্চার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কযঙ্গলে তখন ছ'সাতটি বৌদ্ধ বিহারে তিন শতের উপর বৌদ্ধ শ্রমণ; পুণ্ড্রবর্ধনের বিশটি বিহারে তিন হাজারের উপর শ্রমণ সংখ্যা, সমতটের ত্রিশটি বিহারে শ্রমণ সংখ্যা দুই হাজারের উপর, কর্ণসুবর্ণের দশটি বিহারে দুই হাজারের উপর এবং তাম্রলিপ্তির দশটি বিহারেও প্রায় একই সংখ্যক শ্রমণের বাস। পুণ্ড্রবর্ধনের পো-সি-পো-(মহাস্থানের সন্নিকটে ভাসু বিহার ?) বিহার এবং কর্ণসুবর্ণের রক্তমৃত্তিকা-(লো-টো-মো-চি) বিহার যে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, য়ুয়ান-চোয়াঙের সাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ। নালন্দার-মহাবিহারের সঙ্গে ষষ্ঠ-সপ্তম শতকীয় বাঙলার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, এবং বাঙলার শিক্ষার্থী, আচার্য ও রাজবংশ নালন্দা-মহাবিহারের সংবর্ধনের জন্য যে প্রয়াস করিয়াছেন তাহা তুচ্ছ করিবার মত নয়। এই মহাবিহারের মহাচার্য বিশ্রুতকীর্তি শীলভদ্র ছিলেন সমতটের ব্রাহ্মণ্য রাজবংশের অন্যতম সন্তান, এবং তিনিই ছিলেন য়ুয়ান-চোয়াঙের গুরু। শীলভদ্র ভারতের নানাস্থানে জ্ঞানান্বেষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে নালন্দায় আসিয়া স্থিতিলাভ করেন, এবং আচার্য ধর্মপালকে গুরুত্বে বরণ করিয়া লন। দেখিতে দেখিতে বৌদ্ধধর্মের সূক্ষ্ম ও জটিল চিন্তাধারায় তাঁহার গভীর জ্ঞানলাভ ঘটে এবং তাঁহার জ্ঞান ও জীবনচর্যার খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। শীলভদ্রের যখন মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়স তখন দক্ষিণ-ভারত হইতে এক ব্রাহ্মণ আচার্য নালন্দায় আসেন আচার্য ধর্মপালের সঙ্গে বিতর্কের জন্য। ধর্মপাল শীলভদ্রকে আদেশ করিলেন বিচারে প্রবৃত্ত হইতে। শীলভদ্র অচিরেই সেই ব্রাহ্মণ আচার্যকে বিতর্কে পরাভূত করিয়া আপন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিলেন। মগধের রাজা সন্তুষ্ট হইয়া শীলভদ্রকে একটি গ্রামের রাজস্ব পুরস্কার স্বরূপ দিতে চাহিলেন; শীলভদ্র প্রথমে রাজী হন নাই; পরে তাঁহাকে স্বীকৃত হইতে হয়। সেই অর্থ দ্বারা তিনি একটি বিহার নির্মাণ করেন এবং বাৎসরিক রাজস্ব দান করিয়া দেন সেই বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য। কালক্রমে শীলভদ্র নালন্দা মহাবিহারের মহাচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হন; মহাবিহারে তখন প্রায় ১০,০০০ শ্রমণের বাস। তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র শীলভদ্রই সমস্ত শাস্ত্র ও সূত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিনীত

শ্রদ্ধায় মহাবিহারের সকল শ্রমণেরা তাঁহাকে 'সদ্ধর্মের ভাণ্ডার' বলিয়া সম্ভাষণ করিত। শীলভদ্রের নিকট য়ুয়ান-চোয়াঙ্ যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন ; য়ুয়ান-চোয়াঙের সঙ্গে সঙ্গে একটি ব্রাহ্মণও সেই অধ্যয়নে যোগদান করিয়াছিলেন। শীলভদ্রের অনুরোধে রাজা শিলাদিত্য হর্ষবর্ধন সেই ব্রাহ্মণকে তিনটি গ্রামের ভূমি-রাজস্ব দান করিয়াছিলেন। শীলভদ্র রচিত অন্তত একটি গ্রন্থের কথা আমরা জানি ; সে গ্রন্থটি হইতেছে আর্য-বুদ্ধ-ভূমি-ব্যাখ্যান ; এই গ্রন্থটি তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

সমসাময়িক তাম্রলিপ্তির শিক্ষাদীক্ষার সংবাদ আরও একাধিক চীনা শ্রমণের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়। তা চেঁঙ-টেঙ্ নামে এক চীনা শ্রমণ বারো বৎসর তাম্রলিপ্তিতে বসিয়া সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া বৌদ্ধধর্মে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাহার পর চীনদেশে ফিরিয়া গিয়া সেখানে উল্লঙ্গের নিদানশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাও-লিন নামে আর একজন চীনা শ্রমণ তিন বৎসর তাম্রলিপ্তিতে বসিয়া সংস্কৃত শিখিয়া ছিলেন এবং সর্বাস্তিবাদ-নিকায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ই-ৎসিঙ্ তাম্রলিপ্তি আসিয়াছিলেন ৬৭৩ খ্রীষ্ট শতকে ; সুবিখ্যাত পো-লো-হো (বরাহ ?)-বিহারে তা চেঁঙ্-টেঙের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল ; তিনি এই বিহারে কিছুকাল কাটাইয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষা এবং শব্দবিদ্যার চর্চা করিয়াছিলেন, এবং নাগার্জুন-বোধিসত্ত্ব-সুহৃল্লেখ নামে অন্তত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। অন্য এক চীনা পরিব্রাজক সেং-চি বলিতেছেন, সমতটের তদানীন্তন রাজা প্রতিদিন মহাপ্রাজ্ঞপারমিতা-সূত্রের লক্ষ শ্লোক আবৃত্তি করিতেন।

বৌদ্ধ বিহার-সংঘারামগুলির প্রত্যেকটিই ছিল বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র, এবং য়ুয়ান-চোয়াঙ্ এবং অন্যান্য চীনা-সাক্ষ্যেই সপ্রমাণ যে, এই কেন্দ্রগুলিতে শুধু বৌদ্ধধর্মের চর্চা এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রই শুধু পঠিত হইত তাহা নয়, ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চতুর্বেদ, সাংখ্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলা, মহাযান শাস্ত্র, অষ্টাদশ নিকায়বাদ, যোগশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন দিকও বৌদ্ধ শ্রমণদের অধিতব্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। য়ুয়ান চোয়াঙ্ যে অসংখ্য দেবমন্দিরের কথা বলিয়াছেন, তাহাদের কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মণ-আচার্য-উপাধ্যায় ইত্যাদিও কম ছিলেন না এবং যে অগণিত দেবপূজকের কথা য়ুয়ান-চোয়াঙ্ বলিয়াছেন, তাঁহারা যে শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রেরই চর্চা করিতেন, এমন মনে করিবার কারণ নাই। নানা পার্থিব, দৈনন্দিন সমস্যাগত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষার চর্চাও নিশ্চয়ই তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যাহাই হউক, এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের মধ্যে বাঙলাদেশে সংস্কৃত ভাষা এবং বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আশ্রয় করিয়া আর্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা বাঙলাদেশে প্রোথিতমূল হয় এবং শতাব্দী কালের মধ্যেই ফসল ফলাইতে আরম্ভ করে। সপ্তম শতকের লিপি-গুলির অলংকারময় কাব্যরীতিই তাহার প্রমাণ। এই কাব্যরীতি একান্তই মধ্য-ভারতীয়

রচনারীতি ও আদর্শের প্রেরণা ও অনুকরণে সৃষ্ট, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই লিপিগুলি ছাড়া কাব্যসাহিত্য-চর্চার আর কোনো প্রমাণ আমাদের সম্মুখে অনুপস্থিত।

ব্যাকরণচন্দ্রগোমী ও চান্দ্র-ব্যাকরণ

জ্ঞান বিজ্ঞানের নানাদিক সম্বন্ধে অনুশীলনের কিছু কিছু পরিচয় বিদ্যমান। ব্যাকরণের চর্চায় প্রাচ্য-ভারত, তথা বাঙলাদেশ অতি প্রাচীন কালেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ; পাণিনি সাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ। সপ্তম শতকে ই-ৎসিঙ্ যে-সব বিদ্যা অনুশীলন করিবার জন্য তাম্রলিপ্তি আসিয়াছিলেন তাহার মধ্যে শব্দবিদ্যা অন্যতম। প্রাচীন বাঙলার এই ব্যাকরণ প্রসিদ্ধি যাঁহাদের জ্ঞান ও খ্যাতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদের মধ্যে চান্দ্র-ব্যাকরণ পদ্ধতির স্রষ্টা চন্দ্রগোমী অন্যতম। চান্দ্র-ব্যাকরণ ও তাঁহার বৃত্তি বা টীকা চন্দ্রগোমীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই ব্যাকরণ মুখ্যত পাণিনি-অনুসারী, এবং এক সময়ে কাশ্মীর নেপাল-তিব্বত-সিংহলে ইহার প্রচলনও ছিল প্রচুর, কিন্তু মৌলিকতা এবং নূতন কোনো তত্ত্ব বা রীতির অভাবে এই প্রসার ও প্রসিদ্ধি পরবর্তী কালে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। পাগ্-সাম্-জোন-জাং-গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, চন্দ্রগোমী ছিলেন পতঞ্জলির মহাভাষ্য-রীতিপদ্ধতির বিরোধী। ভর্তৃহরি তাঁহার বাক্যপদীয়-গ্রন্থে জনৈক বৈয়াকরণিক চন্দ্রাচার্যের নাম করিয়াছেন এবং তিনি যে মহাভাষ্য-মতবিরোধী ছিলেন এরূপ ইঙ্গিতও করিয়াছেন ; কল্হণও তাঁহার রাজতরঙ্গিনী-গ্রন্থে চন্দ্রাচার্য ও তাঁহার ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বলিতেছেন, চন্দ্রাচার্য মহাভাষ্য-চর্চার পুনঃ-প্রচলন করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, বিশেষজ্ঞরা অনেকেই মনে করেন, চন্দ্রগোমী ও চন্দ্রাচার্য একই ব্যক্তি। চন্দ্রগোমিন ও তাঁহার ব্যাকরণের সন-তারিখ লইয়া পণ্ডিতদের ভিতর মত-বিরোধের অন্ত নাই। তবে মোটামুটি বলা চলে, জয়াদিত্য ও বামনের কাশিকা-গ্রন্থের (পাণিনি-টীকা) আগেই চান্দ্র-ব্যাকরণ রচিত ও সুপ্রচলিত হইয়াছিল ; কারণ এই টীকায় চন্দ্রগোমীর মূল ৩৫টি সূত্র বিনা স্বীকৃতিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ৩৫টি সূত্র পাণিনি-ব্যাকরণে কোথাও নাই। যাহাই হউক, চন্দ্রগোমী সপ্তম শতক বা সপ্তম শতকের আগেই কোনো সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, এ-সম্বন্ধে কোনো সংশয় নাই। চন্দ্রগোমী ছিলেন বৌদ্ধ ; তাঁহার অন্তনাম গোমিন্ (বাংলা বর্তমান গুঁই ?) এবং তদ্রচিত ব্যাকরণের বৃত্তি বা টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলশ্লোকের সর্বজ্ঞ-স্তুতিই তাহার প্রমাণ। তাঁহার জন্মভূমি ছিল বরেন্দ্রীতে ; কিন্তু পাগ-সাম-জেন্-জাং-গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, তিনি পরবর্তী জীবনে কোনো কারণে বরেন্দ্রী হইতে নির্বাসিত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বাস করেন। তিব্বতী তাঞ্জুরে তালিকাবদ্ধ চন্দ্রগোমীর একটি গ্রন্থে তিনি পরিষ্কার 'দ্বৈপ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিব্বতী ঐতিহ্যমতে চন্দ্রগোমী যে শুধু বৈয়াকরণিক ছিলেন, তাহাই নয়। তর্কবিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী

ছিলেন এবং ন্যায়সিদ্ধালোক নামে তর্কশাস্ত্রের একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, তিনি বৌদ্ধ তান্ত্রিক বজ্রযান সাধনাগত ৩৬টি গ্রন্থের লেখক ছিলেন; তারা এবং মঞ্জুশ্রীর উপর কয়েকটি সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, লোকানন্দ নামে একটি নাটক এবং শিষ্যের নিকট গুরুর পত্র হিসাবে রচিত শিষ্যলেখধর্ম নামে একটি ক্ষুদ্র কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। লোকানন্দ নাটকটির তিব্বতী অনুবাদ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় নাই; শিষ্যলেখধর্ম কাব্যটিতে বিভিন্ন ছন্দে ১১৮টি সংস্কৃত শ্লোক; রচনারীতি দুর্বল ও বহুঅভ্যস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ সংস্কৃত কাব্যানুসারী। এই তিব্বতী ঐতিহ্যমতেই চন্দ্রগোমী এক সময় নালন্দা মহাবিহারে গিয়া আচার্য স্থিরমতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেখানে মাধ্যমিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত চন্দ্রকীর্তির সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তারনাথ বলেন, চন্দ্রগোমীর ব্যাকরণ চন্দ্রকীর্তির শ্লোকবদ্ধ ব্যাকরণগ্রন্থ সমন্তভদ্রকে প্রায় বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। চন্দ্রগোমী নালন্দা-মহাবিহারে আচার্য স্থিরমতির নিকট সূত্র ও অভিধর্মপিটক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতিষ, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা এবং নানা কলায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আচার্য অশোক তাঁহাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষাদান করেন, এবং তিনি তারা ও অবলোকিতেশ্বরের পরমভক্ত হন। চন্দ্রগোমী সিংহল ও দক্ষিণ ভারতে গিয়াছিলেন এবং দক্ষিণ-ভারতে বসিয়াই নাকি চান্দ্র-ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। নালন্দা মহাবিহারের আচার্যরা গোড়ায় তাঁহার প্রতি খুব শ্রদ্ধিত ছিলেন না; কিন্তু পরে চন্দ্রকীর্তি তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পান এবং তাঁহারই প্রেরণায় ও চেষ্টায় চন্দ্রগোমী ক্রমে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। চন্দ্রগোমী যোগাচারী ছিলেন এবং যোগাচার দর্শন লইয়া বিচারালোচনা করিতেন।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বৈয়াকরণিক চন্দ্রগোমী, তিব্বতী ঐতিহ্যের নৈয়ায়িক চন্দ্রগোমী, এবং একই ঐতিহ্যের বজ্রযানী বৌদ্ধ তান্ত্রিক চন্দ্রগোমী কি একই ব্যক্তি? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন; তবে বৈয়াকরণিক এবং নৈয়ায়িক চন্দ্রগোমী এক ব্যক্তি হইলেও বজ্রযানী চন্দ্রগোমী একই ব্যক্তি হওয়া প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। খুব সম্ভব, পরবর্তী তিব্বতী ঐতিহ্য প্রাচীনতর চন্দ্রগোমী এবং অর্বাচীন চন্দ্রগোমীকে এক ব্যক্তিতে পরিণত করিয়া দুই জনের জীবন-কাহিনী একত্র মিশাইয়া দিয়াছিল।

গৌড়পাদ ও গৌড়পাদ-কারিকা

এই পর্বে ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্র ছাড়া দর্শনের আলোচনায় বাঙলা দেশের কিছু প্রসিদ্ধি লাভ ঘটিয়াছিল। গৌড়পাদকারিকা নামে সুপরিচিত একটি আগম-শাস্ত্রগ্রন্থ এই যুগে বাঙলাদেশে রচিত হইয়াছিল, এ তথ্য নিঃসংশয়; তবে ইহার রচয়িতা কে ছিলেন তাহা লইয়া পণ্ডিত মহলে নানা মতামত বিদ্যমান। গ্রন্থকারের নাম বা উপাধি

ছিল গৌড়পাদ, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে, তিনি গৌড়াচার্য বলিয়াও কারিকায় উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার বাড়ী ছিল গৌড়দেশে, এই অনুমানেও সংশয় কিছু নাই। গৌড়পাদ ছিলেন শুকের শিষ্য এবং আচার্য শংকরের পরমগুরু বা গুরুর গুরু। শংকরাচার্যের শিষ্য সুরেশ্বর তাঁহার নৈষ্কর্মসিদ্ধি নামক গ্রন্থে গৌড়পাদকারিকা হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। শংকরের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে গৌড়পাদের কোনো উল্লেখ নাই, কিন্তু কারিকার উদ্ধৃতি আছে; গ্রন্থকারের ইঙ্গিত আছে 'সম্প্রদায়বিদ' ও 'বেদার্থ সম্প্রদায়বিদ্-আচার্য' এই পদে। গৌড়পাদ কারিকার দার্শনিক মতবাদ প্রাক্-শংকর বৈদান্তিক মত ও বৌদ্ধ মাধ্যমিক শূন্যবাদের সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ ও স্বাঙ্গীকরণ। সমগ্র গ্রন্থ ২১৫টি শ্লোকে গ্রথিত (প্রথম ভাগে আগম ২৯টি শ্লোক, দ্বিতীয় ভাগে বৈতথ্য ৩৮টি শ্লোক; তৃতীয় ভাগে অদ্বৈত ৪৮টি শ্লোক, চতুর্থ ভাগে অলাতশান্তি ১০০টি শ্লোক)। শান্তরক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতি পরবর্তী কালের মাধ্যমিক মতবাদী একাধিক বৌদ্ধ আচার্য গৌড়পাদের গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। গৌড়পাদ আরও দুইটি কারিকা রচনা করিয়াছিলেন, একটির নাম সাংখ্য-কারিকা, আর একটির উত্তরগীতা। অল্-বেরুনী জনৈক গৌড়-সন্ন্যাসী রচিত এক সাংখ্য-কারিকার কথা জানিতেন; গৌড়পাদের গ্রন্থ এবং অল্-বেরুনী উদ্দিষ্ট গ্রন্থ বোধ হয় একই গ্রন্থ।

রোমপাদ। পালকাপ্য কাহিনী। হস্ত্যায়ুর্বেদ

আর একটি বিদ্যায়ও প্রাচ্য ভারতের এবং বাঙলাদেশের কিছু প্রসিদ্ধি লাভ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়; সে-বিদ্যার নাম হস্তী-আয়ুর্বেদবিদ্যা। কৌটিল্য ও গ্রীক-ঐতিহাসিকবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া য়ুয়ান-চোয়াঙ পর্যন্ত সকলেই প্রাচ্য দেশকে হস্তীর লীলাভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কৌটিল্য তো হস্তী-চিকিৎসকদের কথাও বলিয়াছেন। কাজেই এ দেশে হস্তী-চিকিৎসা সম্বন্ধে এক বিশেষ শাস্ত্র গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। চম্পার রাজা রোমপাদের সঙ্গে এক ঋষি পালকাপ্য বা পালকাপ্যের সুদীর্ঘ বাক্যালাপ হইয়াছিল হস্তী-চিকিৎসা সম্বন্ধে। গ্রন্থাকারে গ্রথিত এই সুদীর্ঘ কথোপকথনই *হস্ত্যায়ুর্বেদ* (বা *গজ-চিকিৎসা*, বা *গজবিদ্যা*, বা *গজবৈদ্য* বা *গজায়ুর্বেদ*)-গ্রন্থ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। লৌহিত্য যেখানে হিমালয় হইতে নির্গত হইয়াছে সেইখানে ছিল ঋষি পালকাপ্যের আশ্রম। পালকাপ্যের নাকি জন্ম হইয়াছিল কাপ্যগোত্রে, এক ঋষির ঔরসে, হস্তিনীর গর্ভে। আর, রোমপাদ নাকি ছিলেন রামায়ণ-কীর্তিত দশরথের সমসাময়িক! সমস্ত বর্ণনাটিই পৌরাণিক স্বপ্ন-কল্পনার সৃষ্টি, সন্দেহ নাই। পালকাপ্য নামে যথার্থ কোনো পুরুষ ছিলেন কিনা তাহাও সন্দেহজনক; দ্রবিড় ভাষায় পাল অর্থই হস্তী, এবং কপিও এক অর্থে হস্তী। তবে, গ্রন্থটি বিদ্যমান, এবং দশম-একাদশ শতকের আগেই যে ইহা রচিত হইয়াছিল

তাহারও প্রমাণ একাধিক। অগ্নিপুরাণের গজ-চিকিৎসা অধ্যায় পালকাপ্যরোম-পাদের কথোপকথনের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল, এ-কথা অগ্নিপুরাণই বলা হইয়াছে; এবং অগ্নিপুরাণের শাস্ত্রীয় অংশ দশম শতকের আগেই রচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। একাদশ শতকে ক্ষীরস্বামী-রচিত অমরকোষ-টীকায় একাধিক বার পালকাপ্যের উদ্ধৃতি আছে। রঘুবংশ কাব্যে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর বর্ণনা-প্রসঙ্গে এক অঙ্গরাজের হস্তীশালায় সূত্রকারগণ কর্তৃক হস্তীকে-শিক্ষাদানের উল্লেখ আছে। পালকাপ্য এই সূত্রকারদের অন্যতম হওয়া অসম্ভব নয়। যাহাই হউক, এ-তথ্য প্রায় নিঃসংশয় যে. বহু প্রাচীন কাল হইতেই হস্তী-চিকিৎসার একটি ঐতিহ্য প্রাচ্য দেশে বর্তমান ছিল, কিছু গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু পালকাপ্যের হস্তী-আয়ুর্বেদ গ্রন্থ যে-ভাবে ও রূপে আমরা পাইয়াছি তাহা এত সুপ্রাচীন কালের নয়, যদিও রোমপাদ-পালকাপ্যের কাহিনীর মূল সুপ্রাচীন হইলেও হইতে পারে। বর্তমান গ্রন্থটি খুব সম্ভব খ্রীষ্টোত্তর ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে, ব্রহ্মপুত্র তীরে, কোথাও সংকলিত হইয়াছিল, প্রাচীনতর গ্রন্থাদির উপর নির্ভর করিয়া।

এ-পর্যন্ত যে ক'টি গ্রন্থের উল্লেখ করা হইল তাহার প্রত্যেকটিই জ্ঞান-বিজ্ঞানগত। এইগুলি ছাড়া আরও অনেক গ্রন্থ এই পর্বে রচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু সে-সব গ্রন্থ কালের প্রভাব এড়াইয়া মানুষের স্মৃতিতেও বাঁচিয়া থাকে নাই। নানা শাস্ত্র, নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা যে বাঙলাদেশে হইত তাহা তো আগেই দেখিয়াছি, এবং যে দেশে এই পর্বে চান্দ্র-ব্যাকরণ ও গৌড়পাদকারিকার মত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, সে-দেশে সেই পর্বে অন্য বহু গ্রন্থ রচিত হইয়া ভূমি ও পশ্চাদ্‌পট রচনা করে নাই, এমন হইতে পারে না। চন্দ্রগোমী তো কাব্য ও নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্যরচনার একটা ধারাও প্রবহমান ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার উল্লেখ অথবা অবশেষ কোথাও দেখিতেছি না।

সাহিত্য রচনার একটি বেগবান্ প্রবাহ যে বাঙলাদেশের পলিভূমির উপর দিয়া বহিয়া যাইত তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় এই পর্বে গৌড়ী রীতির উদ্ভব, বিকাশ ও প্রসিদ্ধির মধ্যে। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে হর্ষচরিত-গ্রন্থের মুখবন্ধে বাণভট্ট সমসাময়িক ভারতবর্ষে প্রচলিত সাহিত্য-রচনারীতি সম্বন্ধে বলিতেছেন,

শ্লেষপ্রায়মুদীচ্যেষু প্রতীচ্যেম্বর্থমাত্রকম।
উৎপ্রেক্ষা দাক্ষিণাত্যেষু গৌড়েষ্বক্ষরডম্বরম্ ॥
নবোঽর্থো জাতিরগ্রাম্যা শ্লেষোঽক্লিষ্ট স্ফুটো রসঃ।
বিকটাক্ষরবন্ধশ্চ কৃৎস্নমেকত্র দুষ্করম ॥

উত্তর-ভারতের রচনারীতিতে শ্লেষই (অর্থাৎ শব্দ-ব্যবহারের চাতুর্য) সমধিক, পশ্চিমে কেবল অর্থগৌরব; দক্ষিণে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারের প্রাবল্য (অর্থাৎ, কবিকল্পনার অবাধ

সঞ্চরণ) এবং গৌড়জনদের মধ্যে অক্ষর-ডম্বর (অর্থাৎ, মাত্রার আড়ম্বর)। বস্তুত, নূতন অর্থ, অগ্রাম্য জাতি বা রচনাশৈলী, অক্লিষ্ট শ্লেষ, স্ফুরস এবং বিকটাক্ষরবন্ধ, এই সকল গুণের একত্র সমাবেশ দুষ্কর। বাণভট্ট দুঃখ করিয়াছেন, ভারতবর্ষের কোথাও একই জনপদে সু-কাব্যের এই সমস্ত লক্ষণগুলি একত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; কোথাও শুধু শ্লেষের প্রাধান্য, কোথাও অর্থগৌরবের, কোথাও অক্ষরাড়ম্বরের প্রাবল্য, কোথাও বা শুধু কল্পনার অবাধসঞ্চরণ। তাঁহার মতে ভাল কাব্যের যাহা লক্ষণ তাহা যে এই তালিকাতেই শেষ হইয়া গেল এমন নয়; এই লক্ষণগুলি শুধু কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কাজেই গৌড়ীয় কবিদের নিন্দাচ্ছলে বাণভট্ট অক্ষরাড়ম্বরের কথা বলিয়াছেন, এমন মনে করিবার কারণ নাই। অক্ষরাড়ম্বরের অর্থ হইতেছে শব্দপ্রয়োগগত ধ্বনি-সমারোহ; এই সাহিত্যিক গুণটিকেই বলা হইয়াছে বিকটাক্ষরবন্ধ (বিকট=উদারতা লক্ষণযুক্ত)।

গৌড়ীরীতি

সপ্তম-অষ্টম শতকে গৌড়-বঙ্গে যে একটি বিশেষ কাব্যরচনা-রীতির প্রবর্তনা হইয়াছিল এবং সমস্ত ভারতবর্ষে সেই রীতি সুপরিচিত স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ আলংকারিক ভামহ ও দণ্ডীর (সপ্তম-অষ্টম শতক) সাক্ষ্য। এই দুই জনই গৌড়ীরীতি বা গৌড়মার্গের কথা বলিতেছেন বৈদর্ভরীতির সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ বৈদর্ভী ও গৌড়ী, এই দুই রীতিই যে তখন প্রধান প্রচলিত কাব্যরীতি, তাহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছেন। দণ্ডীর পক্ষপাত ছিল বৈদর্ভী রীতির প্রতি এবং এই রীতিই কাব্যরচনার মানদণ্ড বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তাঁহার মতে এই মানদণ্ডের বিচারে গৌড়ী রীতি 'বিপর্যয়' লক্ষণাক্রান্ত, তাহার রূপ পৃথক, রীতি পৃথক, কিন্তু এই পৃথক রূপ ও রীতি সহজেই' প্রস্ফুট'। বৈদর্ভী বিশুদ্ধ মার্গপদ্ধতির অনুসারী, গৌড়ী একটু অলংকার ও আড়ম্বরবহুল, পল্লবিত। দণ্ডী পরিষ্কারই বলিতেছেন, গৌড়জনেরা অতি ও উচ্চকথন এবং অলংকার ও আড়ম্বর প্রিয়; গৌড়ী রীতির প্রধান লক্ষণই হইতেছে 'অর্থ-ডম্বর' এবং 'অলংকার-ডম্বর', অনুপ্রাসপ্রিয়তা এবং বন্ধগৌরব বা রচনার গাঢ়তা। ভামহ কিন্তু বৈদর্ভী রীতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন; বরং সুপ্রযোজিত গৌড়ী রীতির প্রতিই তাঁহার কিছুটা পক্ষপাত সুস্পষ্ট। বৈদর্ভী রীতির প্রধান গুণ ছিল শ্লেষ, প্রসাদ, মাধুর্য, সৌকুমার্য ইত্যাদি।

বাণভট্ট, ভামহ এবং দণ্ডীর সাক্ষ্যে এ-তথ্য পরিষ্কার যে, গৌড়জনেরা সপ্তম শতকের আগেই সুস্পষ্ট লক্ষণাক্রান্ত একটি বিশিষ্ট কাব্যরীতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং এই রীতি সর্বভারতগ্রাহ্য বৈদর্ভী রীতিমানের পাশেই আপন আসন এতটা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল যে, বাণভট্ট, ভামহ বা দণ্ডী কেহই তাহাকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। দশম-একাদশ শতকে গৌড়ী রীতির যখন পূর্ণ বিকশিত অবস্থা, যখন আড়ম্বরা অলংকার এবং পল্লবিত বিস্তৃতির প্রসার আরও বেশি, তখন রাজশেখর (দশম শতক) তাঁহার কাব্য-

মীমাংসা-গ্রন্থে গৌড়ী রীতির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোন উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। বোধ হয়, সেই জন্যই কর্পূরমঞ্জরী-গ্রন্থে বিভিন্ন রীতির তালিকা দিতে গিয়া তিনি গৌড়ী রীতির উল্লেখ করেন নাই, তাহার স্থানে মাগধী রীতির কথা বলিয়াছেন। মাগধী রীতিকে যথার্থত কোনো বিশিষ্ট সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র রীতি রাজশেখর ছাড়া আর কেহ বলেন নাই। একাদশ শতকে ভোজদেব গৌড়ী ও মাগধী, এই দুই রীতির কথা বলিয়াছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু মাগধীকে বলিয়াছেন খণ্ডরীতি, অর্থাৎ অসম্পূর্ণ, অ-স্বতন্ত্র, অপ্রস্ফুটিত রীতি। নাটকেও বোধ হয় অন্যান্য প্রাচ্য দেশের সঙ্গে বাঙলাদেশে একটি বিশিষ্ট রূপ ও রীতির প্রচলন হইয়াছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে চারিটি বিশিষ্ট নাটকীয় রীতির বা প্রবৃত্তির উল্লেখ আছে ঃ অবন্তী, পঞ্চাল-মধ্যমা, দাক্ষিণাত্যা এবং ওড্র মাগধী। ওড্র, বঙ্গ, পৌণ্ড্র এবং নেপালে ওড্র-মাগধী প্রবৃত্তি প্রচলিত ছিল।

এই গৌড়ী রীতির (মাগধী রীতি এবং ভরতনাট্যশাস্ত্র কথিত ওড্র-মাগধী প্রবৃত্তিরও বটে) উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসের দিক হইতে গভীর অর্থবহ। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-কথিত 'গৌড়তন্ত্র' কথাটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি হইতেই গৌড়জনেরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে আরম্ভ করেন; ঈশানবর্মার হড়াহা-লিপি তাহার প্রথম প্রমাণ। তাহার পর হইতেই গৌড় ধীরে ধীরে নিজস্ব জনপদকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে যত্নবান হয়, শশাঙ্কে আসিয়া তাহা একটা সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। মালব-স্থানীশ্বর-কনৌজ-উজ্জয়িনী-প্রয়াগ-বানারসীকেন্দ্রিক মধ্য-ভারতীয় রাষ্ট্রীয় প্রভাব হইতে মুক্ত, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই হইয়া উঠিল গৌড়তন্ত্রের রাষ্ট্রাদর্শ। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এই গৌড়তন্ত্র রূপ লাভ করিল গৌড়ী রীতিতে—সর্বভারতীয়, বৈদর্ভী রীতিকে অস্বীকার করিয়া, তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র রীতির উদ্ভবে ও বিকাশে। সন্দেহ নাই, এই উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছিল গৌড়জনের নিজস্ব প্রতিভা, প্রকৃতি, রুচি ও সংস্কার অনুযায়ী এবং ইহাদেরই প্রেরণায়, শুধু বিশিষ্ট জনপদসুলভ অহংকৃত স্বতন্ত্রপ্রিয়তা এবং স্বাধিকার প্রমত্ততায় নয়।

৩

পাল-চন্দ্রপর্ব। ব্রাহ্মণ্য জ্ঞানবিজ্ঞানসাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি

পাল-বংশ ও পাল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় এবং তাহার দুই এক শতাব্দী আগে হইতেই বাংলাদেশে সংস্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা পরম উৎসাহে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। লোকনাথের ত্রিপুরা-পট্টোলীতে কিংবা ভাস্করবর্মার নিধনপুর-লিপিতে যে অলংকৃত কাব্যরীতির সূচনা দেখা গিয়াছিল সপ্তম শতকে, পাল-বংশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই রীতিরই পরিপূর্ণ বিকাশ ধরা পড়িল। দশম-একাদশ শতকের অগণিত প্রশস্তি-লিপিমালায় সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা ও রচনারীতির যে-সাক্ষ্য উপস্থিত তাহা মধ্য-ভারতীয়

প্রশস্তি-কাব্যরীতির ধারানুযায়ী হইলেও একেবারে উপেক্ষা করিবার মত নয়। তাহা ছাড়া এই লিপিগুলিতে সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা-দীক্ষার যে প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়, ইতিহাসের দিক থেকে তাহা মূল্যহীন নয়। এই লিপিগুলি এবং চতুর্ভুজের হরিচরিত-কাব্য হইতে জানা যায় বাংলাদেশে যে-সকল বিদ্যার চর্চা হইত, বেদ, আগম, নীতি, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, তর্ক, মীমাংসা, বেদান্ত, প্রমাণ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি সমস্তই তাহার অন্তর্গত ছিল। চারি বেদেরই অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত, যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী শাখার প্রসারই ছিল বেশি। এই সব বিচিত্র বিদ্যার চর্চা যে শুধু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জন সমাজেই আবদ্ধ ছিল তাহাই নয়; মন্ত্রী, সেনানায়ক প্রভৃতি রাজপুরুষেরাও এই সব শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। দর্ভপাণি, কেদারমিশ্র ও গুরবমিশ্রের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা, যোগদেব, বোধিদেব ও বৈদ্যদেবের বিস্তৃত শাস্ত্রানুশীলনের কথা, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত-সমাজে নানা বিদ্যাচর্চার কথা বর্ণ-বিন্যাস ও ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে বলিয়াছি, এখানে আর পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই। এই বিদ্যানুশীলনের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান কি কি ছিল, পাঠক্রম কি ছিল, তাহার বিবরণ বা আভাস পর্যন্ত কিছু পাইতেছি না; তবে, অনুমান হয়, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা নিজেদের গৃহে কিংবা বড় বড় মন্দিরকে আশ্রয় করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ চতুষ্পাঠী গড়িয়া তুলিতেন এবং সাধ্যানুযায়ী বিদ্যার্থী সংখ্যা গ্রহণ করিতেন। একজন আচার্যই যে সমস্ত বিদ্যার অধিকারী হইতেন এমন নয়; বিদ্যার্থীরা এক বা একাধিক শাস্ত্রে এক জনের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অন্য শাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য অন্য বিশেষজ্ঞ আচার্যের দুয়ারে উপস্থিত হইতেন। প্রয়োজন হইলে বিদ্যা ও শাস্ত্রাভ্যাসের জন্য বিদ্যার্থীরা ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে গিয়া প্রবাস-জীবনও যাপন করিতেন। ক্ষেমেন্দ্রের দশোপদেশ-গ্রন্থের সাক্ষ্যে মনে হয়, বাঙালী বিদ্যার্থীরা কাশ্মীরে যাইতেন বিদ্যালাভের জন্য এবং সেখানে তর্ক, মীমাংসা, পাতঞ্জল-ভাষ্য প্রভৃতির অনুশীলন করিতেন। বাঙালী বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ আচার্যরাও যে আমন্ত্রিত হইয়া বাঙলার বাহিরে নানাস্থানে যাইতেন বিদ্যাদান ও ধর্মপ্রচারোদ্দেশে, তাহার নানা প্রমাণ বিদ্যমান। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যাঁহারা করিতেন, রাজা-মহারাজ ও সামন্ত-মহাসামন্তরা সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁহাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য অর্থদান, ভূমিদান ইত্যাদি করিতেন, এমন সাক্ষ্যও যে নাই তাহা নয়। পণ্ডিত, কবি, আচার্য প্রভৃতিদের মাঝে মাঝে তাঁহারা পুরস্কৃতও করিতেন, সে সাক্ষ্যও বিদ্যমান। লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যে এ-সব সাক্ষ্য বিস্তৃত।

ভাষার কথা

এই পর্বে অর্থাৎ আনুমানিক ৮০০—১১০০র মধ্যে এবং তাহার পরেও বাঙলা-ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে বাঙলা দেশে সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃত এবং শৌরসেনী অপভ্রংশ এই তিন রকমের ভাষা প্রচলিত ছিল। শিল্পে ও সাহিত্যে, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, দর্শনে ও বিচারে, শিক্ষায় ও দীক্ষায় শিক্ষিত

লোকেরা সকলেই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন ; সকলেরই চেষ্টা ছিল প্রাকৃতজনের কথ্যভাষাকে শুদ্ধ ও সংস্কৃত করিয়া ব্যাকরণসম্মত করিয়া নিজের বক্তব্যকে প্রকাশ করিবার। এই শুদ্ধ, 'সংস্কৃত', ব্যাকরণসম্মত ভাষাই সংস্কৃত ভাষা। প্রাকৃতের চর্চা বাঙলাদেশে বড় একটা হইত না ; অন্তত বাঙলাদেশে প্রাকৃতে সাহিত্যরচনার কোনো ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, তাহার পরিচয়ও নাই। এ-দেশের মহাযানী-বজ্রযানী প্রভৃতি বৌদ্ধরাও যে-ভাষা ব্যবহার করিতেন তাহাও হয় শুদ্ধ সংস্কৃত না হয় প্রাকৃতাশ্রয়ী মিশ্র সংস্কৃত যাহাকে বলা হয় 'বৌদ্ধ সংস্কৃত'। দশম শতকে গৌড়জনের সাহিত্যরুচির পরিচয় দিতে গিয়া সেইজন্যই কাব্যমীমাংসার লেখক রাজশেখর বলিতেছেন,

গৌড়াদ্যাঃ সংস্কৃতস্থাঃ পরিচিতরুচয়ঃ প্রাকৃতে লাটদেশ্যাঃ।

স্পষ্টতই বোঝা যাইতেছে, গৌড় ও প্রতিবাসী জনপদগুলিতে সংস্কৃতের চর্চাই ছিল বেশি, প্রাকৃতের তেমন ছিল না। এদেশীয় পণ্ডিতদের সংস্কৃত উচ্চারণের প্রশংসাও রাজশেখর করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাকৃত বাচনভঙ্গি ছিল কুণ্ঠিত।

পঠন্তি সংস্কৃতং সুষ্ঠু কুণ্ঠাঃ প্রাকৃত বাচি তে।
বাণারসীতঃ পূর্বেণ যে কেচিন্ মগধাদয়ঃ ॥

রাজশেখর বাঙালীর এই কুণ্ঠিত প্রাকৃত উচ্চারণ লইয়া একটু বিদ্রূপই করিয়াছেন। দেবী সরস্বতী গৌড়বাসীর প্রাকৃত উচ্চারণে অতিষ্ঠ হইয়া নিজের অধিকার ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া ব্রহ্মাকে গিয়া বলিলেন, হয় গৌড়জনেরা প্রাকৃত ছাড়ুক, না হয় অন্য সরস্বতী হউক।

ব্রহ্মন্ বিজ্ঞাপয়ামি ত্বাং স্বাধিকারজিহাসয়া।
গৌড়স্ত্যজতু বা গাথামন্যা বাহস্তু সরস্বতী ॥

গৌড়ীয়দের প্রাকৃত উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রাজশেখর বলিয়াছেন, ইহাদের পাঠ অস্পষ্টও নয় অতি স্পষ্টও নয়, রুক্ষও নয় অতি কোমলও নয়, গম্ভীরও নয় অতি-তীব্রও নয়।

যাহা হউক, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছাড়া এবং প্রাকৃতের চেয়ে অনেক বেশি প্রচলিত ছিল পশ্চিমী বা শৌরসেনী অপভ্রংশ, যে-ভাষার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা ছিল সমগ্র উত্তর-ভারত ব্যাপিয়া, এবং মহারাষ্ট্র ও সিন্ধুদেশেও। বাংলা দেশের সহজযানী সিদ্ধাচার্যরা এবং ব্রাহ্মণ্য কবিরাও কেহ কেহ শৌরসেনী অপভ্রংশে কিছু কিছু কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন ; কাহ্নপাদ, সরহপাদ প্রভৃতি সাধকেরা এই ভাষাতেই তাঁহাদের দোহাগুলি রচনা করিয়াছিলেন, আর পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় মৈথিল কবি বিদ্যাপতি এই শৌরসেনী অপভ্রংশেই তাঁহার কীর্তিলতা কাব্য রচনা করেন।

এই পর্বে লোকায়ত বাঙালী সমাজের লোকভাষা ছিল মাগধী অপভ্রংশের গৌড়-বঙ্গীয় রূপ যে-রূপ ক্রমশ প্রাচীন বাঙলা ভাষায় বিবর্তিত হইতেছিল। এই মাগধী অপভ্রংশের

স্থানীয় রূপের সঙ্গে শৌরসেনী অপভ্রংশের খুব বড় একটা পার্থক্য কিছু ছিল না; একটা যিনি বুঝিতেন অন্যটা বুঝিতে তাঁহার খুব বেশি পরিশ্রম করিতে হইত না। আর, এই দুই ভাষাই ছিল খুব সহজবোধ্য এবং নিরক্ষর জনসাধারণের অধিগম্য। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহাদের ধর্মের তত্ত্বকথা লোকায়ত ভাষায় জনসাধারণের চিত্তদুয়ারে পৌঁছাইয়া দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা, এবং কোনো কোনো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, এই দুই ভাষাই বেশি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে মাগধী অপভ্রংশ যখন প্রাচীন বাঙলা ভাষায় বিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিল তখন সৃজ্যমান এই নূতন ভাষাকেও বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা সানন্দে ও সাভ্যর্থনায় গ্রহণ করিলেন। প্রাচীন বাঙলার চর্যাগীতিগুলিই এই নূতন সৃজ্যমান ভাষার একমাত্র পরিচয়। কিন্তু এই ভাষা তখনও সূক্ষ্ম ও গভীর ভাব-প্রকাশের বাহন হইয়া উঠিতে পারে নাই; ধর্ম ও তত্ত্বকথা বুঝাইবার জন্য যতটুকুই প্রয়োজন ততটুকুই মাত্র ইহার বিস্তার ও গভীরতা। বস্তুত, তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে বাঙলাদেশে দুই-তিন শতাব্দী ধরিয়া শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং নূতন বাঙলা ভাষা লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছিল মাত্র। শিক্ষিত, বিদগ্ধ, ও সংস্কৃতিপূতচিত্ত লোকদের মধ্যে প্রাগ্রসরবুদ্ধি ও গণচেতনাসম্পন্ন মাত্র কিছু কিছু পণ্ডিত ও কবি এই কার্যে ব্রতী হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কিছু সাহিত্যধর্মী বা কবিধর্মী ছিলেন না।

ধর্ম, দর্শন, ব্যাকরণ, অলংকার, ব্যবহার, চিকিৎসা-বিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা যখন গ্রন্থাদি লিখিতেন তখন সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনো ভাষার আশ্রয় লওয়ার কথা তাঁহাদের মনেই হইত না। কাজেই এ-পর্বে জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে যত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহা সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় এবং সেই কারণেই এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার শিক্ষিত, পণ্ডিত ও উচ্চকোটি সমাজেই আবদ্ধ ছিল। বাঙলাদেশে সংস্কৃত-চর্চা এবং বিশেষভাবে সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যচর্চার প্রাবল্য এর আগের পর্বেই দেখা দিয়াছিল, নহিলে গৌড়ীরীতির উদ্ভব এবং বিকাশই সম্ভব হইত না। এই পর্বে তাহা আরও সমৃদ্ধি, আরও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং বাঙালীর কল্পনোজ্জ্বল প্রতিভা নানা সূক্তি ও শ্লোকে, নানা কাব্যে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। কালিদাস-ভবভূতি-ভারবি বাণভট্ট-রাজশেখর পড়িয়া রসগ্রহণের সামর্থ্য না থাকিলে এই পর্বের অগণিত বাঙালী কবির পক্ষে এই সব প্রকীর্ণ শ্লোক ও কাব্য রচনা সম্ভবই হইত না। এই অনুমানও বোধ হয় সংগত যে, পণ্ডিত-সমাজের বাহিরে একটি বৃহত্তর সাধারণ সংস্কৃত শিক্ষিত সমাজও ছিলেন যাহার লোকেরা এই সব শ্লোক ও কাব্য পড়িয়া তাহাদের রস গ্রহণ করিতে পারিতেন। এই হিসাবে কাব্য ও নাটকের সামাজিক বিস্তার বেশি ছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু কথ্যভাষার সাহিত্যিক রূপ অপভ্রংশের সঙ্গে তাহার তুলনা হইতে পারে না। সংস্কৃতে যাঁহারা লিখিতেন, তাঁহাদের মানসিক ও সামাজিক পরিধির মধ্যে বৃহত্তর জনসমাজের স্থান ছিল না, এ-কথা বলিলে

অনৈতিহাসিক কিছু বলা হয় না ; তবে, তাঁহাদের কাহারও কাহারও রচনায় বৃহত্তর জনসমাজের নানা সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা-ভাবনা-কল্পনা বস্তুময় কাব্যময় রূপ লাভ করিয়াছে, এ-কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হয়। যাহাই হউক, এ তথ্য অনস্বীকার্য যে, সংস্কৃত এখন আর শুধু কোনোপ্রকারে নিজেকে ব্যক্ত করিবার ভাষামাত্র নয় ; এই পর্বে তাহা মানবজীবনের সূক্ষ্ম ও গভীর ভাবকল্পনা প্রকাশের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু নানা বিদ্যা ও শাস্ত্রে যে পরিমাণ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-অনুশীলনের সংবাদ লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যে পাইতেছি, সেই অনুপাতে গ্রন্থ-রচনা ও গ্রন্থ-রচয়িতাদের সংবাদ –বৌদ্ধ সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থের ছাড়া—কমই পাওয়া যাইতেছে, এবং যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহাও সব বাঙালীর এবং বাঙলাদেশের রচনা কিনা, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং প্রাচীনতম বাঙলায় রচিত বৌদ্ধ-গ্রন্থাদির কথা পরে বলিতেছি। আপাতত ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থাদির কথা বলা যাইতে পারে।

সংস্কৃত গ্রন্থাদি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য

প্রাচীন বাঙলায় বেদ-চর্চা যে খুব বেশি হইত, এমন নয়, তবে উচ্চ পণ্ডিত সমাজে কিছু কিছু নিশ্চয় হইত, এবং লিপিমালায়ও এমন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু, বৈদিক ক্রিয়াকর্ম-যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে এই পর্বে মাত্র একখানা পুঁথির খবর পাইতেছি। কেশবমিশ্রের ছান্দোগ্য-পরিশিষ্ট গ্রন্থের উপর প্রকাশ নামে একটি টীকা রচনা করিয়া-ছিলেন নারায়ণ নামে জনৈক বেদজ্ঞ পণ্ডিত। নারায়ণের পিতা ছিলেন গোণ, পিতামহের নাম উমাপতি, এবং ইঁহারা ছিলেন উত্তর রাঢ়ের অধিবাসী। উমাপতি ছিলেন জয়পালের সমসাময়িক এবং নারায়ণ, দেবপালের।

গৌড়পাদ বা গৌড়াচার্যের পর অধ্যাত্ম চিন্তা ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ-রচনা করিয়া সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন ন্যায়কন্দলী-রচয়িতা শ্রীধর-ভট্ট। বেদ, বেদান্ত, বিভিন্ন দর্শনের চর্চা বাঙলাদেশে কম হইত না (লিপি-সাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ) গ্রন্থ-রচনাও কিছু কিছু হইয়া থাকিবে, কিন্তু কালের হাত এড়াইয়া আমাদের কালে আসিয়া সে-সব পৌঁছায় নাই। শ্রীধরের ন্যায়কন্দলী শুধু বাঁচিয়া আছে, এবং তাহা এই পর্বেরই রচনা। ন্যায়কন্দলী ছাড়া শ্রীধর অদ্বয়সিদ্ধি, তত্ত্বপ্রবোধ, তত্ত্বসংবাদিনী এবং সংগ্রহটীকা নামে অন্তত আরও চারখানি বেদান্ত ও মীমাংসা বিষয়ের পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাদের একটিও আজ বাঁচিয়া নাই। প্রশস্তপাদের পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ নামে বৈশেষিক সূত্রের যে ভাষ্য আছে, ন্যায়কন্দলী-গ্রন্থ তাহারই টীকা। শ্রীধর-ভট্টই বোধ হয় সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে ন্যায়বৈশেষিক মতের আস্তিক্য ব্যাখ্যা দান করেন, এবং সেই হিসাবেই ন্যায়কন্দলীর সবিশেষ মূল্য। ন্যায়কন্দলী বাঙলাদেশে খুব সমাদর লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে

হয় না ; খুব পঠিত বা আলোচিতও বোধ হয় হইত না। এই গ্রন্থের একটি টীকাও বাঙলাদেশে রচিত হয় নাই। যে দু'টি মূল্যবান টীকার কথা আমরা জানি তাহার একটির রচয়িতা মৈথিলী পণ্ডিত পদ্মনাভ এবং আর একটির পশ্চিম-ভারতীয় জৈনাচার্য রাজশেখর। শ্রীধর-ভট্টের পিতার নাম ছিল বলদেব, মাতার নাম আবোকা বা অব্রোকা, জন্ম দক্ষিণ রাঢ়ের সুপ্রসিদ্ধ ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রামে, এবং ন্যায়কন্দলী-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ৯১৩ বা ৯১০ শকে, জনৈক "গুণরত্নাভরণ কায়স্থকুলতিলক" পাণ্ডুদাসের অনুরোধে এবং পৃষ্ঠপোষকতায়।

শ্রীধর-ভট্টের সমসাময়িক ছিলেন লক্ষণাবলী, কিরণাবলী (দুইই প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা), কুসুমাঞ্জলি এবং আত্মতত্ত্ববিবেক-গ্রন্থের রচয়িতা উদয়ন। কুলজী-ঐতিহ্য মতে উদয়ন ছিলেন ভাদুড়ী-গাঞী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু এই ঐতিহ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। উদয়ন তাঁহার রচনায় এক স্থানে বলিয়াছেন, গৌড়মীমাংসক যথার্থ বেদজ্ঞান বিরহিত ছিলেন। এই গৌড়মীমাংসক বলিতে তিনি কি শ্রীধর-ভট্টকে বুঝাইতেছেন, না, গৌড়ীয় মীমাংসা-শাস্ত্রজ্ঞ সকল পণ্ডিতকেই বুঝাইতেছেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। উদয়ন বাঙালী হইলে এই উক্তি করিতেন কিনা সন্দেহ। আশ্চর্য এই, আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকে বাঙালী গঙ্গেশ-উপাধ্যায়ও গৌড়মীমাংসক সম্বন্ধে একই উক্তি করিয়াছেন।

বেদান্তদর্শন-চর্চা বাঙলাদেশে বোধ হয় খুব বেশি ছিল না ; ন্যায়-বৈশেষিক এবং বৌদ্ধ মাধ্যমিক দর্শনের আদরই ছিল বেশি। কৃষ্ণমিশ্র-রচিত প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে আছে, দক্ষিণ-রাঢ়বাসী ব্রাহ্মণ অহংকার কাশীতে গিয়া সেখানে বেদান্ত-চর্চার বাহুল্য দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন,

প্রত্যক্ষাদি প্রমাসিদ্ধ বিরুদ্ধার্থাববোধিনঃ।
বেদান্তাং যদি শাস্ত্রাণি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে॥

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ যারা অসিদ্ধ ও বিরুদ্ধার্থজ্ঞাপক বলিয়া মনে করেন, বেদান্ত যদি শাস্ত্র হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধরা কি অপরাধ করিল!

গৌড়নিবাসী এক অভিনন্দ নামীয় লেখকের যোগবাশিষ্ঠ-সংক্ষেপ নামে একটি গ্রন্থের সংবাদ আমরা জানি। নামেই প্রমাণ যে গ্রন্থটি যোগবাশিষ্ঠের সংক্ষিপ্ত সার ; সমগ্র বিষয়বস্তু ৬ প্রকরণ এবং ৪৬টি সর্গে বিন্যস্ত। গ্রন্থের শেষে লেখক সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে ঃ "তর্কবাগীশ্বর-সাহিত্যাচার্য-গৌড়মণ্ডলালঙ্কার-শ্রীমৎ—"। অভিনন্দ ন্যায়শাস্ত্র এবং সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

ব্যাকরণ ও অভিধান-চর্চা

এই পর্বে ব্যাকরণ-রচনায় চন্দ্রগোমীর ধারা রক্ষা করিয়াছেন দুই বৌদ্ধ বৈয়াকরণিক, মৈত্রেয়-রক্ষিত এবং জিনেন্দ্রবুদ্ধি। জিনেন্দ্রবুদ্ধি 'বোধিসত্ত্ব-দেশীয়াচার্য' বলিয়া আত্ম-

পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিবরণ-পঞ্জিকা (বা 'ন্যাস' নামে পরিচিত) নামে কাশিকার উপর একটি সুবিস্তৃত টীকা রচনা করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়-রক্ষিত জিনেন্দ্রবুদ্ধির বিবরণ-পঞ্জিকার উপর তন্ত্রপ্রদীপ নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন, এবং ভীমসেন-রচিত ধাতুপাঠ অবলম্বন করিয়া ধাতুপ্রদীপ নামে আর একটি ব্যাকরণ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। টীকাসর্বস্ব রচয়িতা সর্বানন্দ, শরণদেব, উজ্জ্বলদত্ত, বৃহস্পতি রায়মুকুট, ভট্টোজি দীক্ষিত অনেক ব্যাকরণ ও অভিধানকার মৈত্রেয় রক্ষিতের তন্ত্রপ্রদীপ গ্রন্থ নিজ নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছেন।

সুভূতিচন্দ্র নামে একজন বৌদ্ধ অভিধানকার কামধেনু নামে অমরকোষের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন ; গ্রন্থটি আজ বিলুপ্ত, কিন্তু তাহার তিব্বতী অনুবাদের কথা তাঙ্গুরে তালিকাবদ্ধ করা হইয়াছে। রায়মুকুট ও শরণদেব কয়েকবারই সুভূতিচন্দ্রের মতামত উদ্ধার করিয়াছেন ; সেই জন্যই অনুমান হয় সুভূতিচন্দ্র বাঙালী হইলেও হইতে পারেন।

চিকিৎসা-শাস্ত্র। চক্রপাণিদত্ত। সুরেশ্বর। বঙ্গসেন

এ-পর্বের শ্রেষ্ঠ সর্বভারতীয় রোগনিদানবিদদের অন্যতম চক্রপাণি-দত্ত নিঃসন্দেহে বাঙালী। তাঁহার পিতা নারায়ণ জনৈক গৌড়রাজের পাত্র (রাজকর্মচারী) এবং রসবত্যধিকারী (রন্ধনশালার তত্ত্বাবধায়ক) ছিলেন। চক্রপাণির ষোড়শ শতকীয় বাঙালী টীকাকার শিবদাস-সেন যশোধর বলিতেছেন, এই গৌড়রাজ ছিলেন পালরাজ জয়পাল। চক্রপাণির বংশ লোধ্রবলি কুলীন ; শিবদাস-সেন বলিতেছেন, লোধ্রবলি কুলীনরা দত্ত-বংশেরই একটি শাখা, এবং মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যমতে ইঁহাদের বাড়ী ছিল বীরভূমে। চক্রপাণির একভ্রাতা ভানুও ছিলেন রোগ-নিদান শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক বা অন্তরঙ্গ ; তাঁহার (চক্রপাণির) গুরুর নাম ছিল নরদত্ত। চক্রপাণি-দত্ত চরকের যে টীকা রচনা করিয়াছেন তাহার নাম আয়ুর্বেদ-দীপিকা বা চরক-তাৎপর্য-দীপিকা, এবং তদ্রচিত সুশ্রুত-টীকার নাম ভানুমতী। তাঁহার অন্য দুইটি ক্ষুদ্রতর গ্রন্থের নাম যথাক্রমে শব্দচন্দ্রিকা ও দ্রব্যগুণসংগ্রহ। শব্দচন্দ্রিকা ভেষজ গাছ-গাছড়া এবং আকর দ্রব্যাদির তালিকা, এবং দ্রব্যগুণসংগ্রহ পথ্যাদি-নিরূপণ সংক্রান্ত পুঁথি। কিন্তু চক্রপাণির শ্রেষ্ঠ মৌলিকগ্রন্থ হইতেছে চিকিৎসা-সংগ্রহ ; এই গ্রন্থ রোগবিনিশ্চয়-প্রণেতা মাধবের এবং সিদ্ধযোগ-প্রণেতা বৃন্দের আলোচনা-গবেষণার ধারাই অনুসরণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও চিকিৎসা-সংগ্রহ ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক গ্রন্থ, এবং ধাতবদ্রব্য-প্রকরণে চক্রপাণি যে মৌলিকত্ব দেখাইয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।

পাল-পর্বের শেষ অধ্যায়ে কিংবা তাহার কিছু পরেই আরও দুইজন নিদান-শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতের কথা জানা যায়, একজন সুরেশ্বর বা সুরপাল, আর একজন বঙ্গসেন। সুরেশ্বরের

পিতামহ দেবগণ চন্দ্ররাজ গোবিন্দচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বা সভা-চিকিৎসক ছিলেন, পিতা ভদ্রেশ্বর ছিলেন বঙ্গেশ্বর রামপালের সভা-চিকিৎসক ; আর সুরেশ্বর নিজে ছিলেন ভীমপাল নামে জনৈক নরপতির অন্তরঙ্গ। তদ্রচিত শব্দপ্রদীপ এবং বৃক্ষায়ুর্বেদ দুইই ভেষজ গাছ-গাছড়ার তালিকা ও গুণাগুণবিচার ; কিন্তু তাঁহার লোহপদ্ধতি বা লোহসর্বস্ব লোহার ভেষজ ব্যবহার এবং লৌহঘটিত ঔষধাদি প্রস্তুত সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বঙ্গসেনের পিতা ছিলেন কাঞ্জিকবাসী গদাধর, এবং তদ্রচিত গ্রন্থের নাম চিকিৎসা-সার সংগ্রহ। বঙ্গসেন সুশ্রুতপন্থী কিন্তু মাধব-রচিত রোগ-বিনিশ্চয় গ্রন্থের প্রতি তাঁহার ঋণ সামান্য নয়।

ধর্মশাস্ত্র। জিতেন্দ্রিয়। বালক

লিপি-সাক্ষ্যে মনে হয়, মীমাংসার চর্চা বাঙলাদেশে হইত না এমন নয়, কিন্তু মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র লইয়া এই পর্বে কেহ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কিছু রচনা করিয়াছিলেন, এমন নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। জিতেন্দ্রিয় ও বালক নামে দুইজন ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতার উল্লেখ ও বচন উদ্ধার করিয়াছেন জীমূতবাহন, শূলপাণি, রঘুনন্দন, প্রভৃতি পরবর্তী বাঙালী স্মৃতিকারেরা। কোনো অবাঙালী স্মৃতিকার ইঁহাদের উদ্ধার বা আলোচনা করেন নাই ; সেই জন্য, মনে হয় ইঁহারা দুইজনই ছিলেন বাঙালী, এবং একাদশ শতকের কোনো সময়ে ইঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কাহারও রচনা কালের হাত এড়াইয়া বাঁচিয়া নাই ; তবে শুভাশুভকাল সম্বন্ধে জিতেন্দ্রিয়ের রচনা উদ্ধার করিয়া জীমূতবাহন তাহার সমালোচনা করিয়াছেন কালবিবেক-গ্রন্থে ; ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে জিতেন্দ্রিয়ের বচন উদ্ধার ও সমালোচনা জীমূতবাহন করিয়াছেন দায়ভাগ ও ব্যবহার মাতৃকাগ্রন্থে, এবং রঘুনন্দন করিয়াছেন দায়তত্ত্ব-গ্রন্থে। বালক ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকিবেন, কারণ জীমূতবাহন, শূলপাণি ও রঘুনন্দন এই তিনজনই দুই বিষয়ে বালকের মতামত সমালোচনা করিয়াছেন। জীমূতবাহন তো তাঁহার মতামতকে 'বালবচন' বলিয়া বিদ্রূপই করিয়াছেন।

ইঁহাদের চেয়েও প্রাচীনতর ("পুরাতন"), যোগ্লোক নামে একজন স্মৃতিকারের মতামত আলোচনা করিয়াছেন জীমূতবাহন ও রঘুনন্দন ; ইনি শুভাশুভ কাল সম্বন্ধে ব্যবহার সম্বন্ধীয় একটি 'বৃহৎ' ও একটি 'লঘু' গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা প্রভৃতি লইয়া বাঙালী স্মৃতিকারদের যে উৎসাহ পরবর্তী সেন-বর্মণ পর্বে দেখা যাইবে, সে-উৎসাহের সূত্রপাত এই পর্বে এখনও হয় নাই।

এই পর্বে একটি মাত্র জ্যোতিষ-গ্রন্থের খবর আমরা জানি ; গ্রন্থটি জনৈক কল্যাণবর্মা রচিত সারাবলী। মল্লিনাথ (শিশুপালবধ-টীকা), উৎপল এবং অল্-বেরুণী এই তিনজনই সারাবলী হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। কল্যাণবর্মা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে "ব্যাঘ্রতটীশ্বর" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই ব্যাঘ্রতটী নিঃসন্দেহে খালিমপুর লিপির ব্যাঘ্রতটী।

সাহিত্য। কাব্য। নাটক

এই পর্বের প্রশস্তি লিপিমালায় সমসাময়িক বাঙলার কাব্যসাহিত্যের এবং কাব্য-চর্চার মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব প্রশস্তি সাধারণত সভাকবিদেরই রচনা, এবং উপমায়-রূপকে, অনুপ্রাসে-অলংকারে, ছায়ায়-ছবিতে একান্তই মধ্য-ভারতীয়, বস্তুত সর্বভারতীয় কাব্যৈতিহ্যের অনুগামী। কোনো মৌলিক কল্পনা বা রীতি বা ভঙ্গি এই প্রশস্তিরচনাগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দুই চারিটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিলেই বোঝা যাইবে, গতানুগতিক ধারার কাব্যরচনা-শক্তিতে সমসাময়িক বাঙালী কিছু হীন ছিল না।

সিদ্ধার্থস্য পরার্থ সুস্থিত মতেঃ সন্মার্গমভ্যস্যতঃ
সিদ্ধিঃ সিদ্ধিমনুত্তরাং ভগবতস্তস্য প্রজাসু ক্রিয়াৎ।
যস্ত্রৈধাতুকসত্ত্বসিদ্ধিপদবীরত্যুগ্রবীর্য্যোদয়াজ্
জিত্বা নির্বৃতিমাসসাদ সুগতঃ সন্ সর্বভূমীশ্বরঃ॥

যাঁহার মতি পরার্থে সুস্থিত, যিনি সৎমার্গ অভ্যাস করিতেছেন, যিনি অত্যুগ্রবীর্য বলে ত্রিলোকবাসী জীবের সিদ্ধির উপায় জয় করিয়া নির্বৃতি লাভ করিয়াছেন, যিনি সুগত এবং যিনি সর্বভূমীশ্বর, এমন ভগবান সিদ্ধার্থের সিদ্ধি তাঁহার প্রজাদিগকে অনুত্তর সার্থকতা দান করুক।

(দেবপালদেবের মুঙ্গের ও নালন্দা-লিপির প্রথম শ্লোক)

মৈত্রীং কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ
সম্যক্‌সম্বোধিবিদ্যাসরিদমলজলক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্কঃ।
জিত্বা যঃ কামকারিপ্রভবমভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ্য শান্তিং
স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোঽন্যশ্চ গোপালদেবঃ॥

যিনি কারুণ্যরত্নপ্রমুদিত হৃদয়ে মৈত্রীকে প্রেয়সীরূপে ধারণ করিয়াছেন, যিনি সম্যক্ সম্বোধিবিদ্যারূপ নদীর অমল জলে অজ্ঞান পঙ্ক ক্ষালন করিয়াছেন, যিনি মাররূপ অরির আক্রমণ পরাভূত করিয়া শাশ্বত শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এমন শ্রীমান্ দশবল লোকনাথ এবং গোপালদেব জয়যুক্ত হউন।

(নারায়ণপালদেবের ভাগলপুর-লিপির প্রথম শ্লোক)

বন্দ্যো জিনঃ স ভগবান্‌করুণৈকপাত্রং ধর্মোঽপ্যসৌ বিজয়তে জগদেকদীপঃ।
যৎসেবয়া সকল এব মহানুভবঃ সংসারপারমুপগচ্ছতি ভিক্ষু সঙ্ঘঃ॥

করুণার একমাত্র পাত্র ভগবান্ জিন বন্দিত হউন; জগতের একমাত্র দীপ ধর্মও জয়যুক্ত হউন; ইঁহাদের সেবায় সকল মহানুভবভিক্ষুসংঘ সংসারের পার প্রাপ্ত হয়।

(শ্রীচন্দ্রদেবের রামপাল ও কেদারপুর-লিপির বন্দনা শ্লোক)

বাল্যাৎ প্রভৃত্যহরহর্যদুপাসিতাসি বাগ্‌দেবতে তদধুনা ফলতু প্রসীদ।
বক্তাস্মি ভট্টভবদেবকুলপ্রশস্তিসূক্তাক্ষরাণি রসনাগ্রমধিশ্রয়েথাঃ।

হে বাগ্‌দেবি, বাল্যকাল হইতে তুমি প্রত্যহ উপাসিতা হইয়াছ, সেই উপাসনা এখন ফলবতী হউক, তুমি প্রসন্না হও। ভট্টভবদেবের কুলপ্রশস্তি সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিব, তুমি রসনাগ্রে অধিষ্ঠিত হও।

(ভট্ট-ভবদেবের ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি ; রচয়িতা বাচস্পতি কবি)

ভট্ট গুরবমিশ্রের প্রশস্তি, ভোজবর্মার বেলাব প্রশস্তি, সমস্তই এ-যুগের কাব্যচর্চার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিটির রচয়িতা কবি মনোরথ ; এই লিপিটিতে সেকালের নৌযুদ্ধের একটি সুন্দর বর্ণনা আছে :

যস্যানুত্তরবঙ্গসঙ্গর জয়ে নৌবাটহীহীরব—
ত্রস্তৈর্দিক্করিভিশ্চ যন্নচলিতং চেন্নাস্তি তদ্‌গম্যভূঃ।
কিঞ্চোৎপাতুককেনিপাতপতনপ্রোৎসর্পিতৈঃ শীকরৈর্
আকাশে স্থিরতা কৃতা যদি ভবেৎ স্যান্নিষ্কলঙ্কঃ শশী॥

যাঁহার দক্ষিণবঙ্গযুদ্ধজয়ে নৌবাহিনীর হীহী রবে ত্রস্ত হইয়া দিগ্‌গজেরা যে পলায়ন করে নাই তাহার কারণ তাহাদের যাইবার স্থান ছিল না। তাহা ছাড়া দাঁড়গুলির উৎক্ষেপে উৎক্ষিপ্ত জলকণা যদি আকাশে স্থির হইয়া থাকিত তাহা হইলে চন্দ্রের কলঙ্ক ঢাকা পড়িত।

গৌড় অভিনন্দ

সংকলয়িতা শার্ঙ্গধর তাঁহার শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি (১৩৬৩ খ্রী শ) নামক গ্রন্থে গৌড়-অভিনন্দ নামে এক কবির দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন ; এই দুইটির একটি শ্লোক শ্রীধরদাস তাঁহার সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থেও উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীধরের মতে তাহার রচয়িতা কবি শুভাঙ্গ বা শুভাংক। শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি-গ্রন্থে আরও দুইটি শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে (কবি) অভিনন্দের রচনা বলিয়া ; এই অভিনন্দের গৌড় অভিধা অনুপস্থিত। গৌড় অভিধাবিহীন অভিনন্দর ৫টি শ্লোক কবীন্দ্রবচন-গ্রন্থে, ২২টি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থে, ৬টি শ্লোক বলহণের শুক্তিমুক্তাবলীতে, এবং একটি পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই অভিনন্দরই দুইটি শ্লোক রামচরিতে উদ্ধার করা হইয়াছে, এবং একাধিক শ্লোকাংশ উজ্জ্বলদত্ত এবং বৃহস্পতি রায়মুকুটও ব্যবহার করিয়াছেন। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়-গ্রন্থে (একাদশ শতক) যে কবি অভিনন্দর উল্লেখ আছে তিনি খুব সম্ভবত এই অভিধাবিহীন অভিনন্দ, কিন্তু ইনি এবং গৌড়-অভিনন্দ একই ব্যক্তি কিনা, নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। গৌড়-অভিনন্দ বাঙালী ছিলেন, তাঁহার অভিধাতেই প্রমাণ। অভিধাবিহীন কবি অভিনন্দের ২২টি শ্লোক বাঙালী

শ্রীধরদাস কর্তৃক সংকলিত হইতে দেখিয়া মনে হয়, ইনিও বোধ হয় বাঙালী ছিলেন, এবং তাহা হইলে এই দুই অভিনন্দ এক হইতে কিছু বাধা নাই। গৌড়-অভিনন্দ কাদম্বরী-কথাসার নামেও একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, পদ্যে।

অভিনন্দ ও রামচরিত

সোঢ্ঢলের উদয়সুন্দরীকথা-গ্রন্থে আর এক সুপ্রসিদ্ধ কবি অভিনন্দর কথা আছে। এই অভিনন্দ এক পালবংশীয় যুবরাজের সভাকবি ছিলেন এবং রামচরিত নামে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্য হইতে জানা যায়, যুবরাজের বিরুদ ছিল হারবর্ষ এবং তিনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। তাঁহার পিতার নাম ছিল বিক্রমশীল এবং তিনি স্বয়ং ছিলেন ধর্মপাল-কুল-কৈরব-কাননেন্দু এবং পালকুল-প্রদীপ, পালকুলচন্দ্র। সন্দেহ নাই যে, যুবরাজ হারবর্ষ ছিলেন পালবংশীয়, এবং নৃপতি ধর্মপালের বংশধর। ধর্মপালের অন্য একটি নাম বা বিরুদ ছিল বিক্রমশীল, এ-তথ্য তিব্বতী ঐতিহ্যে সুস্পষ্ট। সুতরাং এই অনুমান অনৈতিহাসিক নয় যে, যুবরাজ হারবর্ষ এবং দেবপাল একই ব্যক্তি। এ-অনুমান সত্য হইলে রামচরিতের কবি অভিনন্দকে বাঙালী বলিতে আপত্তি হইবার কারণ নাই। তাহা ছাড়া, বাঙলাদেশে বাঙালী কবি কর্তৃক রচিত এই প্রাচীনতম রামচরিত বা রামায়ণ-কাব্যের একটি স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আছে; তাহা দেবীমাহাত্ম্য কীর্তন, যদিও তাহা হনুমানের মুখে, শ্রীরামচন্দ্রের মুখে নয়।

সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিত

পাল-চন্দ্রপর্বে বাঙলা দেশে রামায়ণ-কাহিনী সুপ্রচলিত ছিল, এবং উচ্চকোটিস্তরে রাম-সীতার মূর্তিপূজা প্রচলিত থাকুক বা না থাকুক, অন্তত ইঁহারা লোকের শ্রদ্ধা এবং পূজা আকর্ষণ করিতেন, সন্দেহ নাই। অভিনন্দ রচিত রামচরিতই প্রাচীন বাঙলার একমাত্র রাম-কাব্য নয়; সন্ধ্যাকর-নন্দী নামে প্রসিদ্ধতর আর একজন কবি রামচরিত নামেই আর একখানা ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক কাব্য বলিতেছি এই অর্থে যে, সন্ধ্যাকরের কাব্যটি দ্ব্যর্থব্যঞ্জক; এক অর্থে রামচন্দ্রের কাহিনী, অপর অর্থে পালরাজ রামপাল এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীদের ইতি-কাহিনী। গ্রন্থের শেষে যে-কবিপ্রশস্তি আছে তাহা হইতে জানা যায়, সন্ধ্যাকরের পিতার নাম ছিল প্রজাপতি-নন্দী, পিতামহের নাম পিণাক-নন্দী, এবং জন্মভূমি ছিল বরেন্দ্রান্তর্গত পুণ্ড্রবর্ধনপুরে। প্রজাপতি-নন্দী ছিলেন রামপালের সান্ধিবিগ্রহিক। গ্রন্থ-রচনা আরম্ভ কবে হইয়াছিল, বলা কঠিন, তবে কৈবর্ত-বিদ্রোহ এবং দ্বিতীয় মহীপালের হত্যা হইতে আরম্ভ করিয়া মদনপালের রাজত্ব পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাসের বর্ণনা হইতে মনে হয়, মদনপালের রাজত্বকালে গ্রন্থ-রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল। সন্ধ্যাকর-নন্দী সমসাময়িক

ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ; সেই হিসাবে তাঁহার কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু এই গ্রন্থের যথার্থ সাহিত্যমূল্য স্বল্প এবং মৌলিকত্বও তেমন কিছু নাই। কাব্যটি সু-প্রসিদ্ধ রাঘবপাণ্ডবীয়-কাব্যের ধারার অনুকরণ এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহার ২২০টি আর্যাশ্লোক শ্লেষচাতুর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সন্ধ্যাকর আত্মপরিচয় দিতেছেন 'কলিকাল-বাল্মীকি' বলিয়া, এবং তিনি যে শুধু অলংকারবিদ্ সুনিপুণ কবি তাহাই নয়, কুশলী ভাষাবিদ্ও, এ-দাবিও করিতেছেন। তাঁহার শেষোক্ত দাবি সার্থক, কারণ, শব্দ ও ভাষার উপর যথেষ্ট দখল না থাকিলে আর্যার মত সুকঠিন ছন্দে এবং মাত্র ২২০টি শ্লোকে একাধারে রামপাল-কথা এবং রামায়ণ-কথা বর্ণনা কিছুতেই সম্ভব হইত না। কিন্তু বাল্মীকির সঙ্গে তুলনা অলংকৃত দাবি, সন্দেহ নাই। অলংকারপ্রিয়তায়, শ্লেষোক্তিতে এবং কাব্যের অন্যান্য লক্ষণে সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিত অষ্টম-নবম-দশম-একাদশ শতকীয় সংস্কৃত কাব্যের সমগোত্রীয়।

অবান্তর হইলেও এ-প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য যে, রঘুপতি রামের পূজা এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা পরবর্তী সেন-বর্মণ পর্বে বোধ হয় বাড়িয়াই গিয়াছিল, এবং হয়তো রামের মূর্তিপূজাও প্রচলিত হইয়া থাকিবে। ধোয়ী-কবি তাঁহার পবনদূতে যে ভাবে স্বর্ণদী বা ভাগরথীতীরে রঘুকুলগুরু দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন, মনে হয়, মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতের মত বাঙলাদেশেও রাম সীতার পূজা প্রচলিত ছিল। পরে কোনো সময়ে তাহা অপ্রচলিত হইয়া গিয়া থাকিবে।

ক্ষেমীশ্বর চণ্ডকৌশিক

তবে, চণ্ডকৌশিক-প্রণেতা নাট্যকার ক্ষেমীশ্বর বাঙালী হইলেও হইতে পারেন। নাটকটির নান্দী অংশের একটি শ্লোক হইতে জানা যায়, গ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল মহীপালের রাজসভায়। এই মহীপাল পাল-রাজ মহীপাল হইতে পারেন, আবার গুর্জর-প্রতীহাররাজ মহীপাল হইতেও বাধা কিছু নাই। নাটকে বর্ণিত রাজা কর্ণাটক সৈন্যদের পরাভূত করিয়াছিলেন ; এই রাজা মহীপাল হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু পাল-রাজ মহীপাল যেমন একাধিক কর্ণাটক বাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তেমনই প্রতীহার-রাজ মহীপালকেও রাষ্ট্রকূট-বাহিনীর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, এবং এই রাষ্ট্রকূট-বাহিনীকে যদি কর্ণাটক বাহিনী বলা যায় তাহা হইলে খুব অন্যায় কিছু করা হয় না। কিন্তু চণ্ডকৌশিক-নাটকের সর্বপ্রাচীন যে দুইটি পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান (১২৫০ ও ১৩৮৭ খ্রীষ্ট শতকে অনুলিখিত) দুইটিই পাওয়া গিয়াছে নেপালে। সন্দেহ নাই যে, বিহার বাঙলাদেশ হইতেই সেগুলি নেপালে গিয়া থাকিবে। সেইজন্যই মনে হয়, ক্ষেমীশ্বর বাঙালী হউন বা না হউন তাঁহার কর্মক্ষেত্র বোধ হয় ছিল বিহার-বাঙলা দেশ, এবং চণ্ডকৌশিক-নাটকের প্রচলনও বেশি ছিল এই দুই দেশেই।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণবর্ণিত বিশ্বামিত্র-হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী লইয়া পঞ্চাঙ্ক চণ্ডকৌশিক নাটক। সমস্ত কাহিনীটি নাটকীয় গুণে দুর্বল, এবং ক্ষেমীশ্বরের কবিকল্পনা ও কাব্য-কৌশলও খুব উচ্চস্তরের নয়। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে সেইজন্য চণ্ডকৌশিকের স্থান খুব গর্বের বস্তু নয়। মহাভারতীয় নল-কাহিনী লইয়া ক্ষেমীশ্বর নৈষধানন্দ নামে আর একটি সপ্তাঙ্ক নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

কীর্তিবর্মা কীচকবধ

বরং অলংকারবহুল কাব্য হিসাবে নীতিবর্মার কীচকবধ উল্লেখযোগ্য। মহাভারতীয় বিরাটপর্বের সুপরিচিত কীচকবধ উপাখ্যানটি ১৭৭টি শ্লোকে পাঁচটি সর্গে বর্ণিত, কিন্তু মহাভারতের সবল সারল্য নীতিবর্মার রচনায় অনুপস্থিত। তাহার পরিবর্তে আছে শ্লেষ ও যমকালঙ্কার ব্যবহারের নৈপুণ্য, কবির শব্দ ও বাক্‌ভঙ্গির চাতুর্য। সেইজন্যই পরবর্তী বৈয়াকরণিক-অভিধানিক আলঙ্কারিকেরা নীতিবর্মার কীচকবধ হইতে প্রয়োজন হইলেই দৃষ্টান্ত আহরণ করিতে কার্পণ্য করেন নাই। ১০৬১ খ্রীষ্ট শতকে নামি সাধু নামে জনৈক আলংকারিক রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন; এই টীকায়ই সর্বপ্রথম কীচকবধ হইতে উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হইয়াছে। নীতিবর্মার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কোনো তথ্যই আমাদের জানা নাই, তবে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হয় কলিঙ্গের রাজা ছিলেন না হয় কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন, এই রকমের একটু ইঙ্গিত কাব্যটির প্রথম সর্গেই আছে। কিন্তু বাঙলা অক্ষরের পাণ্ডুলিপি ছাড়া আর কোনো অক্ষরে কীচকবধের কোনো পাণ্ডুলিপি এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, তাছাড়া, কাব্যটির প্রত্যেকটির টীকাকারই বাঙালী। সেই জন্যই মনে হয়, নীতিবর্মার কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশ, এবং কাব্যটির প্রচলনও এই দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল।

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়

একাদশ-দ্বাদশ শতকের আদি বঙ্গাক্ষরে লেখা একটি কবিতা-সংগ্রহ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে নেপালে; পুঁথিটি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ; নাম কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়। সংকলয়িতার নাম জানিবার উপায় নাই, তবে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। বইখানি যে বাঙলাদেশেই সংকলিত হইয়া পরে অন্যান্য অনেক গ্রন্থের মত নেপালে নীত হইয়াছিল, এই অনুমান অযৌক্তিক নয়। বইটিতে ১১১ জন বিভিন্ন কবি-বিরচিত ৫২১টি শ্লোক আছে, এবং এই ১১১ জনের মধ্যে কালিদাস, অমরু, ভবভূতি, রাজশেখর প্রভৃতি সর্বভারতপ্রসিদ্ধ কবিদের রচনা যেমন আছে তেমনই এমন অনেকের রচনা আছে যাঁহাদের বাঙালী বলিয়া মনে করিবার কারণ বিদ্যমান। গৌড়-অভিনন্দ, ডিম্বোক বা হিম্বোক, কুমুদাকর মতি, ধর্মকর, বুদ্ধাকরগুপ্ত, মধুশীল, বাগোক, লালিতোক, বিনয়দেব, ছিত্তপ, বল্প্য তথাগত, জয়ীক, বিতোক, বিদ্যাকা বা বিজ্জাকা, বিনয়দেব, বীর্যমিত্র, বৈদ্যোক,

শুভংকর, শ্রীধর-নন্দী, রতিপাল, যোগোক, সিদ্ধোক, সোনোক বা সোম্নোক, হিঙ্গোক, বৈদ্যধন্য, অপরাজিত-রক্ষিত, প্রভৃতি কবিদের এই সব নাম হইতে বুঝিতে পারা যায়, ইঁহারা বাঙালী ছিলেন, এবং ইঁহারা অনেকেই ছিলেন বৌদ্ধ। সংস্কৃত সাহিত্যে এই ধরনের কবিতা-সংগ্রহ বা কবিতা-চয়নিকার-ধারার উদ্ভব বোধ হয়এ ই পর্বের বাঙলা দেশেই, এবং কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ই এই জাতীয় সর্বপ্রথম সংকলন-গ্রন্থ। এর পরের পর্বের সদুক্তিকর্ণামৃতের সংকলয়িতাও একজন বাঙালী।

মহাকাব্য, এমন কি ছোট ছোট রসহীন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্য বোধ হয় সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালীর খুব বেশি রুচিকর ছিল না ; তাহার বেশি রুচিকর ছিল অপভ্রংশ এবং প্রাকৃত পদ ও ছড়া, ছোট ছোট সংস্কৃত কবিতা, প্রকীর্ণ শ্লোক। এই সব সংস্কৃত শ্লোক ও পদের মধ্যে শুধু যে সমসাময়িক সংস্কৃত কাব্য-রীতির পরিচয়ই আছে তাহাই নয়, বাঙলাদেশের প্রাকৃতিক রূপ এবং সমসাময়িক বাঙালীর কল্পনা এবং মানসপ্রকৃতিও সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। দুই একজন মহিলা কবির পরিচয়ও পাইতেছি—ভাবাক বা ভাব-দেবী ও নারায়ণ-লক্ষ্মী।

নবম শতকের মধ্যভাগে কামরূপাধিপতি বনমালবর্মদেবের একটি লিপিতে বোধ হয় সর্বপ্রথম রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার সুস্পষ্ট আভাস পাইতেছি। ভোজবর্মার বেলাবলিপিতেও সে-উল্লেখ সুস্পষ্ট। কিন্তু কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়-গ্রন্থে উদ্ধৃত বাঙালী কবি-রচিত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন শ্লোকে এই ব্রজলীলার যে-চিত্র দৃষ্টিগোচর, গীতগোবিন্দের ঃ আগে সে-চিত্র আর কোথাও দেখা যায় না। তিনটি শ্লোক এখানে উদ্ধার করিতেছি।

কোঽয়ং দ্বারি হরিঃ প্রযাহ্যু পবনং শাখা মৃগেনাত্র কিং
কৃষ্ণোঽহং দয়িতে বিভেমি সুতরাং কৃষ্ণং কথঃ বানরঃ।
মুগ্ধেঽহং মধুসূদনো ব্রজলতাং তামেব পুষ্পাসবাম্
ইত্থং নির্বচনীকৃতো দয়িতয়া হ্রীণো হরিঃ পাতু বঃ॥

(অজ্ঞাতনাম ; সদুক্তিকর্ণামৃতে এই শ্লোকটি কবি শুভাংকের নামে উদ্ধৃত)

* * *

[শীঘ্রং গচ্ছত] ধেনুদুগ্ধকলশানাদায় গোপ্যো গৃহং
দুগ্ধে বষ্কয়িণীকুলে পুনরিয়ং রাধা শনৈর্যাস্যতি।
ইত্যন্যব্যপদেশ গুপ্তহৃদয়ঃ কুর্বন্ বিবিক্ত ব্রজং
দেবঃ কারণনন্দসূনুরশিবং কৃষ্ণঃ স মুষ্ণাতু বঃ॥ (সোম্নোক)

* * *

ময়া দৃষ্টো ধৃতঃ স সখি নিখিলামেব রজনীম্
ইহ স্যাদত্র স্যাদিতি নিপুণমন্যাভিসৃতঃ।
ন দৃষ্টো ভাণ্ডীরে তটভুবি ন গোবর্দ্ধনগিরে-
ন কালিন্দ্যাঃ [কূলে] ন নিচুলকুঞ্জে মুররিপুঃ॥ (অজ্ঞাতনাম)

৪

পাল-চন্দ্র পর্ব। বৌদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞান ; শিক্ষা ও সংস্কৃতি ; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

পালচন্দ্র পর্বে বাঙলা দেশের যথার্থ গৌরব ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য সংস্কৃতিতে তত নয় যত তাহার বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-সংস্কৃতি অসংখ্য মহাযানী-বজ্রযানী-মন্ত্রযানী-সহজযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা প্রকাশ করিয়াছিলেন সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাঙলা ভাষায় রচিত অগণিত গ্রন্থে। মূল গ্রন্থ অধিকাংশই আজ বিলুপ্ত কিন্তু ইহাদের তিব্বতী অনুবাদ কিছু কিছু বর্তমান এবং তিব্বতী গ্রন্থ-তালিকায় তালিবাবদ্ধ। এই সুদীর্ঘ গ্রন্থমালা তিব্বতী ঐতিহ্যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাহিত্যের অন্তর্গত এবং বৌদ্ধ সূত্রসাহিত্য হইতে পৃথক। দেশীয় ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে এই সব বৌদ্ধ আচার্য এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদির স্মৃতি একেবারে মুছিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। তিব্বতী গ্রন্থ-তালিকা, তিব্বতী লামা তারনাথের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস, সুম্‌পা রচিত পাগ্-সাম্-জোন্-জাং প্রভৃতি গ্রন্থই এ-সম্বন্ধে আমাদের একমাত্র উপাদান।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও তদোদ্ভূত অন্যান্য বৌদ্ধ যান (মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান এবং নাথধর্ম, কৌলধর্ম প্রভৃতি) সম্বন্ধে ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবরণ দিতে চেষ্টা করিয়াছি। বলা বাহুল্য, এই সব বিভিন্ন যান ও ধর্মমত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আজও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ; অধিকাংশ গ্রন্থ এখনও অনূদিত ও আলোচিতই হয় নাই। অনুবাদ এবং আলোচনার বাধাও বিস্তর। প্রথমত, যে সংস্কৃত ভাষায় মূল গ্রন্থসমূহ রচিত হইয়াছিল, সে সংস্কৃত অত্যন্ত ব্যাকরণদোষদুষ্ট শুদ্ধ সুবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষাব্যবহারের কোনো বালাই-ই যেন বৌদ্ধ আচার্যদের ছিল না। তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেন, বুঝিতে পারিলেই হইল, ছন্দ, ব্যাকরণ, অলংকার শব্দ বা পদরীতি ইত্যাদি অশুদ্ধ বা অপ্রচলিত হইলেও কিছু ক্ষতি নাই। কালচক্রযানের বিমলপ্রভা নামে একটি টীকায় বলা হইয়াছে, বৌদ্ধ আচার্যরা স্বেচ্ছাপূর্বক সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি পদ্ধতি, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতি অমান্য করিতেন ; যাঁহারা মানিয়া চলিতেন তাঁহাদের বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেন! ঠিক এই কারণেই তিব্বতী অনুবাদও বহুক্ষেত্রে দুর্বোধ্য এবং তাহা হইতে সংস্কৃতে পুনরনুবাদ খুব সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, এই সব প্রত্যেকটি ধর্ম গুরুনির্ভর ধর্ম, গুরু ছাড়া এই ধর্মের গুহ্য সাধন প্রক্রিয়ার রহস্য ভেদ করা অসম্ভব বলিলেই চলে, এবং দীক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া গুরুরা অন্য কাহারও নিকট সে রহস্য ভেদ ও ব্যাখ্যা করিতেন না। সেই হেতু এই সব ধর্মের বিস্তৃতি দীক্ষিত চক্র বা মণ্ডলের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ ; সর্বসাধারণ সেই সীমার মধ্যে প্রবেশ করিতেই পারিত না। গুরুরা দীক্ষিতদের নিকট এবং দীক্ষিতরা পরস্পরের মধ্যে তাঁহাদের গুহ্যসাধনা সম্বন্ধে যে-ভাষায় কথা বলিতেন সে-ভাষাও ছিল গুহ্যভাষা। যে-ভাষার নাম ছিল সন্ধাভাষা (সন্ধিভাষা), যে ভাষা সুধু 'মৌলিক' 'সম্পূর্ণ' 'নিগূঢ়'

সত্যের কথা বলে ; কিন্তু যত মৌলিক, সম্পূর্ণ এবং নিগূঢ়ই হোক না কেন সে-ভাষা, অদীক্ষিত জনের কাছে তাহা ছিল দুর্বোধ্য। এ-ভাষায় যাহা 'আভিপ্রায়িক', অর্থাৎ আপাত যে-অর্থ কোনো বাক্যের বা পদের, তাহাই তাহার নিগূঢ় অর্থাৎ মৌলিক, সম্পূর্ণ অর্থ নয়, মৌলিক সম্পূর্ণ, উদ্দিষ্ট অর্থের দিকে তাহা ইঙ্গিত করে মাত্র। কাজেই, সে-ভাষার মৌলিক, উদ্দিষ্ট অর্থ ধরিতে পারা সহজ নয়। তৃতীয়ত, ইঁহাদের সাধনপন্থা এবং প্রক্রিয়াও ছিল অত্যন্ত গুহ্য। নানা প্রকারের যাদুমন্ত্র যাদুপ্রক্রিয়া, নানা বিধিবিধান, সাধনমন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল, ধারণী, যোগ, সমাধি প্রভৃতি লইয়া এই বৌদ্ধাচার্যরা এমন একটি রহস্যময় জগৎ গড়িয়াছিলেন ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র-জগতের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য থাকিলেও সর্বত্র সর্বথা তাহা আমাদের অধিগম্য নয়। সে-জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচিত সাধন-রীতি-পদ্ধতি, নীতি ও প্রক্রিয়ার সম্বন্ধ কমই। গুহ্য রহস্যময় সন্ধ্যাভাষায় বৌদ্ধ আচার্যরা গুহ্যতর সাধন-প্রক্রিয়া ও অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন। চতুর্থত, যে-সব ছায়া, রূপক, উপমা, প্রতীক এবং যোগারূঢ় শব্দ আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের সাধন-নীতি ও আদর্শ, রীতি ও প্রক্রিয়া এবং অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা বর্ণিত হইয়াছে, সে-গুলি সমসাময়িক সাধারণ নর-নারীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যৌন-জীবন এবং যৌন-প্রক্রিয়া হইতেই আহৃত, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সেই জীবন ও প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে তাহারা যে অর্থ ও ইঙ্গিত বহন করে তাহা একান্তই আপাত অর্থ ও ইঙ্গিত, এবং সে অর্থ ও ইঙ্গিত আমাদের বর্তমান রুচি ও সংস্কারকে আঘাত করে। কাজেই স্বচ্ছ ও নির্মোহ বিজ্ঞানদৃষ্টি লইয়া এই সুবিস্তৃত সাহিত্য অনুশীলন না করিলে পরিচিত ছায়া উপমারূপক প্রতীকের পশ্চাতে, আপাত অর্থের পশ্চাতে, যে নিগূঢ় অর্থ বিদ্যমান তাহা সহজে ধরা পড়ে না।

মহাযানোদ্ভূত মন্ত্রযান, কালচক্রযান ও বজ্রযানে সীমানির্দিষ্ট পার্থক্য বিশেষ কিছু কখনো ছিল না। একই বৌদ্ধাচার্য বিভিন্ন যান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং একাধিক যান কর্তৃক গুরু এবং আচার্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। শান্তিদেব, শান্তি-রক্ষিত, দীপঙ্কর প্রভৃতি আচার্যরা মহাযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান প্রভৃতি সকল যানেই স্বীকৃত, এবং বজ্রযানী-মন্ত্রযানীরা ইঁহাদের আপন গুরু বলিয়া দাবিও করিয়াছেন। ঠিক একই কথা বলা চলে সহজযান, নাথধর্ম, কৌলধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে। এই সব ধর্ম মত ও সম্প্রদায় সমস্তই সমসাময়িক, এবং এক সম্প্রদায়ের আচার্যরা অন্য সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃতিও লাভ করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বজ্রযান ও মন্ত্রযানের অপেক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠাবান আচার্যরা তো সকলেই সহজযান, নাথধর্ম এবং কৌলধর্মের আদি গুরু বলিয়া স্বীকৃত। সরহ বা সরহপাদ, কৃষ্ণ বা কাহ্নপাদ, শবরপাদ, লুইপাদ-মীননাথ ইঁহারা প্রত্যেকেই বজ্রযানে যেমন স্বীকৃত, তেমনই সহজযানী-নাথপন্থী-কৌলমার্গী প্রভৃতিরাও ইঁহাদের আচার্য, বা গুরু, বা প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া দাবি করিয়াছেন। শান্তিদেব, শান্তি বা শান্তরক্ষিত, দীপঙ্কর প্রমুখ আচার্যরা

গোড়ায় ছিলেন মহাযানী, পরে ক্রমশ বিবর্তিত হইয়াছিলেন বজ্রযানীরূপে, এবং যেহেতু বজ্রযান মহাযান হইতেই উদ্ভূত এবং তাহারই বিবর্তিত রূপ সেই হেতু ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক বা অনৈতিহাসিক কিছু নাই। এই কারণেই নাথপন্থী বা কৌল-মার্গীদের গুরু লুইপাদ-মীননাথ এবং সহজযানীদের লুইপাদ দুই ব্যক্তি, এমন মনে করিবারও কোনো কারণ নাই। বজ্রযানোদ্ভূত এই সব ধর্মমার্গ ও সম্প্রদায় গোড়ায়ই আপনাপন বৈশিষ্ট্য লইয়া সুনির্দিষ্ট সীমায় সীমীত হয় নাই; সে-সব বৈশিষ্ট্য ক্রমশ পরে গড়িয়া উঠিয়াছে। বরং, সূচনায় ইঁহাদের একই ছিল ধ্যান ও আদর্শ, একই ছিল ভাব-পরিমণ্ডল, এবং যাহারা সেই ধ্যান, আদর্শ ও ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিলেন তাঁহারা পরে প্রত্যেক স্ব-স্বতন্ত্র মত ও সম্প্রদায় কর্তৃক গুরু এবং আচার্য বলিয়া স্বীকৃত হইবেন, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তাহা ছাড়া, মন্ত্রযান-বজ্রযান ধর্মের মন্ত্র, মণ্ডল প্রভৃতি বাহ্যানুষ্ঠানের প্রতি সহজযানী সিদ্ধাচার্যদের মনোভাব যত বিরূপই হোক্ না কেন, নাথ ও কৌলধর্মের প্রতি বিরূপ হইবার তেমন কারণ কিছু ছিলনা; ইহাদের মধ্যে মৌলিক বিরোধ স্বল্পই। ইহাদের মধ্যে, বিশেষভাবে নাথধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়া সমানেই চলিতেছিল। 'নাথধর্ম' ছিল কতকটা লোকায়ত ধর্ম, সহজযানও কতকটা তাই। কাজেই ইহাদের মধ্যে এবং অন্যান্য লোকায়ত ধর্মের সঙ্গে পরস্পর যোগাযোগ কিছুটা ছিলই, এবং ছিল বলিয়াই ইহাদের ভিতর হইতে এবং ইহাদেরই ধ্যানাদর্শ লইয়া পরবর্তী বৈষ্ণব সহজিয়া-ধর্ম, শৈব নাথযোগী সম্প্রদায়, আউল-বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায় ও মতামতের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, এখানে আর পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই।

এই সব মহাযানী-কালচক্রযানী-মন্ত্রযানী-বজ্রযানী-সহজযানী আচার্যদের দেশ ও কাল সম্বন্ধে এবং ইঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। ইঁহাদের মধ্যে যাহারা দেশ ছাড়িয়া দূরে অন্যত্র নিজেদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া-ছিলেন তাঁহাদের সমস্ত তথ্যই প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিব্বতী গ্রন্থ-তালিকায় অনেকের জন্ম ও কর্মভূমি উল্লিখিত আছে, কিন্তু অনেকের নাইও। কিন্তু যাঁহাদের আছে তাঁহাদেরও জন্ম-কর্মভূমির স্থান-নাম সর্বদা এবং সর্বত্র সনাক্ত করা সহজ নয়; এ-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যাঁহাদের সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ বিদ্যমান এবং যে-সব স্থান-নামের সনাক্তকরণ সুনির্ধারিত, তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিঃসংশয়ে বলা চলে, এই সব আচার্যরা অধিকাংশই ছিলেন বাঙলা দেশের অধিবাসী, স্বল্পসংখ্যক কয়েকজনের জন্মভূমি ছিল কামরূপ, ওড্রদেশ, বিহার এবং কাশ্মীর। এই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই ইহাও বলা চলে যে, এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের লীলাভূমি ছিল প্রাচ্য-ভারত, বিশেষ ভাবে বাঙলা দেশ। যে-সব মহাবিহারে বসিয়া বৌদ্ধ আচার্যরা অগণিত গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের ভিতর নালন্দা,

ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীল ছাড়া অন্য প্রত্যেকটি মহাবিহারই ছিল বাঙলা দেশে। সমসাময়িক বাঙালীর শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যান্য সুবৃহৎ কেন্দ্র ছিল জগদ্দল, সোমপুরী, পাণ্ডুভূমি, ত্রৈকূটক, বিক্রমপুরী, দেবীকোট, সন্নগর, ফুল্লহরি, পণ্ডিত, পট্টিকেরক প্রভৃতি বিহারে; এ-সংবাদও পাইতেছি তিব্বতী বৌদ্ধ গ্রন্থ-তালিকা হইতেই। এই পর্বের নালন্দা, ওদন্তপুরী এবং বিক্রমশীল মহাবিহারও বাঙালী ও বাঙলা দেশের রাষ্ট্রীয় ওসংস্কৃতি সীমার অন্তর্গত। বিক্রমশীল বিহারের প্রতিষ্ঠাতাই তো ছিলেন পাল-রাজ ধর্মপাল স্বয়ং এবং ওদন্তপুরী ও নালন্দায় এ-পর্বের বিদ্যার্থী ও আচার্যদের অধিকাংশই বাঙালী। নালন্দা ও ওদন্তপুরীর প্রধান পৃষ্ঠপোষকও বাঙলার পাল-বংশ। এই সব বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্যদের স্থিতিকাল সম্বন্ধে নির্দিষ্ট সন-তারিখ নির্ণয় কঠিন হইলেও একেবারে অসম্ভব নয়। কোনো কোনো গ্রন্থ-রচনার তারিখ উল্লিখিত আছে; সমসাময়িক বা পূর্বতন আচার্যদের ও রাজা-রাজবংশের উল্লেখের এবং গুরুপরম্পরানির্ধারণের সাহায্যে মোটামুটি ইঁহাদের কালনির্ণয়ের একাধিক চেষ্টা হইয়াছে। তাহার উপর নির্ভর করিয়া বলা চলে, উল্লিখিত বৌদ্ধ আচার্যদের স্থিতিকাল এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থাদির রচনাকাল মোটামুটি অষ্টম শতক হইতে একাদশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। বিশেষভাবে পাল-পর্বই যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের উদ্ভব, প্রসার ও প্রভাব কাল তাহা তিব্বতী গ্রন্থ-তালিকা, তারনাথের ইতিহাস এবং সুম্‌পার পাগ্‌ সাম্‌ জোন্‌ জাঙ্‌-গ্রন্থের সাক্ষ্যেও সুপ্রমাণিত।

উল্লিখিত বৌদ্ধ আচার্যরা যে শুধু অবলোকিতেশ্বর, তারা, মঞ্জুশ্রী, লোকনাথ হেবুক, হেবজ্র প্রভৃতি বিচিত্র দেবদেবীর সাধনমন্ত্র স্তোত্র, সঙ্গীতি, মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল, যোগ, ধারণী, সমাধি প্রভৃতি লইয়াই গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন তাহাই নয়, যোগ ও দর্শন হেতুবিদ্যা ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও শব্দবিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধেও নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কাজেই, এই সব গ্রন্থের মধ্যেই সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-দীক্ষাও প্রতিফলিত।

উড্ডীয়ান জাহোর সাহোর

বলিয়াছি, এই সব বৌদ্ধ আচার্যরা প্রায় সকলেই ছিলেন বাঙালী, এবং ইঁহাদের কর্মভূমি ছিল পূর্ব-ভারত, প্রধানত প্রাচীন বাঙলা দেশ ও বিহার। কিন্তু বাঙালী বলিয়া দাবি করিবার আগে দুইটি স্থান-নাম সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। মহাযান-বজ্রযান-মন্ত্রযান প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া এক সুবিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভব ও প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল, তাহার কিয়দংশ মাত্র তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল বাঙলা, বিহার, কাশ্মীর ও তিব্বতের নানা বৌদ্ধ বিহারে। এই অনূদিত গ্রন্থগুলির একটি তালিকা ত্রয়োদশ শতকে সংকলিত হইয়াছিল তিব্বতে, তিব্বতী লামা বু-তোন কর্তৃক; তালিকা-গ্রন্থটির নাম ত্যাঙ্গুর। এই অনূদিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই কালের প্রভাব এড়াইয়া আজ বাঁচিয়া

আছে ; মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলিরও কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে নেপালে এবং অন্যত্র। গ্রন্থগুলির অধিকাংশই বজ্রযানী সাধন-সম্পর্কিত ; তিব্বতীতে বলা হইয়াছে বৌদ্ধতন্ত্র বা র্‌গ্যুদ (Rgyud) ; কিছু বৌদ্ধ সূত্র সম্বন্ধীয় বা মৃদো (Mdo)। যাহা হউক, এই সব গ্রন্থ-লেখকদের কাহারও কাহারও জন্মভূমি ছিল জাহোরে বা সাহোরে এবং উড্ডীয়ানে, এবং লোকায়ত ঐতিহ্যমতে উড্ডীয়ানেই বজ্রযানের উদ্ভব। উড্ডীয়ান যে কোন্ স্থান তাহা লইয়া পণ্ডিত-মহলে প্রচুর মতভেদ বিদ্যমান। কাহারও মতে উড্ডীয়ান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও হিন্দুকুশের মধ্যবর্তী সোয়াট্ উপত্যকায়, কাহারও মতে পূর্ব-তুর্কীস্থানের কাসগরে, কাহারও মতে বাঙলা দেশে, কাহারও মতে বাঙলার পূর্ব-সীমান্তে, আবার কাহারও মতে উড়িষ্যায়। এই সব বিভিন্ন মতামতের অরণ্যজাল ভেদ করিয়া সত্য নির্ণয় দুরূহ। তবে, একটি তথ্যের দিকে পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়। ত্যাঙ্গুরে সরোহ (বজ্র) বা সরহকে বলা হইয়াছে উড্ডীয়ান-বিনির্গত, কিন্তু পাগ্-সাম্-জোন্-জাং-গ্রন্থে আবার সেই সরহকে বলা হইয়াছে বঙ্গালের অধিবাসী। ত্যাঙ্গুরের এক অংশে যে অবধূতপাদ অদ্বয়বজ্রকে বলা হইয়াছে উড্ডীয়ানবাসী বলিয়া, সেই ত্যাঙ্গুরেরই অন্য অংশে সেই অদ্বয়বজ্রকেই বলা হইয়াছে বাঙালী। পাগ্-সাম্-জোন্-জাং-গ্রন্থে যে লুইপাদকে বলা হইয়াছে উড্ডীয়ান্-বিনির্গত, ত্যাঙ্গুরে সেই লুইপাদকেই বলা হইয়াছে বাঙলার অধিবাসী। ত্যাঙ্গুরে যে তৈলিকপাদকে বলা হইয়াছে উড্ডীয়ানবাসী, সেই তৈলিকপাদকেই পাগ্-সাম্-জোন্-জাং-গ্রন্থে চট্টগ্রামীয় এক ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। আবার, পাগ্ সাম্-জোন্-জাং-গ্রন্থে নাগবোধির বাড়ী বলা হইয়াছে বরেন্দ্রের শিবসের গ্রামে ; অথচ নাগবোধি স্বয়ং নিজের বর্ণনা দিয়াছেন উড্ডীয়ান বিনির্গত বলিয়া। এত সব সাক্ষ্যের পর উড্ডীয়ান যে বাঙলা দেশের কোনো স্থান নয় এ কথা বলিতে একটু দ্বিধা হয় বই কি ?

জাহোর বা সাহোরসম্বন্ধেও একই সংশয়। সাহোরকে কেহ কেহ মনে করেন লাহোর, কেহ বলেন হিমাচলের মণ্ডি, কেহ মনে করেন বাঙলার যশোর বা ঢাকা জেলার সাভার ; আবার কেহ কেহ মনে করেন সমগ্র হিন্দুস্থানেরই নাম জাহোর বা সাহোর। পাগ্-সাম্-জোন্-জাং-গ্রন্থ একবার শান্তরক্ষিতের পরিচয় দিয়াছে বাঙালী বলিয়া, আর একবার বলিতেছে, তিনি ছিলেন সাহোরের রাজ-পরিবারের সন্তান। অন্যত্র তিব্বতী ঐতিহ্যে শান্তরক্ষিতকে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে গৌড়ের অধিবাসী। তিব্বতী জনশ্রুতি মতে ধর্মপাল ছিলেন সাহোরের রাজা, এবং আর এক তিব্বতী ঐতিহ্যে বাঙালী দীপঙ্কর সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে, তিনি ছিলেন সাহোর-রাজবংশোদ্ভূত। আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্ট শতকে বাঙালী স্মার্ত পণ্ডিত শূলপাণিও আত্মপরিচয় দিয়াছেন সাহুরিয়ান বলিয়া। এই সব সাক্ষ্যে মনে হয়, জাহোর বা সাহোরও বাঙলাদেশেরই কোনো স্থান।

এই সব বাঙালী বৌদ্ধ আচার্যদের কাল সম্বন্ধেও নিঃসংশয় হওয়া কঠিন। তবু

তিব্বতী ঐতিহ্য ও অন্যান্য সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া কিছু কিছু কাল-নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। এই সব প্রচেষ্টা আশ্রয় করিয়া অগণিত বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে স্বল্পমাত্র কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়ার চেষ্টা করা যাইতে পারে কতকটা আনুমানিক কালক্রমানুযায়ী।

বজ্রযানী তান্ত্রিক ও সিদ্ধাচার্য আচার্য-কুল। তাঁহাদের রচনা। অষ্টম-নবম শতক

প্রাচীনতম বজ্রযানী বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে শান্তিরক্ষিত অন্যতম। সুম্‌পা-বর্ণিত তিব্বতী ঐতিহ্যমতে শান্তিরক্ষিত ছিলেন জাহোর-রাজবংশের সন্তান। গোপালের রাজত্ব-কালে তাঁহার জন্ম, ধর্মপালের রাজত্বকালে মৃত্যু। শান্তিরক্ষিতের জন্মভূমি বাঙলাদেশে হউক বা না হউক, তাঁহার কর্মভূমি যে ছিল প্রাচ্য-ভারত এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। ত্যাঙ্গুর গ্রন্থ-তালিকায় দেখা যায়, তিনি অন্তত তিন খানা বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন : অষ্টতথাগতস্তোত্র, বজ্রধর-সঙ্গীত-ভগবত-স্তোত্রটীকা এবং পঞ্চ-মহোপদেশ। তাঁহার অন্য নাম ছিল আচার্য বোধিসত্ত্ব, এবং সেই নামেও সপ্ততথাগত সম্বন্ধে আরও চারখানি বই তিনি লিখিয়াছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্যে এই বজ্রযানী বৌদ্ধ আচার্য শান্তিরক্ষিত এবং মহাযানী নৈয়ায়িক ও দার্শনিক শান্তরক্ষিত একই ব্যক্তি। নৈয়ায়িক শান্তরক্ষিত ছিলেন স্বতন্ত্র মধ্যমক মতের অনুগামী এবং নালন্দা-মহাবিহারের অন্যতম আচার্য। তিনি সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্বসংগ্রহ, বাদন্যায়বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ এবং মধ্যম-কালঙ্কার কারিকা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও মনীষা এবং বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য অধ্যাত্ম চিন্তায় সুগভীর জ্ঞান সদ্যোক্ত তিনটি গ্রন্থে সুপরিস্ফুট। তাঁহার শিষ্য কমলশীল প্রথমোক্ত গ্রন্থটির একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই কমলশীল ছিলেন লুই-পা বা লুইপাদের সমসাময়িক। তিব্বতী ঐতিহ্যমতে শান্তিরক্ষিতের ভগ্নিপতি ছিলেন উড্ডীয়ান্‌ বা ওড্ডীয়ানবাসী রাজকুমার পদ্মসম্ভব।

তিব্বতী ঐতিহ্যমতে শান্তিরক্ষিতের খ্যাতি ভারতবর্ষের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে (অষ্টম শতকের মাঝামাঝি) তিব্বতের রাজা ছিলেন বৌদ্ধ-ধর্মানুরক্ত খি-স্রং-ল্‌দে ব্‌ৎসান এবং শান্তিরক্ষিত কোনো কার্যব্যপদেশে ছিলেন নেপালে। খি-স্রং-ল্‌দে-ব্‌ৎসান কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া শান্তিরক্ষিত গেলেন তিব্বত, কিন্তু তিব্বত তখন যাদু ও ভূতপ্রেতবাদের এবং নানা গুহ্যসাধনার কেন্দ্র। শান্তরক্ষিতের বৌদ্ধ ধর্মের কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। তিনি ফিরিয়া গেলেন নেপালে ; কিন্তু কিছুদিন পরই আবার আমন্ত্রিত হইয়া যাইতে হইল তিব্বত। কিছুদিন পর তাঁহারই নির্দেশে তিব্বত-রাজ পদ্মসম্ভবকেও আমন্ত্রণ করিয়া তিব্বতে লইয়া আসিলেন। তখন শান্তরক্ষিত ও পদ্মসম্ভব দুইজনে মিলিয়া সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন ; তিব্বতে লামা শ্রেণীর সৃষ্টি হইল, এবং সকৃতজ্ঞ খি-স্রং-ল্‌দে-ব্‌ৎসান মগধের ওদন্তপুরী বিহারের

আদর্শে ব্সম্ য়া (Bsam ya) বিহার প্রতিষ্ঠা করিলেন, শান্তিরক্ষিত হইলেন সেই বিহারের প্রথম সংঘাচার্য। পদ্মসম্ভব কিছুদিন পর ধর্মপ্রচারোদ্দেশে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। প্রায় তেরো বৎসর প্রচার ও গ্রন্থাদি রচনার পর এক চীনা শ্রমণ তিব্বতে আসিয়া বৌদ্ধ ধর্মের অন্য আর একটি নিকায় প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। শান্তিরক্ষিত সেই শ্রমণের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তর্কে তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া খ্রি স্রং ল্দে ব্ৎসানকে অনুরোধ করিলেন মগধ হইতে কমলশীলকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিবার জন্য। কমলশীল তিব্বতে আসিয়া চীনা শ্রমণকে তর্কযুদ্ধে হারাইয়া শান্তিরক্ষিতের মতবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

শান্তিদেব

শান্তিরক্ষিত-শান্তরক্ষিতের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে যে-সমস্যা সে-সমস্যা বজ্রযানী গ্রন্থের লেখক তান্ত্রিক শান্তিদেব এবং শিক্ষা সমুচ্চয় ও বোধিচর্যাবতার-রচয়িতা প্রসিদ্ধ মহাযানী আচার্য শান্তিদেব সম্বন্ধেও বিদ্যমান। তারনাথের মতে মহাযানী শান্তিদেব ছিলেন সৌরাষ্ট্রের রাজপরিবারসম্ভূত। কিছুদিন তিনি রাজা পঞ্চমসিংহের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন; পরে তিনি নালন্দা-বিহারে আসিয়া আচার্য জয়দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পাগ্-সাম্-জোন্-জাং-গ্রন্থের মতে মহাযানী শান্তিদেবের বাল্যনাম ছিল শান্তিবর্মা; পিতা ছিলেন কল্যাণবর্মা। এই মহাযানী আচার্য খুব সম্ভব সপ্তম-অষ্টম শতকের লোক। ত্যাঙ্গুর-গ্রন্থে বজ্রযানী তান্ত্রিক শান্তিদেবের তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়: শ্রীগুহ্যসমাজ-মহাযোগ-তন্ত্রবলিবিধি, সহজগীতি ও চিত্তচৈতন্য-শমনোপায়। তাঁহার বাড়ী ছিল জাহোরে। সুমপা বলিতেছেন, তান্ত্রিক শান্তিদেবের অন্য নাম ছিল ভুসুকু বা রাউতু। চর্যাগীতি-গ্রন্থের কয়েকটি গীতির রচয়িতা ছিলেন সহজ-সিদ্ধাচার্য জনৈক ভুসুকু; সন্দেহ নাই, এই ভুসুকু ছিলেন বাঙালী। কিন্তু বজ্রযানী তান্ত্রিক শান্তিদেব ও বাঙালী সিদ্ধাচার্য ভুসুকু একই ব্যক্তি কিনা সে-সন্দেহ থাকিয়াই যায়।

শান্তিপাদ

চর্যাগীতিতে দেখিতেছি, শান্তি-পা বা শান্তিপাদনামে আর একজন বাঙালী গীত-রচয়িতা সিদ্ধাচার্য ছিলেন। এই শান্তিপাদের অন্য নাম ছিল রত্নাকর-শান্তি; ত্যাঙ্গুর গ্রন্থ-তালিকায় দেখিতেছি, তিনি সুখদুঃখদ্বয়-পরিত্যাগদৃষ্টি নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাহা ছাড়া আরও ১৮টি তান্ত্রিক গ্রন্থেরও তিনি ছিলেন লেখক। তারনাথ বলিতেছেন, রত্নাকর শান্তির বাড়ী ছিল মগধে, বিক্রমশীল-বিহারের তিনি ছিলেন অন্যতম আচার্য, এবং সাত বৎসর তিনি সিংহলে প্রচারকার্যে রত ছিলেন। যাহাই হউক, মহাযানী শান্তিদেব ও বজ্রযানী

তান্ত্রিক শান্তিদেব যে দুই ভিন্ন ব্যক্তি এ-সম্বন্ধে বোধ হয় সন্দেহের অবকাশ কম। তবে, তান্ত্রিক শান্তিদেব ও ভুসুক একই ব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন ; উভয়েই একাদশ শতকের লোক। চর্যাগীতির শান্তিপাদ ও ত্যাঙ্গুরের রত্নাকরশান্তিও বোধ হয় একই ব্যক্তি।

সরোরুহবজ্র বা পদ্মবজ্র

সরোরুহবজ্র, কমলশীল, শান্তিরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, ইঁহারা সকলেই প্রায় সমসাময়িক, আনুমানিক অষ্টম শতকের লোক। উড্ডীয়ান্-বিনির্গত সরোরুহবজ্রের অন্য নাম ছিল পদ্মবজ্র ; তিনি ছিলেন হেবজ্রতন্ত্রের অন্যতম পুরোগামী আচার্য, উড্ডীয়ানবাসী অনঙ্গবজ্রের গুরু এবং ইন্দ্রভূতির পরম গুরু। এই সরোরুহবজ্রকে পরবর্তীকালের সরহ-সরহপাদ বা সরহ-রাহুলভদ্রের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে করিবার কোনো কারণ নাই। বস্তুত, ত্যাঙ্গুর, পাগ্-সাম্-জোন্-জাং, তারনাথ প্রভৃতির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, সরহ নামে একাধিক বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন, এবং তাঁহারা সকলেই কিছু সমসাময়িক ছিলেন না। তারনাথ তো পরিষ্কারই দুই সরহের ইঙ্গিত দিতেছেন, একজন সরহ-রাহুলভদ্র, আর একজন সরহ-শাবরি। ত্যাঙ্গুর-গ্রন্থ তালিকায় অনেকবারই সরহের উল্লেখ আছে এবং তাঁহার পরিচয় কখনও মহাচার্য, কখনও মহাব্রাহ্মণ, কখনও মহাযোগী বা যোগীশ্বর, কখনও মহাশবর, কখনও কৃষ্ণবংশধর, কখনও বা উড্ডীয়ান্-বিনির্গত। ইঁহারা প্রত্যেকে এক এবং অভিন্ন কি না, বলা কঠিন ; না হওয়াই সম্ভব। তবে দোহাকার এবং বজ্রযানী-সাধন রচয়িতা সিদ্ধাচার্য সরহ-সরহপাদ এবং তারনাথ-কথিত সরহ-রাহুলভদ্র এক এবং অভিন্ন, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতেছি না। সুম্‌পা বলিতেছেন, এই সরহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন প্রাচ্য দেশে রজ্ঞী শহরের এক ডাকিনীর গর্ভে এবং জনৈক ব্রাহ্মণের ঔরসে। জনৈক চন্দনপালের রাজত্বকালে তিনি রত্নপাল এবং তাঁহার সভাসদ ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রীদের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষাদান করেন। ওড়িবিষ বা ওড্রবিষয়ে তিনি মন্ত্রযান শিক্ষা করেন ; পরে তিনি মহারাষ্ট্রে গিয়া যোগিনী আচারে সিদ্ধ হন এবং সরহ নামে পরিচিত হন। তিনি কিছুদিন নালন্দায় মহাচার্যও ছিলেন। দীক্ষাদানকালে তিনি দোহাগান করিতেন ; বস্তুত ত্যাঙ্গুর-তালিকায় তাঁহার কয়েকটি দোহা ও চর্যাগীতির উল্লেখও আছে। অপভ্রংশ ভাষায় রচিত সংস্কৃত টীকাযুক্ত তদ্রচিত একটি দোহাসংগ্রহ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশও করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, প্রাচীন বাঙলায় রচিত চারিটি গানও চর্যাগীতি গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এই সব গানের ভণিতায় তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছে সরহপাদ। সুম্‌পা-বর্ণিত চন্দনপাল ও রত্নপাল পাল-বংশেরই কেহ হইয়া থাকিবেন, যদিও ইঁহাদের ঐতিহাসিকত্ব কোনো স্বতন্ত্র সাক্ষ্যে সমর্থিত নয়। সরোরুহবজ্র-পদ্মবজ্র অষ্টম শতকের লোক, কিন্তু সরহ-রাহুলভদ্র বোধ হয় একাদশ শতকের আগেকার লোক নহেন।

কুক্কুরিপাদ কম্বলপাদ

তারনাথের মতে সরোরুহবজ্রের সমসাময়িক ছিলেন কুক্কুরিপাদ ও কম্বলপাদ বা কম্বলাম্বরপাদ। কুক্কুরিপাদ বাঙলার এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, পরে বৌদ্ধ তন্ত্রধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ডাকিনীদের দেশ হইতে মন্ত্রযান ও অন্যান্য তন্ত্র (মহামায়া-তন্ত্র ?) উদ্ধার করেন। চুরাশী সিদ্ধার তালিকায় কুক্কুরিপাদের উল্লেখ আছে। তিনিই বোধ হয় তন্ত্র সাধনায় মহামায়া-সাধনের সূচনা করেন। ত্যাঙ্গুর-তালিকায় দেখিতেছি, তিনি অন্তত ছয় খানা তন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে কয়েকটি মহামায়া-সাধন সম্পর্কিত। ত্যাঙ্গুরে এক জায়গায় তাঁহাকে গুরুরাজ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কুকুর-পা বা কুকুররাজ এবং কুক্কুরিপাদ যদি এক এবং অভিন্ন হন, এবং না হইবার কোনো কারণ নাই, তাহা হইলে ত্যাঙ্গুর-তালিকার বজ্রযান সাধন সম্পর্কিত আরও আটটি তন্ত্রগ্রন্থ (বজ্রসত্ত্ব, হেবুক, বৈরোচন প্রভৃতি দেবতা সম্বন্ধীয়) তাঁহারই রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। চর্যাগীতি বা চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-গ্রন্থের অন্তত দুইটি প্রাচীন বাঙলা গীতি কুক্কুরিপাদের রচনা, ভণিতায় তাহা সুস্পষ্ট বলা আছে।

কম্বলপাদ বা কম্বলাম্বরপাদ প্রাচীন বাঙলা ভাষায় কম্বল-গীতিকা নামে একটি দোহা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-গ্রন্থের একটি গীতিরও তিনি ছিলেন লেখক। উভয়ই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বৌদ্ধ গান ও দোহায় স্থান পাইয়াছেন। তিব্বতী ঐতিহ্যানুসারে তিনি হেরুক সাধন সম্বন্ধে অন্তত ছয়খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

শবরীপাদ

ইঁহাদের সমসাময়িক (অষ্টম শতকের শেষ, নবম শতকের প্রথমার্ধ) এবং চুরাশী সিদ্ধার অন্যতম ছিলেন শবরীপাদ বা শবরপাদ। সুম্পা বলিতেছেন, তিনি বঙ্গাল দেশের পর্বতবাসী এক ব্যাধ বা শবর ছিলেন। রসায়নাচার্য নাগার্জুন যখন বাঙলা দেশে ছিলেন (ইনি প্রথম খ্রীষ্ট শতকীয় শূন্যবাদী নাগার্জুন নহেন) তখন তিনিই শবরপাদ এবং তাঁহার দুই স্ত্রীকে তন্ত্রধর্মে দীক্ষাদান করেন। ত্যাঙ্গুর-তালিকানুযায়ী তিনি প্রায় দশখানা বজ্রযানী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-গ্রন্থে শবরীপাদের রচিত দুইখানা বাঙলা গান আছে। শবর-শবরীপাদ এবং শবরীশ্বর যদি এক এবং অভিন্ন হন, তাহা হইলে বজ্রযোগিনী-সাধন সম্বন্ধেও তিনি আরও কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উড্ডীয়ান বা ওদ্যানের রাজা ইন্দ্রভূতি ও তাঁহার ভগিনী বা কন্যা লক্ষ্মীঙ্করা, ইঁহারা দুইই বাঙলা দেশে বজ্রযোগিনী-সাধন প্রবর্তন করেন। মহাচার্য ইন্দ্রভূতি সিদ্ধ-বজ্রযোগিনী-সাধন, জ্ঞানসিদ্ধি এবং অন্যান্য আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীঙ্করাও কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িত্রী ছিলেন ; তাহার মধ্যে অদ্বয়সিদ্ধি মূল সংস্কৃতে পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক, খুব সম্ভব পূর্বোক্ত শবর বা

শবরীপাদই বৌদ্ধ শবর সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য। এই শবর সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান আচার্য ছিলেন অদ্বয়বজ্র ; তাঁহার কথা যথাস্থানে বলিতেছি।

কুমারচন্দ্র

গৌর রত্নদ্বীপের (নেপাল অন্তর্গত রত্নদ্বীপ) অন্যতম অধিবাসী এবং পূর্বোক্ত লক্ষ্মীঙ্করার শিষ্য লীলাবজ্র আচার্য-অবধূত-মহাপণ্ডিত কুমারচন্দ্র-রচিত কৃষ্ণযমারীতন্ত্রের টীকা রত্নাবলীর একটি তিব্বতী অনুবাদ করিয়াছিলেন। কুমারচন্দ্র রত্নাবলী টীকাটি রচনা করিয়াছিলেন বিক্রমপুরী-বিহারে বসিয়া ; সেই জন্যই অনুমান হয়, কুমারচন্দ্র অষ্টম-নবম শতকীয় জনৈক বাঙালী বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন। তিনি তিনটি তান্ত্রিক পঞ্জিকা বা টীকাও রচনা করিয়াছিলেন।

টঙ্কদাস

ধর্মপালের সমসাময়িক বুদ্ধকয়স্থ টঙ্কেদাস বা ডঙ্কদাস পাণ্ডুভূমি-বিহারের অধিবাসী ছিলেন, এবং সেইখানে বসিয়া সুবিশদসম্পুট নামে হেবজ্রতন্ত্রের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

নাগবোধি

রসায়নাচার্য নাগার্জুন যখন পুণ্ড্রবর্ধনে রসায়ন ও ধাতু গবেষণায় নিরত তখন তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন জনৈক নাগবোধি। সুম্‌পা বলিতেছেন, এই নাগবোধির বাড়ী ছিল বরেন্দ্রান্তর্গত শিবসের গ্রামে ; যমারিসিদ্ধচক্রসাধন নামে তিনি অন্তত একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি আত্মপরিচয় দিয়েছেন উড্ডীয়ান-বিনির্গত বলিয়া। তাঞ্জুর-তালিকামতে তিনি তেরো খানা তান্ত্রিক গ্রন্থের রচয়িতা।

এই পর্যন্ত যে-সব বৌদ্ধ আচার্যদের কথা বলা হইল তাঁহারা সকলেই অনুমানিক অষ্টম-নবম শতকের লোক। ইহার পর বেশ কিছুদিন উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ আচার্য-পণ্ডিতদের সাক্ষাৎ যেন পাইতেছিনা। ইহার কারণ বলা কঠিন। তাহা ছাড়া ইঁহাদের দেশ সম্বন্ধে যেমন কাল সম্বন্ধেও তেমনই আমাদের তথ্য নিঃসন্দিগ্ধও নয়। বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন ঐতিহ্যে কাল-সংবাদ, আচার্য-পরম্পরা-সংবাদ বিভিন্ন প্রকারের ; কাজেই নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবারও উপায় নাই। কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, নবম শতকের মাঝামাঝি হইতে দশম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোনো ঐতিহ্যেই কোন আচার্যকে স্থাপিত করা সম্ভব হইতেছে না। এই একশত বৎসর বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার স্রোতে কি ভাঁটা পড়িয়াছিল ? যাহাই হউক, দশম শতকের তৃতীয় পাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত আবার সেই স্রোত সবেগে বহমান, উপস্থিত সাক্ষ্যে এ-কথা স্বীকার করিতেই হয়। দ্বাদশ শতকে সেন-বর্মণ পর্বে বৌদ্ধ বিহারগুলিতে রাজা ও

রাষ্ট্রের পোষকতা আর ছিল না, এবং হয়তো বৌদ্ধ ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় কিছুটা ভাঁটাও পড়িয়াছিল, কিন্তু নিজ নিজ নিভৃত বিহারকক্ষে অথবা আপনাপন গুহ্য সম্প্রদায়ের গুহ্যতর আশ্রয়গুলিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের নিরলস সাধনা অব্যাহতই ছিল। অগণিত সিদ্ধাচার্য ও বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং তাঁহাদের রচিত গান, দোহা এবং সাধনই তাহার প্রমাণ।

আগেই বলিয়াছি, বজ্রযানী-মন্ত্রযানী তান্ত্রিক আচার্যদের সঙ্গে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ও নাথগুরুদের গভীরতর ধ্যান ও আদর্শগত পার্থক্য যাহাই থাকুক না কেন, অন্তত সূচনায় এইসব সমসাময়িক ধর্মসম্প্রদায় ও আচার্যদের জীবনাচরণে বা জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় প্রভেদ বিশেষ ছিলনা। আগেই বলিয়াছি, বজ্রযান-মন্ত্রযান-কালচক্রযানের বাহিরে অথচ কিছুটা ইহাদেরই ভিতর হইতে উদ্ভূত এবং ইহাদের সঙ্গে গভীরভাবে সংপৃক্ত নাথধর্ম, কৌলধর্ম, সহজধর্ম, অবধূতধর্ম প্রভৃতির আচার্যরা প্রায় সকলেই একে অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায় কর্তৃক গুরু ও আচার্য বলিয়া স্বীকৃত ও পূজিত হইয়াছেন। শেষোক্ত ধর্ম ও সম্প্রদায়গুলির প্রধান আচার্য ছিলেন চুরাশী জন, এবং ইঁহারা তিব্বতী ঐতিহ্যে চুরাশী সিদ্ধা বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার বজ্রযান সাধনা ও বজ্রযানী দেবদেবী সম্বন্ধে গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন, মহাযানী ন্যায়ের পুঁথিও লিখিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাদের একান্ত করিয়া পৃথকভাবে বিবেচনা করিবার যুক্তিসঙ্গত কিছু কারণ নাই। বস্তুত, এই কয় শত বৎসর ধরিয়া বাঙলা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং বিভিন্ন লোকায়ত ধর্মের নানা ধ্যান, নানা প্রক্রিয়ার একটা সুবৃহৎ এবং সুগভীর সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণক্রিয়া সমানেই চলিতেছিল। এই সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণই পাল-চন্দ্র-পর্বের বাঙলার ইতিহাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেন-বর্মণ পর্বের উচ্চস্তরের সংস্কৃত স্মৃতি-দর্শন-কাব্য প্রভৃতি সাধনার কথা বাদ দিলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্যত্র এই সমন্বয়-স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়া খুব বাধা পায় নাই। সেই কারণে, এই সব মহাযানী-বজ্রযানী বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে যাঁহারা বাঙালী তাঁহাদের কথা এক সঙ্গেই বলিতেছি, কালপরম্পরা যতটা জানা যায় ততটা বজায় রাখিয়া।

প্রসঙ্গত, এ-কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, মহাযান-বজ্রযান প্রভৃতি মতাবলম্বী তান্ত্রিক আচার্যরা যে সব রচনা রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশই হয় দর্শন ও যোগসাধন সম্বন্ধীয় অথবা বিভিন্ন দেবদেবীর সাধনা, স্তব ও পূজা বিষয়ক শ্লোকাবলী। শেষোক্ত পর্যায়ের রচনায় যাঁহাদের কবিকল্পনা ও কবিপ্রতিভার কিছু কিছু পরিচয় ধরা পড়িয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে বাঙালী ছিলেন সে-সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ কম। সংস্কৃত কাব্যের রীতি-প্রকৃতিতেও ইঁহারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন, মনে হয়। ধর্মাকরমতি, শবরপাদ, কৃষ্ণপাদ, রত্নাকর, শুভাকর, কুলদত্ত, অদ্বয়বজ্র, ললিত-গুপ্ত, কুমুদাকরমতি, পদ্মাকর, অভয়াকর-গুপ্ত, গুণাকর-গুপ্ত, করুণাচল, কোকরদত্ত, অনুপম-রক্ষিত, চিন্তামণি-দত্ত,

সুমতি-ভদ্র, মঙ্গল-সেন, অজিত-মিত্র প্রভৃতি যাঁহাদের নাম সাধনমালা-গ্রন্থে পাইতেছি, তাঁহাদের তো বাঙালী বলিয়াই মনে হইতেছে। ইঁহাদের রচনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবং কিছুক্ষণ আগে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ তন্ত্রধর্মে যে স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছি তাহারও দৃষ্টান্ত স্বরূপ জনৈক অজ্ঞাতনামা কবির একটি তারাস্তুতি উদ্ধার করিতেছি। এই ভক্তি-রসস্নিগ্ধ স্তবটিতে ব্রাহ্মণ্য দুর্গা ও বেদমাতা সরস্বতী এবং বৌদ্ধ তারা ইতিমধ্যেই কবি-কল্পনায় এক এবং অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন।

দেবী (?) ত্বমেব গিরিজা কুশলা ত্বমেব
পদ্মাবতী ত্বমসি [ত্বং হি চ] বেদমাতা।
ব্যাপ্তং ত্বয়া ত্রিভুবনে জগতৈক রূপা (?)
তুভ্যং নমোঽস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ ॥
যানত্রয়েষু দশ পারমিতেতি গীতা
বিস্তীর্ণ যানিকজনা ফলশূন্যতেতি।
প্রজ্ঞাপ্রসঙ্গচটুলামৃতপূর্ণধাত্রী
তুভ্যং নমোঽস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ ॥
আনন্দানন্দবিরসা সহজ স্বভাব।
চক্রত্রয়াদ পরিবর্তিত বিশ্বমাতা।
বিদ্যুৎপ্রভাহৃদয়বর্জিতজ্ঞানগম্যা
তুভ্যং নমোঽস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ ॥

দশম – দ্বাদশ শতক। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ জেতারি

তারনাথ ও সুম্‌পার সাক্ষ্যে মনে হয়, জেতারি নামেও দুইজন বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন। জ্যেষ্ঠ জেতারির বাড়ী ছিল বরেন্দ্রভূমে; তাঁহার পিতা গর্ভপাদ জনৈক সামন্ত সনাতনের সভাসদ ছিলেন। এই জেতারি বিক্রমশীল বিহারের অন্যতম আচার্য এবং শ্রীজ্ঞান-দীপঙ্কর বা অতীশের অন্যতম গুরু ছিলেন। সেই জন্য অনুমান হয়, তিনি দশ শতকের শেষার্ধের লোক ছিলেন। হেতুতত্ত্বোপদেশ, ধর্মাধর্মবিনিশ্চয় এবং বালাবতারতর্ক নামে বৌদ্ধ ন্যায়ের এই তিনটি গ্রন্থ বোধ হয় তাঁহারই রচনা। ইহা ছাড়া তিনি আরও দুইখানা সূত্রগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে সুগতমতবিভঙ্গকারিকা অন্যতম; এই গ্রন্থে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন বাঙালী বলিয়া। কনিষ্ঠ জেতারিও ছিলেন বাঙালী, এবং বোধিভাগ্য লাবণ্যবজ্রের গুরু। তিনি এগারো খানা বজ্রযানী-সাধনের রচয়িতা। তাঁহার কাল সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা কঠিন।

দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান বা অতীশ

বাঙালী বৌদ্ধ মহাচার্যদের মধ্যে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অন্য নাম অতীশ)শ্রেষ্ঠতম এবং দীপঙ্কর-চরিতকথা বাঙলাদেশে সুপরিচিত। কাজেই তাঁহার কথা বিস্তৃত করিয়া বলিবার প্রয়োজন কিছু নাই। ত্যাঙ্গুরের ঐতিহ্যে একাধিক দীপঙ্করস্মৃতি বিধৃত— দীপঙ্কর, দীপঙ্কর-ভদ্র, দীপঙ্কর-রক্ষিত, দীপঙ্কর-চন্দ্র, দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান। নিঃসন্দেহে ইঁহারা সকলে একই ব্যক্তি হইতে পারেন না, তবে ইঁহাদের মধ্যে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান যে বাঙালী ছিলেন এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। তাঁহার জন্মভূমি বঙাল-দেশের বিক্রমণিপুরে; আনুমানিক ৯৮০ খ্রীষ্ট বৎসরে গৌড়রাজ-পরিবারে তাঁহার জন্ম, পিতার নাম কল্যাণশ্রী, মাতা প্রভাবতী, তাঁহার নিজের বাল্য নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। যৌবনে তিনি জেতারির শিষ্য ছিলেন; কিছুদিন তিনি পশ্চিম-ভারতের কৃষ্ণগিরি বা কানূহেরী বিহারে থাকিয়া রাহুলগুপ্তের নিকট বৌদ্ধ ধ্যানে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন; সেইখানেই তাঁহার নামকরণ হয় গুহ্যজ্ঞানবজ্র। উনিশ বৎসর বয়সে ওদন্তপুরী-বিহারে মহাসংঘিক আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন, এবং সেই সময় তাঁহার নামকরণ হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। বারো বৎসর পর তিনি ভিক্ষুব্রতী হ'ন এবং আচার্য ধর্মরক্ষিতের নিকট বোধিসত্ত্বব্রতে দীক্ষিত হ'ন। তারপর তিনি আরও বারো বৎসর যাপন করেন সুবর্ণদ্বীপে আচার্য চন্দ্রকীর্তির নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্রপাঠে। সেখান হইতে তিনি তাম্রদ্বীপ বা সিংহলের পথে মগধে ফিরিয়া আসেন, এবং কিছুদিন পরই মহীপাল কর্তৃক আহূত হন বিক্রমশীল-মহাবিহারের মহাচার্যপদে। এই বিহারে বাসকালেই তিব্বতের বৌদ্ধ রাজা লাহ্-লামা-যে-শেস্ দূত পাঠাইয়া দীপঙ্করকে সাদর আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন তিব্বত যাইবার জন্য। নির্লোভ নিরহঙ্কার দীপঙ্কর সবিনয়ে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার কিছুদিন পর প্রতিবেশী এক রাজকারাগারে তিব্বত-রাজের প্রাণবিয়োগ ঘটে, কিন্তু তাহার আগেই তিনি তাঁহার অবস্থা ও প্রাণের একান্ত অভিপ্রায় জানাইয়া দীপঙ্করের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া যান। লাহ্-লামা যে-শেস্-'গুডের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চান্-চুবের রাজত্ব কালে তিব্বতী আচার্য বিনয়ধর (ট্সুল খ্রিম-গ্যাল্‌বা) সেই পত্র লইয়া দীপঙ্করের উদ্দেশ্যে বিক্রমশীল-বিহারে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং কিছুকাল সেখানে যাপনের পর দীপঙ্করের সঙ্গে পরিচয় কিছু ঘনিষ্ঠ হইলে নিজের মনোবাসনা এবং লাহ্-লামার পত্র তাঁহার গোচর করেন। অবশেষে দীপঙ্কর তিব্বত যাইতে স্বীকৃত হ'ন, কিন্তু তাঁহার হাতে যে সব কাজ ছিল তাহা সারিবার পর। এই সময় আচার্য রত্নাকর ছিলেন বিক্রমশীল-বিহারের অধিনায়ক। বিহারের ভিক্ষুসংঘ তখন নানাপ্রকার নৈতিক ও মানসিক শৈথিল্যে ভারগ্রস্ত; দীপঙ্কর ছাড়া ভিক্ষুদের নৈতিক শাসন অব্যাহত রাখার শক্তি আর কাহারও নাই। মগধ জনপদের নানা বিহারে-সংঘে দীপঙ্করের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব

অপরিসীম। এ-সব বিবেচনা করিয়া রত্নাকর দীপঙ্করকে ছাড়িয়া দিতে কিছুতেই রাজি হইলেন না। কিন্তু পরে যখন ক্রমশ জানিলেন, দীপঙ্কর বিনয়ধরকে কথা দিয়াছেন এবং তিনি নিজেও যাইতে ইচ্ছুক তখন অনুমতি দেওয়া ছাড়া আর উপায় রহিল না, কিন্তু এই সর্তে যে, তিন বৎসরের ভিতর দীপঙ্কর বিক্রমশীল-বিহারে ফিরিয়া আসিবেন। এই উপলক্ষে তিনি বিনয়ধরের নিকট যে-উক্তি করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য ঃ "অতীশ না থাকিলে ভারতবর্ষ অন্ধকার। বহু বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠানের কুঞ্চিকা তাঁহারই হাতে; তাঁহার অনুপস্থিতিতে এই সব প্রতিষ্ঠান শূন্য হইয়া যাইবে। চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, ভারতবর্ষের দুর্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। অসংখ্য তুরুষ্ক সৈন্য ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতেছে, আমি অত্যন্ত চিন্তিত বোধ করিতেছি। তবু, আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি অতীশ ও তোমাদের সঙ্গীদের লইয়া তোমাদের দেশে ফিরিয়া যাও, সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য অতীশের সেবা ও কর্ম নিয়োজিত হউক।" বিনয়ধর, তিব্বতী পণ্ডিত গ্যা-ট্সন্, পণ্ডিত ভূমিগর্ভ এবং অপরান্তবাজ মহারাজ ভূমিসংঘকে লইয়া দীপঙ্কর তিব্বত যাত্রা করিলেন, নেপালের ও হিমালয়ের সুদুর্গম পথে। পথে দুই দুইবার তাঁহারা দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন; গ্যা-ট্সন্ মারা গেলেন; নেপালরাজ অনন্তকীর্তির সঙ্গে দীপঙ্করের সাক্ষাৎকার ঘটিল, এবং অনন্তকীর্তির পুত্র পদ্মপ্রভ দীপঙ্করের নিকট বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিব্বতের পথে তাঁহার সঙ্গী হইলেন। এই সময় বোধ হয়, নেপাল হইতেই তিনি রাজা নয়পালের নিকট একটি লিপি পাঠান। অবশেষে তিব্বতে পৌঁছিয়া দীপঙ্কর রাজসমারোহে অভ্যর্থিত হইলেন এবং তিব্বতের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইলেন। থো-লিং বিহার হইল তাঁহার কর্মকেন্দ্র। দীপঙ্কর প্রায় তেরো বৎসর কাল তিব্বতে বাস করিয়া ৭৩ বৎসর বয়সে আনুমানিক ১০৫৩ খ্রীষ্ট বৎসরে সেইখানেই পরলোক গমন করেন।

সুম্পা-রচিত পাগ-সাম-জোন্-জাং-গ্রন্থের মতে দীপঙ্কর বিক্রমশীল ও ওদন্তপুরী উভয় বিহারেরই মহাচার্য ছিলেন; তাঁহার অন্য নাম ছিল জোবো বা প্রভু। বোধ হয় সোমপুর-বিহারের সঙ্গেও তাঁহার সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠ, এবং সেখানে বসিয়াই তিনি ভাববিবেকের মধ্যমকরত্ন প্রদীপ-গ্রন্থের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। তাঙ্গুর-ঐতিহ্যমতে তিনি প্রায় ১৭৫ খানা গ্রন্থ মৌলিক রচনা অথবা অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহাদের অধিকাংশই বজ্রযানী সাধন, কিন্তু কিছু কিছু মহাযানী সূত্রগ্রন্থও তাঙ্গুর-তালিকায় বিদ্যমান।

চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে, মনীষায় ও অধ্যাত্ম-গরিমায় দীপঙ্কর সমসাময়িক বাঙলার ও ভারতবর্ষের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। পূর্ব-ভারত ও তিব্বতের মধ্যে যাঁহারা মিলনসেতু রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দীপঙ্করের নাম সর্বাগ্রে এবং সকলের পুরোভাগে স্মর্তব্য। সমসাময়িক অবস্থার দিকে তাকাইয়া রত্নাকর বলিয়াছিলেন, 'দীপঙ্কর বিহীন

ভারতবর্ষ অন্ধকার'। এই উক্তির মধ্যে অত্যুক্তি কিছু নাই ; সেই ঘনায়মান মেঘান্ধকারের মধ্যে দীপঙ্করই একমাত্র আলোকরেখা।

জ্ঞানশ্রী মিত্র

বিক্রমশীল-বিহারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাবান আচার্য ছিলেন জ্ঞানশ্রী-মিত্র ; দীপঙ্করের তিব্বত-যাত্রার কিছু আগে বা পরে তিনি এই বিহারে আসিয়া অধিষ্ঠিত হ'ন। তাঁহার বাড়ী ছিল গৌড়ে ; গোড়ায় তিনি ছিলেন হীনযানী বৌদ্ধ, পরে মহাযানে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার বৌদ্ধ ন্যায় সম্বন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ কার্যকারণ-ভাবসিদ্ধি চতুর্দশ শতকে আচার্য মাধব-রচিত সর্বদর্শনসংগ্রহে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অভয়াকর-গুপ্ত

অভয়াকর-গুপ্ত নামে একজন বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন রামপালের সমসাময়িক ; বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া) ও নালন্দায় তিনি ছিলেন পণ্ডিত, এবং বিক্রমশীল-বিহারের অন্যতম আচার্য। তাঁহার জন্ম হয় ঝারিখণ্ডে, বঙ্গল দেশের এক ক্ষত্রিয়-পরিবারে। তারনাথের মতে অভয়াকর তীর্থিক সম্প্রদায়ের তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, পরে বাঙলার বৌদ্ধ তন্ত্রেও পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তাঞ্জুর-ঐতিহ্যমতে তিনি প্রায় বিশ খানা বজ্রযানী গ্রন্থের রচয়িতা, এবং ইহাদের অন্তত চারিখানার মূল সংস্কৃত গ্রন্থ বিদ্যমান। শ্রীসম্পুটতন্ত্ররাজ-গ্রন্থের তদ্রচিত একটি টীকায় এবং বজ্রযানাপত্তিমঞ্জরী নামে তাঁহার একটি গ্রন্থে তাঁহাকে মগধের লোক বলিয়া পরিচয় দেওয়া আছে।

দিবাকর চন্দ্র

দিবাকর-চন্দ্র নামে আর একজন আচার্য ছিলেন নয়পালের সমসাময়িক। তাঞ্জুর ঐতিহ্যমতে তিনি হেরুব-সাধন নামে একটি গ্রন্থ এবং আরো দুইটি অনুবাদ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সুম্‌পা বলিতেছেন, দিবাকর-দেবাকরচন্দ্র মৈত্রী-পা'র শিষ্য ছিলেন ; দীপঙ্কর তাঁহাকে বিক্রমশীল-বিহার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এক পণ্ডিত শ্রীদিবাকরচন্দ্র পাকবিধি নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ১১০১ খ্রীষ্ট বৎসরে ; তিব্বতী ঐতিহ্যে দিবাকর ও দিবাকর-চন্দ্র নামে আরও দুইজন পণ্ডিত গ্রন্থকারের সাক্ষাৎ মেলে! ইঁহারা সকলেই বোধ হয় এক এবং অভিন্ন।

পূর্বোক্ত জেতারির সমসাময়িক এবং দীপঙ্কর-অতীশের অন্যতম শিক্ষাগুরু, রাজাচার্য মহাগুরু রত্নাকরশান্তি অথবা শান্তিপাদ বাঙালী ছিলেন কিনা, নিঃসংশয়ে বলা কঠিন।

তবে মহীপাল-নয়পালেরই সমসাময়িক কুমারবজ্র নিশ্চয়ই ছিলেন বাঙালী ; হেরুবসাধন নামে একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন, এবং দারিকপাদের চক্রসম্বর-সাধনতত্ত্বসংগ্রহ-গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

রত্নাকরশান্তি, কুমারচন্দ্র, দানশীল, বিভূতিচন্দ্র, বোধিভদ্র, প্রজ্ঞাবর্মা

রামপাল-প্রতিষ্ঠিত জগদ্দল-বিহারের দুইটি স্বনামধন্য পণ্ডিত হইতেছেন দানশীল ও বিভূতিচন্দ্র। বিভূতিচন্দ্র ছিলেন রাজপুত্র ; ত্যাঙ্গুর ঐতিহ্যমতে তিনি ছিলেন পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত, আচার্য, উপাধ্যায় ; তাঁহার কর্মভূমি ছিল পূর্ব-ভারতের (উত্তর-বঙ্গের) জগদ্দল-বিহার। তিনি একাধারে ছিলেন গ্রন্থকার, টীকাকার, অনুবাদক ও সংশোধক। বিভূতিচন্দ্র কিছুকাল নেপালে ও তিব্বতে বাস করিয়াছিলেন, এবং তিব্বতীতে অনেক গ্রন্থও অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকখানি মূল সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন, অনেক গ্রন্থের টীকা রচনাও করিয়াছিলেন। লুই-পা'র দুইটি গ্রন্থের এবং অভয়াকরের দুই বা ততোধিক গ্রন্থের অনুবাদ তাঁহারই রচনা।

অভয়াকর-গুপ্ত ও শুভাকর-গুপ্তের খান কয়েক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন আচার্য দানশীল। তাঁহার বাড়ী ছিল ভগল বা বঙ্গল দেশে এবং জগদ্দল-বিহারের তিনি ছিলেন অন্যতম আচার্য। প্রায় ষাটখানা তন্ত্র-গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ তাঁহার রচনা ; নিজে তিনি পুস্তকপাঠোপায় নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং নিজেই তিনি তাহার তিব্বতী রূপান্তরও করিয়াছিলেন। শুভাকর ছিলেন অভয়াকরের সমসাময়িক মগধের একজন বৌদ্ধ আচার্য ; তিনিও কিছুদিন জগদ্দল-বিহারের অধিবাসী ছিলেন। অভয়াকরশিষ্য এবং রামপালের সমসাময়িক, মগধবাসী শুভাকর-গুপ্ত এবং জগদ্দলের শুভাকরকে এক এবং অভিন্ন মনে না করিবার কোনো কারণ নাই।

প্রজ্ঞাবর্মা নামে একজন বাঙালী কাপট্য-বিহারের অন্যতম আচার্য ছিলেন। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের উপর দুইটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন, ধর্মকীর্তির হেতুবিন্দুপ্রকরণ নামক ন্যায় গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন, এবং উদানবর্গের উপর ধর্মত্রাতের অসমাপ্ত টীকাখানা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। প্রজ্ঞাবর্মার গুরু বোধিভদ্র সোমপুরী-বিহারের অধিবাসী ছিলেন। এই বোধিভদ্র এবং তারনাথ-কথিত বিক্রমশীল-বিহারের আচার্য বোধিভদ্র বোধ হয় এক এবং অভিন্ন। বোধিভদ্র প্রায় আট দশখানা তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু ছিলেন মহামতি।

মোক্ষাকর-গুপ্ত পুণ্ডরীক

জগদ্দল-বিহারের আর একজন আচার্য ছিলেন মোক্ষাকর-গুপ্ত। তিনি তর্কভাষা নামে বৌদ্ধ ন্যায়ের উপর একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অপভ্রংশ দোহাকোষের উপর টীকাও বোধ হয় তাঁহারই রচনা।

পুণ্ডরীক নামে একজন রাজা আর্যমঞ্জুনামসংগীতি-টীকার উপর বিমলপ্রভা নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। বর্মণ বংশীয় রাজা হরিবর্মাদেবের ৩৯ রাজাঙ্কে লিখিত এই টীকার একটি পুঁথি নেপালে পাওয়া গিয়াছে। এই পুণ্ডরীক বোধ হয়

বাঙালী ছিলেন, কারণ তাঁহার বাড়ী বলা হইয়াছে উড্ডীয়ানে। তাঁহার অন্য আর একটি নাম ছিল জ্ঞানবজ্র।

লুই-পা মৎস্যেন্দ্রনাথ

সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতম সেই লুই-পা বা লুইপাদ খুব সম্ভব রামপালের সমসাময়িক ছিলেন। তারনাথের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া আচার্য লেভি, শহীদুল্লা প্রভৃতি পণ্ডিতেরা লুই-পাকে খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতকের লোক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু লুই-পা রচিত অভিসময়বিভঙ্গ-গ্রন্থের পুষ্পিকায় স্পষ্টতই বলা আছে যে, আচার্য দীপঙ্কর তাঁহাকে এই গ্রন্থ রচনায় বা তিব্বতী অনুবাদে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঞ্জুর-তালিকায় তদ্রচিত কয়েকখানা বজ্রযান-গ্রন্থের উল্লেখ আছে, এবং তিব্বতী ঐতিহ্যমতে তিনিই আদিসিদ্ধ। চর্যাগীতি-গ্রন্থে তাঁহার প্রাচীন বাঙলায় রচিত দুইটি দোহা আছে, এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন, লুইপাদ-গীতিকা নামে তাঁহার একখানা পৃথক গ্রন্থও ছিল।

অনেকের মতে তিব্বতী ঐতিহ্যের আদিসিদ্ধ লুই-পাদ এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের আদিসিদ্ধ মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ এক এবং অভিন্ন। এরূপ মনে করিবার কারণও আছে। প্রথমতঃ তিব্বতী ভাষায় লুই-পা'র রূপান্তর মৎস্যোদর বা মৎস্যান্ত্রাদ। দ্বিতীয়ত, তিব্বতী ঐতিহ্যে লুই-পা বাঙলা দেশের ধীবর শ্রেণীর লোক; ভারতীয় ঐতিহ্যেও মীননাথ-মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রাচ্য সমুদ্রতীরের চন্দ্রদ্বীপের ধীবরশ্রেণীসম্ভূত। তৃতীয়ত, যোগিনী কৌল সম্প্রদায়ের যে কয়েকটি সংস্কৃত পুঁথি আমাদের জানা আছে, যেমন কৌলজ্ঞাননির্ণয়, এবং নেপালে প্রাপ্ত আরো ৩।৪ খানা পুঁথি, তাহাদের প্রত্যেকটিতেই মীননাথ-মৎস্যেন্দ্রনাথকে সেই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; অন্যদিকে তারনাথ বলিতেছেন, লুইপাদই যোগিনী ধর্মমতের স্রষ্টা। বস্তুত সমস্ত পূর্ব ও উত্তর-বঙ্গ জুড়িয়া এবং কামরূপে হঠযোগ, যোগিনী কৌলধর্ম এবং নাথধর্মকে কেন্দ্র করিয়া যে-সব সম্প্রদায় বহু শতাব্দী ধরিয়া আপনাপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহারা প্রত্যেকেই লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্রনাথকে এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে করে এবং নিজদের আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করে। লুইপাদ-মৎস্যেন্দ্রনাথের ধর্মমত্ই সহজসিদ্ধি নামে খ্যাত। এই সহজসিদ্ধির সঙ্গে একদিকে যেমন বজ্রযান-মন্ত্রযানের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, তেমনই অন্য-দিকে কৌলধর্ম, নাথধর্ম প্রভৃতি এই সহজসিদ্ধি হইতেই উদ্ভূত। সেইজন্য দেখা যাইবে, এই সব সিদ্ধাচার্যদের অনেকেই বজ্রযানী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ নিবিড়। বস্তুত, যোগিনী কৌলের কুল বৌদ্ধ তন্ত্রেরই পঞ্চকুল এবং এই পঞ্চকুল পঞ্চধ্যানী বুদ্ধেরই প্রতীক; আর সহজ সিদ্ধির সহজ এবং বজ্রযানের বজ্র প্রায় একই বস্তুর দুই ভিন্ন নাম মাত্র। তিব্বতী ঐতিহ্যান্তরে কিন্তু মৎস্যান্ত্রাদকে মৎস্যেন্দ্রনাথ

হইতে পৃথক বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং মৎস্যেন্দ্রনাথকে মীননাথের সন্তান বা বংশধর বলা হইয়াছে।

মীননাথ-মৎস্যেন্দ্রনাথের অন্যতম পূর্বপুরুষ ছিলেন মীনপাদ ; তিনি বোধিচিত্তের উপর একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সহজসিদ্ধি মত নেপালে এবং তিব্বতে সুপ্রচলিত হইয়াছিল এবং উভয় দেশেই তিনি অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। বাঙলাদেশে তিনি শিবের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। মৎস্যেন্দ্রনাথের নামে প্রচলিত কয়েকখানা সংস্কৃত পুঁথি নেপালে পাওয়া গিয়াছে।

গোরক্ষনাথ

মীনাথ-মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন গোরক্ষনাথ। বাঙলাদেশে গোরক্ষনাথ-কথা সুপরিজ্ঞাত। গোরক্ষনাথের রচিত কোনও পুঁথি এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই ; তবে তাঙ্গুর তালিকায় এক গোরক্ষের নামে একটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। হয়তো এই গোরক্ষ এবং গোরক্ষনাথ একই ব্যক্তি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অবশ্য বলিয়াছেন, জ্ঞানকারিকা নামে একটি গ্রন্থ গোরক্ষনাথের নামের সঙ্গে জড়িত। গোরক্ষনাথ কাহিনী নানা রূপে রূপান্তরিত হইয়া উত্তর-ভারতের সর্বত্র—নেপালে, তিব্বতে, মধ্যদেশে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, পঞ্জাবে—ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্জাবের যোগীরা, বাঙলাদেশের নাথযোগীরা, নাথপন্থীরা সকলেই গোরক্ষনাথকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। পরবর্তী কালে গোরক্ষসংহিতা, গোরক্ষসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থে গোরক্ষনাথের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সম্প্রদায়ের মতামত বিধৃত হইয়া আছে। বাঙলাদেশে প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী গোরক্ষনাথ রাজা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন।

জালন্ধরীপাদ

গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন জালন্ধরীপাদ বা জালন্ধরপাদ। বাঙলাদেশে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে গোপীচাঁদের গল্পের হাড়ি-পা এবং জালন্ধরীপাদকে অনেকে এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। তারনাথের মতে জালন্ধরীর শিষ্য ছিলেন কৃষ্ণাচার্য এবং তাঁহার সঙ্গে হাড়ি-পা'র একটা সম্বন্ধও ছিল। তারনাথ এবং সুম্‌পা দুই জনই বলিতেছেন, জালন্ধরীর যথার্থ নাম ছিল সিদ্ধ বালপাদ, কিন্তু নেপাল ও কাশ্মীরের মধ্যবর্তী জালন্ধর নামক স্থানে তিনি কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে জালন্ধরের আচার্য বলিয়াই জানিত। তিনি উদ্যান, নেপাল, অবন্তী এবং চাটিগ্রাম বা চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন ভ্রমণে ; গোপীচন্দ্রের পুত্র বিমলচন্দ্র তখন চট্টগ্রামের রাজা। তাঙ্গুর-তালিকায় এক মহাপণ্ডিত, মহাচার্য জালন্ধর, আচার্য জালন্ধরী বা সিদ্ধাচার্য জালন্ধরী পাদের উল্লেখ আছে ; এই মহাচার্য জালন্ধর বা জালন্ধরীপাদ আর গোপীচাঁদ গুরু জালন্ধরী

পাদ বোধ হয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। পূর্বোক্ত জালন্ধরের নামে ত্যাঙ্গুর-তালিকায় চারিখানা বজ্রযান-গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

জালন্ধরীপাদের অন্যতম শিষ্য ছিলেন বিরূ-পা বা বিরূপাদ। তারনাথ বলিতেছেন, এই বিরূ-পা ছিলে সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম। সুম্‌পার মতে এই বিরূ-পার জন্ম হইয়াছিল ত্রিপুরের (ত্রিপুরা) পূর্বদিকে, এবং দেবপালের রাজত্বকালে। ত্যাঙ্গুর-তালিকায় দেখিতেছি, আচার্য-মহাচার্য বিরূ-পা এবং মহাযোগী-যোগীশ্বর বিরূপ প্রায় দশখানা বজ্রযানী পুঁথি, এবং বিরূপপাদ-চতুরশীতি এবং দোহাকোষ নামে দুইখানা পদ ও দোহাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। চর্যাগীতিতে বিরূপার একটি গীতি স্থান পাইয়াছে, এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বিরূপগীতিকা ও বিরূপবজ্রগীতিকা নামক দুইটি গীতিগ্রন্থেরও লেখক ছিলেন বিরূ-পা। বিরূ-পা মহাসিদ্ধ ডোম্বি-হেরুকের অন্যতম গুরু ছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্যমতে ডোম্বি হেরুক ছিলেন মগধের জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা।

সরহ বা সরহপাদের কথা আগেই সরোরুহবজ্র প্রসঙ্গে বলিয়াছি; এখানে পুনরুল্লেখের আর প্রয়োজন নাই।

তিলো-পা

তিলপ, তিল্লপ, তিল্লিপা, তিলিপা, তিল্লোপা, তৈলোপ, তোল্লপা, তেলোপা, তিলোপা, তৈলিকপাদ বা তেলিযোগী নামে একজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য ছিলেন মহীপালের সমসাময়িক। তিব্বতী ঐতিহ্যে তিনি ছিলেন ট্সাটিগাঁও বা চট্টগ্রামের এক ব্রাহ্মণ, পরে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রজ্ঞাবর্মা বা প্রজ্ঞাভদ্র নামে পরিচিত হ'ন। তিনি চারখানা বজ্রযানী গ্রন্থ, একখানা দোহাকোষ, একখানা সহজগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্যে আর এক সিদ্ধাচার্য তৈলিকপাদের কথা আছে যাঁহার বাড়ী ছিল উদ্যানে। এই দুই সিদ্ধাচার্য তৈলিকপাদ এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে না করিবার কোনো কারণ নাই।

নাড়ো-পা

তৈলিকপাদের প্রধান শিষ্য ছিলেন নারো, নারোপা, নারোৎপা, নাড়োপা, নাড়, নাড়পাড়া প্রভৃতি নামে পরিচিত জনৈক সিদ্ধাচার্য। তাঁহার অন্য দুইটি নাম বা উপাধি ছিল জ্ঞানসিদ্ধি ও যশোভদ্র। নাড়োপা জাতে ছিলেন শুঁড়ি, তাঁহার বাসস্থান ছিল প্রাচ্য-ভারতে সালপুত্র নামক স্থানে; মগধের পশ্চিমে ফুল্লহরি নামক স্থানে (বিহার?) তিনি তন্ত্রাভ্যাস করিতেন। এক তিব্বতী ঐতিহ্যে তিনি ছিলেন প্রাচ্য দেশের রাজা শাক্য শুভশান্তিবর্মার পুত্র, আর এক ঐতিহ্যমতে তিনি ছিলেন জনৈক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের পুত্র, পরে হ'ন এক তীর্থিক (ব্রাহ্মণ) পণ্ডিত, এবং সর্বশেষে যশোধর বা জ্ঞানসিদ্ধি নাম লইয়া বৌদ্ধধর্মে সিদ্ধি লাভ করেন। ত্যাঙ্গুরে তাঁহাকে

মহাচার্য, মহাযোগী এবং শ্রীমহামুদ্রাচার্য উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে। আচার্য জেতারির পশ্চাদগামী হিসাবে তিনি বিক্রমশীল-বিহারের উত্তরদ্বারী পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং বিদায় লইবার সময় আচার্য দীপঙ্করের উপর বিহারের দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া যান। বৌদ্ধ আগমে ছিল তাঁহার পরম পাণ্ডিত্য; হেরুক, হেবজ্র এবং অন্যান্য বজ্রযানী দেবদেবীর উপর তিনি প্রায় দশখানা সাধন গ্রন্থ, সেকোদ্দেশ-টীকা নামে কালচক্রযানী দীক্ষা সম্বন্ধে অন্তত একখানা গ্রন্থ দু'খানি বজ্রগীতি, একটি নাড়-পণ্ডিতগীতিকা এবং বজ্রপদসারসংগ্রহ গ্রন্থের উপর একটি পঞ্জিকা বা টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

কাহ্ন পা

লুইপা-মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং গোরক্ষনাথের পরই যে সিদ্ধাচার্যের প্রসিদ্ধি তাঁহার নাম কৃষ্ণ বা কৃষ্ণপাদ বা কহ্নু-পা বা কাহ্ন-পা। কাহ্ন-পা ছিলেন জালন্ধরীপাদের শিষ্য, এবং নাথপন্থী ও সহজপন্থীদের অন্যতম প্রধান আচার্য। তারনাথ বলিতে-ছেন, জালন্ধরীশিষ্য কৃষ্ণাচার্যের বাড়ী ছিল পাদ্যানগর বা বিদ্যানগর; তিব্বতী ঐতিহ্যান্তর মতে কাহ্ন-পা ছিলেন দেবপালের সমসাময়িক জনৈক কায়স্থ, বাসস্থান ছিল সোমপুরী (বিহার)। সুম্‌পা বলিতেছেন, জালন্ধরশিষ্য কাহ্ন ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশজাত জনৈক তান্ত্রিক আচার্য। তারনাথ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ দুই কৃষ্ণাচার্যের কথা বলিতেছেন; তাঁহার মতে কনিষ্ঠ কৃষ্ণাচার্যই ছিলেন হেবজ্র, শম্বর, এবং জামন্তক প্রভৃতি বজ্রযানী দেবতার সাধনগ্রন্থের লেখক এবং দোহা-রচয়িতা; বর্ণে ছিলেন তিনি ব্রাহ্মণ। অন্য আর এক তিব্বতী ঐতিহ্যমতে এক কৃষ্ণ ছিলেন সোমপুরী-বিহারের অধিবাসী। জালন্ধর-শিষ্য কাহ্ন-কাহ্নপা-কৃষ্ণাচার্য এক এবং অভিন্ন, সন্দেহ নাই; তিনিই ছিলেন সোমপুরী বা সোমপুরী-বিহারের অধিবাসী, তান্ত্রিক ও বজ্রযানী সাধনগ্রন্থের লেখক এবং দোহা-রচয়িতা, এবং তারনাথ কথিত কনিষ্ঠ কৃষ্ণাচার্য। যাহা হউক, কাহ্ন-কাহ্নপা কৃষ্ণাচার্য পঞ্চাশ খানারও উপর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; অধিকাংশই বজ্রযান সাধন-সম্পর্কিত। তাহা ছাড়া চর্যাগীতি-গ্রন্থে কাহ্ন-কৃষ্ণাচার্যপাদ-কৃষ্ণপাদের দশখানা গীতি আছে প্রাচীনতম বাঙলা ভাষায়, এবং কৃষ্ণাচার্য-রচিত একখানা দোহাকোষ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিতাচার্য শ্রীকৃষ্ণপাদ-বিরচিত, গোবিন্দপালের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে লিখিত হেবজ্রপঞ্জিকা নামে একখানা পুঁথি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

দারিক, কিল-পা, কর্মার, বীণা পা, গুণ্ডারীপাদ, কঙ্কণ, গর্ভপাদ

বাঙলায় সিদ্ধাচার্যদের তালিকা সুদীর্ঘ। সকলের কথা বলিবার স্থান নাই; প্রয়োজনও নাই। কয়েকজনের কথা উল্লেখ করিতেছি মাত্র। লুই-পা ও নারো-পা'র

এক শিষ্য ছিলেন দারিক বা দারিপাদ ; তিব্বতী ঐতিহ্যমতে তাঁহার বাড়ী ছিল সালিপুত্র (মগধ) নামক স্থানে এবং তিনি (পালবংশীয় ?) ইন্দ্রপালের সমসাময়িক। ত্যাঙ্গুর-তালিকায় তদ্রচিত বারোখানা বজ্রযানী-গ্রন্থের উল্লেখ আছে ; চর্যাগীতিতে একটি গীতিও স্থান পাইয়াছে। লুই-পা'র এক বংশধর ছিলেন কিল-পা বা কিল-পাদ, দোহাচার্য-গীতিকাদৃষ্টি নামে তিনি একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিরূ-পার এক বংশধর ছিলেন কর্মার বা কর্মরি বা কমরি ; তিনি মগধান্তর্গত সালিপুত্রের এক কর্মকার ছিলেন, এবং অন্তত একখানা বজ্রযানী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বীণাপাদ বা বীণা-পাও ছিলেন বিরূপার অন্যতম বংশধর। তিনি খুব ভাল বীণা বাজাইতেন, গহুরের (গৌড়ের ?) এক ক্ষত্রিয় পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। বজ্রডাকিনী এবং গুহ্যসমাজের উপর তিনি অন্তত দু'খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; চর্যাগীতিতে তদ্রচিত একটি গীতিও স্থানলাভ করিয়াছে। কৃষ্ণের বা কৃষ্ণপাদের এক বংশধর ছিলেন ধর্মপাদ বা গুণ্ডারীপাদ। ত্যাঙ্গুর-তালিকায় তদ্রচিত বারোখানা গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে এবং চর্যাগীতিতে আছে দুটি গীত। কম্বলপাদের এক বংশধর ছিলেন কঙ্কন ; চর্যাগীতিতে তদ্রচিত একটি গীত আছে ; তাহা ছাড়া চর্যাদোহাকোষগীতিকা নামে তিনি একখানা গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। গর্ভরী-পা বা গর্ভপাদ বা গাভুরসিদ্ধ হেবজ্রের উপর একখানা গ্রন্থ এবং একখানা বজ্রযান টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

বাঙলাদেশে রচিত মহাযান গ্রন্থাদি

বজ্রযানী-কালচক্রযানী-মন্ত্রযানী এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক অন্যান্য পন্থার পণ্ডিত ও আচার্যদের যে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ও পরিচয় দেওয়া হইল তাহা হইতে এ-কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই সব আচার্যরা শুধু কেবল বজ্রযানী সাধন, দোহা এবং গীতই শুধু রচনা করিয়াছেন, শুধু তন্ত্রধর্মেরই অনুশীলন করিয়াছেন শত শত গ্রন্থে। এ-ধারণা কতকাংশে সত্য হইলেও সর্বাংশে নয়। এই সব পণ্ডিত ও আচার্যরা মহাযানী ন্যায়শাস্ত্র, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানবাদী দর্শন প্রভৃতির আলোচনাও করিয়াছেন, এবং কিছু কিছু মৌলিক চিন্তার প্রমাণও দিয়াছেন। ধর্মপালের সময় হইতেই সে-চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল।

অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার উপর আচার্য হরিভদ্র-রচিত অভিসময়ালঙ্কারাবলোক নামীয় টীকায় হরিভদ্র নাগার্জুন-প্রবর্তিত মধ্যমক চিন্তা ও মৈত্রেয়নাথের যোগাচার-চিন্তার যে সমন্বয় চেষ্টা করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। টীকাখানি লেখা হইয়াছিল ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায়, ত্রৈকূটক-বিহারে। একাদশ শতকের গোড়ায় আচার্য রত্নভদ্র কর্তৃক এই গ্রন্থ তিব্বতীতে অনূদিত হয়। তিব্বতী ঐতিহ্যে জানা যায়, হরিভদ্র এই সুপ্রসিদ্ধ টীকাটি ছাড়া আরও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন মহাযান তত্ত্বাদি সম্বন্ধে ; তন্মধ্যে পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকার একটি সংক্ষিপ্তসার, সঞ্চয়টীকাসুবোধিনী, স্ফুটার্থনামক

টীকা এবং প্রজ্ঞাপারমিতভাবনাই উল্লেখযোগ্য। আচার্য অসঙ্গ ও বিমুক্তসেনের মতামত ও গ্রন্থাদির উপরও তিনি কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন।

হরিভদ্রের প্রধান শিষ্য ছিলেন আচার্য বুদ্ধশ্রীজ্ঞান বা বুদ্ধজ্ঞানপাদ। তিব্বতী জনশ্রুতিমতে তিনি ছিলেন ধর্মপালের সমসাময়িক এবং বিক্রমশীল-মহাবিহারের অধ্যক্ষ; তাঁহার বাড়ী ছিল উড্ডীয়ানে। তিনি মহাযানলক্ষণসমুচ্চয় নামক একখানা মৌলিক গ্রন্থ এবং প্রজ্ঞাপ্রদীপাবলী নামে অভিসময়ালঙ্কারের একটি বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন।

জিনমিত্র নামে আর একজন বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন নরপতি ধর্মপাল, আচার্য দানশীল ও শীলেন্দ্রবোধির সমসাময়িক। শেষোক্ত দুইজন আচার্যের সঙ্গে একযোগে এবং তিব্বতরাজের অনুরোধে জিনমিত্র একখানি সংস্কৃত-তিব্বতী অভিধান রচনা করিয়াছিলেন; এই তিনজন একযোগে নাগার্জুনের প্রতীত্যসমুৎপাদহৃদয়কারিকা-গ্রন্থখানি তিব্বতীতে অনুবাদও করিয়াছিলেন। জিনমিত্র আর একটি গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন তিব্বতী পণ্ডিত জ্ঞানসেনের সহযোগিতায়; গ্রন্থটির নাম অভিধর্মসমুচ্চয়ব্যাখ্যা।

শান্তরক্ষিতের মধ্যমকালঙ্কার-কারিকা ও তাহার বৃত্তি এবং সত্যদ্বয়বিভঙ্গপঞ্জিকাও মহাযানী গ্রন্থ। দশম শতকের শেষে বা একাদশ শতকের গোড়ায় রত্নাকরশান্তি মৈত্রেয়নাথের অভিসময়ালঙ্কার-গ্রন্থের উপর শুদ্ধিমতী নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তদ্রচিত সারোত্তমা, প্রজ্ঞাপারমিতাভাবনোপদেশ এবং প্রজ্ঞাপারমিতো-পদেশ এই তিনখানি গ্রন্থ প্রজ্ঞাপারমিতাতত্ত্বের ব্যাখ্যা। দীপঙ্করগুরু জেতারির বোধিচিত্তোৎপাদসমাদানবিধি এবং বোধিসত্ত্বশিক্ষাক্রম দুইই মহাযানী গ্রন্থ।

তিব্বতী ঐতিহ্য মতে দীপঙ্কর মহাযানের উপর প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছিলেন; তন্মধ্যে শিক্ষাসমুচ্চয়-অভিসময়, সূত্রার্থসমুচ্চয়োপদেশ, প্রজ্ঞাপারমিতা-পিণ্ডার্থপ্রদীপ, মধ্যমোপদেশ সত্যদ্বয়বার, সংগ্রহগর্ভ, বোধিসত্ত্বমণ্যাবলী, মহাযানপথ-সাধনবর্ণসংগ্রহ এবং বোধিমার্গপ্রদীপ উল্লেখযোগ্য।

রামপালের রাজত্বকালে অভয়াকর-গুপ্ত যোগাবলী, মর্মকৌমুদী, এবং বোধিপদ্ধতি নামে তিনখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তিনখানাই মহাযান গ্রন্থ এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কুলদত্ত-রচিত মহাযানের ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাষ্য ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সোমপুর বিহারবাসী বোধিভদ্রের জ্ঞানসারসমুচ্চয়ও মহাযান-গ্রন্থ সন্দেহ নাই। জগদ্দলের বিভূতিচন্দ্র শান্তিদেব-রচিত বোধিচর্যাবতারের একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন; আর একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন দীপঙ্কর স্বয়ং।

বাঙলার বৌদ্ধ বিহার

এতক্ষণ যে-সব বৌদ্ধ আচার্য ও তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার কথা বলা হইল তাহার কেন্দ্র ছিল বাঙলার বৌদ্ধ-বিহারগুলি, এবং তাহাদের সংখ্যা কিছু কম ছিল না।

জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার বিবৃতি-প্রসঙ্গে এই সব বিহারের কথা কিছু কিছু উল্লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু সমসাময়িক বাঙলার সংস্কৃতি-প্রচেষ্টায় ইহাদের দানের পরিমাপ করিতে হইলে সমগ্রভাবে ইহাদের একটু পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

পাল-চন্দ্র পর্বের আগেও বাঙলাদেশে বিহার-সংঘারামের কিছু যে অপ্রতুলতা ছিল না, তাহার সাক্ষ্য রাজকীয় লিপিমালা, ফা-হিয়েন, য়ুয়ান-চোয়াঙ্ ও ই-ৎসিঙের বিবরণ। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর-পট্টে তিন তিনটি বিহারের উল্লেখ আছে—বুদ্ধদত্তের আশ্রম-বিহার, রাজবিহার ও জিনসেন-বিহার। ফা-হিয়েনের সময় এক তাম্রলিপ্তিতেই বাইশটি বিহার ছিল এবং বহু স্থবির ও আচার্য সেই সব বিহারে বাস করিতেন। য়ুয়ান-চোয়াঙের কালে পুণ্ড্রবর্ধনে ছিল বিশটি বিহার, সমতটে ত্রিশটি, তাম্রলিপ্তিতে দশটি, কযঙ্গলে ছয়-সাতটি এবং কর্ণসুবর্ণে দশটি। পুণ্ড্রবর্ধন-রাজধানীর প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে ছিল পো-চি পো বিহার, সুপ্রশস্ত ও আলোকজ্জ্বল ছিল ইহার অঙ্গন, সুউচ্চ ছিল ইহার মণ্ডপ ও চূড়া। সাত শত মহাযানী শ্রমণ এবং পূর্ব-ভারতের অনেক খ্যাতনামা আচার্যের অধিষ্ঠান ছিল এই সংঘারাম। মহাস্থান-সমীপবর্তী ভাসু-বিহারের ধ্বংসাবশেষই বোধ হয় য়ুয়ান-চোয়াঙ্-বর্ণিত পো-চি-পো বিহার। কর্ণসুবর্ণের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিহার ছিল লো-টো মো-চি বা রক্তমৃত্তিকা (রাঙামাটি)-বিহার। এই বিহারেরও কক্ষগুলি ছিল প্রশস্ত এবং সুউচ্চ সৌধগুলি ছিল একাধিক তলযুক্ত। কযঙ্গলের উত্তরাংশে গঙ্গার অনতিদূরে একটি সুউচ্চ সুগঠিত বিহার ছিল ; চারিদিকের দেয়ালে নানা অলংকরণ, নানা দেবদেবীর খোদিত মূর্তি। ই-ৎসিঙের কালে তাম্রলিপ্তির শ্রেষ্ঠ বিহার ছিল পো-লো-হো বা বরাহ-বিহার। এই বিহারের ভিক্ষুদের জীবনযাত্রা, তাঁহাদের দৈনন্দিন নিয়ম-সংযম, খ্যাতি ও সমৃদ্ধি, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পরস্পরসম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু বিবরণ ই-ৎসিঙ রাখিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত বিহারের ব্যয়ভার কি ভাবে নির্বাহ হইত ফা-হিয়েন ও ই-ৎসিঙ্ তাহারও কিছু আভাস রাখিয়া গিয়াছেন। ফা-হিয়েন্ বলিতেছেন, 'দেশের রাজা রাজড়া, নাগরিক ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্য বিহার নির্মাণ এবং তাঁহাদের সকল প্রকার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ভূমি-ঘরবাড়ী, উদ্যান, আরাম প্রভৃতি দান করিয়া থাকেন। এক রাজার পর অন্য রাজা সেই উদ্দেশ্যে তাম্রশাসন দান ও পট্টীকৃত করিয়াছেন। সেই জন্য কেহই সে-সব আত্মসাৎ বা বাজেয়াপ্ত করিতে পারে না।' ই-ৎসিঙের বর্ণনাও উল্লেখযোগ্য। 'বুদ্ধ ভিক্ষুদের পক্ষে চাষবাসের কাজ নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহারা বিহার বা ভিক্ষুসংঘের কৃষিভূমি বিনা করে অন্যকে চাষবাস করিতে দিতেন এবং পরিবর্তে উৎপাদিত শস্যের অংশমাত্র গ্রহণ করিতেন। তাহার ফলে তাঁহারা সাংসারিক চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিতেন, জলসেচনের ফলে প্রাণীহত্যাও তাঁহাদের করিতে হইত না, শীল ও সদাচার পালন করা সহজ হইত। ভিক্ষুদের পরিচ্ছদের ব্যয় সংঘের সাধারণ সম্পত্তি হইতেই বহন করা হইত। বিহারগুলি যে

নিষ্কর ভূমি ভোগ করিত সেই ভূমির উৎপাদিত শস্য, বৃক্ষ ও ফল হইতে ভিক্ষু-শ্রমণদের চীবর, অন্তর্বাস, বহির্বাস প্রভৃতি সব কিছুর ব্যয় নির্বাহ হইত। গৃহী ভক্ত ও উপাসকের নিকট হইতে তাঁহারা নানাপ্রকারের দানও গ্রহণ করিতেন ; আহার্য গ্রহণেও কাহারও কোনো আপত্তি ছিল না। আহার্য ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাঁহারা নির্ভাবনা ছিলেন বলিয়াই সুস্থ ও স্বচ্ছন্দচিত্তে ধ্যান ও পূজায় (এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায়) তাঁহারা কালাতিপাত করিতে পারিতেন'।

উপরে উল্লিখিত গ্রন্থ-লেখকদের জীবনী এবং গ্রন্থনামগুলি বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, এই সব বিহারের আচার্যরা তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্মশাস্ত্রে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা তো করিতেনই, তাহা ছাড়া মহাযান ন্যায় ও দর্শন, ব্রাহ্মণ্য তীর্থিক শাস্ত্রাদি, ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র, শব্দবিদ্যা ; ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতির অধ্যয়ন-অধ্যাপনাও হইত। পুঁথি নকল ও অনুবাদ করা, বৌদ্ধ বজ্রযানী-তান্ত্রিক দেবদেবীর ছবি আঁকা (ফা-হিয়েন এই ধরনের ছবি আঁকাও অভ্যাস করিয়াছিলেন তাম্রলিপ্তির বিহারে) প্রভৃতিও বিহারের ভিক্ষুদের অন্যতম অনুশীলনের বিষয় ছিল। প্রত্যেক বিহারের ছোট বড় গ্রন্থাগারও ছিল, এ-অনুমানও খুব অযৌক্তিক নয় ; নালন্দা-মহাবিহারের ইতিহাস এবং প্রত্নসাক্ষ্যই তাহার প্রমাণ। ই-ৎসিঙের প্রায় সমসাময়িক ত্রিপুরায় আচার্য বন্দ্য সংঘমিত্রের একটি বিহার ছিল, এ-খবর পাওয়া যায় দেবখড়্গের আস্রফপুর লিপিটিতে।

অষ্টম শতকীয় বাঙলার প্রসিদ্ধতম বৌদ্ধ বিহার সোমপুরী-মহাবিহার। এই বিহারেরই ধ্বংসাবশেষ লোকলোচনের গোচর হইয়াছে রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে। ক্রমহ্রস্বায়মান সুউচ্চ ত্রিতল মন্দির-বিহার ; সর্বতোভদ্র তাহার স্থাপত্যরূপ। উত্তর দিকে সুপ্রশস্ত সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠিয়া গিয়াছে ত্রিতল পর্যন্ত। দ্বিতীয় তলায় মন্দির-প্রকোষ্ঠ ; বিহারের অধিষ্ঠাতা দেবতা এই মন্দিরে পূজিত হইতেন। ত্রিতলের উপরে শিখরাকৃতি (?) চূড়া। মন্দিরের চারিদিকে সুপ্রশস্ত অঙ্গন ; প্রত্যেক কোণে একটি করিয়া মণ্ডপ ; সর্বতোভদ্র বিহার-মন্দিরের চারিদিকে ভিক্ষুদের বাসকক্ষ, সর্বসুদ্ধ ১৭৭টি। গোড়ায় বোধ হয় এখানে একটি জৈন-বিহার ছিল। অষ্টম শতকের শেষার্ধে ধর্মপাল নরপতির পৃষ্ঠপোষকতায় বিস্তৃত অঙ্গন ব্যাপিয়া সুপ্রশস্ত সুসমৃদ্ধ বিহার-মন্দির গড়িয়া ওঠে। একাদশ শতকের শেষ বা দ্বাদশ শতকের গোড়া পর্যন্ত এই মহাবিহার সমসাময়িক বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-সাধনার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্ররূপে বিরাজমান ছিল। ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ও বর্ধিত বলিয়া বিহারটির অন্যতম নামই ছিল শ্রীধর্মপালদেব-মহাবিহার ; পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে মাটির শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে "শ্রীসোমপুরে শ্রীধর্মপালদেব মহাবিহারে।" কিন্তু তিব্বতী তারনাথ ও সুম্‌পা দুইজনই বলিতেছেন, বিহারটির নির্মাতা দেবপাল ; একটু ভুল করিয়াছেন, সন্দেহ কি ? সুপ্রসিদ্ধ আচার্য ও মহাপণ্ডিত বোধিভদ্র, আচার্য কালপাদ

বা কালমহাপাদ, স্বনামধন্য দীপঙ্কর, স্থবিরবৃদ্ধ বীর্যেন্দ্র আচার্য করুণাশ্রীমিত্র প্রভৃতিরা কোনো না কোনো সময়ে এই মহাবিহারের অধিবাসী ছিলেন। এই বিহারের অন্তেবাসী মহাযানধারী বিজয়াচার্য স্থবিরবৃদ্ধ বীর্যেন্দ্র বুদ্ধগয়ায় একটি স্থানক বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আবিষ্কৃত খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের লিপি-উৎকীর্ণ একটি লেখা হইতে জানা যায়, জনৈক শ্রীদশবলগর্ভ সমস্ত জীবের কল্যাণার্থ এই বিহার-চত্বরের কোথাও একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একাদশ শতকের শেষাশেষি বা দ্বাদশ শতকের গোড়ায় সোমপুরের এই বিহারে যতি বিপুলশ্রীমিত্রের পরম গুরুর গুরু যতি করুণাশ্রীমিত্র বাস করিতেন। তখন একদিন বঙ্গাল-সৈন্যদল আসিয়া বিহারে অগ্নিসংযোগ করে; প্রজ্বলমান আলয়ে দেবতার পদাশ্রয় করিয়া করুণাশ্রী পড়িয়াছিলেন; তবুও সেই গৃহ পরিত্যাগ করেন নাই; সেই ভাবেই অগ্নিদগ্ধ হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। বিপুলশ্রীমিত্র অগ্নিদাহে বিনষ্ট প্রকোষ্ঠগুলির সংস্কার সাধন করেন, বিহার-প্রাঙ্গনে একটি তারা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সোমপুরীর বুদ্ধমূর্তিকে বিচিত্র স্বর্ণাভরণে অলংকৃত করেন। তিনি নিজে বহুকাল বশী সন্ন্যাসীর মত সেই বিহারে যাপন করিয়াছিলেন।

সোমপুরীর পরই বাঙলার প্রসিদ্ধ বিহার ছিল জগদ্দল-মহাবিহার। এই বিহারটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল একাদশ শতকের শেষে, না হয় দ্বাদশ শতকের গোড়ায়, নরপতি রামপালের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায়। রামাবতীতে রামপালের রাজধানীর সন্নিকটেই ছিল বোধ হয় ইহার অবস্থিতি। এই বিহারের অধিষ্ঠাতা দেবতা ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন যথাক্রমে অবলোকিতেশ্বর ও মহত্তারা। জগদ্দলের আয়ু স্বল্পকাল, কিন্তু সেই স্বল্পকালের মধ্যেই সমসাময়িক বৌদ্ধ জগতের সর্বত্র জগদ্দলের প্রতিষ্ঠা বিস্তৃত লাভ করিয়াছিল। বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, মোক্ষাকর-গুপ্ত শুভাকর-গুপ্ত, ধর্মাকর প্রভৃতি মনীষী আচার্যরা কোনো না কোনো সময়ে এই মহাবিহারের অধিবাসী ছিলেন।

উত্তর-বঙ্গে যেমন সোমপুরী-বিহার ও জগদ্দল-বিহার, পূর্ববঙ্গে তেমনই সুপ্রসিদ্ধ বিহার ছিল বিক্রমপুরী-বিহার, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর-পরগণায়। এই বিক্রমপুরী বিহারও বোধ হয় বিক্রমশীল-ধর্মপালের আনুকূল্যেই, প্রতিষ্ঠিত ও লালিত হইয়াছিল। এই বিক্রমপুরী-বিহারই অন্তত কিছুদিনের জন্য অবধূতাচার্য কুমারচন্দ্র এবং লক্ষ্মীঙ্করাশিষ্য লীলাবজ্রের কর্মভূমি ছিল।

ধর্মপালের সমসাময়িক অন্য একটি বিহার ছিল বাঙলাদেশে, কিন্তু কোন্ স্থানে তাহা বলা কঠিন। এই বিহারটির নাম ত্রৈকূটক-বিহার এবং এই বিহারে বসিয়াই আচার্য হরিভদ্র অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার উপর তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ টীকাটি রচনা করিয়াছিলেন। সুমৃপা রাঢ়দেশের এক ত্রৈকূটক-দেবালয়ের কথা বলিয়াছেন; ত্রৈকূটক-দেবালয় ও ত্রৈকূটক-বিহার এক এবং অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নয়।

চট্টগ্রাম অঞ্চলেও একটি প্রসিদ্ধ বিহার ছিল ; তাহার নাম পণ্ডিত-বিহার। এই বিহার ছিল সিদ্ধাচার্য তৈলপাদের কর্মভূমি। বর্তমান ত্রিপুরা-জেলার পট্টিকেরক নামক স্থানে একটি বিহার ছিল, তাহার নাম কনকস্তুপ-বিহার ; কাশ্মীরী ভিক্ষু বিনয়শ্রীমিত্র এবং তাঁহার কয়েকজন সহকর্মীর স্মৃতি এই বিহারের সঙ্গে জড়িত। সম্প্রতি ময়নামতী পাহাড়ের উপর যে সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বোধ হয় এই বিহারেরই ধ্বংসাবশেষ। ১২২০ খ্রীষ্ট বৎসরের রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেবের তাম্র-পট্টোলীতেও পট্টিকের নগরীতে দুর্গাত্তারার নামে উৎসর্গীকৃত একটি বিহারের উল্লেখ আছে। পট্টিকেরকের কনকস্তুপ-বিহার এবং পট্টিকেরার দুর্গোত্তারা-বিহার একই বিহার কিনা বলা কঠিন। উত্তর-বঙ্গে আর একটি বিহার ছিল, তাঁহার নাম দেবীকোট-বিহার ; আচার্য অদ্বয়বজ্র, ভিক্ষুণী মেখলা প্রভৃতির নাম এই বিহারের সঙ্গে জড়িত। ফুল্লহরি ও সন্নগর-বিহার নামে আরও দুইটি বিহার ছিল প্রাচ্য-ভারতে। ফুল্লহরির অবস্থিতি ছিল উত্তর-বিহারে, বোধ হয় মুঙ্গেরের নিকটে। এই বিহারেও অনেক গ্রন্থ রচিত ও অনূদিত হইয়াছিল। সন্নগর-বিহারও বৌদ্ধ জ্ঞান-সাধনার অন্যতম কেন্দ্র ছিল, এবং আচার্য বনরত্ন সেই বিহারে বাস করিতেন ; কিন্তু ফুল্লহরির মতন এই বিহারটির অবস্থিতিও বোধ হয় ছিল প্রাচীন বাঙলাদেশের বাহিরে।

৫

সৃজ্যমান বাংলাভাষা। শৌরসেনী অপভ্রংশ

পাল-চন্দ্র পর্বে প্রধানত সংস্কৃত এবং হয়তো স্বল্পাংশে মাগধী প্রাকৃতের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া যে সুবিপুল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার কিছুটা পরিচয় লইতে চেষ্টা করিয়াছি। এ-কথাও আগে বলিয়াছি, লোকায়ত স্তরে মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় রূপ এবং উত্তর-ভারতের সর্বজনবোধ্য শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রচলনও ছিল যথেষ্ট। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা কেহ কেহ এই শেষোক্ত ভাষায় কিছু কিছু গান এবং পদ রচনাও করিয়াছেন। মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় গৌড়-বঙ্গীয় রূপের সঙ্গে শৌরসেনী অপভ্রংশের খুব বড় কিছু পার্থক্যও ছিল না। নবসৃজ্যমান বাঙলা ভাষায় রচিত চর্যাগীতিগুলিতে যে-ভাষা আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা সদ্যোক্ত মাগধী অপভ্রংশের গৌড়-বঙ্গীয় রূপেরই সহজ ও স্বাভাবিক বিবর্তন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাবও কিছু কিছু পড়িয়াছে। আর, প্রাচ্যদেশে স্থানীয় লেখকদের জনসাধারণের লেখনীতে ও মুখে মুখে শৌরসেনী অপভ্রংশও অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক উপায়েই কিছু কিছু প্রাচ্য উচ্চারণ ও বানান, বাক্ ও পদবিন্যাস-

ভঙ্গী স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। এই স্বীকৃতি বাঙালী সিদ্ধাচার্যদের রচিত দোহা এবং পদগুলির মধ্যেই সুস্পষ্ট।

শিক্ষিত বর্ণসমাজের উচ্চস্তরে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষাকে বাদ দিলে মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় বিবর্তিত রূপই ছিল এই পর্বে রাঢ়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-সমতট-চট্টলের লোকায়ত ভাষা। মূলত এই আর্যভাষায় আর্যেতর অস্ট্রিক, দ্রবিড় ও ভোটব্রহ্ম ভাষাগোষ্ঠীর নানা স্থানীয় বুলিরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল, শুধু শব্দ ও উচ্চারণ-ভঙ্গীতেই নয়, কিছুটা বাক্‌ভঙ্গী ও পদবিন্যাস-রীতিতেও, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সংস্কৃত হইতে মাগধী প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে মাগধী অপভ্রংশের বিবর্তন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কি করিয়া হইতেছিল, এ-তথ্যও আজ আচার্য সুনীতিকুমারের গবেষণার ফলে সুবিদিত।

যাহাই হউক, সুবিস্তৃত আলোচনা-গবেষণার ফলে আজ এই তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত যে, আনুমানিক নবম-দশম শতকে বাঙলাদেশে সংস্কৃত ছাড়া আরও দু'টি ভাষা প্রচলিত ছিল, একটি শৌরসেনী অপভ্রংশ, আর একটি মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় বিবর্তিত রূপ যাহাকে বলা যায় প্রাচীনতম বাঙলা। একই লেখক এই দুই ভাষায়ই পদ, দোহা ও গীত প্রভৃতি রচনা করিতেন; শ্রোতা ও পাঠকেরাও দুই ভাষাই বুঝিতে পারিতেন। নবম-দশম শতকের আগে এই লোকায়ত ভাষার রূপ কি ছিল আজ আর তাহা জানিবার উপায় নাই; সে-ভাষার নমুনা কোনো সাহিত্যে কেহ ধরিয়া রাখে নাই। পরেও নবসৃজ্যমান যে প্রাচীনতম বাঙলা ভাষার কথা বলিতেছি সে-ভাষায় লিখিত রচনার সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প। সংস্কৃতের মর্যাদা ও প্রভাব শিক্ষিত সমাজে ও উচ্চ বর্ণস্তরে ছিল সর্বব্যাপী, তাঁহারা সকলে সংস্কৃতের চর্চাই করিতেন, এবং মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের কালেও অধিকাংশ পণ্ডিত ও লেখক যখন যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন—জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সাহিত্য-দর্শনে—সাধারণত সংস্কৃতের মাধ্যমেই করিয়াছেন। লোকায়ত ভাষার কৌলিন্য-মর্যাদা তখনও যথেষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এমন কি, পাল-চন্দ্র পর্বে তান্ত্রিক ও বজ্রযানী আচার্যরা যে এক ধরনের প্রাকৃতধর্মী 'বৌদ্ধ সংস্কৃতের' প্রচলন করিয়াছিলেন দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এবং তাঁহারাও বিশুদ্ধ ব্যাকরণসম্মত সংস্কৃত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তবে, এক শ্রেণীর লোকেরা—তাঁহারা সাধারণত ইস্‌লাম-প্রভাবে প্রভাবান্বিত—বাঙলাদেশের কোথাও কোথাও বোধ হয় সেই প্রাকৃতধর্মী 'বৌদ্ধ সংস্কৃতের' ধারা বহমান রাখিয়াছিলেন; শেক-শুভোদয়া-গ্রন্থে সেই ভাষার কিছুটা আভাস ধরিতে পারা কঠিন নয়।

বলিয়াছি, সৃজ্যমান প্রাচীনতম বাঙলায় রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প। সাহিত্য বা জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার দিক হইতে তাহার উল্লেখযোগ্য মূল্য না থাকিলেও বাঙলাভাষা ও বাঙালীর সংস্কৃতির দিক হইতে লোকায়ত ভাষার এই প্রাচীনতম নমুনাগুলির মূল্য অপরিসীম। ইহার পশ্চাতে বহুদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের বা সমাজের শিক্ষিত উচ্চতর বর্ণস্তরের

কোনো সক্রিয় সমর্থন বা সহযোগিতা ছিল না, এবং সংস্কৃত ভাষার মাধ্যম ও উচ্চস্তরের সংস্কৃতির আড়ালে লোকায়ত সংস্কৃতির এই প্রকাশ বহুদিন পর্যন্ত যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

চর্যাগীতি

প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে চারিখানা প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনেন। প্রথমটিতে ছিল বিভিন্ন পদকর্তার রচিত ৪৬৷৷০টি ছোট ছোট গান; বইটির নাম চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতি। গানগুলির সুবিস্তৃত সংস্কৃত টীকাও গ্রন্থটিতে আছে। বহুদিন পর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় মূল-গ্রন্থের একটি তিব্বতী অনুবাদও নেপালেই আবিষ্কার করেন। তিব্বতী অনুবাদে গীত কিন্তু ৫১টি; মূল সংখ্যা বোধ হয় ছিল তাহাই। এই গানগুলি প্রত্যেকটিই প্রাচীনতম বাঙলায় রচিত। দ্বিতীয় তৃতীয় পুঁথি যথাক্রমে সিদ্ধাচার্য সরহ এবং কাহ্ন-রচিত দু'টি দোহাসংগ্রহ। তৃতীয়টি ডাকার্ণব বা ডাক-রচিত দোহা-সংগ্রহ। এই শেষোক্ত তিনটি গ্রন্থই শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত এবং সংস্কৃত-টীকাযুক্ত।

আচার্য সুনীতিকুমার চর্যাগীতিগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন, ইহাদের ভাষা প্রাচীনতম বাঙলা-ভাষার লক্ষণাক্রান্ত। শুধু তাহাই নয়, ইহাদের ব্যাকরণরীতি ও বাক্‌ভঙ্গী একান্তই বাঙলা, এবং এখনও বাঙলা-ভাষায় স্বীকৃত ও প্রচলিত। গীতগুলিতে এমন অনেক প্রবাদ আছে যাহা আজও বাঙলাদেশে সুপ্রচলিত; তাহা ছাড়া, ইহাদের মধ্যে নৌকা, নদনদী প্রভৃতি লইয়া ছবিতে উপমায় যে পারিপার্শ্বিকের চিত্র সুপরিস্ফুট তাহা একান্তই নদীমাতৃক বাঙলা দেশের।

৪৬৷৷০টি চর্যাগীতির ২২ জন কবি সকলেই সিদ্ধাচার্য, এবং চুরাশী সিদ্ধার নামের তালিকায় ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে, ইঁহাদের প্রত্যেকের দেশ ও কালনির্ণয় কঠিন। আচার্য সুনীতিকুমার, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, হর-প্রসাদশাস্ত্রী প্রভৃতিরা নানাদিক হইতে বিচার করিয়া কাল-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন; সাক্ষ্য-প্রমাণ যাহা আছে তাহা কিছুটা পরস্পর বিরোধী, পরিমাণে স্বল্প এবং সর্বত্র সুস্পষ্ট এবং নিঃসংশয়ও নয়। তবে, এক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ছাড়া, আর সকলেই মনে করেন, এই সিদ্ধাচার্য কবিরা মোটামুটি নবম শতক হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে লুই-পা, কাহ্ন-পা, জালন্ধরী-পা বা হাড়ি-পা, শবরী-পা, ভুসুকু, তন্ত্রীপাদ প্রভৃতিরাই সমধিক প্রসিদ্ধ এবং ইঁহাদের দেশ ও কাল সম্বন্ধে আগেই বলিয়াছি। মনে হয়, এই গীত-রচয়িতারা সকলেই প্রাচীন বাংলা দেশের অধিবাসী ছিলেন; যাঁহারা তাহা ছিলেন না তাঁহাদেরও বাঙলা দেশ ও বাঙালীর জীবন সম্বন্ধে অন্তত প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। তবু, এ-তথ্যও একেবারে নিঃসংশয়, এমন বলা চলে না।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক হইতে এই গীতিগুলির মূল্য অপরিমেয়। প্রায়

প্রত্যেকটি গীতই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, এবং অন্ত্যমিলে বাঁধা ; প্রত্যেকটি গীত এব একটি বিশেষ বিশেষ রাগে গাওয়া হইত। বাঙলা পয়ার বা লাচাড়ী ছন্দ এই গীতি-গুলির ছন্দ হইতেই বিবর্তিত। যত গুহ্য অধ্যাত্ম-সাধনার গুহ্যতর তত্ত্বই ইহাদের মধ্যে নিহিত থাকুক্ না কেন, স্থানে স্থানে এমন পদ দু'চারিটি আছে যাহার ধ্বনি, ব্যঞ্জনা, ও চিত্রগৌরব এক মুহূর্তে মন ও কল্পনাকে অধিকার করে। অথচ, এ-কথাও সত্য যে, সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই গীতিগুলি রচিত হয় নাই, হইয়াছিল বৌদ্ধ সহজ-সাধনার গূঢ় ইঙ্গিত ও তদনুযায়ী জীবনাচরণের (চর্যার) আনন্দকে ব্যক্ত করিবার জন্য। সহজ-সাধনার এই গীতিগুলি কর্তৃক প্রবর্তিত খাতেই পরবর্তীকালের বৈষ্ণব সহজিয়া গান, বৈষ্ণব ও শাক্ত-পদাবলী, আউল-বাউল মারফতী-মুর্শিদা গানের প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। এই গ্রন্থের নানা স্থানে নানা সূত্রে চর্যাগীতির নানা বিচ্ছিন্ন পদ উদ্ধার করিয়াছি ; এখানেও দুই চারিটি উদ্ধার করিতেছি ইহাদের সাহিত্য-মূল্যের কিছুটা আস্বাদন দানের উদ্দেশ্যে।

উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মৌউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবর ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলি॥

উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বসতি করে শবরী বালিকা ; শবরীর পরিধানে ময়ুরের পাখা, গলায় গুঞ্জার মালা। ওগো উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোলে ভুল করিও না, দোহাই তোমার—আমি তোমারই গৃহিণী, নামে সহজ সুন্দরী। নানা তরু মুকুলিত হইল, গগন স্পর্শ করিল ডাল ; কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী একেলা শবর এ-বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। তিন ধাতুর খাট পাতিল শবর, মহাসুখে বিছাইল শয্যা ; শবর ভুজঙ্গ এবং নৈরাত্মা স্ত্রী—উভয়ে একত্র প্রেমরাত্রি পোহাইল।

তিন না চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর ণিলয় ণ জাণী॥
হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ি হোহু ভান্তো॥

ভয়ে তৃণ ছোঁয় না হরিণ, না খায় জল ; হরিণ জানেনা হরিণীর নিলয়। হরিণী আসিয়া বলে, হরিণ, তুমি শোনো, এ-বন ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইয়া চলিয়া যাও।

কুলেঁ কুলেঁ মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল ভিণ একুবাকু ণ ভূলহ রাজপথ কন্ধারা ॥
মায়া মোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥
সুনাপান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।
এষা অটমহাসিদ্ধি সিঝই উজ বাট জায়ন্তে ॥

হে মূঢ়, কুলে কুলে ঘুরিয়া ফিরিও না, সংসারে সহজ পথ পড়িয়া আছে। সম্মুখে যে মায়া-মোহের সমুদ্র তাহার যদি না বোঝা যায় অন্ত, না পাওয়া যায় থই, সম্মুখে যদি না দেখা যায় কোনো ভেলা বা নৌকা, তবে এ-পথের যাহারা অভিজ্ঞ পথিক, তাঁহাদের নিকট সন্ধান জানিয়া লিও। শূন্য প্রান্তরে যদি না পাও পথের দিশা, ভ্রান্ত হইয়া আগাইয়া যাইও না ; সহজ পথে চল, তাহা হইলেই মিলিবে অষ্টমহাসিদ্ধি।

কাহ্ন ও সরহপাদের দোহাকোষ

আগেই বলিয়াছি, পশ্চিম ও উত্তর-ভারতীয় শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত হইয়াছিল সরহ ও কাহ্নের দোহাগুলি। এই দোহাগুলিও সহজসিদ্ধির গুহ্যতত্ত্ব ও আচরণ সম্বন্ধীয়, এবং ইহাদেরও অর্থ নিরূপণ অত্যন্ত কঠিন, তবে চর্যাগীতি অপেক্ষা সরলতর। ছন্দে ও ধ্বনিগৌরবে দোহাগুলিও খুব সমৃদ্ধ, তবে অদীক্ষিতের পক্ষে ইহাদের সৌন্দর্যের অনেকখানি গুহ্যনিহিত। ঠিক বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্য ন হইলেও প্রাচীনতম বাঙলা সাহিত্যের ধারার সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ নিবিড় ; দুইই একই ভাব-মণ্ডলের সৃষ্টি। পরবর্তী কালের বাঙলা বৈষ্ণব-পদাবলীর সঙ্গে ব্রজবুলিতে রচিত বৈষ্ণব-পদাবলীর যে-সম্বন্ধ, ভাষা ও ভাব-পরিমণ্ডলের দিক্ হইতে চর্যাগীতির সঙ্গে দোহাকোষের সম্বন্ধ ঠিক তাহাই। প্রাচীন বাঙলায় শৌরসেনীর এই প্রভাব উত্তর-ভারতের দান, এ-দান কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেই হয়।

চর্যাগীতিগুলির পাঠ সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়, গুহ্য অর্থ তাহাকে আরও যেন অস্পষ্ট করিয়া দেয়। সংস্কৃত টীকাটির ভাষা এবং অর্থও দুর্বোধ্য। দোহাকোষ সম্বন্ধেও বক্তব্য একই। চর্যার ভাষায় কোথাও শৌরসেনী অপভ্রংশের এবং কোথাও কোথাও মৈথিলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। ঠিক তেমনই দোহাগুলির অপভ্রংশ কিছু কিছু স্থানীয় বাংলা ও মৈথিলী প্রভাবও ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কাহ্ন ও সরহপাদের ২।৩টি অপভ্রংশ দোহাংশ অন্য প্রসঙ্গে

অন্যত্র উদ্ধার করিয়াছি ; এখানেও একটি উদ্ধার করিলাম, কতকটা ইহাদের সাহিত্য মূলের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য।

পণ্ডিঅ লোঅ খমহু মহু এত্থ ন কিঅই বিঅপ্প
জো গুরুবঅণে মই সুঅউ তহি কিং কহমি সুগোপ্প।
কমল কুলিস বেবি মজ্ঝ ঠিউ জো সো সুরঅ বিলাস
কো তহি রমই ন তিহুঅণে কস্স ন পূরই আস ॥

পণ্ডিত লোক, আমাকে ক্ষমা কর ; এখানে কিছু বিকল্প করা হইতেছে না ; যাহা আমি শুনিয়াছি সুগোপন গুরুবাক্যে তাহা আমি কি করিয়া বলি ! কমল এবং কুলিশ এই দুইয়ের মধ্যস্থিত যে সুরতবিলাস তাহাতে ত্রিভুবনে কে না সুখী হয় এবং কাহার না আশা পূর্ণ হয় !

কৃষ্ণ-রাধা কাহিনী

প্রাচীনতম বাঙলা ভাষা যেমন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ভাবের ও তত্ত্বের বাহন হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যেও যে সে-ভাষা একেবারে ব্যবহৃত হয় নাই, এমন নয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণ কাহিনীর কয়েকটি নাম যে বিবর্তিত রূপে আমাদের গোচর তাহাদের ভাষাতত্ত্বগত ইঙ্গিত খুব সুস্পষ্ট বলিয়াই মনে হয়। কৃষ্ণ-কাহ্ন-কানু বা কানাই, রাধিকা-রাহী-রাই, কংস-কাংস, নন্দ-নান্দ, অভিমন্যু-অহিবণ্ণু বা অহিমণ্ণু-আইহণ, আইমন-আয়ান প্রভৃতি নামের বিবর্তনের মধ্যে অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে অপভ্রংশের মারফৎ প্রাচীন বাঙলায় রূপান্তরের মধ্যে বোধ হয় এ-তথ্য লুক্কায়িত যে কৃষ্ণ-রাধিকার কাহিনী কোনো না কোনো সাহিত্যরূপ আশ্রয় করিয়া কামরূপে ও বাঙলা দেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল তুর্কী-বিজয়ের বহু আগেই। এই সাহিত্যরূপের প্রত্যক্ষ প্রমাণও কিছু কিছু আছে, যদিও তাহা সুপ্রচুর নয়। কামরূপরাজ বনমালদেবের একটি লিপিতে, ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়-গ্রন্থের কয়েকটি প্রকীর্ণ শ্লোকে কৃষ্ণের ব্রজলীলার বর্ণনার কথা তো আগেই বলিয়াছি।

তাহা ছাড়া, চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতায় ১০৫১শকে (১১২৯ খ্রীষ্ট বৎসরে) মানসোল্লাস বা অভিলষিতার্থচিন্তামণি নামে একটি সংস্কৃত কোষগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ; এই গ্রন্থের গীতবিনোদ অংশে ভারতবর্ষের সমসাময়িক সমস্ত স্থানীয় ভাষায় রচিত কিছু কিছু গানের দৃষ্টান্ত সংকলিত হইয়াছে ; ইহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রাচীনতম বাংলায় রচিত গানও আছে। এই বাংলা গানগুলির বিষয়বস্তু গোপীদের লইয়া শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা এবং বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার-বর্ণনা। এই গানগুলি বাংলা দেশেই রচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই, এবং এই প্রান্ত হইতেই মহারাষ্ট্র-প্রান্তে প্রচারিত হইয়াছিল।

গীতগোবিন্দের ভাষা

আচার্য সুনীতিকুমার দেখাইয়া দিয়াছেন, জয়দেব গীতগোবিন্দ-গ্রন্থে এমন কতকগুলি পদ বা গান আছে যে-গুলি আগেও সুরে গাওয়া হইত, এখনও হয়। গীতগোবিন্দের ভাষা শব্দ ও ব্যাকরণের দিক হইতে সংস্কৃত সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার ছন্দ, রীতি ও ভঙ্গী, ইহার অনুভব, ইহার প্রাণবায়ু সমস্তই যেন লোকায়ত স্থানীয় ভাষার, সে-ভাষা প্রাচীনতম বাঙলাই হোক্ বা বাঙলা দেশে প্রচলিত শৌরসেনী অপভ্রংশই হোক্। আর, আগেই বলিয়াছি, এই দুই ভাষায় বিশেষ পার্থক্যও কিছু ছিলনা। এমন কথাও কেহ কেহ বলেন, মূল গীতগোবিন্দ রচিত হইয়াছিল শৌরসেনী অপভ্রংশে বা প্রাচীনতম বাংলায়, পরে তাহার উপর একটা সংস্কৃত পোষাক পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র! এ-অনুমান সত্য হউক বা না হউক (সত্য বলিয়া মনে করিবার কারণ খুব নাই), একদিকে চর্যাগীতি ও অন্যদিকে গীতগোবিন্দের ধারায়ই পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-পদাবলীর সৃষ্টি।

চতুর্দশ শতকের শেষাশেষি প্রাকৃত-পৈঙ্গল নামে অবহঠট (অপভ্রষ্ট) বা অপভ্রংশ-ভাষায় রচিত গীতি-কবিতার একটি সংকলন গ্রন্থ রচিত হয়; প্রাকৃত ছন্দের বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতির দৃষ্টান্ত সংকলন করাই ছিল অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থে একাদশ-চতুর্দশ শতকীয় শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত এমন কয়েকটি পদ আছে যে-গুলির মধ্যে কিছু কিছু বাঙলা শব্দ, বাঙলা ধরন ধারন প্রত্যক্ষ গোচর। ভাষার দিক হইতে গীতগোবিন্দের পদগুলির সঙ্গেও কয়েকটি পদের আত্মীয়তা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। এক কথায় ইহাদের আবহ যেন একান্তই বাঙালার, এবং খুব সম্ভব এই অপভ্রংশ পদগুলি বাঙলাদেশেই রচিত হইয়াছিল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিতেছি। ক্ষুদ্র পরিসরে ঘনীভূত ভাব ও রসের, ধ্বনি ও ছন্দের এমন সুন্দর প্রকাশ প্রাচীন কালে খুব কমই দেখা যায়। আমার ধারণা, প্রাকৃত-পৈঙ্গলের অনেকগুলি শ্লোক ও কবিতায় বাঙলাদেশের যেটুকু পরিচয় পাইতেছি তাহা প্রাক্-তুর্কী বাঙলার।

> কাঅ হুউ দুব্বল, তেজ্জি গরাস, খণে খণে জানিঅ অচ্ছ ণিসাস।
> কুহুরব তার দুরন্ত বসন্ত, নিদ্দঅ কাম নিদ্দঅ কন্ত॥

দুর্বল হইল কায়, গ্রাস (অর্থাৎ আহার) হইল পরিত্যক্ত, ক্ষণে ক্ষণে (দীর্ঘ) নিশ্বাস জানা যাইতেছে; কুহুরব তীব্র, বসন্ত দুরন্ত—কাম-নির্দয় কি কান্ত নির্দয়, জানিনা।

> সো মহ কন্তা দূর দিগন্তা।
> পাউস আএ চেউ চলাএ॥

সেই আমার কান্ত (গিয়াছে) দূর দিগন্তে; প্রাবৃষ (বর্ষা) আসিতেছে, চঞ্চলিত হইতেছে চিত্ত।

গজ্জই মেহ কি অম্বর সামর
ফুল্লই ণীব কি বুল্লই ভামর।
এক্কল জীঅ পরাহিণ অম্মহ
কীলউ পাউস কীলউ বম্পহ ॥

মেঘ গর্জন করিতেছে, অম্বর শ্যামল, নীপ ফুটিয়াছে, ভ্রমর বুলিতেছে ; আমার একলা জীবন পরাধীন ; প্রাবৃষ (মেঘ) খেলা করিতেছে, মন্মথও খেলা করিতেছে।

তরুণ-তরুণি, তবই ধরণি, পবণ বহখরা
লগ ণহি জল, বড় মরু থল, জনজীবন হরা।
দিসই বলই, হিঅ অ দুলই, হমি একলি বহূ
ঘর ণহি পিঅ, সুণহি পহিঅ, মণ ঈচ্ছই কহূ ॥

তরুণ সূর্যে ধরণী তপ্ত, বাতাস বহিতেছে খর বেগে, নিকটে নাই জল, জল জীবননাশা বিস্তৃত মরুস্থল (সম্মুখে) ; ঘরে নাই আমার প্রিয়, আমি একেলা বধু—শোনো গো পথিক, আমার মন কি চায়।

শুধু প্রেমের কবিতা, ভক্তিরসের কবিতাই নয়, বীররসের কবিতাও প্রাকৃত-পৈঙ্গলে মিলিতেছে, এবং সেই প্রসঙ্গে বাঙালীর বীরত্বের গৌণ প্রশংসাও আছে। সুকুমার সেন মহাশয় তাহার কিছু কিছু উদ্ধার করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণরাধাকাহিনী, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি লইয়াও দুই চারিটি ছোট ছোট কবিতা আছে। একটি শ্লোকে দেখিতেছি, কয়েকটি বিশিষ্ট মাত্রা-সংস্থানের নামকরণই হইয়াছে বাংলাদেশে পূজিতা চারিজন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবীর নামানুসারে—লক্ষ্মী, গৌরী, চুন্দা ও মহামায়া। আর একটি শ্লোকে শিবজায়া পার্বতীর দারিদ্র্যময় সংসারের গার্হস্থ্য দুঃখ বর্ণনা অত্যন্ত করুণ।

বাল কুমারো ছঅ মুণ্ডধারী, উবাঅহীণা মুই এক্ক ণারী।
অহংণিসং খাই বিসং ভিখারী গঈ ভবিত্তী কিল কা হমারী ॥

ছয় মুণ্ডধারী বালকপুত্র আমার ছয়মুখে খায়, আর আমি একা উপায়হীনা নারী। আমার ভিখারী স্বামী অহর্নিশ কেবল বিষ খায় ; কী গতি হইবে আমার।

এই বর্ণনা মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে শিবগৃহিণী পার্বতীর গার্হস্থ্য-বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায় ; সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থেরও একাধিক প্রকীর্ণ শ্লোকে একই চিত্র সুস্পষ্ট দৃষ্টি-গোচর। সন্দেহ নাই, এ-চিত্র একান্তই বাঙালীর এবং বাঙলার আবহে-পরিবেশে আম্রাত।

শুদ্ধ ও সংযত, স্বচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধ সংসারের সংক্ষিপ্ত বাস্তব বর্ণনাও আছে।

পুত্ত পবিত্ত বহুত্ত ধণা ভত্তি কুটুম্বিণি সুদ্ধমনা।
হাক্ক তরাসই ভিচ্চগণা কো কর বব্বর সগ্‌গমণা ॥

পুত্র পবিত্র ; অনেক ধন ; ভর্ত্রী অর্থাৎ স্ত্রী এবং কুটুম্বিনীরা শুদ্ধ স্বভাবা ;
হাঁকে ত্রস্ত হয় ভৃত্যগণ ; (এমন সব রাখিয়া) কোন্ বর্বর স্বর্গে যাইতে চায় !

গীতগোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেব অপভ্রংশ ভাষায়ও গীতি-কবিতা রচনা করিতেন। গুর্জরী ও মারু রাগে গেয় জয়দেবের দুটি গান শিখদের শ্রীগুরুগ্রন্থে বা আদিগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, কিছুটা বিকৃত রূপে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা উদ্ধার করিয়াছেন।

ধর্মাশ্রয়ী বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য গীতি-কবিতা ছাড়া অপভ্রংশে কিছু কিছু প্রেমের কবিতাও যে বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল তুর্কী-বিজয়ের আগেই, তাহার পরিচয় তো প্রাকৃত-পৈঙ্গলের কতকগুলি শ্লোকে পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে কিছু বাঙলা শব্দ, বাঙলা বাক্‌ভঙ্গী, বাঙলা ধরন-ধারন, সর্বোপরি বাঙলার আবহ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। খুব সম্ভব এই ধরনের কবিতাগুলি বাঙলাদেশেই রচিত হইয়াছিল, এমন অপভ্রংশে যাহার উপর প্রাচীনতম বাঙলা ভাষার প্রভাব অত্যন্ত বেশি।

সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মদাসের বিদগ্ধমুখমণ্ডল-গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে। সুকুমার সেন মহাশয় দেখাইয়াছেন, এই গ্রন্থের কোনো কোনো শ্লোক ও শ্লোকাংশ প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত ; প্রাচনীতম বাঙলাভাষারও দু'একটি ছত্র বিদ্যমান।

সুনীতিবাবু দেখাইয়াছেন, শেক-শুভোদয়ার ঊনবিংশ অধ্যায়ে মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় রচিত একটি প্রেমের কবিতা আছে, কবিতাটি প্রাক্-তুর্কী আমলের রচনা বলিয়াই মনে হয় ; পরে শেক-শুভোদয়া রচনাকালে সমসাময়িক ভাষায় রূপান্তরিত করা হইয়াছিল।

ডাক ও খনার নামে যে বচনগুলি বাঙলাদেশে আজও প্রচলিত তাহাও বোধ হয় প্রাক্-তুর্কী আমলের চল্‌তি প্রবাদ সংগ্রহ ; কালে কালে তাহাদের ভাষা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে মাত্র। শুভংকরের নামে প্রচলিত গণিত-আর্যার শ্লোকগুলিতেও যে অপভ্রংশের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান তাহা অঙ্গুলি সংকেতে দেখাইবার প্রয়োজন আজ আর নাই।

লক্ষ্যণীয় এই যে, এই পর্বে প্রাচীনতম বাঙলায় এবং অপভ্রংশে রচিত সাহিত্যের অল্পস্বল্প যে-সব দৃষ্টান্ত আমাদের গোচর তাহা সমস্তই গীতি-কবিতা, এবং তাহার অধিকাংশ সুরে-তালে গেয়। বাঙলা দেশের এই সুপ্রাচীন গীতিকাব্যের ধারার সঙ্গেই মধ্যযুগীয় বাঙলা গীতিকাব্যের প্রবাহ যুক্ত, তাহা বৈষ্ণব-পদাবলীর ধারাই হোক্, আর মঙ্গল-কাব্যের ধারাই হোক্।

মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গল-কাব্যে চাঁদ সদাগর-লখীন্দর-বেহুলা-ধনপতি-লহনা-খুল্লনা-শ্রীমন্ত-কালকেতুর যে-কাহিনীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়, গোপীচাঁদের গানে রাজা গোপীচন্দ্র-লাউসেন-ময়নামতী বা মদনাবতী-অদুনা-পদুনার যে গল্প আমরা পাইতেছি,

এই সব গল্প খুব সম্ভব প্রাক্-তুর্কী বাঙলার লোকায়ত স্তরে জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, এবং অসম্ভব নয়, কিছু কিছু নূতন রচনাও হয়তো হইয়া থাকিবে। তবে, এ-সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। মনসা-মঙ্গলের গল্পে অন্তর্বাণিজ্য ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের যে ছবি তাহা মধ্যযুগীয় বাঙলার ছবি নয়; সে-যুগে বাঙলার এই সামুদ্রিক বাণিজ্যসমৃদ্ধি আর ছিল না। মনে হয়, এই চিত্র প্রাচীনতর কালের দূরাগত স্মৃতিমাত্র; তাহারই উপর সমসাময়িক কালের প্রলেপ পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মে মনসার প্রতিষ্ঠা নবম দশম একাদশ-দ্বাদশ শতকেই; কাহিনীটিতে মনসার যে প্রতাপ দৃষ্টিগোচর তাহা প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে হওয়াই স্বাভাবিক। আর, গোপীচাঁদের গল্পে তো একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় সহজিয়া তান্ত্রিকধর্মের স্রোত সবেগে বহমান।

৬

সেন-বর্মণ পর্ব

দ্বাদশ শতকের সেন-বর্মণ পর্ব বাঙলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের সুবর্ণযুগ। সেন-বর্মণ রাজ বংশের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়া ধীরে ধীরে বদলাইতে আরম্ভ করে। এই দুই রাজবংশই বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্মৃতি ও সংস্কারানুযায়ী সমাজ পুনর্গঠনের প্রয়াসী। এই প্রয়াসের স্বাভাবিক প্রকাশ হইবে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পোষকতা, ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিগ্রন্থাদির অধিকতর আলোচনা ও রচনা, ব্রাহ্মণ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকতর প্রচার, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও জীবনাদর্শের অধিকতর প্রসার, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। এই পর্বে বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম ও জীবনাদর্শ অনাদৃত; অন্তত রাষ্ট্রের এবং সমাজের প্রতাপবান এবং সমৃদ্ধ উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর সক্রিয় পোষকতা ইহাদের পশ্চাতে আর নাই। সংঘ-বিহার ইত্যাদি ছিল না, বা এখানে সেখানে বৌদ্ধ ও অন্যান্য অবৈদিক ও অপৌরাণিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বা শিক্ষা-দীক্ষার চর্চা আর হইত না, তাহা নয়, কিন্তু যাহা যতটুকু হইত তাহার পরিধি সংকুচিত হইয়া গিয়াছিল, সন্দেহ নাই, এবং সমস্ত চর্চা ও চর্যা একান্ত ভাবেই সংকীর্ণ ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া, এই সব বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীগুলির প্রভাব ক্রমশই সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। পাল-বংশের শেষ অধ্যায় হইতেই সমাজ ও সংস্কৃতির এই গতি ধীরে ধীরে ধরা পড়িতেছিল; সেন-বর্মণ বংশ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বেগ বাড়িয়াই গেল। প্রাকৃতধর্মী 'বৌদ্ধ সংস্কৃত', সৃজ্যমান প্রাচীনতম বাঙলা এবং শৌরসেনী অপভ্রংশের গৌড়-বঙ্গীয় রূপের চর্চা যাহা ছিল তাহা সাধারণত বৌদ্ধ

তান্ত্রিক সমাজের মধ্যেই এবং লোকায়ত স্তরের স্বল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়।

এই পর্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরভ্যুত্থান শুধু যে বাঙলাদেশেই আবদ্ধ ছিল তাহা নয়। সমগ্র উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতবর্ষ জুড়িয়াই তখন নূতনতর এক ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টির এবং সৃষ্টির তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে—কাশ্মীরে, কল্যাণে (মহারাষ্ট্র), কলিঙ্গে, কনৌজে, ধারায়, মিথিলায়। এই একই ব্রাহ্মণ্য তরঙ্গ বাঙলাদেশেও বহিয়া আসে নাই, তাহা কে বলিবে? কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, এই পর্বের বাঙলায় সমস্ত গ্রন্থ-রচনাই তিনটি রাজার রাজত্বকালে—হরিবর্মা, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, এবং সমস্ত গ্রন্থই প্রায় হয় জ্যোতিষ-মীমাংসা ধর্মশাস্ত্র-স্মৃতিশাস্ত্র, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য আচার আচরণ সম্পর্কিত, অথবা কাব্য-নাটক, এবং সে কাব্য-নাটকও চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী এবং ব্রাহ্মণ্য-ঐতিহ্যে ভরপুর। ব্যাকরণে, ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের আলোচনায়, তান্ত্রিক দর্শনে, নূতন সাহিত্যরীতির প্রবর্তন ও প্রচলনে যে-বাঙলাদেশ গুপ্তোত্তর ও পালপর্বে প্রায় সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, এই পর্বে সে-সব দিকে কোনো উল্লেখযোগ্য চেষ্টাও যে ছিল, এমন নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। এই তথ্যের মধ্যে ইতিহাসের যে-ইঙ্গিত নিহিত তাহা অন্য প্রসঙ্গে একাধিকবার ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি; এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আসল কথা, এই পর্বে বাঙালীর মনন ও অন্বেষণের স্রোতে ভাঁটা পড়িয়া গিয়াছিল, গভীরতর এবং বহুমুখী জ্ঞানসাধনা আর ছিল না, স্বাধীন চর্চার ক্ষেত্রে স্বকীয়ত্ব প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। একমাত্র কবিকল্পনার ক্ষেত্রে কিছুটা সরস প্রাণপ্রবাহ ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্তও অব্যাহত ছিল, কিন্তু সে-প্রাণেরও বিস্তার বা গভীরতা স্বল্প। গীত-গোবিন্দের মত কাব্যও যথার্থত স্বল্পপ্রাণ; তাঁহার মাধুর্য আছে, শক্তি নাই; সুর আছে, তেজ নাই; দাহ আছে, দীপ্তি নাই।

মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ্য বিধি-বিধান

গৌড় মীমাংসক সম্বন্ধে উদয়ন ও গঙ্গেশ উপাধ্যায় যে উক্তিই করিয়া থাকুন না কেন বাঙলাদেশে যে মীমাংসার চর্চা হইত তাহার লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। তাহা ছাড়া অনিরুদ্ধ ও ভবদেব-ভট্ট এই দুইজনই ছিলেন মীমাংসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; তাঁহারা দুইজনই কুমারিল-ভট্টের মীমাংসা সম্বন্ধীয় মতামতের সঙ্গে সুপরিচিত। হলায়ুধও বলিতেছেন, বাঙলাদেশে বৈদিক শাস্ত্রাদির আলোচনা হইত না বটে, কিন্তু মীমাংসার চর্চা ছিল। কিন্তু তাহা থাকিলেও এই পর্বে রচিত মীমাংসাশাস্ত্রের মাত্র দু'টি গ্রন্থের খবর আমরা জানি। একটি ভবদেব-ভট্টকৃত তৌতাতিতমততিলক, অর্থাৎ তৌতাতিত বা কুমারিল-ভট্টের তন্ত্র-বার্তিক গ্রন্থের টীকা, আর একটি হলায়ুধের মীমাংসাসর্বস্ব। শেষোক্ত গ্রন্থটি বিলুপ্ত; আর, তৌতাতিতমততিলক পূর্বমীমাংসাসূত্রের একাংশের মাত্র টীকা।

ভবদেব ভট্ট

এই পর্বে ধর্মশাস্ত্রের প্রসিদ্ধতম লেখক হইতেছেন বলবলভী ভুজঙ্গ (বালবলভী নামক নগরের নাগরক), রাঢ়ান্তর্গত সিদ্ধলগ্রামবাসী, সামবেদীয় কৌঠুমশাখাধ্যায়ী, সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ভট্ট-ভবদেব। তাঁহার এক পূর্বপুরুষ জনৈক অনুল্লিখিতনাম গৌড়-রাজের নিকট হইতে হস্তিনীভিট্ট নামক গ্রাম শাসনস্বরূপ পাইয়াছিলেন; তাঁহার পিতামহ আদিদেব জনৈক বঙ্গরাজের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন; পিতার নাম ছিল গোবর্ধন; মাতা সাঙ্গোকা ছিলেন জনৈক বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণের কন্যা। ভবদেব নিজে বর্মণরাজ হরিবর্মা এবং সম্ভবত তাঁহার পুত্রেরও মহাসান্ধিবিগ্রহিক-মন্ত্রী ছিলেন। শিক্ষিত অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া ভবদেব রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বেরও অধিকারী হইয়াছিলেন, ধর্মাচরণোদ্দেশে অনেক দীঘি ও মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার চেয়েও উল্লেখযোগ্য এই যে, সমসাময়িক কালে তাঁহার চেয়ে যুগন্ধর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর কেহ ছিলেন না। তিনি ছিলেন ব্রহ্মাদ্বৈত দর্শনের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা, কুমারিল-ভট্টের মীমাংসা বিষয়ক মতামতের সঙ্গে সুপরিচিত, বৌদ্ধদের পরম শত্রু এবং পাষণ্ড বৈতণ্ডিকদের তর্কখণ্ডনে পটু, অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, আয়ুর্বেদ-অস্ত্রবেদ-তন্ত্র গণিত সিদ্ধান্তে সুদক্ষ, জ্যোতিষে ফলসংহিতায় দ্বিতীয় বরাহ। বাচস্পতি-রচিত ভবদেব-প্রশস্তিতে বলা হইয়াছে যে, তিনি হোরাশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে এক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং ভট্টোক্ত (অর্থাৎ কুমারিলোক্ত) নীতি অনুসরণ করিয়া এক সহস্র ন্যায়ে মীমাংসা সম্বন্ধীয় আরও একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

ভবদেব রচিত হোরাশাস্ত্রের কোনো পুঁথি আজও পাওয়া যায় নাই। মীমাংসাসম্বন্ধীয় গ্রন্থটি পূর্বোক্ত তৌতাতিতমততিলক, সন্দেহ নাই। ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; ব্যবহার, প্রায়শ্চিত্ত এবং আচার সম্বন্ধে অন্তত তিনখানা গ্রন্থের সংবাদ এ-পর্যন্ত জানা গিয়াছে—ব্যবহারতিলক, প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ (বা প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ), এবং ছান্দোগ্যকর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি (বা দশকর্মপদ্ধতি বা সংস্কার-পদ্ধতি বা দশকর্মদীপিকা)। ব্যবহারতিলক-গ্রন্থের কোনো পুঁথি আজও পাওয়া যায় নাই, তবে রঘুনন্দন, মিত্রমিশ্র এবং বর্ধমান প্রভৃতি পরবর্তী স্মৃতিকর্তারা এই গ্রন্থের নানা মতামত উদ্ধার করিয়াছেন তাঁহাদের রচনায়। প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ-গ্রন্থে ভবদেব প্রায় ষাট জন পূর্বগামীদের মতামত উদ্ধার করিয়া ছয় প্রকারের অপরাধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ বাঙলাদেশে এবং বাঙলাদেশের বাহিরে প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল; পরবর্তীকালের বেদাচার্য, নারায়ণভট্ট এবংগোবিন্দানন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতারাও ভবদেবের মতামত উদ্ধার ও আলোচনা করিয়াছেন। ছান্দোগ্য-কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি সামবেদীয় দ্বিজবর্ণের সংস্কার সম্বন্ধীয় গ্রন্থ; গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া ষোলো প্রকারের সংস্কারের আলোচনা এই গ্রন্থে আছে।

জীমূতবাহন

ধর্মশাস্ত্র রচয়িতাদের মধ্যে ভবদেব-ভট্টের পরেই নাম করিতে হয় পারিভদ্রীয় (পারিভদ্র-কুলজাত ; বোধ হয় রাঢ়ীয় পারিহাল বা পারি-গাঞী) মহামহোপাধ্যায় জীমূতবাহনের। তাঁহার বাড়ী ছিল খুব সম্ভব রাঢ়দেশে। জীমূতবাহনের কাল লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বিস্তর। তিনি রাজা ভোজ এবং গোবিন্দরাজের নাম করিয়াছেন এবং শকাব্দ ১০১৪—১০৯২ খ্রীষ্ট বৎসরের উল্লেখ করিয়াছেন ; কাজেই তাঁহার কাল একাদশ শতকের আগে হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। অন্যদিকে বাচস্পতি মিশ্র, শূলপাণি ও রঘুনন্দন তিন জনই জীমূতবাহনের গ্রন্থাদি হইতে মতামত উদ্ধার ও আলোচনা করিয়াছেন ; কাজেই তাঁহার কাল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের পরেও হইতে পারে না। খুব সম্ভব তিনি দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে জীবিত ছিলেন। জীমূতবাহন অন্তত তিনখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—কালবিবেক, ব্যবহারমাতৃকা এবং দায়ভাগ। কাল-বিবেক-গ্রন্থ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা পূজানুষ্ঠান, শুভকর্ম, আচার, ধর্মোৎসব প্রভৃতি পালনের শুভাশুভ কাল, সৌরমাস, চান্দ্রমাস প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা। এ-সম্বন্ধে জীমূতবাহন পূর্ববর্তী অসংখ্য লেখকের রচনা উদ্ধার ও আলোচনা করিয়া নিজের মতামত ও যুক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ-গ্রন্থ সমসাময়িক কালে প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছিল, এবং রঘুনন্দন, শূলপাণি, বাচস্পতি, গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি সকলেই সশ্রদ্ধভাবে তাঁহার যুক্তি ও মতামত উদ্ধার ও স্বীকার করিয়াছেন। ব্যবহারমাতৃকা-গ্রন্থ ব্রাহ্মণ্যাদর্শানুযায়ী বিচারপদ্ধতির আলোচনা, গ্রন্থের পাঁচটি বিভাগ : ব্যবহারমুখ, ভাষাপাদ, উত্তরপাদ, ক্রিয়াপদ এবং নির্ণয়পাদ। ব্যবহারের সংজ্ঞা, প্রাড্‌বিবাক বা বিচারকের গুণাগুণ ও কর্তব্য, নানা প্রকার ও স্তরের ধর্মাধিকরণ, ধর্মাধিকরণ-সভ্যদের কর্তব্য, বিচারার্থীর আবেদন বা পূর্বপক্ষ, প্রতিভূ বা জামীন, প্রত্যর্থীদের চার প্রকারের উত্তর বা জবাব, প্রমাণ বা ক্রিয়া, মানুষী ও দৈবী নানা প্রকারের সাক্ষ্য, বিচার ও বিচারফল প্রভৃতি সমস্তই পূর্বোক্ত পাঁচভাগ জুড়িয়া আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থেও জীমূতবাহন পূর্বগামী পণ্ডিতদের প্রচুর বচন ও মতামত উদ্ধার ও নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন। জীমূতবাহনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ দায়ভাগ, এবং এই গ্রন্থ আজও মিতাক্ষরা-বহির্ভূত হিন্দুসমাজে দায় বা উত্তরাধিকার, সম্পত্তি-বিভাগ এবং-স্ত্রী-ধন সম্পর্কে একতম সুবিখ্যাত ও সু-প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে জীমূতবাহন পূর্বগামী অসংখ্য শাস্ত্রকারদের যুক্তি ও মতামত উদ্ধার করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্য এবং প্রখর বুদ্ধির সাহায্যে সে-সব আলোচনা ও খণ্ডন করিয়াছেন। দায়ভাগের টীকাকার অনেক ; রঘুনন্দন বারবার তাঁহার গ্রন্থে দায়ভাগের যুক্তি ও মতামত গ্রহণ করিয়াছেন। সন্দেহ নাই, দায়ভাগ সমসাময়িক কালেই যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। বাঙলাদেশে তো আজও দায়ভাগ আলোচ্য বিষয়ে একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। জীমূতবাহন যে অদ্ভুত মনীষা ও পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তি

ছিলেন, সুকুশলী নৈয়ায়িক ছিলেন, প্রখর ছিল তাঁহার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব এ-তথ্য অনস্বীকার্য।

অনিরুদ্ধ

ধর্মাধ্যক্ষ বা ধর্মাধিকরণিক, বরেন্দ্রান্তর্গত চম্পাহট্টীয় মহামহোপাধ্যায় অনিরুদ্ধ, এবং বরেন্দ্রীবাসী বল্লাল-গুরু, বেদ, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রবিদ্‌ অনিরুদ্ধ একই ব্যক্তি, সন্দেহ নাই। বল্লালসেন ইঁহারই নিকট পুরাণ ও স্মৃতিশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং দানসাগর-গ্রন্থে ইঁহারই সশ্রদ্ধ উল্লেখ বর্তমান। অনিরুদ্ধের হারলতা এবং পিতৃদয়িত উভয়ই সুবিখ্যাত গ্রন্থ। অনিরুদ্ধ বাস করিতেন গঙ্গাতীরে বিহার-পাটকে। কুমারিল-ভট্টের মীমাংসা সম্বন্ধীয় মতামতের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। হারলতা অশৌচ-সংক্রান্ত নানা বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা। পিতৃদয়িত সামবেদী গোভিল-পন্থীদের শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে নানা ক্রিয়াকর্মের বর্ণনা বিধান। আচমন, দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যা, পিতৃতর্পণ, বৈশ্বদেবতর্পণ, পার্বণশ্রাদ্ধ, দানস্তুতি প্রভৃতি কিছুই বাদ পড়ে নাই। রঘুনন্দন এই দুই গ্রন্থেরই বিস্তৃত ব্যবহার করিয়াছেন।

বল্লালসেন

অনিরুদ্ধ-শিষ্য সেন-রাজ বল্লালসেন অন্তত চারখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর এবং অদ্ভুতসাগর। দানসাগরে প্রথম দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে; আচারসাগরের কিছু কিছু উদ্ধৃতি আছে বেদাচার্যের স্মৃতিরত্নাকর এবং বিশ্বেশ্বর-ভট্টের মদনপারিজাত গ্রন্থদ্বয়ে। কিন্তু আচারসাগর ও প্রতিষ্ঠাসাগর গ্রন্থ আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই। দানসাগর রচিত হইয়াছিল গুরু অনিরুদ্ধের শিক্ষার অনুপ্রেরণায়, এ-কথা বল্লালসেন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু রঘুনন্দন বলিতেছেন, গ্রন্থটি অনিরুদ্ধ-ভট্টের নিজের রচনা। গ্রন্থটিতে ৭০টি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের দান, দানপুণ্য, দানের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা, স্থান-কাল-পাত্র, কুদান, নিষিদ্ধদান, দানকরণ এবং দানগ্রহণের রীতি, ক্রম ও পদ্ধতি, ষোড়শ মহাদান, অসংখ্য ক্ষুদ্র দান প্রভৃতি সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা আছে। এ-বিষয়ে অন্যান্য নানা গ্রন্থ এবং সাধারণ সমস্ত পুরাণের উল্লেখও আছে। অদ্ভুতসাগর নানা শুভাশুভলক্ষণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ; তিনটি ভাগে গ্রহতারা, রামধনু, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়, ভূমিকম্প অর্থাৎ আকাশী, বায়বীয় এবং ভৌতিক নানা ইঙ্গিত ও লক্ষণের আলোচনা। অদ্ভুতসাগর বল্লালসেন সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি সমাপন করিয়াছিলেন পুত্র লক্ষ্মণসেন পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাক্রমে। গ্রন্থটির রচনা আরম্ভ হইয়াছিল ১০৮৯শকে (১১৬৮ খ্রীষ্ট বৎসরে)।

গুণবিষ্ণু

দামুক-পুত্র গুণবিষ্ণু হয় বাঙালী ছিলেন, না হয় মৈথিলী। হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণ-সর্বস্বগ্রন্থে গুণবিষ্ণুর ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য-গ্রন্থ প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন ; কাজেই গুণবিষ্ণু হলায়ুধের পূর্বগামী। ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য সামবেদীয় গৃহ্যসূত্রের প্রায় ৪০০ মন্ত্রের সুবিস্তৃত টীকা। আটটি ভাগে গুণবিষ্ণু গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া সমাবর্তন, বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত প্রধান প্রধান সংস্কারগুলির আলোচনা করিয়াছেন ; স্নান, সন্ধ্যা, পিতৃতর্পণ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতির আলোচনাও আছে ; তাহা ছাড়া পুরুষসূক্তের একটি টীকাও আছে। গুণবিষ্ণু ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণ বা মন্ত্রব্রাহ্মণ-গ্রন্থের একটি টীকা এবং পারস্কর-গৃহ্যসূত্রের একটি টীকাও রচনা করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতকে সায়নাচার্য গুণবিষ্ণুর নাম করেন নাই, কিন্তু ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্য হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি গ্রহণ করিয়াছেন।

হলায়ুধ

প্রথম যৌবনে রাজপণ্ডিত, পরিণত যৌবনে লক্ষ্মণসেনের মহামাত্য, এবং প্রৌঢ়বয়সে লক্ষ্মণসেনেরই ধর্মাধ্যক্ষ বা ধর্মাধিকারী, আবস্থিক, মহাধর্মাধ্যক্ষ (বা মহাধর্মাধিকৃত বা ধর্মাগারাধিকারী) হলায়ুধও ছিলেন এ-যুগের অন্যতম যুগন্ধর পণ্ডিত এবং প্রভাবশালী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। তাঁহার পিতা ধনঞ্জয় ছিলেন বৎস-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, মাতা উজ্জ্বলা। ধনঞ্জয় ছিলেন ধর্মাধ্যক্ষ। হলায়ুধের দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ঈশান ও পশুপতি ; ঈশান আহ্নিক-পদ্ধতি নামে একটি গ্রন্থ এবং পশুপতি শ্রাদ্ধপদ্ধতি ও পাকযজ্ঞ নামে দুইখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঈশান এবং পশুপতির তিনটি গ্রন্থই বিলুপ্ত ; তবে জনৈক রাজপণ্ডিত পশুপতি-রচিত শুক্লযজুর্বেদীয় কাণ্বশাখানুসারী গৃহ্যানুষ্ঠানাদি সম্পর্কিত দশকর্মপদ্ধতি নামে একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান। ধনঞ্জয়পুত্র পশুপতি এবং রাজপণ্ডিত পশুপতি এক এবং অভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়।

ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব এবং পণ্ডিতসর্বস্ব নামে অন্তত পাঁচখানা গ্রন্থ হলায়ুধ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণসর্বস্ব ছাড়া আর বাকী চারিটি গ্রন্থই বিলুপ্ত। শেষোক্ত দু'টি গ্রন্থের উল্লেখ ও কিছু আলোচনা রঘুনন্দন করিয়াছেন। হলায়ুধ নিজেই বলিতেছেন, রাঢ় এবং বরেন্দ্রের ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ করিতেন না, এবং সেই হেতু বৈদিক ক্রিয়াকর্মের যথাযথ নিয়মও জানিতেন না। সেইজন্যই তিনি ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, প্রধানত শুক্ল-যজুর্বেদীয় কাণ্ব-শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদের নিত্যকর্ম ও গৃহ্যসূত্রীয় সংস্কারাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য। বৈদিক মন্ত্রভাষ্য রচনাই এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এবং মন্ত্রগুলি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া হলায়ুধ প্রাতকৃত্য, পূজা, অতিথিসেবা, বেদপাঠ, পিতৃতর্পণ, দশসংস্কারাচার প্রভৃতি সমস্তই আলোচনা করিয়াছেন। এই কাজে কাত্যায়নের ছান্দোগ্যপরিশিষ্ট এবং পারস্করের

গৃহ্যসূত্র তিনি প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, এবং প্রকাশ্যে ঋণ স্বীকার করিয়াছেন উবট এবং গুণবিষ্ণুর।

পুরুষোত্তম দেব। পুরুষোত্তম

আগেই বলিয়াছি, এই পর্বে গভীর মননের কোনো নিদর্শন বাঙলাদেশে নাই, সেই হেতু দর্শনগ্রন্থ রচনার চেষ্টাও নাই। তবে ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থ রচনার কিছুটা চেষ্টা হইয়াছিল, এবং রচয়িতাদের মধ্যে আর কেহ বাঙালী হউন বা না হউন, এক আর্তিহরপুত্র বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দই সকলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কথা বলিবার আগে বৈয়াকরণিক পুরুষোত্তমদেব এবং কোষকার পুরুষোত্তম সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিতেই হয়। এই দুই পুরুষোত্তম এক এবং অভিন্ন কিনা, নিঃসংশয়ে কিছু বলা কঠিন। ইঁহাদের দুইজনই বৌদ্ধ ছিলেন, নাম ছিল এক, এবং সমসাময়িককালে জীবিত ছিলেন, শুধু এই সব কারণে দুইজনকে এক এবং অভিন্ন বলা চলে কিনা সন্দেহ। সপ্তদশ শতকে সৃষ্টিধর নামে জনৈক বৈয়াকরণিক পুরুষোত্তমদেব-রচিত ভাষাবৃত্তি-গ্রন্থের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই টীকায় সৃষ্টিধর বলিতেছেন, পুরুষোত্তমদেব রাজা লক্ষ্মণসেনের নির্দেশে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই নির্দেশে ও অনুরোধে পুরুষোত্তম তাঁহার গ্রন্থে বৈদিক ব্যাকরণ আলোচনা করেন নাই। বেদানুরক্ত, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক লক্ষ্মণসেন কেন যে বৈদিক ব্যাকরণসূত্রগুলি বাদ দিতে বলিবেন, তাহা বুঝা কঠিন। তাহা ছাড়া, বৌদ্ধ পুরুষোত্তম বৈদিক ব্যাকরণ বাদ দিতে গিয়া বৌদ্ধরীতির অনুসরণ করিয়াছেন; বৌদ্ধেরা তো এমনিতেই বৈদিক ব্যাকরণের সূত্র মানিতেন না; তাহার জন্য লক্ষ্মসেনের অনুরোধের প্রয়োজন হইবে কেন? ১১৫৯ খ্রীষ্ট বৎসরে সর্বানন্দ পুরুষোত্তমের ভাষাবৃত্তির উল্লেখ যদি করিয়াই থাকেন, তবু সন্দেহ থাকিয়াই যায়; কারণ, প্রথমত উল্লেখটাই নির্ভরযোগ্য নয়; দ্বিতীয়ত ১১৫৯-এ লক্ষ্মণসেন হয়তো সিংহাসনেই আরোহণ করেন নাই। কাজেই লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে তথা বাংলাদেশের সঙ্গে পুরুষোত্তমের সম্বন্ধ সন্দেহাতীত নয়। পুরুষোত্তমদেব যে একাদশ বা দ্বাদশ শতকের লোক তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

কোষকার পুরুষোত্তমের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ত্রিকাণ্ডশেষ বিখ্যাত অমরকোষের সম্পূরক; অমর যাহা বাদ দিয়া গিয়াছেন পুরুষোত্তম তাহাই পূরণ করিয়াছেন। তিনি আরও অন্তত তিন খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—হারাবলি, বর্ণদেশনা ও দ্বিরূপকোষ। হারাবলি ২৭৮টি শ্লোকে সাধারণত অব্যবহৃত প্রতিশব্দ ও সমশব্দের সংগ্রহ। বর্ণদেশনা গদ্যে রচনা; যে-সব শব্দের বানানের রূপ নানা প্রকারের সেই সব শব্দের আলোচনা এই গ্রন্থে আছে, বিশেষভাবে গৌড়ীয় লিপিরূপের জন্য যে-সব বানানে নানা রকমের গোলমাল সেই সব শব্দের উল্লেখ ও আলোচনা আছে। দ্বিরূপকোষে ৭৫টি শ্লোকে এমন সব শব্দের একটি তালিকা আছে যাহাদের বানানের দুইটি রূপ।

একাদশ শতকের শেষভাগে বৈয়াকরণিক ক্ষীরস্বামী তাঁহার অমরকোষের টীকায় অনেকবারই জনৈক গৌড়ীয় বৈয়াকরণিকের উল্লেখ করিয়াছেন ; কয়েকবার গৌড়ীয় বৈয়াকরণিক এক গোষ্ঠীর উল্লেখও যেন করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈয়াকরণিকটি যে কে, কিংবা গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরাই বা কাহারা, কিছুই বলিবার উপায় নাই।

সর্বানন্দ

আর্তিহর-পুত্র বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের প্রতিষ্ঠার নির্ভর টীকাসর্বস্ব নামক অমরকোষের টীকার উপর। এই গ্রন্থ বাঙলার গৌরব, এবং সুপ্রচুর বাঙলা দেশি শব্দের সর্বপ্রাচীন সংগ্রহ। বৃহস্পতি রায়মুকুটের পদচন্দ্রিকা (১৪৩১ খ্রীষ্ট বৎসর) নামক অমরকোষের টীকায় টীকাসর্বস্ব হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি আছে। কিন্তু এ-পর্যন্ত টীকাসর্বস্বের একটি পাণ্ডু-লিপিও বাঙলাদেশে পাওয়া যায় নাই, পাওয়া গিয়াছে দক্ষিণ ভারতে। সর্বানন্দ নিজেই বলিতেছেন, ১০৮ শকাব্দে ১১৫৯-৬০ খ্রীষ্ট শতকে তাঁহার গ্রন্থ-রচনা চলিতেছিল।

লক্ষ্যণীয় এই, এই পর্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনা একান্ত ভাবেই শিক্ষিত উচ্চ বর্ণস্তরে আবদ্ধ। ধর্মশাস্ত্রগুলির দৃষ্টি-পরিধির মধ্যে তো দ্বিজবর্ণ ছাড়া আর কাহারও স্থানই নাই। ব্যাকরণ এবং কোষগ্রন্থগুলিতে মোটামুটি ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-দীক্ষারই প্রতিফলন। এই শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যবস্থা, পাঠক্রম, রীতিপদ্ধতি এই পর্বে কিরূপ ছিল তাহা বলিবার মত উপাদান আমাদের নাই। বৌদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার যে পার্থক্য তাহা তো ছিলই ; অর্থাৎ বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার কেন্দ্র ছিল বৌদ্ধ সংঘ ও বিহার এবং সেখানে শিক্ষাটা হইতে সংঘবদ্ধ ভাবে। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ছিল একক ও ব্যক্তিক এবং সে-শিক্ষার কেন্দ্র ছিল গুরুগৃহ। সেই গৃহে দ্বিজবর্ণ এবং উচ্চতর বর্ণস্তরের শিক্ষার্থী ছাড়া আর কাহারও স্থান ছিল না। তাহা ছাড়া, এই পর্বের গুরুগৃহে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিষয়ও ছিল সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। লিপি-প্রমাণ ও সমসাময়িক সাহিত্যে যে সব বিষয়ের উল্লেখ পাইতেছি তাহা মীমাংসা, স্মৃতি, গৃহ্যসূত্র, ব্যাকরণ ও ফলসংহিতা-জ্যোতিষেই যেন সীমাবদ্ধ। যে-ন্যায়শাস্ত্রে বাঙলা দেশের প্রতিষ্ঠা তাহাও এই পর্বে পড়িয়া ওঠে নাই। শস্ত্রবেদ, আয়ুর্বেদ, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখও কোথাও দেখিতেছি না। দর্শন-শাস্ত্রের গভীর গহনে আত্মস্থ হইবার সাহস তো নাইই। এই সব কারণেই বোধ হয় সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টি-পরিধিই সংকীর্ণ হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল ; সৃষ্টির প্রেরণাও ছিল দুর্বল। সমস্ত মনন যেন শুধু টীকা ও টিপ্পনীর বন্ধ্যা বন্ধনে শৃঙ্খলিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই অবস্থায় শিক্ষিত উচ্চ বর্ণস্তরের চিত্ত মুক্তি পাইতে চায় কবি-কল্পনার অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততর ক্ষেত্রে। এই পর্বের শিক্ষিত সমাজে

তাহাই হইয়াছিল, এবং তাহা প্রধানত রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়া। সেন-রাজারা সকলেই, বিশেষভাবে বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেন পরম বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, নিজেরা কবি ছিলেন এবং কবিজনের সমাদরও করিতেন। কবি ধোয়ী লক্ষ্মণসেনকে বলিয়াছেন বাঙলার বিক্রমাদিত্য। তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিতেন অন্তত পাঁচজন সৃষ্টিধর কবি—গোবর্ধন বা গোবর্ধনাচার্য, শরণ, জয়দেব, উমাপতি-ধর এবং কবিরাজ। কবিরাজ বোধ হয় বলা হইত ধোয়ী কবিকে, কারণ জয়দেব ধোয়ীকেই বলিয়াছেন কবি ক্ষমাপতি এবং ধোয়ী নিজেও তাঁহার পবনদূত কাব্যে নিজেকে ঐ বিশেষণে বিশেষিত এবং কবিরাজ আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। এই পাঁচজন ছাড়াও সমসাময়িক কাব্য সংকলনগ্রন্থ সদুক্তিকর্ণামৃতে আরও অনেক বাঙালী কবির সংবাদ এবং তাঁহাদের কাব্য-নিদর্শন পাওয়া যায়। বস্তুত, সংস্কৃত গীতিকাব্যে এই পর্বের বাঙালী কবিদের দান শুধু সংখ্যা-সমৃদ্ধিতেই উল্লেখযোগ্য নয়, কাব্যসমৃদ্ধিতেও গৌরবের দাবি রাখে। তবু, স্বীকার করিতেই হয়, এ-পর্বের সমস্ত কাব্যই, এমন কি গীতগোবিন্দও ক্ষীণাত্মা ও অল্পপ্রাণ; ইহাদের সহজ সৌন্দর্য আছে, ভাবের ও দৃষ্টির গভীরতা নাই। যে কবি-কল্পনার পশ্চাতে সবল ও গভীর মননের প্রেরণা নাই, বিস্তৃত জীবনের সাধনা নাই তাহার প্রকৃতি সর্বদেশে সর্বকালেই এইরূপ।

সদ্যোক্ত কবিদের কথা বলিবার আগে নৈষধচরিত-রচয়িতা শ্রীহর্ষ, বেণীসংহার-রচয়িতা ভট্ট-নারায়ণ এবং অনর্ঘরাঘব রচয়িতা মুরারী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া লইতে হয়।

শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত

নৈষধচরিত-কাব্য রচয়িতা শ্রীহর্ষ বাঙালী কিনা এই লইয়া পণ্ডিত মহলে প্রচুর বিতণ্ডা বিদ্যমান। বাঙালী কুলপঞ্জিকাকারদের মতে শ্রীহর্ষের পিতার নাম মেধাতিথি বা তিথিমেধা, কিন্তু যথার্থত তাঁহার পিতা ছিলেন শ্রীহীর এবং মাতা ছিলেন মামল্লদেবী। নৈষধ-চরিতের সপ্তম সর্গের ১১০ সংখ্যক শ্লোকে জানা যায়, শ্রীহর্ষ অনুল্লিখিত নাম জনৈক গৌড়রাজ সম্বন্ধে একটি প্রশস্তি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, ষোড়শ সর্গের ১৩১ সংখ্যক শ্লোকে দেখিতেছি, তাঁহার প্রতিভার সমাদর করিয়াছিলেন কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা; আবার দ্বাবিংশতম সর্গের ২৬ সংখ্যক শ্লোকে জানা যাইতেছে, কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন তাঁহার পৃষ্ঠপোষক। নৈষধ-চরিতের একজন অর্বাচীন টীকাকার বাঙালী গোপীনাথ আচার্য তাহার হর্ষহৃদয় নামীয় টীকায় বলিতেছেন, শ্রীহর্ষের উল্লিখিত বিজয়প্রশস্তি-কাব্যটি সেন-রাজ বিজয়সেন সম্বন্ধে। তেমনই আবার অন্যদিকে চাণ্ডুপণ্ডিত ও অন্যান্য টীকা-কারেরা এবং রাজশেখর সূরি তাঁহার প্রবন্ধচিন্তামণি-গ্রন্থে বলিতেছেন, যে-কান্যকুব্জরাজ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁহার নাম জয়চন্দ্র। জয়চন্দ্র যাঁহার পৃষ্ঠপোষক কিংবা

কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা যাঁহার অনুরক্ত, বিজয়সেন সম্বন্ধে প্রশস্তি রচনায় তাঁহার কোনো বাধা থাকিবার কথা নয়। ইতিহাসগত বাধাও কিছু নাই। কাব্যটি আগাগোড়া গৌড়ী-রীতিতে রচিত ; সর্বত্র অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি ; শ-য-স হইয়া ধ্বনিসাম্য-অর্থবৈষম্যের খেলা, বাঙালী-সুলভ দন্ত্য 'ন' এবং মূর্ধা 'ণ', বর্গীয় 'ব' এবং অন্তঃস্থ 'ব', বর্গীয় 'জ' এবং অন্ত্যস্থ 'য' প্রভৃতির একই মূল্য দান সামাজিক বিবাহ-ভোজে ভাত এবং মাছ খাওয়া ; ব্যঞ্জনে দই ও সরিষার ব্যবহার ; দুগ্ধপক্ক বটক (বা বড়া পিঠে) খাওয়া, ভোজে বসিয়া বরযাত্রীদের ব্যবহারের নানা খুঁটিনাটি, বিবাহে উলুলু ধ্বনি, শঙ্খবলয় ও সীমন্তে সিঁদুর ব্যবহার, মঙ্গলানুষ্ঠানে আলপনা আঁকা, বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলগীত গাওয়া, দরজার দুই ধারে কদলী বৃক্ষরোপণ, বিবাহে গাঁটছড়া বাঁধা, বিবাহ সংক্রান্ত নানা স্ত্রী-আচার, বাসরঘরে চুরি করিয়া দেখা বা আড়ি পাতিয়া শোনা, প্রভৃতি তথ্য একত্র করিলে শ্রীহর্ষকে বাঙালী বলিয়াই তো মনে হয়। টীকাকারেরা সকলেই তাঁহাকে গৌড়ীয় অর্থাৎ বাঙালী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু বাঙালী হইলেও তাহার নৈষধ-চরিত কাব্য লইয়া গর্ব করিবার কিছু নাই। শ্রীহর্ষ দাবি করিয়াছেন 'কবিকুলের অজ্ঞাত অদৃষ্ট পথের তিনি পথিক !' এত বড় দাবি এ-কাব্য সম্বন্ধে করা চলে না। মহাভারতের নল-দময়ন্তীর মধুর কাহিনীটির একাংশ মাত্র নানা অবান্তর বর্ণনায় অলংকৃত করিয়া বাইশটি সুদীর্ঘ সর্গে এমন একটি জটিল মহাকাব্য তিনি রচনা করিয়াছেন যাহা ছন্দ, অলঙ্কার এবং পাণ্ডিত্যের গুরুভারে ভারাক্রান্ত, কিন্তু যথার্থ কাব্যমূল্যে দরিদ্র ও দুর্বল। কোনো সূক্ষ্ম উচ্চস্তরের কম্পনা বা গভীর জীবনদর্শন এই কাব্যকে মহিমান্বিত করে নাই। তবু, কেন যে নৈষধচরিত প্রাচীন ভারতের পাঁচটি মহাকাব্যের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহা বলা কঠিন।

নৈষধ-চরিত ছাড়া শ্রীহর্ষ আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহার উল্লেখ নৈষধ-চরিতেই আছে : নবসাহসাঙ্ক-চরিত, স্থৈর্যবিচার-প্রকরণ, অর্ণব-বর্ণনা, শিবশক্তিসিদ্ধ, ছিন্দ-প্রশস্তি ও শ্রীবিজয়-প্রশস্তি। খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য নামে দর্শনের উপরও তিনি একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

বাঙালীর ঐতিহ্য বেণীসংহার-রচয়িতা শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্ট-নারায়ণকেও বাঙালী বলিয়া দাবি করে ; আদিশূর-প্রবর্তিত এবং কনৌজাগত পঞ্চব্রাহ্মণের তিনি নাকি অন্যতম। এ-তথ্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন ; অন্তত ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু নাই। মৌদ্‌গল্য-গোত্রীয় বর্ধমানাঙ্কপুত্র, অনর্ঘরাঘব-রচয়িতা মুরারী-মিশ্রকেও অনেকে বাঙালী বলিয়া মনে করেন; টীকাকার প্রেমচন্দ্র-তর্কবাগীশ তো তাহাই বলিতেছেন। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে উৎসবাভিনয়ের জন্য অনর্ঘরাঘব রচিত হইয়াছিল।

একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের বাঙলাদেশে নাট্য-রচনার যথেষ্ট প্রাচুর্য ছিল বলিয়া মনে হয়। এবং ইহাদের অধিকাংশই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ প্রভৃতির কাহিনী লইয়া

রচিত হইয়াছিল। ১৪৩১ খ্রীষ্ট বৎসরের আগে সাগরনন্দী-রচিত ("মুকুটেশ্বর নন্দিবংশ ব্যোমাঙ্গনৈকশশী") নাটকলক্ষণরত্নকোষ-গ্রন্থে বহু বাঙালী নাট্যকারের নাট্যরচনার উল্লেখ আছে। কয়েকটি নাম উল্লেখ করিতেছি: কীচকভীম, প্রতিজ্ঞাভীম, শর্মিষ্ঠা-পরিণয়, রাধা, সত্যভামা, কেলি-রৈবতক, ঊষাহরণ, দেবী-মহাদেব, উর্বশী-মর্দন, নলবিজয়, মায়া-মদালসা, উন্মত্ত চন্দ্রগুপ্ত, মায়া-কাপালিক, মায়া-শকুন্ত, মদনিকা-কামুক, জানকী-রাঘব, রামানন্দ, কেকয়ী-ভরত, অযোধ্যা-ভরত, বালিবধ, রামবিক্রম, মারীচ-বঞ্চিতক, ইত্যাদি।

সমসাময়িক বাঙলাদেশের কবিমনের সম্পূর্ণ পরিচয় নৈষধ-চরিতে নাই, এমন কি ধোয়ীকবি-রচিত পবনদূতেও নয়। প্রাচীনতম বাঙলায় বা শৌরসেনী অপভ্রংশের স্থানীয় রূপে যে স্বল্প কবিতা ও গান এই দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেও সে-পরিচয় পাইবার কথা নয়; কারণ এই সব কবিতা ও গান রচিত হইয়াছিল ধর্মের প্রেরণায়, কাব্যের প্রেরণায় নয়। তাহা ছাড়া, রচয়িতারা সকলেই কিছু শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান লোক ছিলেন না; মন ও বুদ্ধি শিক্ষাশাসন দ্বারা যথেষ্ট মার্জিত ছিল না, চিত্ত ছিল না কল্পনায় উজ্জ্বল। সেই জন্য কল্পনোজ্জ্বল শিক্ষিত মনের পরিচয় শৌরসেনী অপভ্রংশ বা প্রাচীনতম বাঙলা পদগুলিতে বড় একটা পাওয়া যায় না; তাহা পাওয়া যায় বাঙলার কবিদের সংস্কৃত ভাষায় কাব্য-রচনার মধ্যে, এবং বিশেষভাবে যে-কাব্য রচিত হইয়াছিল রাজসভার আলোকমালার আড়ালে।

কাব্য ও কবিতা

ব্রাহ্মণ্য পণ্ডিত-সমাজের বাহিরেও কাব্য-সাহিত্যের রসিক একটি শ্রেণী ছিল, এবং পুরা একখানা কাব্য বা প্রকীর্ণ শ্লোক যে সংস্কৃতে রচিত হইত তাহা শুধু পণ্ডিত-সমাজের জন্যই নয়, বরং এই বৃহত্তর রসিক শ্রেণীটিকে উদ্দেশ্য করিয়াই। প্রধানত এই শিক্ষিত রসিক শ্রেণীটির জন্যই বোধ হয় বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম সরস শ্লোক-সংগ্রহ বা কবিতা-চয়নিকা সঙ্কলন করিবার একটা সজাগ প্রয়াস দেখা দেয়। অন্তত, সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে কয়েকটি কবিতা-সংগ্রহ সুপরিচিত তাহার মধ্যে সর্বপ্রাচীন দু'টি সংগ্রহই বাঙলাদেশে বাঙালী সংকলন-কর্তাদ্বারা সংকলিত ও সম্পাদিত; সে দু'টি কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয় এবং সদুক্তিকর্ণামৃত। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের কথা আগের পর্বেই বলিয়াছি; বই-খানা বোধ হয় একাদশ শতকের শেষ পর্বের সঙ্কলন।

সদুক্তিকর্ণামৃত

সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থখানা সঙ্কলিত হয় ১২০৬ খ্রীষ্ট বৎসরে (১২২৭ শকাব্দ), বোধ হয়, কেশবসেনের রাজত্বকালে। গ্রন্থের পুষ্পিকা-শ্লোকে যেন কেশবসেনের নামোল্লেখ

আছে। সঙ্কলয়িতা শ্রীধরদাসের পিতা শ্রীবটুদাস লক্ষ্মণসেনের প্রতিরাজ বা লেখক এবং অন্যতম মহাসামন্ত ছিলেন। বটুদাস লক্ষ্মণসেনের 'অনুপম প্রেমের একমাত্র পাত্র' এবং 'সখা' ছিলেন। শ্রীধরদাস নিজে কবি ছিলেন কিনা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু তাঁহার সঙ্কলিত শ্লোক-সংগ্রহ এবং শ্রেণীবিভাগ বিশ্লেষণ করিলে এ-তথ্য অস্বীকার করা যায় না যে, তিনি একজন বিদগ্ধ কাব্যরসিক ও সাহিত্যবোদ্ধা ছিলেন। এই গ্রন্থ পাঁচটি প্রবাহ বা অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক প্রবাহে কয়েকটি করিয়া 'বীচি' বা তরঙ্গ বা শ্রেণী, এবং প্রত্যেক বীচিতে পাঁচটি করিয়া শ্লোক। প্রত্যেক শ্লোকের শেষে সংকলয়িতার নাম দেওয়া আছে; যে-সব ক্ষেত্রে নাম শ্রীধরদাসের অজ্ঞাত ছিল সে-সব ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে 'কস্যচিৎ'। প্রথম প্রবাহে ৯৫টি বীচিতে নানা দেবতার লীলাবিষয়ক ৪৭৫টি শ্লোক; দ্বিতীয় শৃঙ্গার প্রবাহে ১৭৯টি বীচির ৮৯৫টি শ্লোকে প্রেম, নায়ক-নায়িকা, প্রেমের নানা ভাব ও অবস্থা, বিভিন্ন ঋতু ও প্রকৃতির নানা অবস্থার সরস বর্ণনা; তৃতীয় চাটু প্রবাহে ৫৪টি বীচির ২৭০টি শ্লোকে রাজার স্তুতি, বীরের বীর্য, যুদ্ধ, সেনা, শত্রু, তূর্য-ধ্বনি, কীর্তি ইত্যাদির বর্ণনা বা প্রশংসা; চতুর্থ অপদেশ প্রবাহে ৭২টি বীচির ৩৬০টি শ্লোকে দেবতাদের দোষগুণ, পার্থিব সংসার, গাছলতাপাতা, পশুপক্ষী ইত্যাদির বর্ণনা; এবং পঞ্চম উচ্চাবচ প্রবাহে ৭৪টি বীচির ৩৭০টি শ্লোকে গরু, ঘোড়া, মানুষ, পাখী, দেশ, কবি, স্থান, গুণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে নানা বর্ণনার ছড়াছড়ি। গ্রন্থটিতে সর্বসুদ্ধ ৪৮৫ জন বিভিন্ন কবির রচনার নমুনা আছে; ইহাদের মধ্যে পাণিনি, ভাস, ভারবি, কালিদাস, ভামহ, অমরু, বাণভট্ট, বিহ্লন, ভর্তৃহরি, মুঞ্জ, রাজশেখর, বাক্‌-পতিরাজ, বিশাখদত্ত প্রভৃতি সর্বভারতীয় কবির রচনা যেমন আছে, তেমনই আছে অসংখ্য বাঙালী কবির রচনা। বস্তুত, কবিদের নামের রূপ দেখিয়া মনে হয়, অর্ধেকেরও উপর বোধ হয় শ্রীধর দাসের সমসাময়িক অথবা কিছু আগেকার গৌড়-বঙ্গীয় কবিকুলের রচনা। সুকুমার সেন মহাশয় এই বাঙালী কবিকুলের সুদীর্ঘ নাম-তালিকা চয়ন করিয়াছেন।

সমসাময়িক বাংলাদেশের সাহিত্যিক আবহাওয়ার চমৎকার নিদর্শন এই গৌড়-বঙ্গীয় কবিদের প্রকীর্ণ শ্লোকগুলি। এই আবহাওয়া রাজসভায় রচিত স্তুতি-প্রশস্তিতে বা কাব্যে নাই। জয়দেব যে যুদ্ধ ও বীররসের কবিতা এবং মহাদেবের বন্দনা শ্লোক রচনা করিতেন, গীতগোবিন্দে সে-পরিচয় পাইবার সুযোগ নাই, অথচ সদুক্তিকর্ণামৃতে সে-পরিচয় পাইতেছি। সে-রাজসভায় যে নানা সমস্যাপূরণ লইয়া শ্লোক-রচনার প্রতি-যোগিতা খেলা চলিত এ-ইঙ্গিতও পাইতেছি এই গ্রন্থের কিছু প্রকীর্ণ শ্লোকে, এবং এই সব শ্লোকাশ্রয়েই জানিতেছি যে, লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন, শরণ ও জয়দেব পাল্লা দিয়া রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করিতেন। জয়দেব-রচিত মহাদেব স্তুতি-বিষয়ক শ্লোকটি দেখিয়া মনে হয়, তিনি শুধু রাধাকৃষ্ণের লাস্যলীলার কবি ছিলেন না, এমন কি আমাদের প্রচলিত ধারণায় বৈষ্ণব সাধক-মহাজনও ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিদ্যাপতির মত

পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ, এবং তাঁহার জীবনে যুদ্ধ ও বীররসের স্পর্শও লাগিয়াছিল। কবি শরণ বা উমাপতি-ধরও শুধু বিজয়সেন ও লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তি ও স্তুতিশ্লোক লিখিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করেন নাই; রাজসভার বাহিরে বসিয়া লোকায়ত জীবনের নানা প্রকীর্ণ শ্লোকও রচনা করিয়া ছিলেন। এই গ্রন্থে লক্ষ্মণসেনের ১১টি, কেশবসেনের ১০টি এবং হলায়ুধেরও ৫টি শ্লোক আছে।

সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্থের নানা শ্লোক এই গ্রন্থের নানা অধ্যায়ে নানা প্রসঙ্গে উদ্ধার ও ব্যবহার করিয়াছি। এই শ্লোকগুলি নানা দিক দিয়া সমসাময়িক বাংলাদেশের নানা পরিচয় বহন করে; তাহা ছাড়া, সমসাময়িক সাহিত্যিক আবহাওয়ার স্পর্শও ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। ভবিষ্যত বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির কিছু কিছু আভাসও ইহাদের গর্ভেই নিহত। একটি অজ্ঞাতনামা কবি (খুব সম্ভব বাঙালী) বিবাহকালে গৌরির বর্ণনা দিতেছেন—

ব্রহ্মায়ং—বিষ্ণুরেষ—ত্রিদশপতিরসৌ—লোকপালাস্তথৈতে,
জামাতা কোঽত্র ? যোঽসৌ ভুজগপরিবৃতোভস্মরূক্ষ কপালী।
হা বৎসে ! বঞ্চিতাসীত্যনভিমতবর প্রার্থনাব্রীড়িতাভির্
দেবীভিঃ শোচ্যমানাপ্যুপচিতপুলকা শ্রেয়সে যেঽস্তু গৌরী ॥

এই শ্লোকটিতে পার্বতীর বিবাহের যে-বর্ণনা এবং শিবের প্রতি যে মনোভাব তাহারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে, বিশেষ ভাবে ভারতচন্দ্রে। কয়েকটি শ্লোকে দরিদ্র শিবের গৃহস্থালী বর্ণনা, শিশু কার্তিকেয়ের বেশভূষায় শিবের অনুকরণ, শিবের জটাজুট লইয়া খেলার বর্ণনা প্রভৃতি পড়িতে পড়িতে স্বতই মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের অনুরূপ ছবিগুলি মনে পড়িয়া যায়। এই শ্লোকগুলি তো বাঙ্গালী কবিদেরই রচনা বলিয়া মনে হইতেছে; ভাবাত্মীয়তা একান্তই ঘনিষ্ঠ। কবি কুলশেখরের চারিটি হরিভক্তি সম্বন্ধীয় শ্লোকে এবং অজ্ঞাতনামা কোনো কবির একটি শ্লোকে চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণবের হৃদয়ধ্বনি যেন কানে আসিয়া প্রবেশ করে। সন্দেহ নাই, এই শ্লোক গুলির মধ্যে হরিভক্তির পূর্বাভাস দেখা যাইতেছে; সে যে আসে, আসে, আসে। এই গ্রন্থে জয়দেবের ৩১ শ্লোক আছে; তন্মধ্যে ৫টি মাত্র গীতগোবিন্দের শ্লোক, কয়েকটি আছে প্রকীর্ণ শ্লোক, দু'একটি লক্ষ্মণসেনের স্তুতি-শ্লোক, বাকী সবগুলিই যুদ্ধ, শৌর্য-বীর্য, তুর্যনিনাদ, সংগ্রাম, কীর্তি প্রভৃতি সম্বন্ধীয়। সন্দেহ হয়, জয়দেব বীররসেরও একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এবং এই শ্লোকগুলি সেই কাব্যের; কিন্তু সে-কাব্য আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই। লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তিমূলক শ্লোকটি এইরূপ :

লক্ষ্মীকেলি-ভুজঙ্গ! জঙ্গমহরে! সংকল্প কল্পদ্রুম!
শ্রেয়ঃ সাধকসঙ্গ! সঙ্গরকলা-গাঙ্গেয়! বঙ্গপ্রিয়!

গৌড়েন্দ্র ! প্রতিরাজরাজক ! সভালংকার ! কারার্পিত—
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল ! পালক সতাং ! দৃষ্টোঽসি, তুষ্টা বয়ম !!

বোধ হয় এই শ্লোকটি কণ্ঠে লইয়াই জয়দেব কেন্দুবিল্ব হইতে নবদ্বীপে আসিয়া লক্ষ্মণ সেনের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন ! শৃঙ্গার-প্রবাহে উমাপতি-ধরের একটি সুন্দর কাব্যময় শ্লোক আছে ; বনবিহার-কালে একটি সুন্দরী নারী পায়ের আঙুলে ভর দিঃ। দাঁড়াইয়া উপরে গাছের ডাল হইতে ফুল পাড়িতেছেন, বাহুমূল উর্ধ্বে উত্তোলিত, উর্ধ্বপ্রয়াসে স্তন ঈষদোন্মুক্ত, বসন ঈষদ্‌ব্যায়ত হইয়া পড়ায় নাভিহ্রদ দেখা যাইতেছে—

দূরোদঞ্চিত বাহুমূলবিলসচ্চীন প্রকাশস্তনা
ভোগব্যায়ত মধ্যলম্বিবসনানির্মুক্তনাভিহ্রদা
আকৃষ্টোজ্ঝিত পুষ্পমঞ্জরিরজঃ পাতাবরুদ্ধেক্ষণা
চিষত্যাঃ কুসুমং ধিনোতি সুদৃশঃ পাদাগ্রদুস্থাতনুঃ ॥

এই সংকলনে শরণ, উমাপতি-ধর, জয়দেব, গোবর্ধনাচার্য, ধোয়ী-কবিরাজ, লক্ষ্মসেন, কেশবসেন প্রভৃতিরা তো আছেনই, কিন্তু ইঁহাদের ছাড়া অগণিত গৌড়-বঙ্গীয় কবিদের সাক্ষাতও পাইতেছি ঃ জলচন্দ্র, যোগেশ্বর, বৈদ্য গঙ্গাধর, সাঞ্চাধর, বেতাল, ব্যাস-কবিরাজ, কেবট, পপীপ, (জনৈক) বঙ্গাল, চন্দ্রচন্দ্র, গাঙ্গোক, বিম্বোক, শুঙ্গোক ইত্যাদি অনেক অজ্ঞাতনামা কবি। ইঁহারা সকলেই ছিলেন সমসাময়িক বাঙলার কবি, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার খুব কারণ নাই। বটুদাসের প্রশস্তিময় পাঁচটি শ্লোক যে পাঁচজন কবির রচনা তাঁহারা সকলেই সমসাময়িক বাঙালী, এ-তথ্যও সন্দেহ করা বোধ হয় চলে না ; এই পাঁচজন হইতেছেন মথু, সাঞ্চাধর, বেতাল, উমাপতি-ধর এবং কবিরাজ-ব্যাস।

আঁতিহরপুত্র সর্বানন্দ দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে অমরকোষের যে টীকা রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে বাঙালী কবির রচনা হইতেও কিছু কিছু শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সাহিত্যকল্পতরু, দেবীশতক, বিদগ্ধমুখমণ্ডল, বৃন্দাবনযমক, বাসনামঞ্জরী (শ্রীপোব্যোক-রচিত) প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙালী কবির রচনা বলিয়াই তো মনে হয়। সর্বানন্দ নিজেও ছিলেন কবি, এবং তাঁহার টীকাসর্বস্বের প্রথম শ্লোকেই তিনি যে গোপাল-বন্দনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কবি-প্রতিভা কিছুটা প্রতিফলিত।

বর্হিণ বর্হাপীড়ঃ সুষিরপরো বালবল্লবো গোষ্ঠে।
মেদুরমুদিরশ্যামলচিরব্যাদেষ গোবিন্দঃ ॥

এইবার সেন-রাজসভার পঞ্চরত্ন অর্থাৎ শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতি-ধর এবং জয়দেবের কথা একটু বিশদভাবে পৃথক পৃথক করিয়া বলা যাইতে পারে।

শরণ

শরণ বা শরণদেবের ২০টি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে (বা সূক্তিকর্ণামৃতে) উদ্ধার

করা হইয়াছে ; তন্মধ্যে একটি শ্লোকে শরণ জনৈক সেন-বংশতিলকের রাজত্বে বাসের ইঙ্গিত দান করিয়াছেন ; অপর একটি শ্লোকে গৌড়লক্ষ্মী-প্রসঙ্গে চেদি, কলিঙ্গ কামরূপ এবং ম্লেচ্ছরাজের পরাজয়ের ইঙ্গিত আছে (এই শ্লোকটি রাজবৃত্ত-প্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছি)। জয়দেব বলিতেছেন, "শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহ-দ্রুতে"—কবি শরণ দুরূহ দ্রুত শ্লোকবন্ধনে শ্লাঘ্য ও প্রশংসনীয়।

ধোয়ী কবিরাজ

ধোয়ী (বা ধোই, ধোয়ীক, ধুয়ী)-কবিরাজ সম্বন্ধে জয়দেব বলিতেছেন, "বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবি-ক্ষমাপতিঃ"। ধোয়ী সাধারণত পবনদূত-কাব্যের রচয়িতা হিসাবেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কালিদাসের মেঘদূতের আদর্শে যত দূতকাব্য পরবর্তী কালে রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে পবনদূত প্রাচীনতম। মন্দাক্রান্তা ছন্দে ১০৪টি শ্লোকে ধোয়ী সুকৌশলে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক লক্ষ্মণসেনের স্তুতিবাদ করিয়াছেন। লক্ষ্মণসেন নাকি দক্ষিণ-দেশে গিয়াছিলেন ; সেখানে কুবলয়বতী নাম্নী এক গন্ধর্ব-কন্যা তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিণা-মলয়বায়ুকে দূত করিয়া বিরহিনী কুবলয়বতী লক্ষ্মণ-সেনের নিকট প্রেমবার্তা প্রেরণ করিতেছেন, ইহাই পবনদূতের বিষয়বস্তু। কাব্যটির মৌলিকত্ব বিশেষ কিছু নাই, ভাব-গভীরতার পরিচয়ও স্বল্পই, তবে কোনো কোনো শ্লোকের চিত্র-গরিমা এবং কল্পনার মাধুর্য চিত্তকে স্পর্শ করে। ধোয়ী নিজেই বলিতেছেন, পবনদূত ছাড়াও তিনি অন্য একাধিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সে-সব কাব্য আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। তবে, সদুক্তিকর্ণামৃতে তাঁহার রচিত ২০টি শ্লোক আছে, এবং জহ্লণের সূক্তিমুক্তাবলীতে আছে আরও দুইটি ; এ গুলি তাঁহার অন্যান্য কাব্যের প্রকীর্ণ শ্লোক হওয়া অসম্ভব নয়।

উমাপতি-ধর

কবি উমাপতি-ধর বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তির রচয়িতা ; বোধ হয় তিনি সেন-রাজসভার অন্যতম সভাকবি ছিলেন। এই প্রশস্তির চারিটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধার করা হইয়াছে। এই সংকলনে উমাপতি-ধরের নামেই আর একটি শ্লোক আছে যাহা লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-পট্টোলীতেও হুবহু একই রূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই কারণে মনে হয়, মাধাইনগর-লিপিটিরও রচয়িতা ছিলেন উমাপতি-ধর। মেরুতুঙ্গ তাঁহার প্রবন্ধচিন্তামণি-গ্রন্থে বলিতেছেন, উমাপতি-ধর লক্ষ্মণসেনের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। মনে হয়, বিজয়সেন হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মণসেন পর্যন্ত তিন পুরুষ ধরিয়া উমাপতি সেন-রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপ ছাড়িয়া পূর্ববঙ্গে পলায়নের পরও উমাপতি-ধর জীবিত ছিলেন এবং বিজয়ী ম্লেচ্ছরাজের

সাধুবাদ করিয়া স্তুতিশ্লোকও রচনা করিয়াছিলেন। এই শ্লোকটি রাজবৃত্ত-প্রসঙ্গে উদ্ধার করা হইয়াছে। বৃদ্ধ কবির এই পরিণতির কথা অন্যত্র বলিয়াছি; এখানে আর পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই। সদুক্তিকর্ণামৃতে উমাপতি-ধরের নামে ৯১ টি শ্লোক আছে। এই সংকলন গ্রন্থেই আর এক উমাপতির নামেও কয়েকটি শ্লোক আছে; এই উমাপতি জনৈক রাজা চাণক্যচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় চন্দ্রচূড়-চরিত নামে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই দুই উমাপতি এক এবং অভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়। দেওপাড়া-লিপিতে উমাপতি-ধর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, শব্দজ্ঞান ও শব্দার্থবোধ দ্বারা এই কবি পরিশুদ্ধবুদ্ধি ছিলেন; আর জয়দেব বলিতেছেন, উমাপতি-ধরের লেখনীতে বাক্য যেন পল্লবিত হইত (বাচঃ পল্লবয়তি)।

আচার্য গোবর্ধন

গোবর্ধনাচার্য আর্যা-সপ্তশতীর কবি বলিয়াই সর্বভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই শৃঙ্গার কাব্যটি জনৈক সেনকুলতিলক ভূপতির পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হইয়াছিল, এবং এই কাব্যেই খবর পাইতেছি, গোবর্ধনের পিতার নাম ছিল নীলাম্বর। তাঁহার দুই ভ্রাতা ও শিষ্যের নাম ছিল উদয়ন ও বলভদ্র। নীলাম্বর ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং উদয়ন ও বলভদ্র গোবর্ধন-রচিত কাব্যটি রচনার কাজে সাহায্য করিয়াছিলেন। গোবর্ধন যে সুদক্ষ কবি এবং সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা তাঁহার আচার্য উপাধিতেও প্রমাণ। আর্যা ছন্দে রচিত সপ্তশতীর কিঞ্চিদধিক সাতশত শৃঙ্গার শ্লোকও সে-সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কবি হালের সরস ও সহৃদয় এবং সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময় সহজ প্রকাশের সঙ্গে গোবর্ধনাচার্যের সুচতুর এবং কষ্টকল্পিত কাব্যভঙ্গীর আত্মীয়তা সুদূর। তাহা ছাড়া, আর্যা ছন্দের স্খলিত গতিও শৃঙ্গার রসের ঘন অনুভূতি বা অর্থগর্ভ ইঙ্গিতকে ফুটাইয়া তুলিবার যথাযোগ্য বাহন নয়। জয়দেব অবশ্য বলিয়াছেন, ত্রুটিবিহীন শৃঙ্গারকাব্য রচনায় গোবর্ধনাচার্যের কোনো তুলনা ছিলনা; কিন্তু ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, সদুক্তিকর্ণামৃতের শৃঙ্গারপ্রবাহে বা এই গ্রন্থের অন্যত্র কোথাও আর্যা-সপ্তশতীর একটি শ্লোকও উদ্ধৃত হয় নাই। জনৈক গোবর্ধনের ছয়টি শ্লোক সদুক্তিতে আছে, কিন্তু ছয়টির একটিও সপ্তশতীর শ্লোক নয়। গোবর্ধনাচার্যের নামে শার্ঙ্গধরপদ্ধতি-তে একটি এবং সূক্তিমুক্তাবলীতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত আছে; দু'টিই আর্যাছন্দে রচিত এবং দু'টিই সপ্তশতীর শ্লোক। পদ্যাবলীতে গোবর্ধনাচার্যের নামে চারিটি শ্লোক আছে; তিনটি সপ্তশতীর শ্লোক; চতুর্থটি সপ্তশতীতে নাই, কিন্তু সদুক্তিকর্ণামৃতে আছে জনৈক অজ্ঞাতনামা কবির রচনা হিসাবে। মনে হয়, সংকলয়িতা শ্রীধরদাস আর্যা-সপ্তশতীর খুব অনুরক্ত পাঠক ছিলেন। বস্তুত, সপ্তশতীর শ্লোকগুলির শৃঙ্গার রস যেন একটু বেশি দেহতাপে তপ্ত।

জয়দেব ও গীতগোবিন্দ

গীতগোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেব এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, এবং প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবের দিক্‌ হইতে স্বল্প সংখ্যক সর্বভারতীয় কবিদের মধ্যে অন্যতম। ষোড়শ শতকে সন্ত কবি নাভাজী দাস তাঁহার ভক্তমাল-গ্রন্থে জয়দেবের প্রশস্তি গাহিয়া বলিতেছেন,

> জয়দেব কবি নৃপচক্কবৈ, খণ্ড মণ্ডলেশ্বর আণি কবি ॥
> প্রচুর ভয়ো তিহুঁ লোক গীতগোবিন্দ উজাগর।
> কোক-কাব্য নবরস-সরস-শৃঙ্গার-কো আগার ॥
> অষ্টপদী অভ্যাস করৈ, তিহি বুদ্ধি বঢ়াবৈ।
> রাধারমণ প্রসন্ন হুঁা নিশ্চৈ আবৈ ॥
> সন্ত-সরোরুহ-খণ্ড-কৌ পদুমাবতি-সুখ-জনক রবি।
> জয়দেব কবি নৃপচক্কবৈ, খণ্ড মণ্ডলেশ্বর আনি কবি ॥

> কবি জয়দেব হইতেছেন চক্রবর্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড মণ্ডলেশ্বর মাত্র। তিন লোকে গীত-গোবিন্দ প্রচুর ভাবে উজাগর বা উজ্জ্বল হইয়াছে। ইহা একাধারে কোকশাস্ত্র, কাব্য, নবরস ও সরস শৃঙ্গারের আগার স্বরূপ। যে এই গ্রন্থের অষ্টপদী অভ্যাস করে তাঁহার বুদ্ধি বর্ধিত হয়; রাধারমণ প্রসন্ন হইয়া শুনেন এবং নিশ্চয় সেখানে আসিয়া বিরাজিত হ'ন। সন্তরূপ কমলদলের পক্ষে তিনি পদ্মাবতী-সুখ জনক রবি। কবি জয়দেব চক্রবর্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড মণ্ডলেশ্বর মাত্র।

এই পর্বে এবং পরবর্তী কালেও জয়দেবের কবি-চক্রবর্তীত্বে প্রতিযোগিতার স্পর্দ্ধা রাখেন, সত্যই এমন কেহ বড় একটা নাই। তবে, নাভাজী দাস যে তাঁহাকে কবি-চক্রবর্তী-রাজা বলিতেছেন, তাহা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক মধুর কোমলকান্ত কাব্য গীতগোবিন্দের রচয়িতা হিসাবেই, যথার্থ কবি-প্রতিভার জন্য কিনা তাহা উদ্ধৃত পদগুলি হইতে বুঝা যাইতেছে না। নাভাজীর উক্তি বৈষ্ণব সন্তের স্বতস্ফূর্ত ভক্তি ও প্রেমে অনুপ্রাণিত, কাব্য ও সাহিত্য বোদ্ধার উক্তি বোধ হয় নয়। বস্তুত, সর্বভারত জুড়িয়া জয়দেবের খ্যাতি যেন একান্তই ভক্ত বৈষ্ণব সাধক কবিরূপে, এবং গীতগোবিন্দ যেন সেই সাধকের দৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রত্যক্ষ করিবার কামমধুর ভক্তিরসময় উপায়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার উপর শ্রুতিমধুর, শৃঙ্গার-ভাবনাময়, রসাবেশময় গানের রচয়িতা হিসাবে জয়দেবের পক্ষে রসিক বৈষ্ণব-সমাজে এবং জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ সহজেই সম্ভব হইয়াছিল; এবং পরে একবার যখন গীতগোবিন্দ চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম মূল প্রেরণা বলিয়া স্বীকৃত হইল তখন গীতগোবিন্দ হইয়া উঠিল ধর্মগ্রন্থ এবং জয়দেব হইলেন দিব্যোন্মাদ সাধক। অথচ, জয়দেব একান্তই তাহা ছিলেন না, আমাদের প্রচলিত ধারণার ভক্তি ও প্রেমোন্মাদ বৈষ্ণবও ছিলেন না। আমি আগেই বলিয়াছি, তিনি ছিলেন সাধারণ ভাবে

পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ ; কল্কি এবং মহাদেবও তাঁহার অকুণ্ঠ স্তুতিপূজা লাভ করিয়াছেন; তিনি যোগমার্গ সাধনার উপর কবিতা লিখিয়াছেন, শৌর্য-বীর্য-যুদ্ধ-তূর্য সংগ্রামের উপরও কাব্য তিনি রচনা করিয়াছেন। সেই জয়দেব গীতগোবিন্দও রচনা করিয়াছিলেন, এবং সন্দেহ নাই, এ-রচনা একান্ত ভাবে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার জন্য, যে-রাজসভায় রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা এবং নানা প্রকারের কামকল্পনা-ভাবনাকে আশ্রয় করিয়া প্রতি সন্ধ্যায় বাররামাদের নৃত্যগীত হইত, এবং নবদ্বীপকৃষ্ণ লক্ষ্মণসেন পাত্রমিত্রদের লইয়া সেই নৃত্যগীত উপভোগ করিতেন। গীতগোবিন্দ, আর্যা-সপ্তশতীর শৃঙ্গার রসসমৃদ্ধ শ্লোক, পবনদূত সমস্তই সেই রাজসভার বিলাসলালসময় সংস্কৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত। বাঙলা দেশ যখন অর্ধেক মুসলমানদের করতগত তখনও বিক্রমপুরে কেশবসেনের রাজসভায় একই বৃন্দাবনলীলা অব্যাহত। ধোয়ী, জয়দেব, গোবর্ধনাচার্যের মত প্রতিভাও সেই ইন্ধনে আহুতি দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই ; অথচ সেই রাজসভার বাহিরে অন্য রসের কাব্যও তাঁহারা রচনা করিয়াছেন।

আসল কথা, এই পর্বের বাঙলাদেশে রাজসভায়, সামন্ত-সভায় উচ্চতর সম্প্রদায়গুলির বহির্বাটিতে, এক কথায় উচ্চকোটি সমাজের সামাজিক আবহাওয়াটাই এই ধরনের। অন্যত্র সে-ইঙ্গিত ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। সংস্কৃতির কথা বলিতে বসিয়া আরও কয়েকটি তথ্যের ইঙ্গিত অন্বেষণ করা যাইতে পারে। ধোয়ীই হউন আর শ্রীধরদাসই হউন, জয়দেবই হউন আর উমাপতি-ধরই হউন, সকলেই লক্ষ্মণসেনের স্তুতি যখন গাহিয়াছেন তখন অনিবার্যভাবেই যেন তাঁহার তুলনা করিয়াছেন কৃষ্ণের সঙ্গে, এবং সে-কৃষ্ণ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ নহেন, মথুরা-বৃন্দাবনের রাধালীলাসহচর কৃষ্ণ। শুধু তাহাই নয়, সর্বত্রই, এমন কি কাশী-কলিঙ্গ-কামরূপের যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁহার সঙ্গে কেলি-লীলা যেন অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ; যেখানে লক্ষ্মণসেন সেখানেই 'কেলি' তাহা রাজকীয় লিপিতেই হোক্, বা কবির স্তুতিতেই হউক। এ-তথ্যের ঐতিহাসিক ইঙ্গিত অবহেলার বস্তু নয়। দ্বিতীয়ত, শ্রীহর্ষের নৈষধ-চরিত বা ধোয়ীর পবনদূত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ বা গোবর্ধনের সপ্তশতী সর্বত্রই যেন শৃঙ্গার রসের প্রাবল্য একটু বেশি, কামলালসাময় ভাবনা কল্পনার দিকে আকর্ষণ প্রবল, রুচি তরল এবং ইন্দ্রিয়বিলাসী। সাহিত্যের এই চিত্র সাধারণ ভাবে সমসাময়িক সমাজের প্রতিফলন, সন্দেহ কি, এবং এই সমাজ রাজসভাপুষ্ট অভিজাত সমাজ। কারণ এই সমাজের বাহিরে বৃহত্তর যে সমাজ তাহার প্রতিফলনও সমসাময়িক সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে কিছু কিছু আছে ; সে সাহিত্য এমন ভাবে শৃঙ্গার রসে জারিত নয়, এমন কামলালসাময় ভাবনা-কল্পনাদ্বারা অভিসিঞ্চিত নয়। তাহার দৃষ্টান্ত সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, এবং সে-সব দৃষ্টান্তের মধ্যে ধোয়ী, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতির শ্লোকও নাই, এমন নয়। তৃতীয়ত, এ-যুগের কাব্য সাহিত্যে ধ্বনিতত্ত্বের প্রভাব আর নাই ; এ-যুগ দণ্ডী-ভামহের যুগ নয়, মম্মট-ভট্টের রসতত্ত্বের যুগ ; রস-ই এ-

যুগের কাব্যে প্রধান গুণ বলিয়া কীর্তিত। সেন-রাজসভায় এবং সমসাময়িক অভিজাত স্তরে সেই রসই কামদহনে মদ্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। গীতগোবিন্দেও কিছুটা পরিমাণে সেই মদ্যই পরিবেশিত হইয়াছে, অন্তত শেষতম সর্গে। অর্বাচীন জৈন-গ্রন্থে, লোকস্মৃতিতে লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে যে-সব কাহিনী বিধৃত, রাজকীয় লিপিমালায় এবং সমসাময়িক সভা-সাহিত্যে সেন-রাজসভার এবং উচ্চকোটিস্তরের যে-চিত্র দৃষ্টিগোচর তাহার সঙ্গে গীতগোবিন্দের নৃতগীতলাস্যবিলাসময়, কামভাবনাময় তরল রসের কোথাও কোনো অমিল নাই। রাজসভার সুর ও আবহের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া নৃপতি ও সভাসদ্‌দের রসাবেশনিমীলিত চক্ষুর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জয়দেব গীতগোবিন্দ এবং গোবর্ধন সপ্তশতী রচনা করিয়াছিলেন!

শুধু জয়দেবের গীতগোবিন্দই নয়। প্রায় সমসাময়িক কাল বা কিছু পরবর্তী কালে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণেও ঘন কামনাবাসনাময় আবহের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ লীলাকে আশ্রয় করিয়া একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়-কামনা ও প্রেমভক্তির জয়-ঘোষণার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এ-ক্ষেত্রেও সামাজিক আবহাওয়ার প্রতিফলন অনস্বীকার্য।

কিন্তু পরবর্তী কালে রূপ-গোস্বামীর রসব্যাখ্যায় প্রভাবান্বিত হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ গীতগোবিন্দের মধ্যে নূতন অর্থসন্ধান লাভ করিলেন; গীতগোবিন্দ নূতন মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিল এবং অন্যতম ধর্মগ্রন্থ পর্যায়ে উন্নীত হইল। তাহার আগেই ভক্ত বৈষ্ণবসমাজ এই গ্রন্থকে কিছুটা ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দান করিয়াছিল। প্রধানত তাহারই ফলে সমগ্র উত্তর-ভারত জুড়িয়া গীতগোবিন্দের প্রতিষ্ঠা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অব্যাহত ছিল, সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে তো বটেই, অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেও, বিশেষ ভাবে সেই সব সম্প্রদায়ে যাহাদের প্রধান আশ্রয় ভক্তি ও প্রেম। তাহারই ফলে জয়দেব সহজিয়া সম্প্রদায়েরও আদিগুরু, নব রসিকের অন্যতম রসিক। বল্লভাচারী সম্প্রদায়ও গীতগোবিন্দকে অন্যতম ধর্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন। বল্লভাচার্যের পুত্র বিঠ্‌ঠলেশ্বর গীতগোবিন্দের অনুকরণেই তাঁহার শৃঙ্গাররসমণ্ডন-গ্রন্থ রচনা করেন। প্রধানত এই কারণেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে গীতগোবিন্দের চল্লিশ খানারও উপর টীকা রচিত হইয়াছে, অনুকরণে দশ বারোখানা কাব্য রচিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন সংকলন-গ্রন্থে বারবার গীতগোবিন্দ হইতে অসংখ্য শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। গীতগোবিন্দের জনপ্রিয়তার ইহার চেয়ে বড় সাক্ষ্য আর কি হইতে পারে? গীতগোবিন্দের অন্যতম প্রাচীন প্রসিদ্ধতম টীকা মেবাড়পতি মহারাণা কুম্ভের নামে প্রচলিত রসিকপ্রিয়া (১৪৩৩-১৪৬৮ খ্রী)। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের একটি ওড়িয়া শিলালেখ হইতে (১৪৯৯) জানা যায়, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের আদেশে ঐ সময় হইতে গীতগোবিন্দের গান ও শ্লোক ছাড়া জগন্নাথ-মন্দিরে অন্য কোনো গান ও শ্লোক গীত হইতে পারিত না।

গীতগোবিন্দের লোকপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ, ইহার পদ বা গীতগুলির ভাষা। এই কাব্যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের ভাষা এবং পরবর্তী ও সমসাময়িক কালের অপভ্রংশ ও ভাষা-কাব্যের ভাষা এক উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। আখ্যায়িকা বা বর্ণনামূলক অংশ সংস্কৃত কাব্যের ধারা অনুসরণ করিয়াছে—ভাবে, ভাষায় ও শব্দে; কিন্তু পদ বা গীতগুলির সমস্ত আবহাওয়াটা অপভ্রংশ ও ভাষা কাব্যের; ছন্দ এবং মিলও সেই কাব্যেরই। ছন্দ তো পরিষ্কার মাত্রাবৃত্ত, সংস্কৃত কাব্যের অক্ষরবৃত্ত নয়। ছত্রের অন্ত্য এবং আভ্যন্তর অক্ষরের মিলও অপভ্রংশ ও ভাষা-কাব্যের রীতি অনুসরণ করিয়াছে। শ্লোকগুলি একে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন নয়; অন্ত্য মিল এবং ধুয়া মিলিয়া প্রত্যেকটি গীতাংশের একটি সমগ্র রূপ খুব সুস্পষ্ট। এই সমগ্র রূপ একান্তই ভাষা-কাব্যের বৈশিষ্ট্য; সংস্কৃতে এই রূপ অনুপস্থিত। সেই জন্যই মনে হয়, কাব্যের এই রূপ জয়দেব গ্রহণ করিয়াছিলেন লোকায়ত চলিত ভাষা-সাহিত্য হইতে। জয়দেবের কালে সংস্কৃত কাব্য ও নাট্য-সাহিত্যের অবস্থা বদ্ধ জলাশয়ের মতো; জয়দেবই বোধ হয় সর্বপ্রথম সেই সাহিত্যে নূতন স্রোত সঞ্চার করিলেন, লোকায়ত চলিত-সাহিত্যের গান ও গীতিনাট্যের খাত কাটিয়া। সেই লোকায়ত ভাষা-সাহিত্যে গান ও অভিনয় লইয়া এক ধরনের যাত্রা প্রচলিত ছিল, এবং এই সময়ের সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে তাহার প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট, ভাষা এবং সাহিত্যরূপ উভয়ত। রামকৃষ্ণের গোপালকেলিচন্দ্রিকা, উমাপতি-উপাধ্যায়ের পারিজাত-হরণ, মহানাটক প্রভৃতি সমস্তই এই ভাষা সাহিত্যরূপের নিদর্শন; কিন্তু গীত-গোবিন্দ ইহাদের সকলের আদিতে।

সমসাময়িক কালে একদিকে সেন-রাজসভা ও উচ্চকোটির সমাজস্তর এবং অন্যদিকে ঘনায়মান অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করিয়া সামাজিক কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন কিনা সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন অনিবার্য হইলেও, জয়দেব যে যুগন্ধর ও সৃষ্টিধর কবি ছিলেন এবং তাঁহার গীতগোবিন্দ যে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। প্রথমত, তাঁহার লেখনীতে সংস্কৃত কাব্যভাষার অপভ্রংশ ও ভাষাধর্মী সদ্যোক্ত রূপান্তর প্রায় বৈপ্লবিক বলিলেও চলে। দ্বিতীয়ত, অলৌকিক দেবকাহিনী ও লৌকিক প্রেমগাথার এরূপ সমন্বয় ইতিপূর্বে ভারতীয় সাহিত্যে আর দেখা যায় নাই; গীতগোবিন্দের এই সমন্বয়ের ধারায়ই পরবর্তী বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলীর উদ্ভব। এই সমন্বয়ই মধ্যযুগের হিন্দু সাংস্কৃতিক নবজাগরণের মধ্যযুগীয় হিউম্যানিজমের মূলে। অলৌকিক দেবতাদের এইরূপ মানবীকরণের ইঙ্গিত বহুলভাবে জয়দেবই প্রথম সূচনা করিলেন। অন্য কবিদের রচিত সদুক্তিকর্ণামৃতের দু'চারিটি প্রকীর্ণশ্লোকেও সে-ইঙ্গিত কিছু কিছু পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, সন্দেহ নাই, গীতগোবিন্দ একান্তই গীতিকাব্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হয়, লোকায়ত নাট্যাভিনয়ের (যাত্রার ?) নাটকীয় লক্ষণও কিছুটা এই কাব্যে বর্তমান, বিশেষত রাধার সখীদের অথবা স্বয়ং রাধা ও কৃষ্ণের কথোপকথনাত্মক গীতাংশে।

বস্তুত, গীতগোবিন্দে বর্ণনা-বিবৃতি, আলাপ বা কথোপকথন, এবং গীত এই তিনটি একসঙ্গে একই কাব্য বা সাহিত্যরূপের মধ্যে সমন্বিত। এই রূপও একান্তই অভিনব এবং সংস্কৃত সাহিত্যে অজ্ঞাত। চতুর্থত, কাব্যটির বিষয়বস্তু ধর্মগত, কিন্তু লৌকিক ইন্দ্রিয়-কামনার এমন রসাবেশময় ব্যঞ্জনা সংস্কৃত-সাহিত্যে বিরল। বস্তুত মৌলিক যৌনকামনার এমন অপূর্ব ভক্তিরসময় রূপান্তর মধ্যযুগীয় বাংলার পদাবলী-সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। পঞ্চমত, গীতগোবিন্দ একাধারে পদ-কাব্য (মধুর কোমলকান্ত পদাবলীং) এবং মঙ্গলকাব্য (শ্রীজয়দেব কবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলম্ উজ্জ্বল গীতি), এবং এই হিসাবে পরবর্তী বাংলা পদাবলী-সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্য-সাহিত্য এই দুই সাহিত্যধারার আদিতে গীতগোবিন্দের স্থান।

সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে জয়দেবের ৩১টি শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৫টি মাত্র গীতগোবিন্দ হইতে, এ-কথা আগেই বলিয়াছি। অনুমান হয়, তিনি অন্য এক বা একাধিক কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। জয়দেবের রচিত দুইটি কবিতা শিখদের শ্রীগুরু-গ্রন্থ বা গ্রন্থসাহেবে (ষোড়শ শতক) স্থান পাইয়াছে ; তন্মধ্যে একটি যোগমার্গের পদ। সদুক্তিকর্ণামৃতে কল্কির উপরও জয়দেব-রচিত একটি পদ আছে।

জয়দেবের পিতার নাম ছিল ভোজদেব, মাতা রামাদেবী (পাঠান্তরে, বামাদেবী, রাধাদেবী) ; তাঁহার জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব (অজয়-নদের তীরে কেদুঁলি গ্রাম)। স্ত্রীর নাম বোধ হয় ছিল পদ্মাবতী। কবির বন্ধু এবং তাঁহার গানের দোহার বা গায়েন ছিলেন পরাশর। জয়দেবের সম্বন্ধে নানা কাহিনী সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রচলিত ; নাভাজী দাসের ভক্তমাল (সপ্তদশ শতক)-গ্রন্থে ও চন্দ্রদত্তের ভক্তমালায় কিছু কিছু এই সব কাহিনীর বিবৃতি আছে। কাহিনীগুলির মধ্যে পদ্মাবতীর কাহিনী সুপরিচিত। পদ্মাবতীর পিতার ইচ্ছা ছিল, কন্যাকে দেবদাসীরূপে জগন্নাথ মন্দিরে সমর্পণ করিবেন, কিন্তু নারায়ণকর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া জয়দেবের সঙ্গে তাহার বিবাহ দেন। 'দেহিপদ-পল্লবমুদারম্'-সংক্রান্ত আখ্যায়িকাটিও বাংলাদেশে সুপরিচিত। গীতগোবিন্দের দুইটি পদে পদ্মাবতীর নামোল্লেখ আছে ; এক জায়গায় পাইতেছি "পদ্মাবতী-রমণ-জয়দেব কবি" ; অন্য জায়গায় আছে, "পদ্মাবতী-চরণচারণচক্রবর্তী"। জয়দেব গীতগোবিন্দের পদ গাহিতেন এবং পদ্মাবতী সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে নাচিতেন, এই জনশ্রুতি ষোড়শ শতকেই স্বীকৃতিলাভ করিয়াছিল। শেকশুভোদয়া-গ্রন্থেও জয়দেব-পদ্মাবতী সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। বাঙলাদেশের বাহির হইতে জনৈক সঙ্গীতজ্ঞ বুঢ়নমিশ্র সেন-রাজসভায় আসিয়া জয়দেবকে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন ; জয়দেবপত্নী পদ্মাবতী তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পদ্মাবতী যে গীতনৃত্যনিপুণা ছিলেন তাহা তাঁহার পিতার দেবদাসীরূপে কন্যাকে সমর্পণের বাসনায়, গীতগোবিন্দের শ্লোকে 'পদ্মাবতীচরণ-

চারণচক্রবর্তী' ও নাভাজী দাসের 'পদ্মাবতীসুখজনকরবি' এই আখ্যায় এবং শেক-শুভোদয়ার এই গল্প হইতেই অনুমান করা যায়।

এই সব সুবিস্তৃত কাব্য-সাহিত্য এবং প্রকীর্ণ শ্লোকাবলী ছাড়াও সেন-বর্মণ রাজসভায় অলঙ্কারবহুল উচ্ছ্বসিত কাব্য রচনার পরিচয় পাওয়া যায় রাজকীয় লিপিগুলির প্রশস্তি শ্লোকাবলীতে, এবং এই সব শ্লোক প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রাজসভাকবিদের দ্বারা রচিত। ভবদেব-প্রশস্তির কথা আগেই বলিয়াছি। বিজয়সেনের বারাকপুর-প্রশস্তি, বল্লালসেনের নৈহাটি প্রশস্তি, লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া, গোবিন্দপুর ও তর্পণদীঘি-শাসনের প্রশস্তি প্রভৃতি সমস্তই সমসাময়িক কবি-প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পাঠ-পঞ্জী

প্রাচীন বাঙলার সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত নানা মূল্যবান নিবন্ধ নানা সাময়িক (বাঙলা ও ইংরেজি) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ও এখনও হ'চ্ছে। যে-সব প্রবন্ধ-নিবন্ধ আমার গোচরে এসেছে, সে-সবই আমি পড়েছি, এবং লাভবান হয়েছি; কিন্তু তার সবই আমার কাজে লাগেনি, ব্যবহারও করিনি। যে-সব প্রকীর্ণ রচনা আমি ব্যবহার করেছি, শুধু সেগুলিরই আমি উল্লেখ করছি, যেমন করছি যে-সব গ্রন্থ আমি ব্যবহার করেছি। তথ্যাদির দিক থেকে আমি সবচেয়ে উপকৃত হয়েছি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সুকুমার সেন ও নলিনীনাথ দাশগুপ্তের গ্রন্থাদি ও প্রকীর্ণ রচনাবলী পড়ে; ব্যবহারও করেছি তাঁদের আবিষ্কৃত ও বর্ণিত তথ্যাদি। অধুনা স্বর্গত নলিনীনাথ তাঁর অপ্রকাশিত রচনাও আমায় ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু, একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাহিত্যিক মতামত, সামাজিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যনির্দেশ সমস্তই আমার নিজের। এজন্য, যা কিছু দায়িত্ব তা' সবই আমার, এবং তা' এ-গ্রন্থের সমস্ত অধ্যায় সম্বন্ধেই।

লেখমালা আমার অন্যতম প্রধান উৎস, কিন্তু এখানে আর তার উল্লেখ করছিনা, যেহেতু পরিশিষ্ট "খ"-তে তার পূর্ণ তালিকা পাওয়া যাবে।

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য; "প্রাচীনবঙ্গে বেদচর্চা", হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ১ম খণ্ড, ২০২ পৃ; নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম, কলিকাতা; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৩৮; "শ্রীজয়দেব কবি," ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৫০; "সদুক্তিকর্ণামৃত", বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫০; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, কলিকাতা, ১৩২৩; হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ২য় খণ্ড, কলিকাতা।

Bagchi, P. C., "Materials for the study of the Bengali Caryapadas", Journal of the Department of Letters, Calcutta University, vol. XXX; "Dohakosha (texts)", ibid, XXVIII, Kaulajnananirnaya (Introduction), Calcutta, 1934; Studies in the Tantras, Calcutta University, 1939; Bhandarkar, R. G.. Report on the search for Sanskrit Mss. in the Bombay Presedency, Poona; Bhattacharya, D. C, Paninian Studies in Bengal, Sir Asutosh Mookerjee Silver Jubilee Volume, III, Orientalia, Calcutta University; Bhattacharyya, S. P., "The Gaudi riti in theory and practice", Indian Historical Quarterly, 1927, p. 378 ff.; Bose, P. N., Indian teachers

of Buddhist Universities, Madras, 1923; Bu-ston, History of Buddhism (in Tibetan, trans. Obermillery; Chakravarti, Chintaharan. "Bengal's contribution to philosophical literature in Sanskrit", Indian Antiquary, LVIII, p. 201 ff., LIX, p. 23 ff.; Chakravarti, Manomohan, "Sanskrit literature in Bengal during the Sena rule", Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1906, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1945, p. 319 ff.; "Contributions to the history of Smriti in Bengal and Mithila", Journal of the Asiatic Society of Bengal, N. S. XI. p. 311 ff.; Chatterji, Sunitikumar, The origin and development of the Bengali langnage, 2 vols, Calcutta University, 1926; Indo-Aryan and Hindi; "The study of Kol", Calcutta Revied, 1923, p. 51 ff.; "Purana legends and the Prakrit tradition in New Indo-Aryan", Bulletin of the School of Oriental Studies, London, VIII, 1936; Cordiers, p., Catalogue de fonde Tibetain de la Bibliotheque Nationale, Paris, 1908; Das, Sarat Chandra, Indian Pandits in the Land of Snow, Calcutta, 1893; "Contributions on religion, history etc. of Tibet", Journal of the Asiatic Society of Bengal, LI. 1882, p. I ff.; Dasgupta, Nalininath, Off prints placed at my disposal, of articles in Indian Historical Quarterly and Indian Culture, both of Calcutta; De, S. K., Sanskrit Poetries, I; Early history of the Vaishnva faith and movement in Bengal; "Pre-Chaitanya Vaishnavism in Bengal", Festrchrift M. Winternitz; Dacca University, History of Bengal, vol. I, Dacca, 1943, Chaps. XI, XII, XIII, XVII; Hoernle, A.F.R., Medicine of Ancient India; Kaviraj, Gopinath, History and Bibliography of Nyaya-Vaiseshika literature; Keith, A. B,. History of Sanskrit literature; Sanskrit Drama; Kavindravacanasamuccaya, ed. by F.W. Thomas, Kane, P. V., History of Dharmasastras, I and II; Mitra, Rajendralal, Sanskrit Buddhist literature of Nepal; Notices of Sanskrit Manuscripts, Asiatic Society, Calcutta; Pal, Pramod Lal, The early history of Bengal. Vol. II; Padyavali, ed. by S. K. De; Poussin, L. de la Vallee, "Tantrism (Buddhist)," Encyclopaedia of Religion and Ethics, XII; Ray, P. C., History of Hindu Chemistry, I. Introduction; Sridharadasa, Saduktikarnamrita, ed. by Ramavatara Sarma and Haradatta Sarma; Sastri, Haraprasad, Descriptive catalogue of Sanskrit Ms...under the care of Asiatic Society of Bengal,

Calcutta ; "Literary history of the Pala period", Journal of the Bihar and Orissa Research Society, V. p. 171 ff. ; Sahidullah, M., Buddhist Mystic Songs, Dacca Univ. Studies, IV, p. 1 ff. ; Sumpa .., Pag Sam Jong Zang, ed. by Sarat Chandra Das ; Taranath, Geschichte der Buddhismus in Indien, German trans, from Tibetan by Schiefner ; Vidyabhushan, S.C., History of Indian Logic. Calcutta University ; Dasgupta, S.N, and De, S. K., History of Sanskrit literature, III, Calcutta University ; Winternitz, M., History of Sanskrit literature, I and II, Calcutta University.

চতুর্দশ অধ্যায়

শিল্পকলা

১

যুক্তি

ভাষা-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষায় যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত তাহার পশ্চাতে সচেতন বুদ্ধির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ। কিন্তু সংস্কৃতির এমন প্রকাশও আছে যেখানে বুদ্ধির লীলা সক্রিয় থাকিলেও তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা দেয় না, কিংবা বুদ্ধিই সেখানে একমাত্র নিয়ামক নয়। সংস্কৃতির সেই প্রকাশ ধরা পড়ে চারুকলায় ও সঙ্গীতে, এবং এ-দুয়েরই প্রধান উৎস ও আবেদন মানুষের বোধ, বুদ্ধি ও বোধির ক্ষেত্রে। এ-বিষয়ে ভাষা-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানাপেক্ষা চারুকলা ও সঙ্গীতের আবেদন একদিকে যেমন সূক্ষ্মতর, অন্যদিকে তেমনই প্রত্যক্ষতর এবং পরিধি হিসাবে বিস্তৃততর, বোধ হয়, গভীরতরও বটে।

উপাদান

কিন্তু আদিম লোকায়ত বাঙালীর চারুকলা বা সঙ্গীত সম্বন্ধে উপাদান অভাবে কিছু বলিবার উপায় নাই। সাংস্কৃতিক নরতত্ত্বের গবেষণার কাজও এমন কিছু অগ্রসর হয় নাই যে, সেদিক হইতে কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। চারুকলার কিছু কিছু উপাদান যদিও বা পাওয়া যায় একেবারে শেষ পর্বের আগে সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনো কথাই বলা যায় না। অথচ, গুহাবাসী অরণ্যচারী মানুষেরও প্রাথমিক সাংস্কৃতিক প্রকাশ তো গানেই। এই গানের ভিতর দিয়াই তো সে তাহার সুখদুঃখক, আনন্দবেদনা ব্যক্ত করে। আদিম কৌম বাঙালীও—রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ-সুহ্ম প্রভৃতি জনপদবাসীরাও তাহাই করিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই গানের কি ছিল রাগ-রাগিণী, কি ছিল সুর, তাল, লয়, মান কিছুই আমরা জানি না, কেহ তাহা লিখিয়াও রাখে নাই। পরবর্তী কালে, একেবারে দশম—দ্বাদশ শতকে যে-সব রাগ-রাগিণী, তাল-লয়ের পরিচয় পাইতেছি তাহা তো একান্তই সভ্য, সংস্কৃতিপূত চিত্তের প্রকাশ, প্রধানত আর্যমানসের প্রকাশ, যে আর্যমানসে অন্তত কিছুটা পরিমাণে বহির্ভারতীয় সংস্কৃতির স্পর্শও লাগিয়াছে। কিন্তু, তাহাতে কৌম বাঙালীর লোকায়ত সঙ্গীতের প্রভাবও পড়ে নাই, এ-কথাও বলা যায়না, বরং তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণও আছে। সে-সব কথা পরে বলিতেছি। আজিকার দিনেও বাঙালীর বাউল, ভাটিয়াল, ঝুমুর গানে যে সংস্কৃতির প্রকাশ এবং যাহা আজও বিশুদ্ধ মার্গ-সঙ্গীতের পর্যায়ে স্থান লাভ করে নাই, সেই সব গানে কৌম বাঙালীর লোকায়ত সঙ্গীতের ধারাই তো বহমান, এ-কথা কোনো তথ্যগত প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এবং এই লোকায়ত সঙ্গীতকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অসংখ্য গানে উচ্চস্তরের সাঙ্গীতিক মর্যাদা দান করিয়াছেন।

লোকায়ত সঙ্গীত ও নৃত্য

আজিকার সাঁওতাল, কোল, হো, মুণ্ডা, শবর, গারো, খাসিয়া, কোচ প্রভৃতিদের মধ্যে যে সব সুর ও তালের গান শোনা যায়, নাচ দেখা যায়, সেই সব সুর ও তাল, নাচের ভঙ্গী প্রভৃতির মধ্যেও সুপ্রাচীন কৌম বাঙালীর নৃত্যগীতের ধারা বহমান, সে-সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ কম। গ্রামে নিম্নস্তরের মেয়েদের মধ্যে যে সব গীত ও নৃত্য প্রচলিত, বীরভূমে রায়বেঁশেদের মধ্যে, অন্যান্য জেলার লাঠিয়ালদের মধ্যে যে ধরনের নৃত্য আজও অভ্যস্ত তাহা সমস্তই সেই আদিম ধারার খাতে প্রবাহিত। লোকায়ত সেই সব নাচ ও গান উচ্চস্তরের কৌলিন্য মর্যাদা লাভ করেন নাই বলিয়া তাহাদের কথা কোথাও কীর্তিতও হয় নাই। তবু, সকল উপেক্ষা সহ্য করিয়া, উচ্চকোটি-সংস্কৃতির চাপ সহ্য করিয়া ইহারা আজও বাঁচিয়া আছে, এবং কালে কালে ইহাদের অনেক রূপ ও ভঙ্গী মার্গস্তরে স্বীকৃত এবং গৃহীতও হইয়াছে।

লোকায়ত শিল্প

চারুকলার ক্ষেত্রেও এই লোকায়ত সংস্কৃতির ধারা আজও বহমান এবং একই অবস্থার ভিতর দিয়া। আমাদের ব্রত ও অন্যান্য মঙ্গলানুষ্ঠানের আলপনায়, কাঁচা বা পোড়া মাটির তৈরি পুতুল ও খেলনায়, মনসা বা গাজীর পটচিত্রে, মাটিলেপা বেড়ার উপর, অথবা সরা ও ঘটের উপর নানা রঙীন চিত্র ও নকসায়, কাঁথার উপর বিচিত্র সূচীকার্যে, ঝুলানো শিকার পরিকল্পনায়, খুঁটি ও খড়ের তৈরি ধনুকাকৃতি দোচালা, চৌচালা বা আটচালা ঘরে, নানা বাঁশ ও বেতের শিল্পে, এবং আরও নানা প্রকারের গৃহকলায় সেই প্রাচীন লোকায়ত শিল্পের ধারাই বহমান। এ-সব বিষয়ে কিছু দিন যাবৎ আমাদের শিক্ষিত সমাজের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা-গবেষণা আজও বিশেষ আরম্ভ হয় নাই। তবু, স্বীকার করিতে বাধা নাই, এই সব বিচিত্র প্রকাশের ভিতর দিয়াই বহু শতাব্দী ধরিয়া আমাদের কৌম গ্রামীণ লোকায়ত মানস নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু আদিপর্বের লোকায়ত বাঙালীর এই সব রচনার বিশেষ কোনো নিদর্শন আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছায় নাই।

ঘরবাড়ীর উপাদান

ইহার অন্যতম কারণ সহজভঙ্গুর উপাদানের ব্যবহার। সাধারণ লোকেরা বসবাসের জন্য ঘরবাড়ী যাহা নির্মাণ করিত তাহা সাধারণত বাঁশ, কাঠ, নল-খাগড়া, খড়, পাতা প্রভৃতির সাহায্যে। কাল জয় করিবার মতন শক্তি ইহাদের ছিল না। রাজপ্রাসাদগুলিও সাধারণত একই মাল-মসলা দিয়া তৈরি হইত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইটের ব্যবহারও ছিল না এমন নয়; কিন্তু ইটও কালজয়ী নয়, বিশেষত বাঙলার উষ্ণ, জলীয় আব-

হাওয়ায়। ছোটখাট মন্দিরগুলিও বাঁশ-কাঠ-খড়ের চালাঘর ছাড়া কিছু ছিল না ; তবে রাজা-রাজড়া এবং সমাজের সমৃদ্ধ শ্রেণীর লোকেরা যে-সব দেবমন্দির, বিহার ইত্যাদি নির্মাণ করাইতেন সেগুলিতে প্রধানত ইট এবং খুব স্বল্প পরিমাণে পাথর—যেমন, দরজায়, জানালায়, খিলানে, সিঁড়িতে, কোণে কোণে—ব্যবহৃত হইত। বাঙলাদেশ পাথরের দেশ নয় ; কাজেই বহুল পরিমাণে পাথর ব্যবহারেব সুযোগই ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইটের তৈরি মন্দির-বিহার ইত্যাদি ধ্বংস হইয়া মাটির ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে ; কতগুলি ভাঙা পাথরের টুকরা, অসংখ্য ভাঙা ইট ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে মাত্র। দু'একটি ক্ষেত্রে মাত্র ইটের তৈরি বিহার, মন্দির অর্ধভগ্ন অবস্থায় কোনো রকমে দাঁড়াইয়া আছে, যেমন, পাহাড়পুরের মন্দির-বিহার, দক্ষিণ-বঙ্গের জটার-দেউল বরাকরের মন্দির, সাত-দেউলিয়ার মন্দির, বহুলারার মন্দির প্রভৃতিতে। তবু যে প্রাচীন বাঙলার ছোটবড় মন্দিরগুলির আকৃতি প্রকৃতির কতকটা ধারণা আমরা করিতে পারি তাহা বিশেষভাবে সম্ভব হইয়াছে পাথরের তৈরি সমসাময়িক দেব-মূর্তির ফলকগুলির এবং রঙে-রেখায় আঁকা কয়েকটি পাণ্ডুলিপি-চিত্রের সহায়তায়। এই ফলক এবং চিত্রগুলিতে সমসাময়িক মন্দিরাদির কিছু কিছু নক্সা সহজেই ধরিতে পারা যায়, এবং ইহাদের সাহায্যে অর্ধভগ্ন মন্দিরগুলির মৌলিক চেহারাটাও ধরা পড়ে।

তক্ষণশিল্পে পাথর, কাঠ ও মাটি কালাতীত মৃৎশিল্প।

মূর্তি-শিল্পে পাথরের তৈরি অর্থাৎ পাথরে খোদাই মূর্তি ইত্যাদি যাহা নির্মিত হইয়াছে তাহারই কিছু কিছু নমুনা আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে নানা খনন ও অনুসন্ধানের ফলে। কিন্তু রাজমহল পাহাড় অথবা ছোটনাগপুরের পাহাড় হইতে পাথর আনাইয়া ভাস্করকে তাহার পারিশ্রমিক দিয়া মূর্তি নির্মাণ করাইবার মত সামর্থ্য খুব বেশি লোকের ছিল না ; সম্পন্ন সমৃদ্ধ লোকেরাই তাহা করিতেন এবং তাহাও বিশেষভাবে মন্দিরসজ্জা এবং প্রতিমা-প্রতিষ্ঠাব উদ্দেশ্যেই। সেই জন্যই প্রস্তরভাস্কর্য-নিদর্শন যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই জৈন, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর মূর্তি অথবা বিহার-মন্দির সংপৃক্ত অলংকরণ-ফলক, স্থাপত্যাংশ বা ধর্মগত পুরাণ কাহিনীর প্রস্তরীকৃত প্রতিকৃতি, এবং সেই হেতু অল্পবিস্তর প্রতিমা-লক্ষণ শাস্ত্র বা ধ্যান-সাধনের সূত্রদ্বারা নিয়মিত। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব গতিভঙ্গীর এবং লোকায়ত প্রাণ-প্রবাহের পরিচয় সেই হেতু ইহাদের মধ্যে ধরা পড়িবার সুযোগ কম ; ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের বা আনন্দ-বেদনার প্রকাশও সেখানে সহসা ধরা পড়েনা। প্রাচীন বাঙলার প্রস্তর-ভাস্কর্যে বাঙালী মনের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তাহা তাহার সংস্কৃতিপূত চিত্তের সমষ্টিগত গভীরতর ধ্যান-কল্পনার এবং সূক্ষ্মতর দৃষ্টির, যে দৃষ্টি ও ধ্যান কল্পনার যোগ সর্বভারতীয় দৃষ্টি ও ধ্যান-কল্পনার সঙ্গে। কাঠেও প্রচুর তক্ষণ ও মণ্ডণ কার্য হইত, সন্দেহ নাই,

পাথরের চেয়ে বোধ হয় বেশিই হইত, কিন্তু আমাদের হাতে যে কয়েকটি নিদর্শন আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাদের ভিতরও একই ভাস্কর্য-লক্ষণ সুপরিস্ফুট। কাজেই, না প্রস্তরশিল্পে না কাষ্ঠশিল্পে সমসাময়িক লোকায়ত মানসের পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। সেই পরিচয় স্বভাবতই ধরা পড়িবার কথা মৃৎশিল্পে, বিশেষত গঙ্গা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্রের পলিবিস্তৃত বাঙলাদেশে। নদীর ধারে, পুকুর পারে, মাঠের মধ্যে বসিয়া কাদা লইয়া খেলা, আঁটালো মাটির নরম ঢেলা লইয়া বিচিত্র রূপ গড়া ও ভাঙ্গা, ভাঙ্গা ও গড়া, দৈনন্দিন জীবনের চলতি মুহূর্তের ক্ষণস্থায়ী কামনা-বাসনার, আনন্দ-বেদনার, বিচিত্র গতি ও স্থিতির নানারূপ — এই মুহূর্তে আছে পরের মুহূর্তে নাই, এমন সব রূপের বাতি জ্বালানো এবং নেভানো, মাটির নরম তাল লইয়া খেলার ইহাই তো প্রকৃতি। কিন্তু, এই সব বিচিত্র রূপের লীলা প্রত্যক্ষ করিবার কোনো উপাদানই আজ আর আমাদের হাতে নাই। মাটিতেই যাহার সৃষ্টি মাঠির ধূলায়ই কবে তাহা গিয়াছে মিশিয়া। তবু, এই সব রূপ কালজয়ী, কালাতীত ; কালপ্রবাহকে অতিক্রম করিয়া তাহারা আজও আমাদের মধ্যেই বাঁচিয়া আছে ; বাঁচিয়া আছে আমাদের ব্রতানুষ্ঠানের মাটির গড়া নানা মূর্তিতে, গ্রামের কুমোরের তৈরি নানা মাটির পুতুল ও খেলনায়। সেই প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার আমলে সিন্ধুনদীর তীরে বসিয়া সমসাময়িক লোকেরা যে পুতুল তৈরি করিত, বাঙলার গ্রামে নদীর ধারে পুকুর পাড়ে বটের ছায়ে বসিয়া বাঙালী কুমোর, বাঙালী ব্রতধর্মী নারী আজও তাহাই করে।

কালধর্মী মৃৎশিল্প

কিন্তু আর এক ধরনের মাটির শিল্পরূপও লোকেরা গড়িত, গড়া শেষ হইয়া গেলে প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য নয়, বা নেহাতই খেয়াল-খুসীর খেলনার জন্যও নয়। সেগুলি লোকে ব্যবহার করিত ঘরের কুলুঙ্গি, মণ্ড, দেয়াল প্রভৃতি সাজাইবার জন্য, আমরা যেমন ছবি দিয়া ঘর সাজাই ; আবার সেগুলির সাহায্যে, সুযোগ পাইলেও প্রয়োজন হইলে, বড় বড় মন্দির, বিহার প্রভৃতির বহিরঙ্গ সজ্জাও হইত। বড় বড় মন্দির-বিহারের সুবিস্তৃত বহির্গাত্র শিল্পরূপে ঢাকিয়া দিবার মত পাথরের প্রাচুর্য বাঙলাদেশে ছিল না ; কাজেই তখন ডাক পড়িত গ্রামের কুমোর শিল্পীদের। তাহারা তখন আসিয়া স্বল্প সময়ের মধ্যে ছাঁচের সাহায্যে অথবা হাতের আঙুলে টিপিয়া টিপিয়া অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয়াসে ক্ষুদ্র বৃহৎ মাটির ফলক গড়িয়া চারিদিক ঢাকিয়া দিত জীবনের শোভা-যাত্রায়। এই ধরনের অন্তত কিছুটা স্থায়িত্বের প্রশ্ন যেখানে ছিল সেখানে মাটির গড়া এই সব শিল্পফলক, ছোটই হোক আর বড়ই হউক, আগুনে পোড়ানো হইত। এই ধরনের পোড়া মাটির ছোটবড় শিল্প-ফলক বাঙলার নানা প্রত্নস্থান হইতে কিছু কিছু

পাওয়া গিয়াছে—খ্রীষ্ট্রীয় শতকের প্রারম্ভ হইতে একেবারে অষ্টম নবম শতক পর্যন্ত। সুপ্রচুর সংখ্যায় পাওয়া গিয়াছে পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ হইতে। এই সব পোড়ামাটির ফলকগুলি ঠিক পূর্বোক্ত কালাতীত বা কালজয়ী প্রকৃতির নয়; বরং ইহাদের উপর কালের ছাপ সুস্পষ্ট এবং সমসাময়িক পাথরের তক্ষণ শিল্পের শিল্পরূপ ও ধারার প্রভাবও ইহারা একেবারে এড়াইতে পারে নাই। কিন্তু বিষয়বস্তু এবং লোকায়ত জীবনের প্রাণ-প্রবাহের দিক হইতে ইহাদের মধ্যে পার্থক্যও প্রচুর। পোড়ামাটির শিল্প সাধারণত দেবদেবীর মূর্তি নয়, কাজেই কোনো শাস্ত্র বা নিয়ম-বন্ধন দ্বারা নিয়মিতও নয়। ইহাদের বিষয়বস্তু দৈনন্দিন জীবনের চলমান প্রবাহের লোকায়ত কথা ও কাহিনীর, ক্ষণস্থায়ী জীবন-রূপের, কোনো গভীর ভাব-রহস্যের, কোনো গভীর তত্ত্বের বা আদর্শের দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপেরও নয়। বস্তুত, প্রাচীন বাঙালীর লোকায়ত শিল্পের প্রধান অভিজ্ঞান এই মাটির ফলকগুলিই।

প্রাচীন বাঙলার লোকায়ত চিত্রশিল্পের কোনো নিদর্শনই আমাদের কালে আসিয়া পৌছায় নাই; অথচ তাহা যে ছিলনা, এমন নয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকীয় বাঙলা পটচিত্রের ধারা প্রাচীন কৌম লোকায়ত খাতেই বহিয়া আসিয়াছে, এবং তাহার কিছু কিছু প্রাচীন আভাস ও সাম্প্রতিক গবেষণায় ধরা পড়িয়াছে। ধর্মানুশাসিত উচ্চকোটি-স্তরের যে চিত্র-নিদর্শনের কথা আমরা কিছু কিছু জানি তাহা সমস্তই পুঁথিচিত্র; পুঁথিসজ্জা, পুঁথিবর্ণিত দেবদেবীর মূর্তি-পরিচয়ের জন্যই তাহাদের সৃষ্টি।

২

সঙ্গীত ও নৃত্য

আগেই বলিয়াছি, দশম-একাদশ শতকের আগে নৃত্য ও গীত সম্বন্ধে কিছু বলিবার মত উপাদান আমাদের নাই। কিন্তু দশম-দ্বাদশ শতকীয় চর্যাগীতিগুলিতে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং লোচন-পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিনী-গ্রন্থে এমন সব রাগের ও তালের নামোল্লেখ পাইতেছি যাহাতে মনে হয়, এই সময়ের বহু আগে হইতেই প্রাচীন বাঙলা-দেশ ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাস্রোতের সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং সর্বভারতে অভ্যস্ত ও প্রচলিত অনেক রাগ ও তাল বাঙলাদেশেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

চর্যাগীতির রাগ

চর্যাগীতির পদগুলি যে সুরে তালে গাওয়া হইত তাহা গীতারম্ভে রাগের নামেই প্রমাণ; কিন্তু এ-সব রাগের ঠাট্ বা কাঠামো যে কি ছিল, এখন আর তাহা বলা যায় না। এ-গুলি প্রায় সমসাময়িক লোচন-পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিনীর বা কিছু পরবর্তী কালের

শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত-রত্নাকরের (১২১০-১২৪৭) পদ্ধতি অনুযায়ী গাওয়া হইত কিনা, বলা কঠিন। চর্যাগীতির ৫০টি গীত যে-সব রাগে গাওয়া হইত তাহাদের সংখ্যা ১০টি। ১, ৬-৭, ৯, ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬ এবং ৪৮ নং গীতের রাগ পটমঞ্জরী, এবং বারংবার ব্যবহারে মনে হয়, এই রাগটিই ছিল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ; ২-৩ ও ১৮ নং—গবড়া বা গউড়া ; ৪—অরু ; ৫, ২২, ৪১, ৪৭—গুর্জরী, গুঞ্জরী, কাহ্ন-গুর্জরী ; ৮—দেবক্রী ; ১০, ৩২—দেশাখ ; ১৩, ২৭, ৩৭, ৪২—কামোদ ; ১৪—ধনসী, ধানশ্রী ; ১৫, ৫০—রামক্রী ২১, ২৩, ২৮, ৩৪—বলাড্ডী বা বরাড়ী ; ২৬, ৪৬—শবরী ; ৩০, ৩৫, ৪৪, ৪৫, ৪৯—মল্লারী ; ৩৯—মালসী ; ৪০—মালসী-গবুড়া ; ৪৩—বঙ্গাল ; ১২, ১৬, ১৯, ৩৮—ভৈরবী। গবড়া ও গউড়া একই রাগ, সন্দেহ নাই, এবং খুব সম্ভব কাব্যে যেমন গৌড়ীরীতি রাগের মধ্যেও তেমনই একটি ছিল গউড়া বা গৌড়ী রাগ, এবং তাহারই সঙ্গে মালসী বা মালশ্রী (মালব-শ্রী ?) মিশাইয়া যে মিশ্র রাগ তাহার নাম মালসী-গবুড়া (৪০)। লোচন-পণ্ডিত কিন্তু এক গৌরী-রাগের নাম করিয়াছেন ; গৌরী কি গৌড়ী রাগ ? গুঞ্জরী গুর্জরী-রাগেরই লিপিকর প্রমাদ, এবং কাহ্ন-গুর্জরী গুর্জর-রাগেরই বিশেষ এক প্রকার মিশ্রিত রূপ ; অসম্ভব নয়, মার্গ গুর্জরীর সঙ্গে দেশী কাহ্ন-রাগের মিশ্রণেই কাহ্ন-গুর্জরীর সৃষ্টি। কাহ্ন বা কৃষ্ণভক্তরা যে ঠাটে গুর্জরী রাগ গাহিতেন তাহাই কি কাহ্নগুর্জরী ? বা মথুরা-বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলার প্রচলিত গুর্জরীরাই কাহ্নগুর্জরী ? রামক্রী-রাগ নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালের রামকেলি, গীতগোবিন্দের রামকিরী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রামগিরি রাগ। কিন্তু দেবক্রীর পরবর্তী ভগ্নরূপ দেবকিরী-দেবকেলি বা দেবগিরির উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছিনা। বস্তুত, পরবর্তী সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিভিন্ন ঘরানায় দেবক্রীরাগের কোনো স্থান যেন আর নাই। দেশাখ নিঃসন্দেহে গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দেশাগ ; কিন্তু দেশাখ কি দেশাখ্য, অর্থাৎ কোনো দেশী রাগের মার্গীকরণ ? ধানসী, ধানশ্রী পরবর্তী (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) কালের ধানুষী, এবং মল্লারী সুপরিচিত মল্লার। কিন্তু সঙ্গীতেতিহাসের দিক হইতে চর্যাগীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাগ শবরী ও বঙ্গাল-রাগ। শবরী রাগ তো নিঃসন্দেহে শবরদের মধ্যে প্রচলিত রাগ। এই লোকায়ত রাগটির মার্গীকরণ কবে হইয়াছিল, বলা কঠিন, তবে ইহার উল্লেখ শুধু চর্যাগীতিতেই পাইতেছি, আগে বা পরে সে-উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছি না। বঙ্গাল রাগও যে কি ধরনের আজ আর তাহা বুঝিবার উপায় নাই, তবে এই রাগটিও যে এক সময় গুর্জরী, মালবশ্রী বা মালসী, শবরী প্রভৃতি রাগের মত স্থানীয় লোকায়ত রাগ ছিল, সন্দেহ নাই। অথচ ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতে বঙ্গাল-রাগ এক সময় সুপরিচিত রাগ ছিল, এবং অষ্টাদশ শতকের রাজস্থানী চিত্রনিদর্শনে বঙ্গাল-রাগের চিত্রও দুর্লভ নয়। পরে কখন কি ভাবে যে এই রাগটি লুপ্ত হইয়া গেল তাহা জানা যাইতেছেনা। বস্তুত, চর্যাগীতির দেবক্রী, গউড়া বা গবুড়া, মালসী-গবুড়া, শবরী, বঙ্গাল,

কাহ্ন গুর্জরী প্রভৃতি অনেক রাগই আজ বিলুপ্ত। দেশাখ-রাগ তো বোধ হয় আজিকার দেশ-রাগে বিবর্তিত বা রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। অরু-রাগ যে কি তাহাও আজ আর বুঝিবার উপায় নাই।

চর্যাগীতির ধ্রুবপদ

সমসাময়িক সঙ্গীত-পদ্ধতির একটি সংকেত চর্যাগীতে খুব সুস্পষ্ট। এই গীতগুলির মূল পুঁথিতে এবং শাস্ত্রী-মহাশয়ের সংস্করণেও প্রতি পদের প্রত্যেক দুইলাইনের শেষে "ধ্রু" এই শব্দটির উল্লেখ আছে। "ধ্রু" যে ধ্রুবপদের সংকেত ইহাতে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। কয়েকটি পদের সংস্কৃত টীকাতেই 'ধ্রুবপদেন দৃঢ়ীকুর্বন', 'ধ্রুবপদেন চতুর্থানন্দ-মুদ্দীপয়ন্নাহ' ইত্যাদি ব্যাখ্যা বর্তমান ; কিন্তু মূল গীতে দ্বিতীয় পদটিকে বলা হইয়াছে ধ্রুবপদ, অথচ সংস্কৃত টীকায় ধ্রুবপদ বলা হইয়াছে তৃতীয় পদটিকে,এবং তাহাকেই দ্বিতীয় পদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বুঝিতে কিছু অসুবিধা নাই যে, প্রথম পদের পর যে পদ তাহাই ধ্রুবপদ বা বাঙলা ধুয়া। তিব্বতী টীকায়ও এই পদটিকে বলা হইয়াছে "ধ্রু পদ"। ইহার অর্থই যে, প্রত্যেকটি পদ গাহিবার পরই এই 'ধ্রু বা ধ্রুবপদটি গাহিতে হইত। এই পদটিই বর্তমান উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতির 'স্থায়ী' পদ। চর্যাপদগুলির ভাব-বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায় এই ধ্রুবপদটিতেই সহজ-সাধনের সূত্রটি ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সাধককে সতর্ক করা হইয়াছে। সেই জন্যই প্রত্যেক পদ গাহিবার পরে বারবার এই পদই গাহিবার নির্দেশ ছিল, গায়কের এবং শ্রোতার বুদ্ধি ও দৃষ্টিকে বারবার ঐ দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতিতে 'স্থায়ী'র কাজও একই ; স্থায়ীতেই বিশিষ্ট রাগটির প্রধান স্বর-সন্নিবেশ, এবং এই সন্নিবেশই রাগটির মনচিত্রের কেন্দ্রবিন্দু। কাজেই বারবার স্থায়ীতে ফিরিয়া আসা প্রয়োজন, শ্রোতার মন ও দৃষ্টিকে ঐদিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য।

গীতগোবিন্দের রাগ ও তাল

জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদগুলিও রাগে-তালে গাওয়া হইত, এ-তথ্য সুপরিজ্ঞাত। গ্রন্থটির সমস্ত পাণ্ডুলিপিতেই রাগ ও তালের উল্লেখ আছে। এই গানগুলিতে ব্যবহৃত রাগের ও তালের সংখ্যা যথাক্রমে ১১ ও ৫ : মালব-রাগ—রূপকতাল, যতিতাল ; গুর্জরী রাগ—নিঃসার তাল, যতিতাল, একতালী ; বসন্ত-রাগ—যতিতাল ; রামকিরী—যতিতাল ; কর্ণাট রাগ—যতিতাল ; দেশাগ-রাগ (দেশাখ)—একতালী ; দেশ-বরাড়ী-রাগ—রূপক-তাল, অষ্টতালী ; বরাড়ী রাগ—রূপকতাল ; গোণ্ডকিরী রাগ—রূপকতাল ; ভৈরবী রাগ—যতিতাল ; বিভাষ-রাগ—একতালী। মালব নিঃসন্দেহে মালবশ্রী-মালসী-মালশ্রী, এবং গোড়ায় ছিল স্থানীয় লোকায়ত গানের রাগ, পরবর্তী কালে মার্গ-সঙ্গীতে স্বীকৃত ও

গৃহীত হয়। গুর্জরী-রাগের কথা চর্যাগীতি-প্রসঙ্গেই বলিয়াছি। বসন্ত-ভৈরবী-বিভাষ প্রভৃতি রাগ ত আজও সুপ্রসিদ্ধ ও সুঅভ্যস্ত। রামকিরী, রামক্রী রামগিরি একই রাগের বিভিন্ন নামরূপ। বরাড়ী ও দেশাখ (দেশাগ) বা দেশ-রাগের মিশ্রিত রূপ দেশ-বরাড়ী, এরূপ অনুমানে বাধা দেখিতেছি না। রামকিরীরাগের নামানুসরণে গোণ্ডকিরী খুব সম্ভব প্রাচীনতর গোণ্ডক্রী নামের অপভ্রংশ, এবং মনে হয়, আদিম গোন্দ্ বা গোণ্ড্‌জনদের স্থানীয় লোকায়ত গানের রাগ। বাঙলাদেশে কর্ণাট-রাগের ব্যবহারের ইঙ্গিত জয়দেবের মত লোচন-পণ্ডিতও দিতেছেন ; ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। জয়দেব ছিলেন লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি আর লোচন-পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিনী রচিত হইয়াছিল বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভকালে, বোধ হয় সেন-রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায়। আর, সেন-বংশীয় রাজারা তো আদিতে কর্ণাটদেশবাসীই ছিলেন। দক্ষিণী কর্ণাটী সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি ক্ষীণধারার পরিচয় প্রাচীন বাংলাদেশে আছে, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। গীতগোবিন্দের গানের তালগুলির মধ্যে অন্তত নিঃসার-তালের কথা পরবর্তী কালে কোথাও শুনিতেছিনা। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বলিতেছেন, "যে-সব ঘরানাতে জয়দেবের গান সংরক্ষিত আছে, সেখানে গীতগোবিন্দের গান শিখিতে গিয়া বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব সঙ্গীতাধ্যাপক মহারাষ্ট্রদেশীয় পণ্ডিত ভীমরাও-শাস্ত্রী তাহার স্বরলিপি ও তালের বাঁট লইয়া আসেন। সেই বাঁট দেখিয়া আচার্য ভাতখণ্ডে বলেন, 'এ কি! এ-সব যে মালাবারের জিনিস!' বস্তুত, সমসাময়িক বাঙলার সঙ্গীত-সাধনায় দক্ষিণী প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। লোচনের রাগতরঙ্গিনী-গ্রন্থেও সে-প্রভাব অনস্বীকার্য। সে-কথা পরে বলিতেছি। হয়তো নৃত্যেও সে-প্রভাব ছিল, বিশেষত দেবদাসী নৃত্যে ; সমসাময়িক কালে বাঙলাদেশের রাজসভায় ও অভিজাত স্তরে এই নৃত্য, বাররামাদের নৃত্য প্রভৃতি বহুল প্রচলিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে, শিখদের শ্রীগুরু-গ্রন্থে জয়দেবের যে গান দুইটি উদ্ধার করা আছে সে দু'টি যথাক্রমে গুজরী বা গুর্জরী এবং মারূ (মরুবাসী মাড়বারীদের স্থানীয় লৌকিক) রাগে গাওয়া হইত।

তুম্বুরুনাটক গ্রন্থ ও প্রাচ্যরীতি

চর্যাগীতির রাগতালিকা এবং গীতগোবিন্দের রাগ ও তাল-তালিকা বিশ্লেষণ করিলে সহজেই মনে হয়, সমসাময়িক বাঙলাদেশে সঙ্গীতচর্চার অপ্রাচুর্য ছিল না, এবং সর্বভারতীয় মার্গসঙ্গীত-প্রবাহের সঙ্গে বাঙলাদেশের যোগও ছিল ঘনিষ্ঠ। সেইজন্যই মনে হয়, সঙ্গীতশাস্ত্র লইয়াও কিছু না কিছু আলোচনা নিশ্চয়ই হইয়া থাকিবে। লোচন-পণ্ডিত রাগতরঙ্গিণী-গ্রন্থে প্রাচীনতর তুম্বুরুনাটক-গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই ; তবে মনে হয়, কোনো বিশেষ নাট্যশাস্ত্রসম্পর্কিত গ্রন্থ

ছিল এই তুম্বুরু নাটক। লোচন এই গ্রন্থ হইতে কিছু মতামত উদ্ধার করিয়াছেন ; একটি উক্তিতে আছে ঃ

ইন্দুত্থানং সমারভ্য যাবদ্দুর্গামহোৎসবম্
প্রাতর্গেয়স্তু দেশাখ্যো ললিতঃ পটমঞ্জরী ॥

এই যে শুক্লপক্ষের (দেবীপক্ষে) সূচনা হইতে দুর্গামহোৎসব পর্যন্ত প্রাতঃকালে দেশাখ, ললিত ও পটমঞ্জরী রাগে গান গাওয়া, এ যেন একান্তই বাঙালীর দুর্গাপূজার আগের কয়েকদিনের আগমনী গান, এবং রাগগুলিও সেই দিক হইতে লক্ষ্য করিবার মতন। এই ভাবে দুর্গামহোৎসব তো আর কোথাও হয় না, বা হইত না ! সেইজন্যই মনে হয় গ্রন্থকার যিনিই হউন, তিনি প্রাচ্য দেশ, বিশেষভাবে গৌড়-বঙ্গের কথাই যেন বলিতেছেন ! সঙ্গীত সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে,

দেশভাষাবিভেদাশ্চ রাগসংখ্যা ন বিদ্যতে।
ন রাগাণাং ন তালানামান্তঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ॥

দেশভাষা যেমন স্বল্প বিভেদে অনন্ত, তেমনই রাগের সংখ্যাও অনন্ত ; রাগ ও তালের অন্ত কোথাও দেখা যায় না। ইহাই প্রাচ্যদেশীয় মত। রক্ষণশীল উৎকট মার্গপন্থীরা আজও এই মত স্বীকার করেন না, আগেও করিতেন বলিয়া মনে হয় না। সঙ্গীতের দিক হইতে তম্বুরু নাটক গ্রন্থের মতামত অন্যকারণেও উল্লেখযোগ্য। মার্গ-সঙ্গীতের ধারায় বিশেষ বিশেষ রাগ-রাগিণীর জন্য বিশেষ বিশেষ কাল শাস্ত্রানুসারে নির্দিষ্ট। তুম্বুরুনাটকের রচয়িতা কিন্তু এই মত স্বীকার করিতেন না ; তাঁহার মতে, রাগের কাল স্থিরীকৃত হয় স্বরবৈচিত্র্যের রঞ্জকতা অনুযায়ী।

যথাকালে সমারব্ধং গীতং ভবতি রংজকম্।
অতঃ স্বরস্য নিয়মাদ্ রাগেঽপি নিয়মঃ কৃত ॥

নাট্যরঙ্গমঞ্চে বা রাজসভায়ও কালদোষ থাকিতে পারে না (রঙ্গভূমৌ নৃপাজ্ঞায়াং কালদোষো ন বিদ্যতে), কারণ, রঙ্গভূমিতে গান গাহিতে হয় নাটকের প্রকরণ বা কালানুযায়ী এবং রাজসভায় রাজার আজ্ঞায়।

বুদ্ধনাটকের নৃত্যগীত

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে চর্যাগীতিতে বুদ্ধনাটকের কথা। কিন্তু এই নাটকের কি ছিল রূপ এবং নৃত্যগীতের কি ছিল স্থান, কি-ই বা ছিল তাহাদের প্রকৃতি, বলিবার কোনো উপায় নাই। কিন্তু প্রাচীনকালে নৃত্য বা নৃত্ত ছাড়া নাটক ছিল না ; কাজেই বুদ্ধনাটকই হউক আর তুম্বুরুনাট্যই হউক, নৃত্য ছিলই, বাদ্যও ছিল এই অনুমানে বাধা নাই। বিশেষত, আলোচ্য চর্যাগীতিতেই পাইতেছি, 'নাচন্তি বাজিল গাঅন্তি দেবী, বুদ্ধনাটক বিসমা হোই'।

লোচনের রাগতরঙ্গিনী

প্রাচীন বাঙলায় সঙ্গীত-শাস্ত্রালোচনার একমাত্র নিদর্শন যাহা আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা লোচন-পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিনী। এই গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে, লোচন রাগতরঙ্গিনী ছাড়া আরও অন্তত একখানা সঙ্গীত-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; তাহার নাম ছিল রাগসংগীতসংগ্রহ, কিন্তু সে-গ্রন্থ এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই (এতেষাং প্রপঞ্চস্তু মৎকৃতরাগসংগীতসংগ্রহে অন্বেষ্টব্যঃ)। তাঁহার কালে অন্য পণ্ডিতদের রচিত আরও অনেক সঙ্গীতশাস্ত্রের কথা লোচন ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু সে-সব গ্রন্থের একটিও আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বস্তুত, লোচনের রাগতরঙ্গিনী এবং শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত-রত্নাকরের চেয়ে প্রাচীনতর কোনো সঙ্গীত-গ্রন্থের কথাই আমরা জানিনা।

লোচনের রাগতরঙ্গিনী-গ্রন্থে দেশী ভাষার গানের নমুনা হিসাবে মৈথিল অপভ্রংশে রচিত শ্রীবিদ্যাপতির মৈথিলগীতি উদ্ধার করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এই গ্রন্থে অমীর খুসরু (ত্রয়োদশ শতকের শেষ, চতুর্দশ শতকের গোড়ায়) বা তাঁহার কিছু পরে প্রচলিত ইমন্‌, ফির্‌দোস্ত্‌ প্রভৃতি রাগের নাম আছে। সেই হেতু পণ্ডিতেরা অনেকে মনে করেন, লোচন চতুর্দশ শতকের আগের লোক হইতে পারেন না। কিন্তু আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, লোচন-পণ্ডিত বল্লালসেনের আমলের লোক ছিলেন এবং ১০৮২ শকাব্দ=১১৬০ খ্রীষ্ট বৎসরে বল্লালসেনের রাজত্বের প্রথম বৎসরে লোচন পণ্ডিত রাগতরঙ্গিনী-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; বিদ্যাপতির গান বা ইমন্‌ ও ফির্‌দোস্ত-রাগের কথা প্রভৃতি পরবর্তী কালে এই গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থের পুষ্পিকা শ্লোকটি সুস্পষ্ট।

ভুজবসুদশমিতশাকে শ্রীমদ্‌ বল্লালসেনরাজ্যাদৌ।
বর্ষৈকষষ্টিভোগে মুনয়স্ত্বাসন বিশাখায়াম্‌ ॥

এই হিসাবে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভে ১০৮২ শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছিল। ১০৮২ শক=১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে যে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভের কাল তাহা অন্য স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সাক্ষ্য দ্বারাও সমর্থিত। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেই সব সাক্ষ্যেরও বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

স্বর ও স্বরসংস্থান

গ্রন্থারম্ভেই লোচন স্বরসংস্থান সংজ্ঞার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শুদ্ধ স্বর সাতটি এবং তাহা বাইশটি শ্রুতির মধ্যে যথাস্থানে অধিষ্ঠিত ; বিকৃত স্বর হইল শুদ্ধ স্বরের তীব্র বা কোমল রূপ মাত্র ; কাজেই শুদ্ধ স্বরেরই দাবি মান্য এবং সাতটি শুদ্ধ স্বরই তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার ব্যবহৃত বিকৃত স্বর হইতেছে কোমল ঋষভ, তীব্রতর গান্ধার, তীব্রতর মধ্যম, কোমল ধৈবত এবং তীব্রতর নিষাদ ; বিকৃত স্বরকে তিনি বলিতেছেন কাকলী। পূরবা বা পূরবীতে লোচন নিজে তীব্র ধৈবত ব্যবহার

করিয়াছেন। যে সব তালের (চঞ্চৎপুট, চাচপুট ইত্যাদি) কথা তিনি বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ বা অভ্যাস পরবর্তীকালে দেখা যাইতেছে না।

জনক ও জন্য-রাগ

লোচনের মতে প্রাচ্যদেশে প্রচলিত রাগ বারোটি মাত্র, ইহাদের প্রত্যেকটিরই নাম ও লক্ষণও তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। এই বারোটি রাগই [ভৈরবী, গৌরী (গৌড়ী ?), কর্ণাট, কেদার, ইমন্, সারঙ্গ, মেঘ ধানশ্রী বা ধনাশ্রী, টোড়ী, পূর্বা, মুখারী ও দীপক] জনক-রাগ, এবং এই জনক-রাগ কয়টি হইতেই অন্যান্য অনেক রাগের উৎপত্তি—সে গুলি হইতেছে জন্য-রাগ, যেমন ভৈরবী হইতে দুইটি, কর্ণাট হইতে কুড়িটি, গৌরী হইতে সাতাশটি, ইমন্ হইতে চারিটি, কেদার হইতে তেরোটি, সারঙ্গ হইতে পাঁচটি, মেঘ হইতে দশটি, ধনাশ্রী বা ধানশ্রী হইতে দুইটি, এবং টোড়ী, পূর্বা, মুখারী ও দীপক এই চারিটির প্রত্যেকটি হইতে এক একটি, এই মোট ৮৬ টি জন্য-রাগ। পূরবা বা পূর্বা=পূরবী, সন্দেহ নাই ; কিন্তু মুখারী রাগ আজ অপ্রচলিত। এই জন্য রাগ গুলির লক্ষণ অর্থাৎ আরোহ-অবরোহ সম্বন্ধে লোচন কিছু আলোচনা করেন নাই, অন্যত্র দেখিয়া লইতে বলিয়াছেন।

লোচনের জনক ও জন্য-রাগের প্রকরণটি পড়িলে পরিষ্কার বুঝা যায়, নানা রাগের মিশ্রণে নূতন নূতন রাগ সৃষ্ট হইত ; আবার সেই সব মিশ্ররাগের মিশ্রণেও নূতন নূতন সংকর-রাগের উদ্ভব ঘটিত। লোচন তাহা জানিতেন, এবং সেই জন্যই তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকরণ হইল সকল দেশে গুণীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ যত মিশ্র ও সংকর-রাগ তাহাদের নামোল্লেখ এবং তাহাদের জনক রাগের নির্দেশ।

লোচনের সময়ই বিভিন্ন রাগের ঠাট্-কাঠামো লইয়া কিছু কিছু মতভেদ দেখা দিয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, লোচন মনে করিতেন, ভৈরবীতে শুদ্ধ সপ্তস্বর ব্যবহার করাই সঙ্গত ; কিন্তু তখনই কেহ কেহ ভৈরবী-রাগে কোমল ধৈবত ব্যবহার করিতেন। লোচন তাহা পছন্দ করিতেন না, কারণ তাঁহার মতে তাহা অশুদ্ধ এবং যথেষ্ট চিত্তরঞ্জকও নয়। কোন্ কোন্ রাগ কখন গাওয়া হইবে সে-সম্বন্ধেও কিছু কিছু মতভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল ; লোচন তাহা আলোচনা করিতে গিয়া তুম্বুরুনাটক-গ্রন্থের মতামত উদ্ধার করিয়া তাহাই সমর্থন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাগ ও তাল

চর্যাগীতি-লোচন-জয়দেবের পর বহুদিন বাঙলাদেশে প্রচলিত মার্গবদ্ধ রাগ-রাগিণী গুলির পরিচয় আর পাইতেছি না। প্রায় আড়াই-শ' তিন-শ' বৎসর পর বড়ু চণ্ডীদাস-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদগুলি যে-সব রাগে ও তালে গাওয়া হইত তাহার সুবিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপিতেই। তুলনার সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া

রাগগুলির নামোল্লেখ এখানে করিতেছি ঃ কোড়া, কোড়া-দেশাগ, বরাড়ী, দেশ-বরাড়ী, কহ্নু (কহ্নু)-গুজ্জরী (গুর্জরী) বিভাষ, বিভাষ-কহ্নু, বঙ্গাল, বঙ্গাল-বরাড়ী, গুজ্জরী (গুর্জরী), পাহাড়িয়া (নিঃসন্দেহে লোকায়ত রাগ), দেশাগ (দেশাখ), আহের (আহীরী, অর্থাৎ আভীর বা আহীর কৌমের লোকায়ত সঙ্গীতের রাগ ?), রামগিরি (রামক্রী=রামকেলী), ধানুষী (ধানশ্রী), মালব (মালবশ্রী=মালশ্রী=মালসী), বেলবলী, কেদার, মল্লার, ভাটিয়ালী (নিঃসন্দেহে লোকায়ত সঙ্গীতের রাগ), ললিত, মাহারঠা (মহারাষ্ট্র-প্রান্তের স্থানীয় লোকায়ত রাগ ?), শৌরী (শৌরসেনী, অর্থাৎ শূরসেন অঞ্চলের স্থানীয় লোকায়ত রাগ ?), বসন্ত, ভৈরবী, শ্রী, সিন্ধোড়া (পরবর্তী হিন্দোলা ; গোড়ায় কি সিন্ধু প্রান্তের স্থানীয় লোকায়ত রাগ ?) , পঠ (পট) মঞ্জরী । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদগুলির তাল-মান-লয়ের পরিচয়ও সবিস্তারেই পাইতেছি । তালের মধ্যে যতি, একতাল, অষ্টতাল, রূপক, আড়ুকক, লঘুশেখর, ক্রীড়া প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে । রাগের তালিকাটি একটু মনোযোগে বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, বাঙলা দেশের উচ্চস্তরের গানে ভারতের নানা প্রান্তের লোকায়ত সঙ্গীতের সুর ইত্যাদি যেমন স্থান লাভ করিতেছিল, তেমনই ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গেও ক্রমশ লোকায়ত সঙ্গীতে ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল । প্রাচীন বাঙলাদেশও এই সমন্বয়-ক্রিয়া হইতে বাদ পড়ে নাই, কিংবা উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীত-প্রবাহ হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে নাই ; অন্তত দশম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে-সব সাক্ষ্য বিদ্যমান তাহাতে এই তথ্য সুস্পষ্ট ।

নৃত্য-গীত-বাদ্য

বাদ্যযন্ত্রাদির কথা আগে অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি ; এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া লাভ নাই । তবে, নৃত্যগীতবাদ্য সম্বন্ধে চর্যাগীতিতে পটমঞ্জরী রাগে গেয় একটি গান আছে ; সেটি উদ্ধার করিতেছি ।

সুজ লাউ সসি লাগেলী তান্তী
অণহা দাণ্ডী চাকি কিঅত অবধূতী ।
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা
সুন-তান্তি-ধনি বিলসই রুণা । ধ্রু ।
আলি কালি বেণি সারি সুনিআ
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ ।
জবে করহা করহকলে চাপিউ ॥
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই ॥

সূর্য লাউ, শশী লাগিল তন্ত্রী, অনাহত দাণ্ডী, অবধূতী হইল চাকী। হে সখি! অনাহত বীণা বাজিতেছে, শূন্য তন্ত্রীর ধ্বনি বিলসিত হইতেছে ক্ষীণ সুরে। অ-বর্গ ও ক-বর্গ দুও শোনা যাইতেছে সারিকা (বা সপ্তস্বর)। গজবরের সমরস সন্ধি গোনা হইল। যখন হাতে করভফল চাপা হইল তখন বত্রিশ তন্ত্রীর ধ্বনি সকল দিকে বিত হইল। বাজিল (হেবজ্র) নাচিতেছেন, দেবী গাহিতেছেন, বুদ্ধনাটক বিসম হইতেছে।

লাউ-এর খোলের সাহায্যে তারের বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন, সপ্তস্বর, সুরের বিলাস, বত্রিশটি তার, সনৃত্য গান সমস্তই এই গীতটিতে সুস্পষ্ট। জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতীও তো স্বামীর গীতগোবিন্দ গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে নাচিতেন, এমন জনশ্রুতি বিদ্যমান; সেই জনশ্রুতি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে কোচবিহার-রাজ নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজের সভাকবি রাম-সরস্বতী তাঁহার জয়দেব-কাব্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

> জয়দেব মাধবর স্তুতিক বর্ণাবে,
> পদ্মাবতী আগত নাচন্ত ভঙ্গিভাবে।…
> কৃষ্ণর গীতক জয়দেব নিগদতি,
> রূপক তালর চেবে পদ্মাবতী॥

নৃত্যের নানা লোকায়ত রূপের পরিচয় পাওয়া যায় পাহাড়পুর এবং ময়নামতীতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকগুলিতে; আর উচ্চকোটি-লোকসমাজে যে ধরনের নৃত্য প্রচলিত ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় সমসাময়িক প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ নৃত্যপর ও নৃত্যপরা নানা দেবদেবী, অপ্সরা গন্ধর্ব-নারী, মন্দির-নর্তকী প্রভৃতিদের নৃত্যের গতিতে ও ভঙ্গিমায়।

৩

তক্ষণ-শিল্প প্রাথমিক বিকাশ ও ক্লাসিক্যালপর্ব

পোড়ামাটি, পাথর ও মিশ্রধাতুর, কচিৎ কখনও কাঠের তৈরি ভাস্কর বা তক্ষণ-শিল্পের যে-সব শিল্প-নিদর্শন বিগত প্রায় শতবর্ষ যাবৎ নানা ব্যক্তিগত, প্রতিষ্ঠানিক ও সরকারী চিত্রশালায় সংগৃহীত হইয়াছে, আজও হইতেছে, আজও যত নিদর্শন বাঙলার মাঠে-ঘাটে ঝাড়ে-জঙ্গলে পড়িয়া আছে—অজ্ঞতায়, অনাদরে, অবহেলায় তাহার প্রায় সমস্তই এক সময় ছিল কোনো না কোনো মন্দির বা বিহারের অংশ—গর্ভগৃহের দেবদেবী, প্রাচীর-গাত্র, কুলুঙ্গি বা দরজার অলংকরণ। এ-ধরনের বিহার ও মন্দিরের কথা যে পরিমাণে সমসাময়িক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, সাহিত্য ও লিপিপাঠ করা যায় সেই পরিমাণে

ইহাদের সাক্ষাৎ আজ আর পাওয়া যায় না ; পাথর বা পোড়ামাটি বলিয়া তক্ষণ-শিল্পের নিদর্শনগুলি ইতস্তত পড়িয়া আছে মাত্র, ভগ্ন বা অল্পাবিস্তর অক্ষত অবস্থায়। ধাতব নিদর্শনগুলির অধিকাংশই মানুষ লোভের বসে গালাইয়া ফেলিয়াছে। কাজেই, স্বাভাবিক ও মৌলিক উদ্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে আজ আর ইহাদের সাক্ষাৎ পাইবার উপায় নাই, এবং সেই হেতু ইহাদের যথার্থ শিল্পরূপও আর আমাদের দৃষ্টি-গোচর নয়। ব্যক্তিগত সংগ্রহে বা সাধারণ চিত্রশালায় ইহাদের পরিপূর্ণ রসোপলব্ধি, এমন কি রূপবোধও কিছুতেই সম্ভব নয় ; এ-ভাবে, এ-পরিবেশে দেখিবার জন্য বা আমাদের জ্ঞানের কৌতূহল বা চিত্তের রূপতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার জন্য ইহাদের সৃষ্টি হয় নাই, হইয়াছিল একটা বিশেষ প্রেরণায়, বিশেষ পরিবেশে, বিশিষ্ট একটা উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য। সে প্রেরণা ধর্মবোধগত—আমাদের প্রচলিত অর্থে নন্দনবোধগত নয় ; সে-পরিবেশ বিশিষ্ট সমাজের ও সম্প্রদায়ের সামগ্রিক ঐক্য ও মিলনবোধগত, কারণ, পূজামন্দির বা তীর্থস্থানগুলিই ছিল সেই ঐক্য ও মিলনের কেন্দ্র, এবং সেই উদ্দেশ্য হইতেছে সমাজ ও সম্প্রদায়গত ধর্ম ও ঐক্যবোধে ব্যক্তি ও সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা, সচেতন করা। এই প্রেরণা, পরিবেশ বা উদ্দেশ্য কিছুই আজ আর উপস্থিত নাই ; কাজেই সাম্প্রতিক মানুষের পক্ষে ইহাদের যথার্থ মূল্য ও আবেদনের পরিমাপ করা অত্যন্ত কঠিন। তবু, সবিনয়ে একথা স্বীকার করা ভাল যে, যে-শৈলী ও রীতি-বিবর্তনের দিক হইতে বা নন্দনবোধের দিক হইতে আমরা সাধারণত ইহাদের মূল্যবিচার করিয়া থাকি তাহাই ইহাদের সর্বাঙ্গীন পরিচয় নয়, এমন কি প্রধান পরিচয়ও নয়। শিল্প সম্বন্ধে এই একান্ত রূপগত ও ইন্দ্রিয়গত দৃষ্টি একেবারেই সাম্প্রতিক কালের।

তাহা ছাড়া, ঘরে বসিয়া বা চিত্রশালায় ঘুরিয়া আমরা ইহাদের যে-রূপ প্রত্যক্ষ করি তাহা ইহাদের উদ্দিষ্ট রূপও তো নয়। যে-মূর্তির পূজা হইত তাহা থাকিত গর্ভ-গৃহের অন্ধকারে বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত ; তাহার উপর পড়িত প্রদীপের ক্ষীণ আলো। সেই প্রায়ান্ধকারে স্তিমিত আলোর জ্যোতির মধ্যে ভক্ত ও পূজারীর সম্মুখে দেবতা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেন—নিবাত নিষ্কম্প শিখার পেলব আলোয় প্রস্তরীভূত দেহে ধীরে ধীরে প্রাণের স্পর্শ লাগিত, দেহের রেখা ও ভঙ্গী ধূপের ধোঁয়ার মধ্যে ধরা-অধরার দোলায় দুলিত। তাহারই ভিতর দেবতার মুখমণ্ডল থাকিত স্থির ও অচঞ্চল। শিল্পীর এই তথ্য অজানা ছিল না ; এবং সেই অনুযায়ীই তিনি পূজাবেদীর উদ্দিষ্ট মূর্তির রূপ-কল্পনা করিতেন, এবং কল্পনা ও ধ্যানানুযায়ী পাথরে বা ধাতুতে সেই রূপ ফুটাইয়া তুলিতেন, যে-রূপ কালজয়ী, যে-রূপ মানুষের মৌলিক ভাবনা-কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর, যে-সব মূর্তি ও অলংকরণ থাকিত মন্দিরের বাহিরে প্রাচীর-গাত্রে তাহাদের রূপ-কল্পনা অন্য প্রকারের, অন্য দৃষ্টির ; কারণ, তাহাদের উপর পড়িত সারাদিনের সূর্যের আলো, কখনো রক্তিমাভায়, কখনো ছায়ায়, কখনো প্রদীপ্ত কিরণবাণে। সেখানে নিত্য, সংসারের

অফুরন্ত লীল ; দেবতা-মানুষ-পশুপক্ষী-গাছপালা সকলে মিলিয়া অনন্তকাল ধরিয়া যে-জীবনলীলায় মাতিয়াছে তাহারই গতিময় ভঙ্গিমা, ছন্দিত ছবি। তাহার উপর কালাতীত জীবনের স্বাক্ষর যেমন সুস্পষ্ট তেমনই সুস্পষ্ট কালধৃত জীবনের হস্তাবলেপ। কোনোটিই উপেক্ষার বস্তু নয়। অথচ, ঘরে বা চিত্রশালায় ইহাদের সেই উদ্দিষ্ট রূপ ধরা পড়িবার উপায় একেবারেই নাই, এমন কি সাম্প্রতিক কালের চেতনা-কল্পনার মধ্যেও তাহা নাই। ধর্মগত ও সামাজিক, স্থানগত ও কালগত, অর্থ ও উদ্দেশ্যগত সমস্ত পরিবেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া আজ ইহাদের মূল্য শুধু আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, হয় ইহাদের নন্দনত্ব গুণে, না হয় প্রতিমা-লক্ষণের অভিজ্ঞানে। অথচ, সেই নন্দনত্বও সবটুকু আমাদের চোখে ধরা পড়িতেছে না!

সাধারণ ভাবে এই কয়েকটি কথা মনে রাখিয়া প্রাচীন বাঙলার তক্ষণ-শিল্পালোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই উষ্ণ, জলীয়, বৃষ্টিস্নাত, নদীবিধৌত বাঙলাদেশে সুপ্রাচীন নিদর্শন যে পাওয়া যাইতেছে না, তাহা কিছু অস্বাভাবিক নয়, অন্যান্য কারণের ইঙ্গিত আগেই দিয়াছি। খ্রীষ্টোত্তর ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের আগেকার নিদর্শন যাহা পাওয়া গিয়াছে, সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এ ক্ষেত্রেও তাহা স্বল্পই। স্বল্পতার প্রধান কারণ, দেশের মাটি ও জলবায়ু, পাথরের অপ্রাচুর্য, যথাযথ খননাবিষ্কারের অভাব, কিন্তু সর্বোপরি যে-কারণ ছিল সক্রিয় তাহা ঐতিহাসিক। প্রাচীন বাঙলাদেশে আর্য-সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ স্পর্শ খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের আগে ভাল করিয়া লাগেই নাই, এবং সেই সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল মধ্যদেশের সঙ্গে যোগাযোগও খুব ঘনিষ্ঠ হইয়া ওঠে নাই। তাহার আগে আদিম কোম-সন্নিবিষ্ট রাঢ়-পুণ্ড্র-সুহ্ম-বঙ্গ প্রভৃতি জনপদ নিজেদের সমাজ-সংস্থা, নিজেদের শিল্প ও সংস্কৃতি, নিজেদের জীবনযাত্রা লইয়া ভারতবর্ষের এক ধারে পড়িয়াছিল, আর্যমনের অবজ্ঞা ও অজ্ঞতায়। মাঝে মাঝে আর্যীকরণের এবং ভারতবর্ষের সামগ্রিক জীবনধারার স্রোতের মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা যে হয় নাই, এমন নয়; কিন্তু আদিম কোম মনের স্বাভাবিক প্রবণতাই ছিল সে-স্রোতকে যতটা সম্ভব ঠেকাইয়া রাখা। এই সব কোম নরনারীর নিজেদের শিল্প কিছু ছিল না এমন নয়; কিন্তু আগেই বলিয়াছি, সে-সব শিল্পের উপাদান-উপকরণ ছিল ক্ষীণজীবী—মাটি, খড়, বাঁশ, বড় জোর কাঠ। কাজেই সে-সব নিদর্শন কালের ও প্রকৃতির হাত এড়াইয়া আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছায় নাই, যদিও তাহাদের ঐতিহ্য ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্য আজও অব্যাহত। ভারতবর্ষে আমরা পাথর কুঁদিতে শিখিয়াছি মাত্র মৌর্য-আমলে বা হয়তো তাহার কিছু আগে; কিন্তু সেই শিক্ষা বাঙলাদেশে আসিয়া পৌঁছিতে এবং বহুল প্রচলিত হইতে আরও কয়েক শত বৎসর লাগিয়াছিল। ধাতু গলাইয়া মূর্তি গড়িবার কৌশল বোধ হয় শিখিয়াছি খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে। গুপ্ত-পর্বের আগে কিছু কিছু নিদর্শন বাঙলাদেশের নানা জায়গায় পাওয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার বেশির ভাগই

পোড়ামাটির অথবা ছোট ছোট টুকরো পাথরের, এবং সেই হেতু এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় সহজেই বহন করিয়া লইয়া যাইবার মত। কাজেই জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই যে, এই নিদর্শনগুলি বাঙলার বাহির হইতে—মধ্যদেশ হইতে—সমসাময়িক শিল্পী-ব্যবসায়ী-বণিক প্রভৃতিরা বহন করিয়া আনেন নাই। অন্তত, ইহাদের মধ্যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য কিছু নাই, বরং সমসাময়িক কালের মধ-ভারতীয় শিল্পশৈলীর প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। বস্তুত, সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এ ক্ষেত্রেও তেমনই, এই নিদর্শনগুলিই বাঙলাদেশে মধ্য-ভারতীয় আর্য-সভ্যতা বিস্তৃতির প্রথম পদচিহ্ন।

শুঙ্গ ও কুষাণ শিল্পের ধারা

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক পর্যন্ত সমগ্র গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা ও মধ্য-ভারত জুড়িয়া পোড়ামাটির এক ধরনের শিল্পশৈলী প্রচলিত ছিল। পাটলীপুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মথুরা পর্যন্ত নানা জায়গায়—বসার, রাজঘাট, কৌশাম্বী বা কোসাম, এলাহাবাদ, ভিটা, বক্সার, পাটলীপুত্র ও তাহার উপকণ্ঠ, মথুরা প্রভৃতি স্থানে অল্পবিস্তর পরিমাণে এই শিল্পশৈলীর নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই যৌবনসমৃদ্ধ নরনারীর মূর্তি, বিশেষভাবে নারীমূর্তি, কিছু কিছু শিশুমূর্তিও আছে, কিছু কিছু আছে শুধু শিশু ও নরনারীমুণ্ড। অনেকগুলি মুণ্ডের আকৃতি ও মুখাবয়বে, কেশবিন্যাসে এবং মস্তকাভরণে সমসাময়িক যাবনিক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। কোনো কোনোটিতে যে ব্যক্তিগত অর্থাৎ প্রাতিকৃতিক বৈশিষ্ট্যও নাই, এমন নয়। সন্দেহ নাই যে, সমসাময়িক কালে শিল্পীদের চোখের সম্মুখে এই সব বিদেশীদের যাতায়াত এবং বসবাস ছিল। তাহা ছাড়া, মাটি দ্বারা প্রতিকৃতি রচনার প্রচলনও নিঃসন্দেহে ছিল। এই ধরনের নরনারী মূর্তি ছাড়া নানা চলিত কথা ও কাহিনীর রূপায়ণও অজ্ঞাত ছিল না। কৌশাম্বী, মথুরা এবং অন্যান্য স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে এই ধরনের কাহিনী-বর্ণনাগত ফলকও অনেক পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙলাদেশে পোখরণা (বাঁকুড়া জেলা), তমলুক, মহাস্থান প্রভৃতি প্রত্নভূমি হইতে যে কয়েকটি পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গিয়াছে তাহা ঠিক এই জাতীয় বর্ণনাগত ফলক নহে, বরং তাহাদের আত্মীয়তা পূর্বোক্ত যৌবনগর্বিতা, অলংকারভারগ্রস্তা, আত্মসচেতনা নারীমূর্তিগুলির সঙ্গে। ইহাদের সর্বাঙ্গে স্থূল অথচ বিচিত্র আয়তন ও আকৃতির অলঙ্কার; কেশভার সুপ্রচুর এবং নানা আকারে ও ভঙ্গীতে সেই কেশের বিন্যাস; যৌন ও যৌবনলক্ষণ আয়ত ও উচ্চারিত; স্থিতি ও গতিভঙ্গী সচেতন, বসন স্থূল অথচ সমৃদ্ধ এবং সমসাময়িক রুচি অনুযায়ী সুবিন্যস্ত। এই নারীমূর্তিগুলি উত্তর-ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশেষ একটা স্তরের প্রতীক। রুচি, সংস্কৃতি ও অভ্যাসের দিক হইতে আদিম-কৌম-মানসের স্থূলত্ব ইহাদের এখনও ঘুচে নাই, অথচ ইহারা যে-সমাজের প্রতিনিধি সেই

সমাজের আর্থিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক পরিবেশ ইহাদিগকে দেহগত যৌবন ও সৌন্দর্য, আলংকারিক ঐশ্বর্য এবং যৌন আবেদন সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছে। এই দুই-এর, অর্থাৎ, একদিকে রুচির ও অভ্যাসের স্থূলত্ব, অন্যদিকে দেহ ও অর্থগত সমৃদ্ধির সচেতনতার সহজ সংঘাত ও সমন্বয় দুইই এই মূর্তিগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট। সন্দেহ নাই যে, এই বৈশিষ্ট্য গ্রাম্য কৌম-সমাজের কখনও হইতেই পারে না; সে-সমাজের সহজ সারল্য ও নিরলঙ্কার সৌন্দর্য ইহাদের মধ্যে কোথাও নাই। এমন কি, বরহুতের প্রস্তর স্তূপ-বেষ্টনীর ফলকগুলির নারীমূর্তির মধ্যে বসনভূষণের প্রাচুর্য এবং সমৃদ্ধ কেশবিন্যাস সত্ত্বেও যে সলজ্জ আড়ষ্টতা, যে নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব, যে ভীত মন্থরতার আভাস বর্তমান, এই নারীমূর্তিগুলি সেই স্তর বহুদিন পার হইয়া আসিয়াছে; সেই মানস আর ইহাদের মধ্যে বর্তমান নাই। সেই জন্যই, বহিরাবয়ব বা বসনভূষণ-ভঙ্গিমার দিক হইতে শুঙ্গ আমলের বলিয়া মনে হইলেও বস্তুত ইহারা আরও কিছু পরবর্তী কালের, যে-কালে সমাজের, অন্তত সমাজের একটা বিশিষ্ট স্তরের অর্থসমৃদ্ধি বাড়িয়াছে, প্রাথমিক লজ্জা-ভয়-আড়ষ্টতা কাটিয়া গিয়াছে, সচেতন নগর-সভ্যতা বেশ কিছুটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, সেই বিশেষ স্তরের নারীরা দেহগত ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে, এবং বৃহত্তর সমাজের নানা দেশি-বিদেশি আদান-প্রদানের সম্মুখীন হইয়াছে বা হইতেছে। অথচ, কি রুচি, কি শিল্পরীতি বা ভঙ্গী কোনো দিক হইতেই ইহাদের স্থূলত্ব তখনও ঘুচে নাই। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে যে নাগর-জীবনের আভাস আমরা পাইতেছি সেই সূক্ষ্ম, সুরুচিসম্পন্ন, সচেতন ও বাণিজ্য সমৃদ্ধ অভিজাত নাগর-সমাজ এখনও গড়িয়া উঠে নাই, কিন্তু তাহার সূচনা কেবল দেখা দিতেছে, অর্থাৎ স্থূল কৌম সমাজ ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ ও সচেতন নাগর সমাজে বিবর্তিত হইতেছে মাত্র। এই অবস্থার, সমাজ-বিবর্তনের এই স্তরের ছবিই ধরা পড়িতেছে পোড়ামাটির এই অসংখ্য ফলকগুলিতে বিশেষ ভাবে নারীমূর্তিগুলিতে। বাণিজ্য-সমৃদ্ধির প্রেরণায় ক্রমবর্ধমান নগরগুলির গৃহ-সজ্জায় এই সব মৃৎফলকগুলি ব্যবহৃত হইত, সন্দেহ কি! এই সামাজিক অবস্থার কিছু কিছু স্বাক্ষর পড়িয়াছে সাঁচী স্তূপের প্রস্তর-তোরণের ফলকগুলিতে, স্বল্পাংশে বুদ্ধগয়ার বেষ্টনীর উপর, কিন্তু আরও উচ্চারিত রূপে মথুরার কয়েকটি প্রস্তর-বেষ্টনীর গাত্রে। কিন্তু, এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রুচিবোধ আরও একটু সূক্ষ্ম ও অভিজাত, মন ও দৃষ্টি আরও সচেতন, এবং কারুকলার আঙ্গিক আরও সুনিপুণ। তবে, সামাজিক বিবর্তনের প্রাথমিক স্তরের স্থূলতর প্রমাণ হিসাবে মৃৎফলকগুলির সাক্ষ্য অধিকতর প্রাসঙ্গিক। বাঙলাদেশে যত এ ধরণের নিদর্শন মৃৎকলা পাওয়া গিয়াছে তাহার সঙ্গে কৌশাম্বী-পাটলীপুত্র-বসাঢ় প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও খ্রীষ্টোত্তর প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের ফলকগুলির আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ। কিন্তু সংখ্যায় এত স্বল্প যে, ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া বলা কঠিন, সমাজ-বিবর্তনের সদ্যোক্ত তরঙ্গ এই সময় বাঙলাদেশেও আসিয়া লাগিয়াছিল কিনা। কিছুটা স্পর্শ হয়তো লাগিয়া থাকিতেও পারে।

পোড়ামাটির এই ফলকগুলি ছাড়া কতকটা কুষাণ শিল্পশৈলীর স্বল্পায়তন কয়েকটি পাথরের মূর্তিও বাঙলা দেশে পাওয়া গিয়াছে। লক্ষ্যণীয় এই যে, সব ক'টিই উত্তর-বঙ্গীয়, এবং কুষাণ শিল্পশৈলীর কেন্দ্র মথুরার স্থানীয় লাল বালি-পাথরে তৈরী নয়। সেই জনাই এ-অনুমান স্বাভাবিক যে, মূর্তিগুলি রচিত হইয়াছিল সমসাময়িক বাঙলা দেশেই। ইহাদের মধ্যে দুইটি সূর্যমূর্তি, পাওয়া গিয়াছে রাজসাহী জেলার নিয়ামতপুর গ্রামে ; একটি বিষ্ণু মূর্তি, প্রাপ্তিস্থান মালদহ জেলার হাঁকরাইল গ্রাম। তিনটি মূর্তিরই অঙ্গরচনা ও বিন্যাস, রেখা ও ডৌল, গতি ও গড়ন একই প্রকার। রচনার ও শিল্পদৃষ্টির আপেক্ষিক স্থূলতা সত্ত্বেও মথুরার কুষাণ ও শক(?)-রাজাদের মর্মর প্রতিকৃতিগুলির সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সে-আত্মীয়তা মূর্তি তিনটির অঙ্গরেখার আকৃতি -প্রকৃতি এবং গড়নেও সুস্পষ্ট। অথচ, ইহারা শক-কুষাণ শিল্পীদের রচনা এ-কথা কিছুতেই বলা চলে না ; বরং ইহাদের অঙ্গভঙ্গীর আড়ষ্টতা এবং গ্রাম্য অনাড়ম্বর প্রকাশ একান্তই আঞ্চলিক। আসল কথা, মধ্যদেশে উচ্চকোটি স্তরে যখন যে শিল্পশৈলীর প্রসার ও প্রচলন তাহার অন্তত কিছুটা তরঙ্গাভিঘাত স্তিমিত বেগে বাঙলাদেশেও আসিয়া লাগিয়াছে; এই মূর্তিগুলিতে তাহারই স্বাক্ষর কতকটা স্থানীয় রূপ ও রুচিদ্বারা প্রভাবিত হইয়া দেখা দিতেছে। বাঙলাদেশে কিছু কিছু কুষাণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে ; এবং মুরুণ্ড কোমের লোকেরা বোধ হয় প্রথম-দ্বিতীয় তৃতীয় শতকের বাঙলাদেশে একেবারে অজ্ঞাত ছিলেন না। কাজেই বাঙলার শিল্পের এই পর্বে শক-কুষাণ শিল্পরীতির কিছুটা প্রভাব দেখা যাইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়।

দিনাজপুর জেলার বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত এবং বর্তমানে কলিকাতা আশুতোষ চিত্রশালায় সংরক্ষিত কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি পোড়ামাটির ফলকে গুপ্তপূর্ব মথুরার, সাধারণভাবে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার শিল্পশৈলীর লক্ষণও সুপরিস্ফুট। মথুরার নারী-মূর্তিগুলির দেহবিলাসের সচেতনতা ও অভিজাত সংবেদন বাণগড় ফলকের নারীমূর্তি-গুলিতে নাই, কিন্তু প্রশস্তমেখলা, পীনপয়োধরা এবং অলংকারবহুলা এই নারীদের অঙ্গ-বিন্যাস একান্তই সেই মধ্যদেশীয় ধারাই অনুসরণ করিয়াছে, বিশেষভাবে মথুরা অঞ্চলের, এবং এই হিসাবে ইহারা পূর্বোক্ত মহাস্থান-পোখরণা-তাম্রলিপ্তির ফলক-চিত্রিত নারীদেরই বংশধর। তবে বাণগড়ের এই স্বল্পাকৃতি নারীমূর্তিগুলিতে সমসাময়িক ও ভাবীকালের ইঙ্গিতও সমান প্রত্যক্ষ। সে-ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে ইহাদের ঈষদানত পয়োধরের মসৃণ ডৌলে, সুডৌল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, গড়নের আপেক্ষিক মসৃণতায় এবং সৌকুমার্যে। ইহাদের মধ্যে যেন গুপ্ত আমলের রুচি ও রূপাদর্শের দূরাগত ক্ষীণ পদধ্বনি শোনা যাইতেছে।

গুপ্ত-পর্বের বৈশিষ্ট্য

মথুরার শক-কুষাণ তক্ষণশৈলীর কালগত স্বাভাবিক পরিণতি গুপ্তপর্বের তক্ষণ শৈলীতে। গুপ্ত-শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্র ছিল সারনাথ কিন্তু প্রভাবের ও ঐতিহ্যের বিস্তৃতি ছিল পূর্বপ্রান্তে তেজপুর হইতে পশ্চিমে গুজরাট-মহারাষ্ট্র পর্যন্ত, এবং কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত। মথুরার ভারী, দৃঢ়, স্থূল, একান্ত ইহগত এবং সূক্ষ্মানুভূতিবিহীন বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বই ক্রমশ গুপ্ত আমলের সূক্ষ্ম মার্জিত পেলব, ধ্যানকেন্দ্রিক, যোগগর্ভ বুদ্ধবোধিসত্ত্ব মূর্তিতে, বিষ্ণুমূর্তিতে রূপান্তর লাভ করে। এই রূপান্তরের মধ্যে সমগ্র ভারতীয় বুদ্ধি ও কল্পনার, মনন ও সাধনার সুগভীর ও সুবিস্তৃত ইতিহাস বিবৃত; কিন্তু তাহার আলোচনা এ প্রসঙ্গে অবান্তর। মথুরার বৃহদায়তন মূর্তিগুলি প্রভূত মানবিক দৈহিক শক্তির দ্যোতক, গুপ্ত আমলের অর্থাৎ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকীয় সারনাথের বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বের মূর্তিগুলির আপেক্ষিক আয়তন হ্রস্ব, কিন্তু ইহাদের মানবিক রূপ ও ভঙ্গী ধ্যানযোগের এবং স্বচ্ছতর মনন-কল্পনার স্পর্শে এক অতি সূক্ষ্ম সংবেদনময় অপরূপ অধ্যাত্মভাব ও অলৌকিক রসের দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছে।

সারনাথের প্রভাব পূর্বাঞ্চলে আসামের তেজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এ-কথা আগেই বলিয়াছি। এই প্রভাবের ধারাস্রোত বাঙলাদেশের উপর দিয়াই বহিয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু বাঙলাদেশে প্রাপ্ত সমসাময়িক মূর্তির সংখ্যা খুব বেশি নয়। বিহারৈল গ্রামে প্রাপ্ত চুনারের বালি-পাথরে রচিত একটি বুদ্ধ-প্রতিমায় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকীয় সারনাথের প্রতিধ্বনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই মূর্তিটির মসৃণ, মার্জিত, রমণীয় ডৌল, সুকুমার অঙ্গ-বিন্যাস ও সৌষ্ঠব, শান্ত সৌম্য ধ্যানগম্ভীর দৃষ্টি এবং রেখা প্রবাহের ধীর সংযত গতি একান্তই সমসাময়িক মধ্য-গাঙ্গেয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান। গভীর ধ্যানলব্ধ আনন্দের, চরম জ্ঞান ও উপলব্ধির, পরম পরিতৃপ্তির সহজ, সংযত ও মার্জিত প্রকাশই সারনাথ-শৈলীর বৈশিষ্ট্য; এবং এই বৈশিষ্ট্যই সারনাথের বুদ্ধ-প্রতিমাকে বিহারের সুলতানগঞ্জের বুদ্ধ-মূর্তি অপেক্ষা অথবা রাজগীরের মণিয়ার মঠে দেহ-সচেতন, সুন্দর, পেলব মূর্তিগুলি অপেক্ষা অধিকতর কৌলিন্য দান করিয়াছে। বিহারৈল প্রতিমাটি এই হিসাবে যেন সারনাথ-শৈলীরই একটি স্থানীয় রূপ, একটু কম সূক্ষ্ম, একটু কম পেলব।

সুলতানগঞ্জের ব্রোঞ্জ বুদ্ধ-মূর্তিতে অথবা রাজগীর মণিয়ার-মঠের প্রতিমাগুলিতে সারনাথ শৈলীর যে পূর্বাঞ্চলিক ভাষা প্রত্যক্ষ, সেই ভাষারূপ কতকটা ধরা পড়িয়াছে বগুড়া জেলার দেওড়া গ্রামে প্রাপ্ত সূর্যমূর্তিটিতে। আনুমানিক ষষ্ঠ শতকীয় এই প্রতিমাটির বলিষ্ঠ ত্রিবলীচিহ্ন, অলংকার-বিরলতা, কাঠামোর দৃঢ় সংযত সারল্য, চক্রাকার প্রভামণ্ডল এবং আস্কন্ধবিলম্বিত তরঙ্গায়িত কেশগুচ্ছ নিঃসন্দেহে মধ্য-গাঙ্গেয় গুপ্ত-ঐতিহ্য ও লক্ষণের দ্যোতক, কিন্তু ইহার মাংসল দেহের কবোষ্ণ সংবেদনের মধ্যে এবং চক্ষুর নিম্নতটে ও নিম্নোষ্ঠের তীরে গাঢ় ছায়ার মধ্যে পূর্বাঞ্চলিক দেহমাধুর্যাবেদনও সমান প্রত্যক্ষ।

সুন্দরবন-কাশীপুরে প্রাপ্ত সূর্য প্রতিমাটিতেও (আশুতোষ-চিত্রশালা) মার্জিত রসবোধ ও অধ্যাত্ম-চেতনার আভাস দৃষ্টিগোচর। এই প্রতিমাটিতে গুপ্তশৈলীর সদ্যোক্ত পূর্বাঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যতটা ধরা পড়িয়াছে, বাঙলায় প্রাপ্ত আর কোনো প্রতিমাতেই এমন সুস্পষ্ট হইয়া তাহা ধরা পড়ে নাই। কালবিচারে কাশীপুরের প্রতিমাটি হয়তো দেওড়ার প্রতিমাপেক্ষা প্রাচীনতর, কিন্তু গঠন সৌষ্ঠবে কাশীপুর-সূর্য অনেক বেশি মার্জিত, দৃষ্টি ও কল্পনায় গভীরতর, এবং অনুভবে বেশি পেলব ও সংযত। আকৃতি এবং প্রকাশভঙ্গীর দিক হইতেও সাদৃশ্য এবং প্রমাণবোধ অধিকতর সচেতন।

বলাইধাপ স্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জধাতু-নির্মিত স্বর্ণপত্রমণ্ডিত মঞ্জুশ্রী-প্রতিমাটিতেও পূর্বাঞ্চলিক আবেগময়তা এবং ডৌল ও গঠনরীতির উষ্ণ সংবেদনশীলতা সমান প্রত্যক্ষ। সুপূর্ণ মাংসল মুখমণ্ডল, স্থূল নিম্নোষ্ঠ, বঙ্কিমায়িত করাঙ্গুলির ক্রমহ্রস্বায়মান সূক্ষ্মাগ্র এবং সুকুমার দেহ-কাঠামোর মধ্যে সমস্ত অঙ্গের পেলব সচেতনতা যেন দানা বাঁধিয়াছে ; দেহ-ডৌলের সঙ্গে বসনের ঘনিষ্ঠতা, অলংকার-বিরলতা, সহজ ও নিরাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গী সমস্তই পূর্বাঞ্চলিক গুপ্ত-শৈলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় আবদ্ধ।

মুর্শিদাবাদ-মালার গ্রামে প্রাপ্ত চক্রপুরুষের একটি মূর্তিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-চিত্রশালা)। এই মূর্তিটির ডৌলে, গড়নে এবং রচনাবিন্যাসে গুপ্ত-শৈলীর পূর্বাঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। তবে, বালিপাথরে গড়া এই প্রতিমাটির গড়নে দেহ-ডৌলের সেই সূক্ষ্মতা ও ভাবব্যঞ্জনা ততটা ধরা পড়ে নাই।

স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকীয় বাঙলার তক্ষণ-শিল্পের সাধারণ লক্ষণ ও প্রকৃতি সমসাময়িক উত্তর-গাঙ্গেয় ভারতের শিল্প-লক্ষণ ও প্রকৃতির সঙ্গে ঐক্য-সূত্রে গাঁথা। সারনাথ-শৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট ও অনস্বীকার্য, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাঞ্চলিক আবেগ-প্রাধান্য এবং স্থানীয় বৈশিষ্ট্যও সমান প্রত্যক্ষ। এ-তথ্য লক্ষ্যণীয় যে, এই পর্বে গুপ্ত-শৈলীর যে-কটি নিদর্শন বাঙলাদেশে পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই উত্তর-বঙ্গে বা প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন হইতে। কিন্তু উত্তর-বঙ্গই হোক্ আর সুন্দরবনই হোক্, তেজপুরই হোক্ আর বাঁকুড়াই হোক্, সর্বত্রই মূলগত একটি ধারা প্রত্যক্ষ, এবং সে-ধারা প্রধানত মধ্য-গাঙ্গেয় গুপ্ত শৈলীর ধারারই স্থানীয় রূপ।

বিবর্তন

তৃতীয়-চতুর্থ শতকে উত্তর-ভারতীয় মনন ও কল্পনা মথুরা-বুদ্ধগয়ার যে রূপ-প্রচেষ্টায় স্বপ্রকাশ পঞ্চম শতকে সারনাথ-উদয়গিরি-মথুরাতে তাহার পূর্ণ পরিণতি। সূক্ষ্মতম বোধ, গভীরতম ধ্যান ও চরমতম জ্ঞানের এমন সুনিপুণ অঙ্গসৌষ্ঠবময় সুকুশলী প্রকাশ শুধু ভারতীয় শিল্পে কেন, পৃথিবীর তক্ষণ শিল্পেই বিরল। সমসাময়িক সারনাথ ক্লাসিক্যাল

শিল্পের শিখরচূড়ায় আসীন ; ইহার পর এই শিল্পাদর্শ ও রীতিতে অলব্ধ, অনাবিষ্কৃত আর কিছু ছিল না। সব সন্ধান যখন নিরস্ত ও নিঃশেষিত, সুচিরচেষ্টিত সাফল্য যখন আয়ত্ত তখন কিছুকাল কাটে সাফল্যের দীপ্তি ও গরিমার মধ্যে ; তারপর দেখা দেয় ক্লান্তি ও অবসাদ, এবং তাহার পরের স্তরেই নিদ্রালু বিবশতা। ষষ্ঠ শতকের শেষার্ধ হইতেই উত্তর-ভারতীয় তক্ষণ-শিল্পে এই বিবশতা দেখা দিতে আরম্ভ করে, এবং সমগ্র সপ্তম শতক জুড়িয়া তাহার আভাস সুস্পষ্ট। অন্যদিকে এই সময়েই আবার নবতর শিল্প-প্রেরণাও ধীরে ধীরে রূপ গ্রহণ করে। এই নবতর রীতি বা আদর্শের প্রেরণা কোন্ মূল, কোন্ উপাদান হইতে সঞ্চারিত হইয়াছিল বলা কঠিন। শতাব্দী-সঞ্চারিত ইতিহাসের নানা আবর্তে, নানা ঘটনা ও আদর্শের সংঘাতে, নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলন-বিরোধের ফলে শিল্পে ও সাহিত্যে নূতন নূতন রীতি ও আদর্শের উদ্ভব ঘটে। এই সব আবর্ত ও সংঘাত মিলন ও বিরোধের পুংখানুপুংখ সকল কথা আজও আমরা জানিনা, এবং তাহার ফলে আমাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে কি কি রূপান্তর ঘটিয়াছিল তাহাও সুনিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হইতেই মধ্য-এশিয়ার নানা যাযাবর জাতি ভারতবর্ষের বুকে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে ঃ প্রথম তরঙ্গে য়ুয়ে-চি-শক-কুষাণ, দ্বিতীয় তরঙ্গে আভীর (দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক), তৃতীয় তরঙ্গে হূণ (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতক) এবং চতুর্থ তরঙ্গে গুজর-গুর্জর ও তুরুষ্কবা (সপ্তম-নবম শতক)। ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ সংস্কৃতির বাহক ছিলেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু বহু দিন সেই সংস্কৃতির কোনো সুস্পষ্ট সুগভীর স্বাক্ষর ভারতবর্ষে দেখা যায় নাই ; বলবত্তর স্থানীয় রীতি ও আদর্শকে অতিক্রম করিয়া তাহা নিজকে ব্যক্ত করিবার সুযোগও বিশেষ পায় নাই, শক্তিও হয়তো ততটা ছিল না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহা যে পুরাতন ভারতীয় রীতি ও আদর্শকে রূপান্তরিত করিতেছিল, অন্তত শিল্পাদর্শের ক্ষেত্রে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, তাহার প্রমাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। অষ্টম শতক হইতে ভারতীয় ভাস্কর্যে, প্রাচীর-চিত্রে ও অন্যান্য শিল্পে তাহার স্বাক্ষরও ক্রমশ সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ-সব কথা আলোচনার অবসর এ-গ্রন্থ নয়। তাহা ছাড়া, সপ্তম শতক হইতে নেপাল ও ভোটদেশ বা তিব্বতের সঙ্গেও মধ্য ও প্রাচ্য ভারতের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং প্রাচীন কিরাত বা বোড়ো সংস্কৃতির কিছু কিছু প্রভাবও অষ্টম শতক হইতেই ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতির অবসাদের ফলে স্থানীয় লোকায়ত সংস্কৃতি উচ্চকোটির সংস্কৃতি ছাপাইয়া নিজকে ব্যক্ত করিবার সুযোগ লাভ করে। এই সব রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবাহের সম্মিলিত প্রভাব ভারতীয় জীবন, মনন ও কল্পনাকে, রাষ্ট্র ও সমাজ-বিন্যাসকে কিভাবে কতদূর রূপান্তরিত করিয়াছিল তাহা লইয়া আলোচনা-গবেষণা আজও বিশেষ হয় নাই। তবে, সপ্তম-অষ্টম-নবম শতকে উত্তর-ভারতীয় ইতিহাসের যে দিক

পরিবর্তন এবং সর্বতোভদ্র রূপান্তর সকল ঐতিহাসিকই লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার মূলে এই সব প্রভাব কিছুটা সক্রিয় ছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি। এই রূপান্তরেরই আর এক অর্থ, ক্ল্যাসিক্যাল যুগের অবসান ও মধ্যযুগের সূচনা। কোনো বিশেষ রাষ্ট্রীয় ঘটনা মধ্যযুগের সূচনা করে নাই; কোনো নির্দিষ্ট সন-তারিখও নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির, রাষ্ট্র ও সমাজের যে প্রকৃতি ও আদর্শ দ্বারা মধ্যযুগ চিহ্নিত, জন-সংঘাতের ফলে সেই প্রকৃতি ও আদর্শ কয়েক শতাব্দী ধরিয়াই ভারতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে দেখা দিতেছিল, এবং জৈব নিয়মের বশেই তাহা ধীরে ধীরে লালিত ও বর্ধিত হইতেছিল। উত্তর-ভারতের ইতিহাসে অষ্টম-নবম-দশম শতক সেই লালন-বর্ধনের যুগ।

যাহাই হউক, সদ্যোক্ত রূপান্তরের একেবারে সূচনার মুখে অথবা ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শের অবসাদ-কালের (আনুমানিক সপ্তম শতক) কয়েকটি প্রতিমা বাঙলাদেশেও পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে তিনটি ধাতব মূর্তি উল্লেখযোগ্য: একটি দেবখড়্গ-মহিষী প্রভাবতীর লিপি-উৎকীর্ণ অষ্টধাতুনির্মিত সর্বাণী-দেবীমূর্তি, প্রাপ্তিস্থান ত্রিপুরা জেলার দেউলবাড়ী গ্রাম। দ্বিতীয়টি স্বল্পায়তন, প্রায় পুতুলাকৃতি বলিলেই চলে; ইহারও প্রাপ্তিস্থান দেউলবাড়ী গ্রাম (ঢাকা-চিত্রশালা); শিল্পবিষয় রথোপরি উপবিষ্ট সপ্তাশ্বসহিত সূর্য। তৃতীয়টি ব্রোঞ্জধাতুনির্মিত একটি দণ্ডায়মান শিবপ্রতিমা; প্রাপ্তিস্থান ২৪-পরগণা-জেলার মণিরহাট গ্রাম (অজিতঘোষ-সংগ্রহ, কলিকাতা)। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকীয় গুপ্ত-তক্ষণশিল্পে প্রতিমারূপের যে রূপান্তর পরবর্তীকালে দেখা যায় তাহা এই তিনটি নিদর্শনেই সুস্পষ্ট। সর্বাণী মূর্তিটির পরিকল্পনা ও রূপায়ণ তো স্পষ্টই পরবর্তী পাল শিল্পের পূর্বধ্বনিমাত্র; ইহার ঋজু ও আড়ষ্ট দেহভঙ্গী এবং কাঠামোর বিন্যাস এ-সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহই রাখে না। স্বল্পায়তন সূর্য-প্রতিমাটি সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। শিবমূর্তিটির গড়ন ও ডৌলে গুপ্ত-বৈশিষ্ট্য এখনও তাহার কিছু স্বাক্ষর রাখিয়াছে, কিন্তু সেই স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম দীপ্তি আর নাই, সেই যোগনিবদ্ধ দৃষ্টি বা ভাবের নৈর্ব্যক্তিক পরিচয়ও আর নাই। গুপ্ত-মূর্তিকলার সুবর্ণযুগ অস্তমিত; পরবর্তী পাল-আমলের নবতর রীতি ও রূপাদর্শের সূচনা যেন দেখা যাইতেছে।

প্রাচ্য-ভারতীয় মূর্তিকলার এই পর্যায়ের কয়েকটি নিদর্শন এবং তাহার প্রভাবযুক্ত কয়েকটি প্রতিমা পাহাড়পুর-মন্দিরের ভিত্তিগাত্রেও দেখা যায়। কিন্তু পাহাড়পুর-মন্দিরের শিল্পকলা আরও নানাদিক হইতে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন বাঙলার অন্তত সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীর সাংস্কৃতিক মানসের পূর্ণতর অভিব্যক্তি এই বিহার-মন্দিরের তক্ষণ-রূপায়ণে ভাষালাভ করিয়াছে। পাহাড়পুর-শিল্প এই কারণেই বিস্তৃততর আলোচনার দাবি রাখে।

পাহাড়পুরের বৌদ্ধ-বিহার মন্দির নির্মিত হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে নরপতি ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায়। কিন্তু তাহার আগেও এখানে বোধ হয় কোনো

ব্রাহ্মণ্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং তাহার কিছু কিছু প্রতিমা-নিদর্শনও পরবর্তী বিহার-মন্দিরের ভিত্তিগাত্রসজ্জায় ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। বিহার-মন্দিরটির বিভিন্ন স্তরের চারিদিকের প্রাচীরগাত্র অগণিত মৃৎফলকে ঢাকা ; তাহা ছাড়া ভিত্তিগাত্রসজ্জায় উৎকীর্ণ প্রস্তরফলকও প্রচুর ব্যবহার করা হইয়াছে (বর্তমান সংখ্যা ৬৩)। মৃৎফলকগুলির কথা পরে বলিতেছি। প্রস্তরফলকগুলি সম্বন্ধে গোড়ায়ই বলা প্রয়োজন যে, এই ৬৩টি প্রস্তরফলক সবই যেমন এক যুগের নয় তেমনই নয় একই শিল্পরীতি ও আদর্শের।

পাহাড়পুর মন্দিরের প্রস্তরশিল্পে তিন ধারা

এই প্রস্তর-ফলকগুলির মধ্যে এক ধরনের ফলক দেখিতেছি যাহাদের ভঙ্গী, বিষয়বস্তু ও শিল্পদৃষ্টি একান্তই প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত ; ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর রূপায়ণই তাহাদের উদ্দেশ্য। ভঙ্গী-মর্যাদায়, সৌষ্ঠবে এবং রুচিবোধে ইহারা যে-পরিচয় বহন করে তাহা অবসরপুষ্ট ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রিত সমাজের উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীস্তরের। এই দৃষ্টি ও রীতির স্বাক্ষর পড়িয়াছে কয়েকটি ফলকেই, বিশেষভাবে রাধাকৃষ্ণ (?)-মিথুনমূর্তি, যমুনা, শিব এবং বলরামের অনুকৃতিতে। ইহাদের মধ্যে ষষ্ঠ-সপ্তম শতকীয় পূর্বী গুপ্ত-শিল্পদৃষ্টি ও রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। সেই সুকুমার দেহভঙ্গী, সূক্ষ্ম পেলব গড়ন এবং নমনীয় ডৌলের ঐতিহ্য এখনও বিস্মৃতিতে ঢাকা পড়ে নাই। নির্মাণকলার কোমল সংবেদনশীল রূপায়ণ তো আছেই ; তাহা ছাড়া, ইহাদের বসনভূষণের সৌষ্ঠব, গড়ন এবং বিন্যাসেও গুপ্তাদর্শের মার্জিত রুচি ও সূক্ষ্মবোধ প্রত্যক্ষ। কিন্তু তাহার চেয়েও বেশি প্রত্যক্ষ মধ্য-গাঙ্গেয়ভূমির গুপ্তযুগীয় শিল্পদৃষ্টির স্বচ্ছ দীপ্তি এবং তাহারই পূর্বাঞ্চলিক ঐতিহ্যের ভাবালুতা এবং ইন্দ্রিয়পরতা। বস্তুত, রাজগীর-মণিয়ার মঠের মূর্তিগুলির সঙ্গে এবং মহাস্থানে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জধাতুনির্মিত মঞ্জুশ্রীমূর্তির শিল্পদৃষ্টি ও রীতির সঙ্গে এই ফলকগুলির আত্মীয়তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আমার বিশ্বাস, এই ফলকগুলি ষষ্ঠ শতকীয়, এবং সমসাময়িক কোনো মন্দির সজ্জায় ইহারা ব্যবহৃত হইয়াছিল, পরবর্তীকালে পূর্বতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে আহরণ করিয়া অষ্টম শতকীয় পাহাড়পুর বিহার-মন্দিরের ভিত্তিগাত্রসজ্জায় আবার ইহাদের ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই দৃষ্টিরই স্থূল, রূঢ় শিথিল, গুরুভার, প্রাকৃত রূপায়ণ দেখিতেছি প্রায় ১৫।১৬টি ফলকে। ইহাদেরও বিষয়বস্তু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী, এবং ইহাদের শিল্পরূপও প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত। স্থূল, গুরুভার গড়নই ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দুই একটি মূর্তিতে একটু গতিময়তার আভাস থাকিলেও একটা রূঢ় আড়ষ্টতা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। হ্রস্বদেহ, দণ্ডায়মান মূর্তিগুলির দেহভঙ্গীর অনমনীয়তার ফলে মনে হয়, স্থূল পদযুগল যেন দুইটি স্তম্ভের মত একটি গুরুভার দেহকে কোনো মতে পতন হইতে রক্ষা করিয়াছে। গুপ্ত-শৈলীর অপরূপ সূক্ষ্ম রেখাপ্রবাহের এবং স্বচ্ছ নমনীয় ডৌলের

কোনো চিহ্ন আর অবশিষ্ট নাই। অর্ধচন্দ্রাকৃতি, প্রশস্ত ও গুরুভার মুখমণ্ডলে দীপ্তি ও ভাব লাবণ্যযোজনার বিশেষ কোনো লক্ষণ প্রায় অনুপস্থিত। সন্দেহ নাই, এই ফলকগুলি এমন সব শিল্পীর রচনা যাঁহারা প্রতিমা-লক্ষণ জানিতেন, ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুশাসন মানিতেন, কিন্তু যাঁহাদের অন্তর্নিহিত ভাব ও রসের যথার্থ কোনো বোধ ও বুদ্ধি ছিল না, যাঁহারা গুপ্তশৈলীর মূর্তিকলার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাহার রূপ-ভাবনা এবং আঙ্গিকের উপর কোনো অধিকারই যাঁহাদের ছিল না। খুব সম্ভব, এই ফলকগুলির শিল্পীদের পাথর কুঁদার অভিজ্ঞতাও বিশেষ ছিল না, কিন্তু পৃষ্ঠপোষকদের আদেশে ও প্রয়োজনানুরোধে এই কার্যে তাঁহাদের ব্রতী হইতে হইয়াছিল। রূপসৃষ্টির আনন্দের কোনো চিহ্নই যেন ফলকগুলিতে নাই। কালের দিক হইতে ইহারাও ষষ্ঠ-সপ্তম শতকীয় এবং লক্ষণীয় এই যে, এই ফলকগুলিতে পরবর্তী পাল আমলের ফলক রচনা-বিন্যাসের পূর্বাভাস সুস্পষ্ট; কিন্তু ষষ্ঠ-সপ্তম শতকীয় পূর্বী শিল্পরীতির সুচারু ডৌল, সুষ্ঠু গড়ন, বা ভঙ্গীর ব্যঞ্জনা ইহাদের মধ্যে নাই। গুপ্ত-শৈলীর মার্জিত সংস্কৃত রূপের সঙ্গে ইহাদের দূরত্ব অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

লোকায়ত শিল্পের আভাস

কিন্তু অষ্টম শতকীয় পাহাড়পুর বিহার-মন্দিরের বিশিষ্ট শিল্পরূপ সদ্যোক্ত এই ধরনের ফলকগুলির মধ্যে নাই। সংখ্যায় ইহাদের চেয়ে বেশি এক ধরনের অনেকগুলি ফলক আছে যাহার বালি-পাথর সাদাটে ধূসর বর্ণের এবং দানাদার, দাগবহুল। এই ফলকগুলি সবই একই আয়তনের; ভিত্তি গাত্রের ছক্ বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যায়, ছকের আয়তনানুযায়ী ফলকগুলির আয়তনও নির্ণীত হইয়াছিল। এই ফলকগুলিতে নানা কাহিনীর রূপায়ণ। অনেকগুলিতে কৃষ্ণায়ণের বিচিত্ররূপ; কিন্তু এই কৃষ্ণ একান্তভাবে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুমোদিত কৃষ্ণ নহেন; তাঁহার রূপ যেন একান্তই লোকায়ত জীবনের। কতকগুলিতে রামায়ণ মহাভারতের নানা গল্পের রূপ, এবং সেই সব গল্পের লোকায়ত জীবনে যাহাদের আবেদন প্রত্যক্ষ। তাহা ছাড়া, দৈনন্দিন লৌকিক জীবনের নানা রূপও অনেকগুলি ফলকে উৎকীর্ণ—নৃত্যপরা নারী, মিথুনাসক্তা নরনারী, যষ্ঠিতে হেলান দিয়া দাঁড়ান বিশ্রামরত দ্বারপাল ইত্যাদি। ইহাদের সকলেরই বসন-ভূষণ স্বল্প ও নিরাভরণ; প্রকাশভঙ্গিমায় অন্তর্লোকের কোনো গভীর চিন্তা বা ভাবের অভিব্যক্তি নাই, নাই কোনো মার্জিত রুচি বা বিদগ্ধ গরিমার ব্যঞ্জনা। ইহাদের চালচলন ও মুখাবয়ব স্থূল এবং ক্ষেত্রবিশেষে অমার্জিত; দণ্ডায়মান ভঙ্গী বলিষ্ঠ, কিন্তু আড়ষ্ট। পরিপূর্ণ সুগোল মুখমণ্ডলে, অর্ধচন্দ্রাকৃতি ওষ্ঠে এবং বৃহৎবিস্ফারিত নয়ন যুগলে সহজ সারল্যময় লোকায়ত জীবনের আনন্দোজ্জ্বল হাসির স্বাক্ষর; এই হাসি যেন একান্তই তাহাদের নিজস্ব। কোথাও কোনো সূক্ষ্ম আড়াল রচনা নাই, কোনো কার্পণ্য নাই, সামগ্রিক জীবন

যেন ইহাদের রূপায়ণে পূর্ণ অভিব্যক্ত। প্রাণের প্রাচুর্য এবং স্বাভাবিক গতিময়তা, সহজ অথচ পরিপূর্ণ ও অপরূপ প্রকাশ-মহিমাই এই ফলকগুলির শিল্পবৈশিষ্ট্য। শিল্পশাস্ত্র এবং প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্রের নিয়ম-বন্ধন হইতে মুক্ত এই শিল্পদৃষ্টি গভীর বস্তুচেতনায় প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবন হইতে সমস্ত রস আহরণ করিয়াছে, প্রাত্যহিক জীবনের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, রঙ্গকোলাহলময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং নিশ্ছিদ্র গতিময়তাই এই শিল্পে জীবন সঞ্চার করিয়াছে। সাধারণ মানুষের লৌকিক ঘটনাবলী এবং তাহাদের অভিজ্ঞতাই এই শিল্পের উপজীব্য। আঙ্গিকের দিক হইতে এই শিল্পরূপ স্থূল, অমার্জিত ও অসম্পূর্ণ, কিন্তু মানবিকবোধে গভীর, জীবনের অভিব্যক্তিতে বিস্তারিত এবং শিল্পরসে তাৎপর্যময়।

এই প্রস্তর ফলকগুলির সঙ্গে পূর্বোক্ত অন্য দু'টি শিল্পরূপ ও দৃষ্টির কোথাও কোন মিল নাই; কিন্তু প্রাচীরগাত্রের অসংখ্য ও বিচিত্র মৃৎফলকগুলির রূপ ও দৃষ্টির সঙ্গে ইহাদের আত্মীয়তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সমসাময়িক শিল্পেতিহাসে পাহাড়পুর বিহার-মন্দিরের প্রাচীর গাত্রের এই ফলকগুলি এক অপরূপ বিস্ময়। শুধু পাহাড়পুরেই নয়, ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ হইতেও ঠিক একই ধরনের অসংখ্য মৃৎফলক সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সন্দেহ নাই, অন্যান্য বৃহদায়তন ও সমসাময়িক প্রাচীন মন্দির-বিহারের প্রাচীরগাত্রও এই-ভাবে মৃৎফলকের আস্তরণে শোভিত ও অলংকৃত ছিল।

পাহাড়পুর ও ময়নামতীর লোকায়ত মৃৎশিল্প

পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৃৎফলক-কলার মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ লৌকিক, এবং সাধারণ লোকায়ত কৃষিজীবনের মানস কল্পনাই ইহাদের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহারা রস আহরণ করিয়াছে লোকায়ত দৈনন্দিন জীবন হইতে; স্থিতি ও গতির বিভিন্ন অবস্থায় বস্তু ও প্রাণী-জগতের সকল জিনিসকে সহজ আবেগময় দৃষ্টিতে দেখা, এবং বিচিত্র ভাবে ও ভঙ্গীতে সেই দেখাকে অপূর্ব স্বচ্ছন্দ গতিময়তায় এবং নিছক বস্তু-ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করা, ইহাই যেন ছিল এই মৃৎশিল্পীদের শিল্পাদর্শ। এই অসংখ্য ফলকগুলিকে সারি সারি ভাবে সাজাইয়া দেখিলে মনে হয়, লোকায়ত জীবন যেন এক বিচিত্র শোভা-যাত্রায় চলিয়াছে, যেন এই মৃৎশিল্পীরা অনুভূতি ও সচেতন বস্তু-অভিজ্ঞতার একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অবিরত আন্দোলিত হইয়াছে, এবং সেই আন্দোলন ফলক-গুলির উপর প্রত্যক্ষ। ধর্মগত, উচ্চকোটিস্তরের ঐতিহ্যগত শিল্পের কোনো স্তরে এমন সুবিস্তৃত সামাজিক পরিবেশ, মানবিক কল্পনা ও অনুভূতির এমন বৈচিত্র্য, প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব ঘটনা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে এমন গভীর সংযোগ, এমন স্বতোচ্ছ্বসিত ভঙ্গিমা ও চালচলন, প্রকাশের এমন সজীব ও পরিপাটি ছন্দের পরিচয় সুদুর্লভ। গ্রাম্য মৃৎশিল্পীরা সুলভ আঁটাল মাটি লইয়া আনন্দচ্ছলে যে রূপ সৃষ্টি

করিয়াছেন তাহতে 'সভ্য', 'ভদ্র', অবসরপুষ্ট জীবনের পরিমিত সৌষ্ঠব বা মার্জিত রুচির পরিচয় বা উচ্চস্তরের ভাবানুভূতি, গভীরতর অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা বা জটিল মননক্রিয়ার পরিচয় আশা করা অন্যায়; কিন্তু মানুষ ও প্রকৃতির বিস্তৃত লীলাক্ষেত্রের ক্ষুদ্রতম বৈশিষ্ট্য সম্পর্ক তাঁহাদের যে গভীর চেতনা এবং জীবন সম্পর্কে তাহাদের যে শ্রদ্ধাশীল অভিনিবেশ এই ফলকগুলিতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। উচ্চকোটির ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় শিল্পসাধনার যে কোন শ্রেণী বা স্তরে এই ধরনের শিল্পদৃষ্টি দুর্লভ। সমসাময়িক বাঙলার লোকায়ত সামাজিক জীবনের যথার্থ বস্তুময় স্পন্দিত পরিচয় এই ফলকগুলিতে যতটা পাওয়া যায়, প্রস্তর প্রতিমাশিল্পে ততটা কিছুতেই নয়। রাজপ্রাসাদ ও অভিজাত-চক্রের পরিধি হইতে দূরে সাধারণ মানুষের নিত্যকোলাহলময় জীবনধারা কি ভাবে প্রবাহিত হইত, সমসাময়িক ব্যক্তি ও সামাজিক মানসের কি ছিল প্রকৃতি তাহার পরিপূর্ণ অভিজ্ঞান এই মৃৎফলকগুলি।

সমসাময়িক জীবনের কোনো বস্তুই এই মৃৎশিল্পীদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণকথার নানা গল্প, পঞ্চতন্ত্র ও বৃহৎকথার নানা কাহিনী যেমন এই ফলক-গুলিতে দৃষ্টিগোচর, তেমনই দৃষ্টিগোচর প্রত্যন্ত বাঙলার নানা আদিবাসী নরনারীর নানা দেহরূপ, নানা অভ্যাস, নানা সংস্কারের চিত্র, কাল্পনিক প্রাণীজগতের বিচিত্র নিদর্শন—গন্ধর্ব, কিন্নরী, অর্ধমানব-অর্ধপশুর লীলাময় কল্পনার ছন্দিত রূপ; সমৃদ্ধ পশুপক্ষী জগতের নানা বিচিত্র নিদর্শন—প্রত্যেকের নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় এবং বিষয়বস্তুর মর্যাদা ও বৈচিত্র্যানুযায়ী রূপায়িত; নানা ভঙ্গিমায় জননী ও শিশু: কুস্তীকস্রত ও নানা শারীর-ক্রিয়ারত মল্লবীর; যষ্টিধৃত দ্বারপাল; কূপে জলাহরণরতা ও জলপাত্রবাহিনী নারী; গৃহ-প্রবেশরতা নারী; স্ত্রী ও পুরুষ যোদ্ধা, রথারোহী ধনুর্ধর; দীর্ঘশ্মশ্রু আনতপৃষ্ঠ ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসী ভিক্ষুক; লাঙ্গলবাহী কৃষক; মৎস্যবাহিনী ও মৎস্যকর্তনরতা নারী; নৃত্যপরা ও সঙ্গীতরতা নারী; শিকারবাহী ব্যাধ; গীতবাদ্যরত পুরুষ; ধর্মাচরণরত ব্রাহ্মণ; অস্থিচর্মসার, ন্যাঙ্গোটিমাত্র পরিহিত, স্কন্ধদেশে প্রলম্বিত যষ্টির দুইপ্রান্তে পুঁটুলি ঝুলানো পথিক সন্ন্যাসী বা দরিদ্র ভিক্ষুক; নানা কৌতুকময় ঘটনা, রূপ ও ভঙ্গিমা; মোরগের ও ষাঁড়ের লড়াই প্রভৃতি জীবনের অসংখ্য বিচিত্ররূপ। দেবদেবী মূর্তিও একেবারে অপ্রতুল নয়; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশের কয়েকটি মূর্তি আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আছেন শিব, সেই শিব যে-শিবের লোকায়ত রূপ ও ভঙ্গিমা মধ্যযুগীয় বাঙলাসাহিত্যে এবং লোকায়ত শিল্পে কীর্তিত, এবং আজও সুপরিচিত। বৌদ্ধ দেবদেবী, বিশেষ ভাবে মহাযান-বজ্রযানবর্গের কয়েকটি দেবদেবীও আছেন, যেমন বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি, মঞ্জুশ্রী, তারা। কিন্তু শাস্ত্র-ব্যাখ্যাত দেবদেবীর সংখ্যা প্রায় নগণ্য বলিলেও চলে।

আগেই বলিয়াছি, এই ফলকগুলির গড়নে মার্জিত স্পর্শের, সূক্ষ্ম রুচির বা গভীর ব্যঞ্জনার পরিচয় সামান্যই; কিন্তু লক্ষণীয় ইহাদের সাবলীল গতিচ্ছন্দ, ইহাদের স্বচ্ছন্দ

প্রাণময়তা, জীব ও মানবদেহের গঠন, গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে শিল্পীদের সচেতন দৃষ্টি, জড়জগতের এবং দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যক্ষবোধ। এমন অপূর্ব বস্তুময়তাও দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। সন্দেহ করিবার কারণ নাই যে, এই শিল্প একান্তই লৌকিক শিল্প, প্রথাবদ্ধ প্রতিমা-শিল্পের সঙ্গে ইহাদের কোনো যোগ নাই। যে বিহার-মন্দির নৃপতি ও উচ্চতর অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রথাগত ধর্মের নিশ্চিত নিয়ন্ত্রণাধীনতায় রচিত, তাহার প্রাচীর গাত্রে বিস্তার লাভ করিবার এমন প্রশস্ত সুযোগ সমসাময়িক লৌকিক শিল্প পাইল কি করিয়া, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মৃৎশিল্প প্রাকৃত স্তরের শিল্প; প্রাচীন ভারতীয় ধারণায় এই শিল্প অপভ্রংশ পংক্তির শিল্প; অভিজাত সংস্কৃত স্তরের শিল্পের সঙ্গে একাসনে ইহার স্থান কোথাও নাই—শিল্পশাস্ত্রেও নাই; সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় মন্দির-বিহারেও তেমন সুপ্রচুর নিদর্শনও কোথাও নাই। জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সৃজনক্রিয়ার এই সব নিদর্শন উচ্চকোটি ও সংস্কৃত শিল্পসাধনার নিপুণতর নিদর্শনের পাশে কোথাও দাঁড়াইবার সুযোগ পায় নাই, সে স্পর্ধাও ছিল না।

এ-কথা অস্বীকার করা চলে না যে, এই লৌকিক মৃৎশিল্প পূর্বতন যুগেও সুঅভ্যস্ত ছিল, বাঙলাদেশে ছিল, সমগ্র গাঙ্গেয়ভূমি জুড়িয়াই ছিল। প্রাকৃত ভাবনা-কল্পনার তাৎক্ষণিক রূপের ভাষাই তো এই মৃৎশিল্প। কিন্তু, মনে হয়, এই শিল্প আজও যেমন তখনও তেমনই গ্রামে গ্রাম্য জনসাধারণের লোকায়ত জীবনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এবং তাহাই ছিল সাধারণ নিয়ম। পাহাড়পুর এবং ময়নামতীতে যে এই শিল্পকে দেখিতেছি পুরোভাগে এবং ইহারই নিদর্শন দেখিতেছি প্রচুরতম, তাহার প্রধান কারণ, বাঙলাদেশে পাথরের অভাব এবং প্রাকৃত সংস্কৃতির আপেক্ষিক প্রাবল্য। পাহাড়পুর বা ময়নামতীর মতন সুবৃহৎ বিহার-মন্দিরের সুবিস্তৃত প্রাচীরগাত্র ঢাকিয়া দিবার মত এত পাথর এবং প্রস্তর-তক্ষক বাঙলাদেশে ছিল না। কাজেই ডাক পড়িয়াছিল প্রাকৃত শিল্পরূপে অভ্যস্ত লোকায়ত শিল্পীকুলের, এবং তাঁহারা অগণিত মৃৎফলকে সমস্ত প্রাচীর গাত্র ঢাকিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এমন সুযোগ তাঁহারা সচরাচর পাইতেন বলিয়া মনে হয় না। বস্তুত, অষ্টম-নবম শতকের পর বহুদিন এই লোকায়ত শিল্পের নিদর্শন আর কোথাও দেখিতেছি না। বহু শতাব্দী পর, বাঙলাদেশে যখন কেন্দ্রীয় অন্যতর রাজশক্তি ধর্ম ও সংস্কৃতির পোষক, রাষ্ট্র ও রাজপ্রাসাদের সংস্কৃতিবন্ধন যখন শিথিল, প্রথাগত ও উচ্চকোটির সংস্কৃত ধর্মের শাসন যখন দুর্বল, লোকায়ত ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব যখন কিছুটা প্রসারিত তখন, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত, এই লোকায়ত শিল্পের আপেক্ষিক প্রসার ও প্রতিপত্তি আবার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই সময় এবং ইহার কিছু আগে হইতেই গ্রাম্য কৃষিজীবী জন-সাধারণের ভাব ও চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ দেশীয় অর্থাৎ বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের পরিচয়

পাওয়া যায়, এবং মঙ্গলকাব্যে, বারমাস্যায়, মহাকাব্যের লৌকিক রূপায়ণে, নানা গাথা-গীতিকায়, পদাবলীতে দেশ ও জাতির মর্মবাণী ব্যক্ত হয়। এই লোক-সাহিত্যের সমান্তরালে দেখিতেছি লৌকিক শিল্পেরও বিকাশ। ফরিদপুর, যশোহর, বর্ধমান, বীরভূম, চব্বিশ-পরগণা এবং বাঙলার অন্যান্য জেলার বহু ইটের তৈরি মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরগাত্রে অগণিত মৃৎফলকের সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য এই কালে আবার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহাদের শিল্পদৃষ্টি ও আঙ্গিক কিছুটা ভিন্নতর, কিন্তু লোকায়ত শিল্পের যাহা প্রধান মৌলিক বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ সাবলীল গতিময়তা, স্বচ্ছন্দ প্রাণপ্রবাহ এবং প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন জীবনের সমৃদ্ধ বস্তুময়তা তাহা এই দৃষ্টি এবং আঙ্গিকেও সমান প্রত্যক্ষ। রাজপ্রাসাদ, অভিজাতচক্র এবং পুরোহিতবর্গের শাস্ত্রানুগ শিল্পের স্পর্শবিমুক্ত এই লৌকিক শিল্পের ধারা বহুদিন পর্যন্ত স্বীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

পালপর্বের আগে প্রস্তর-ভাস্কর্যের নিদর্শন যে বাঙলাদেশে খুব বেশি নাই, তাহার প্রধান কারণ সুলভ মৃৎশিল্পের প্রসার। নমনীয় মাটির নিজস্ব একটা গুণ ও প্রকৃতি তো আছেই; সহজ দৃঢ় অঙ্গুলি ও করতালু চালনার ফলে নানা বিচিত্র দ্রুত ভঙ্গ ও ভঙ্গী সহজেই রূপ গ্রহণ করে, ডৌলের মার্জনা সহজ নয়। এই মাধ্যমে কাজ করার ফলে বাঙলার লোকায়ত শিল্পের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আপনি ধরা দিয়াছিল। তারপর যখন এই সব শিল্পীরা মধ্য-ভারতীয় প্রভাবে পড়িয়া পাথরের কাজে হাত দিলেন তখন প্রাথমিক বাধা কতকগুলি দেখা দিবে, তাহা বিচিত্র নয়! কিন্তু এই বাধা সংঘাতের ভিতর দিয়াই সৃষ্টি লাভ করিল নূতন শিল্পরীতি যে-রীতিতে মৃৎশিল্পের গতিময়তা, প্রাণপ্রবাহ এবং মার্জিত ডৌল একদিকে যেমন পাথরে রূপান্তরিত হইল তেমনই পাথরে কাজ করার দরুন দেহরূপে এবং ভঙ্গীতে দেখা দিল একটা দৃঢ় কাঠিন্য। এই রীতির পরিচয়ও পাহাড়পুরেরই কতকগুলি দেবদেবী মূর্তিতে (কৃষ্ণ, বলরাম, ইন্দ্র, যম, কুবের, গণেশ ইত্যাদি) পাইতেছি; দুই একটি নৃত্যপরা নারী-মূর্তিতেও তাহা সুস্পষ্ট। এই রীতি ও ধারাই ক্রমপরিণতি লাভ করিয়া পাল-পর্বের মধ্যযুগীয় পূর্বী প্রতিমাশৈলীতে বিবর্তিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এর পশ্চাতে ছিল বহুযুগের অভ্যাস ও অনুশীলন।

বাঙলাদেশে পাথরে তৈরি নানা পর্বের যে-সব প্রতিমা বা মূর্তি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহার কয়েকটি ছাড়া কোনোটিতেই কোনো সন-তারিখ উৎকীর্ণ নাই, এমন কি কোনো লেখাও যথেষ্ট উৎকীর্ণ নাই যাহার সাহায্যে ইহাদের কালনির্ণয় করা চলে। কাজেই গঠন ও রূপ-বিশ্লেষণ ছাড়া ইহাদের কাল নির্ণয়ের অন্য কোনো উপায় নাই। যেমন সাহিত্যে, শিল্পেও তেমনই নানা সামাজিক ও আদর্শগত কারণে, গঠনরীতিগত কারণে, বিবর্তনগত কারণে, এক এক যুগে এক এক দেশখণ্ডে কতকগুলি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রূপ

গ্রহণ করে। সেই জন্য সেই বৈশিষ্ট্যগুলি আশ্রয় করিয়া মূর্তিগুলির কাল নিরূপণ সহজ হয়।

সপ্তম-অষ্টম শতকীয় মূর্তি

বাঙলার নানা জায়গায় প্রাপ্ত সপ্তম-অষ্টম শতকীয় মূর্তিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের প্রায় সবই পূজার্চনার জন্য তৈরি দেবদেবী মূর্তি, এবং ইহাদের নির্মাণ ও রচনা-বিন্যাস একান্তই প্রতিমালক্ষণ-শাস্ত্র দ্বারা মোটামুটি নিয়মিত। পাহাড়পুরে যে দেবদেবীর মূর্তিগুলি দেখিতেছি, এ গুলি ঠিক অর্চনার জন্য তৈরি দেবদেবী প্রতিমা নয়, বোধ হয় প্রাচীর বা ভিত্তিগাত্র সজ্জার জন্যই ইহাদের রচনা; কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রতিমাশাস্ত্রের নির্দেশ একেবারে অস্বীকৃতও হয় নাই। তবে, প্রাচীর বা ভিত্তিগাত্র সজ্জার জন্য যে মূর্তি রচিত হইত তাহার আর কোনো পৃষ্ঠপট প্রয়োজন হইত না, কিংবা সাধারণত তাহার শিরোভাগের পশ্চাতে কোনো শিরশ্চক্র বা প্রভামণ্ডল থাকিত না। কিন্তু গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিয়মিত অর্চনার জন্য যে-সব দেবদেবীর প্রতিমা রচিত হইত তাহাদের পৃষ্ঠপট ও শিরশ্চক্র দুইই প্রয়োজন হইত, কিছুটা শিল্পের প্রয়োজনে, সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায়, কিছুটা শাস্ত্রনির্দেশে।

৪

সপ্তম-অষ্টম-নবম শতকে ভারতেতিহাস ও সংস্কৃতির দিক পরিবর্তন বা রূপান্তরের কথা আগে একবার একটু বলিয়াছি; কি ভাবে ক্ল্যাসিক্যাল পর্বের অবসান ঘটিয়া মধ্য-যুগের আভাস ক্রমশ সুস্পষ্ট হইতে আরম্ভ করিল, তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছি। পাল ও সেন আমলের (আ ৭৫০—১২৫০ খ্রী) তক্ষণশিল্পের কথা বলিবার আগে সেই ইঙ্গিতটিই অন্যদিক হইতে আরও একটু ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

তক্ষণশিল্পের দ্বিতীয় পর্ব পূর্ব-ভারতীয় শিল্পের ধারা মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সূচনা

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টোত্তর ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পসাধনার বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে একটি মৌলিক ঐক্য সুস্পষ্ট। একটি সর্বভারতীয় সার্বভৌমত্বের আদর্শও এই কয়েক শত বৎসরের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পরিমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত ছিল। এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য, স্থানীয় এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও থাকিয়া থাকিয়া সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় এবং সাংস্কৃতিক আদর্শকে কখনও ব্যাহত কখনও সমৃদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই কয়েক বৎসর ধরিয়া

ভারতীয় বোধ, বুদ্ধি এবং আত্মিক সাধনার কেন্দ্রে একটি সর্বভারতীয় ঐক্য ও মানের, কল্পনা ও মননের, ভাব ও আদর্শের প্রভাব ছিল সচেতন ও সক্রিয়। গুপ্ত-পর্বে কালিদাসের কাব্য, সারনাথের ভাস্কর্য, অজন্তা-গুহার চিত্রাবলী সেই চেতনার চরম অভিব্যক্তি, তাহাই সর্বভারতীয় মানদণ্ড। কিন্তু সপ্তম শতকের শেষার্ধ হইতেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নূতন বাঁক নিয়ে আরম্ভ করে, শুধু রাষ্ট্রক্ষেত্রেই নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। সর্বভারতীয় আদর্শের চেতনা পরেও আরও কিছুদিন সক্রিয় ছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু আঞ্চলিক আদর্শ ও কল্পনা ভারতীয় জীবনের নানাদিকে ক্রমশ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে স্থানীয় ছোট ছোট রাজ্য ও সামন্তরাষ্ট্র মানুষের চেতনাকে অধিকার করিল, এবং এই আঞ্চলিক মনোবৃত্তি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুভূত হইতে দেরি হইল না। উত্তর-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে-সব বিভিন্ন প্রান্তীয় ভাষা ও অক্ষর প্রচলিত তাহার প্রত্যেকটিরই জন্মকাল খ্রীষ্টোত্তর নবম-দশম-একাদশ শতকের মধ্যে; সর্বভারতীয় সংস্কৃত বা প্রাকৃত এবং ব্রাহ্মীলিপি এই শতাব্দীগুলির ভিতরই প্রান্তীয় ভাষা ও অক্ষরে রূপান্তর লাভ করে। এই সময়েই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক স্মৃতিশাস্ত্র রচনার সূত্রপাতও দেখা দেয়; এ-ক্ষেত্রেও সমাজবিন্যাসে আঞ্চলিক মানস প্রত্যক্ষ। শিল্পসাধনার ক্ষেত্রেও এই সময় সর্বভারতীয় মানদণ্ড ছাড়িয়া অথচ সেই মান হইতেই বিবর্তিত হইয়া আঞ্চলিক রূপ ও রীতিকে আশ্রয় করিয়া এক একটি আঞ্চলিক শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া ওঠে। রাষ্ট্রে আঞ্চলিক সামন্তাদর্শ, সমাজে আঞ্চলিক স্মৃত্যাদর্শ ও স্তরভেদ, ভাষা ও অক্ষরে আঞ্চলিক রূপ ও রীতি, শিল্পেও আঞ্চলিক রূপ ও রীতি। সর্বভারতাদর্শ ও বোধের ক্ষেত্রে এই সর্বব্যাপী আঞ্চলিক আদর্শ এবং বোধই ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূচক।

যাহাই হউক, বাঙলাদেশে, এবং সমগ্র বঙ্গ-বিহারে, পাল-বংশকে আশ্রয় করিয়াই এই মধ্যযুগীয় লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করে, এবং আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে এই লক্ষণগুলি ক্রমশ প্রকট হইতে থাকে। কি কি কারণে এই গভীর রূপান্তর সাধিত হইয়াছিল তাহার কিছু আভাস আগে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি; আমাদের আলোচনা-গবেষণার বর্তমান অবস্থায় তাহার চেয়ে বেশি বলিবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া, বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজনও নাই। এই কয়েক শতক (৭৫০—১২৫০) ধরিয়া বাঙলায় আচরিত শিল্পকলায় কি কি রূপান্তরের ফলে আসাম-বাঙলা-বিহারে অর্থাৎ প্রাচ্য-ভারতে এক নূতন শিল্পরূপ ও রীতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল তাহাই বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য।

মধ্যযুগীয় পূর্বী শিল্পের সামাজিক পটভূমি

পাল-রাজবংশ বৌদ্ধ, কিন্তু রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিও যথেষ্ট অনুরক্ত

ছিলেন, এবং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান দুইই তাঁহাদের পোষকতা লাভ করিত ; জনসাধারণের অধিকাংশই যে ছিলেন ব্রাহ্মণ্য বা লোকায়ত ধর্মাশ্রয়ী তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। পাল-পর্বের শিল্পসাধনার পশ্চাতে রাজানুকুল্য কতখানি ছিল বা না ছিল, বলা কঠিন, কিন্তু সমৃদ্ধ বিত্তশালী লোকদের পোষকতা যে ছিল, এবং তাঁহাদের ও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রয়োজনের প্রেরণাও যে সক্রিয় ছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। সেন-আমলে রাজবংশ ও অভিজাত-চক্রের দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু পরিবর্তন ঘটে। সেন বংশ ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুরাগী এবং একান্তই ঐ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ; অভিজাত-চক্রও তাহাই। এই আমলের রাজসভাপুষ্ট সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে তাকাইলে মনে হয়, রাজসভা এবং অভিজাতচক্রের সমাজে অলংকরণ ও বিলাস-ব্যসনের আতিশয্য, জাঁকজমক ও আড়ম্বরপ্রিয়তা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। সেন-আমলের তক্ষণ-শিল্পেও একই লক্ষণ দৃষ্টিগোচর ; রচনা-বিন্যাসে এবং দেহভঙ্গীতে অতিরিক্তমাত্রা সংবেদনশীলতার আবেদন, ডৌলে ও গড়নে ইন্দ্রিয়পর ইহমুখীতার আকর্ষণ। সেইজন্যে মনে হয়, এই আমলের তক্ষণ-শিল্পে রাজপ্রাসাদ ও অভিজাত-চক্রের রুচি ও ভাবনাই ছিল একান্তভাবে সক্রিয়।

এই চার-পাঁচ শ' শতাব্দীর শিল্পের মূল প্রেরণা ছিল বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুমোদিত, উচ্চকোটির ধর্ম-কল্পনা ও ভাবনা, কোনো ব্যক্তি বিশেষের বোধ বা অভিজ্ঞতাসঞ্জাত কল্পনা-ভাবনা নয়, বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের যৌথ সংহত বোধ ও অভিজ্ঞতা জাত ভাবনা-কল্পনা। এই পর্বের বৌদ্ধ, জৈন এবং ব্রাহ্মণ্য প্রত্যেক ধর্মেরই প্রতিমার স্বকীয় শাস্ত্রনির্দিষ্ট রূপ প্রত্যঙ্গ, কিন্তু সে-রূপ সাধারণত কোনো ব্যক্তিগত বোধ বা অভিজ্ঞতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। তাহা ছাড়া, প্রতিমা-শাস্ত্রের দিক হইতে বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিমায় যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, শিল্পের দিক হইতে ইহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্যই নাই ; শিল্পরীতি ও আদর্শ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক। এর পর আবার, প্রতিমাশাস্ত্রের নির্দেশ কোনো ক্ষেত্রেই কোনো ব্যক্তিগত সৌন্দর্য বা অধ্যাত্মবোধ বা অভিজ্ঞতা দ্বারা রূপান্তরিত নয়। সমগ্র ভারতীয় প্রতিমাশিল্প সম্বন্ধেই এ-কথা প্রযোজ্য, এবং সেই হেতুই এই শিল্প অনামী।

মন্দির নির্মাণ ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্মগত পুণ্যার্জনের সৌভাগ্য সকলের ছিল না। যাঁহারা এই ব্যয়ভার বহন করিতে পারিতেন তাঁহারাই কেবল সেই সুযোগ-সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। কাজেই এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, সমসাময়িক কালে জনসাধারণের মধ্যে একটি বিত্তশালী সম্প্রদায় ছিল যাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্মের অনুশাসন মানিয়া চলিতেন, ধর্মগত পুণ্যার্জনে বিশ্বাস করিতেন।

যাঁহারা প্রতিমা দান ও প্রতিষ্ঠা করিতেন, তাঁহারা পুণ্যার্জনের তৃপ্তি ও আনন্দ উপভোগেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। প্রতিমা-নির্মাণের রীতি-নিয়ম সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনো ব্যক্তিগত মতামত বা নির্দেশ বা রুচি কিছু ছিল না। শিল্পী চলিত প্রথা ও আদর্শ, শাস্ত্রীয়

অনুশাসন এবং শিল্পরীতির সাধারণ ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া মূর্তি গঠন করিতেন। তাহারই চতুঃসীমার মধ্যে শিল্পী ও তাঁহার সহকর্মীদের যাহা কিছু ভাবদৃষ্টি ও শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয়। শাস্ত্রীয় ধ্যানগত কল্পনার সঙ্গে শিল্পীর দৃষ্টি ও ভাবনা, ধ্যান ও কল্পনা সব সময় একাত্ম হইত তাহা নয়; যখন হইত, তখন যথার্থ শিল্পবস্তু রচিত হইত, যখন তাহা হইত না তখন শুধু প্রতিমাই হইত, শিল্পসৃষ্টি হইত না, মূর্তি হইত না।

শিল্পীরা ছিলেন সমাজের নিম্নতর স্তরের লোক, এবং সাধারণত সকলেই ছিলেন পেশাগত শ্রেণী, গণ বা নিগমভুক্ত। তাঁহাদের পেশা বা বৃত্তিও সাধারণত নিম্নস্তরের বলিয়াই গণ্য হইত। প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ-গ্রন্থে ভবদেব-ভট্ট একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া যে সব নিম্নবর্ণ ও শ্রেণীর স্পৃষ্ট খাদ্য ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ এবং যাঁহাদের বৃত্তি ব্রাহ্মণদের পক্ষে গ্রহণীয় নয় তাহার একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই তালিকায় অন্যান্যদের মধ্যে নট, নর্তক, তক্ষক, চিত্রোপজীবী, শিল্পী, রঙ্গোপজীবী, স্বর্ণকার এবং কর্মকারের নাম উল্লিখিত আছে। অবশ্য, বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপিতে বরেন্দ্রভূমির শিল্পীগোষ্ঠীচূড়ামণি এক রাণক শূলপাণির উল্লেখ আছে। মনে হয়, কখনও কখনও শিল্পীদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো রাজদরবারে সম্মানিত পদ অধিকার করিতেন, তবে এ-ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল।

তারনাথ এই আমলের দুই জন শিল্পী, ধীমান এবং তাঁহার পুত্র বিটপলোর নাম করিয়াছেন এবং বলিতেছেন, এই পিতা ও পুত্র দুইজনে তক্ষণশিল্প, ধাতব মূর্তিশিল্প এবং চিত্রকলার একটি বিশিষ্ট শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বজকীয় দলিলপত্রে এবং ঐতিহ্যে আর কোনো শিল্পীর নাম বা স্মৃতিমাত্রও রক্ষিত হয় নাই। পাথরের ফলকে ও তাম্রপট্টে লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছেন এমন বহু তক্ষকের নাম জানা যায়; তাঁহাদের কেহ কেহ শিল্পী বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন; কোনো কোনো ক্ষেত্রে পিতা-পিতামহের নামও উল্লিখিত হইয়াছে। মনে হয়, ইঁহারা শুধু লিপিই উৎকীর্ণ করিতেন না, মূর্তি নির্মাণও করিতেন। সিলিমপুর-লিপির শেষ পংক্তিতে লিপি-লেখক তক্ষক সম্বন্ধে যে-ইঙ্গিত আছে তাহাও এই অনুমানের সমর্থক। "প্রেমিক যেমন গভীর মনোনিবেশে তাঁহার প্রিয়ার প্রতিকৃতি চিত্রিত করেন, তেমনিই মাগধ-শিল্পী সোমেশ্বরও গভীর অভিনিবেশে এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিয়াছেন।" এখানে কবি সংক্ষেপে এবং প্রায় অননুকরণীয় ভাষায় সোমেশ্বরের শিল্পাদর্শের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন: মনে হয়, সোমেশ্বর সত্যই কৃতী শিল্পস্রষ্টা ছিলেন, শুধু কারুবিদ্ মাত্র ছিলেন না। বাঙলার এই আমলের লিপিগুলিতে আর যে সব শিল্পীর নামোল্লেখ দেখিতেছি তাঁহাদের এখানে একত্র ধরা যাইতে পারে: ভোগটের পৌত্র শুভটের পুত্র তাতট; সৎ-সমতট নিবাসী শুভদাসের পুত্র মংকদাস; বিমলদাস; সূত্রধার বিষ্ণুভদ্র; বিক্রমাদিত্যের পুত্র শিল্পী মহীধর; মহীধর বা মহীধর-দেবের পুত্র শিল্পী শশীদেব; শিল্পী

কর্ণভদ্র ; শিল্পী তথাগতসার ; এবং ধর্মপ্রপৌত্র মনদাসপৌত্র বৃহস্পতিপুত্র 'বরেন্দ্রকশিল্পী গোষ্ঠীচূড়ামণি' রাণক শূলপাণি।

এই চারি পাঁচ শতাব্দীর বঙ্গীয় শিল্পধারার সামাজিক পোষকতা কাহারা করিতেন এবং প্রেরণা আসিত সমাজের কোন্ স্তর হইতে তাহা বুঝিতে পারা কঠিন নয়। এই প্রেরণা ও পোষকতার স্তর তালিকাগত করিলে এইরূপ দাঁড়ায়, (১) রাজপ্রাসাদ, রাজদরবার, সামন্ত-চক্র ও অভিজাত-চক্র ; (২) বিশিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এবং তাঁহাদের ধ্যান-ধারণা, ভাব-কল্পনা ; (৩) বিশিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের অনুশাসনাধীন শ্রেণী ও বর্ণস্তর ; এবং (৪) শ্রেণী, গণ বা নিগমভুক্ত শিল্পীকুল। ১নং স্তর সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই। ২নং স্তর স্পষ্টতই ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ বা জৈন পুরোহিত-শাসনের নীতি-নিয়ম, ধ্যান ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ৩নং স্তর সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য, তবে, মূর্তি, মন্দির প্রভৃতির পোষকতা যখন ইঁহারা করিতেন তখন ইঁহারা স্বভাবতই এমন শ্রেণী-স্তরের লোক ছিলেন যে-স্তর বিত্তশালী এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্পবিত্ত বৃহত্তর জনসাধারণেরই একাংশ, কিন্তু সমাজে তাঁহারা বিশেষ সম্মানের পাত্র বলিয়া গণ্য নহেন। এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, এই চারি পাঁচ শতাব্দীর শিল্পে বৃহৎ জনসাধারণের বিশেষ কোন স্থান নাই ; যাঁহাদের আছে তাঁহারা পুরোহিত শ্রেণীর এবং অল্পবিস্তর বিত্তশালী সমৃদ্ধ সংকীর্ণায়তন গোষ্ঠীর লোক ; তাঁহাদেরই সংহত সমন্বিত ঐতিহ্য ভাবকল্পনা এবং চিত্তাদর্শ এই শিল্পে প্রতিফলিত। এই মূর্তিকলা ভাবকল্পনায় সংস্কৃত ও অভিজাত উচ্চকোটির শিল্পকলা, সমসাময়িক সামাজিক-অর্থনৈতিক বিন্যাসের প্রতিপত্তিশীল শ্রেণীর শিল্পকলা। এই কয় শতাব্দীর লোকায়ত শিল্পের স্বাক্ষর যে কি ছিল, কেমন ছিল তাহার রূপ তাহা বলিবার মতন কোনো অভিজ্ঞান আমাদের জানা নাই।

পাল ও সেন-পর্বের তক্ষণ-কলার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

সাধারণভাবে বলিতে গেলে পাল ও সেন-পর্বের সমস্ত মূর্তিই সূক্ষ্ম অথবা অপেক্ষাকৃত মোটা দানার কষ্টিপাথরে তৈরি ; ধাতব মূর্তিগুলি পিতল অথবা অষ্টধাতুতে গড়া। সোনা এবং রূপার তৈরি দু'একটি মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। কাঠের মূর্তি এবং অলংকরণ রচনাও একেবারে অজ্ঞাত ছিল না ; ঢাকা-চিত্রশালায় তেমন নিদর্শনও দুই চারিটি সংগৃহীত আছে। কিন্তু পাথরই হোক আর কাঠ বা ধাতুই হোক, গঠনরীতির যত পার্থক্যই থাকুক, ভাবকল্পনা ও শিল্পদৃষ্টির, ডৌল ও মণ্ডনের, কাঠামো ও বিন্যাসের কোনো পার্থক্যই এ-যুগে দৃষ্টিগোচর নয়।

এই যুগের প্রায় সমস্ত প্রস্তর ও ধাতব মূর্তিই পৃষ্ঠপটযুক্ত ফলকে উৎকীর্ণ। দুই চারিটি ক্ষেত্রে মাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায়। পাহাড়পুরের প্রস্তর ফলকগুলিতে এবং দেউলবাড়ীর সর্বাণীমূর্তিতে ইতিপূর্বেই পৃষ্ঠপট ব্যবহারের প্রচলন দেখা গিয়াছিল ; অষ্টম-

শতকে তাহা পূর্ণ রূপ গ্রহণ করে। কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ফলকোৎকীর্ণ মূর্তি ক্রমশ পৃষ্ঠপট-নিরপেক্ষ হইতে থাকে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও মূর্তিগুলি কখনও একান্তভাবে সমতলবদ্ধ-দৃষ্টি হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। একেবারে দ্বাদশ শতকের দুই চারিটি প্রতিমায় পূর্ণ ত্রিভুজায়িত রূপ যেন কিছুটা প্রত্যক্ষ। ফলকের উপর উৎকীর্ণ মূল প্রতিমার শিরোদেশের পশ্চাতে প্রভামণ্ডল; গোড়ার দিকে এই মণ্ডলটি অগ্নিশিখার রূপে সীমাঙ্কিত মাত্র; ক্রমশ তাহা অলংকরণবহুল হইতে হইতে পরিণামে প্রভামণ্ডলের অলংকরণসজ্জার ও বিন্যাসের পারিপাট্য মণ্ডলের অর্থ হরণ করিয়া লয়।

এই প্রতিমাগুলিতে দেবদেবীদের যে নরনারীদেহ রূপায়িত তাহাতে একাধারে পার্থিব এবং দৈবী উভয় ভাব-কল্পনারই অপরূপ সমন্বয়। ইহাই শাস্ত্রীয় বিধান। সাধনমালার বা প্রতিমালক্ষণশাস্ত্রের যে কোনো ধ্যান বা সাধন আলোচন ও বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, অধ্যাত্ম নৈর্ব্যক্তিকতা এবং প্রায় ইন্দ্রিয়স্পর্শক্ষম দৈহিক সৌকুমার্য ও সৌন্দর্য দুইই একই সঙ্গে এবং সমভাবে স্বীকৃত। অর্চনার উদ্দেশ্যে যখনই কোনো দেবদেবীর মূর্তি রচিত হইত, তখনই রূপাদর্শ থাকিত রূপযৌবনময় সুকুমার নর বা নারী। নারীদেহের নারীত্বকে ইন্দ্রিয়স্পর্শালু করিবার জন্য যেমন দেবী-প্রতিমার স্তন-যুগল সুডৌল মাংসল এবং মেখলা ও নিতম্ব দেশকে গুরুভার ও লীলায়িত রূপ দেওয়া হইয়াছে, তেমনই দেবমূর্তিতে নরদেহের প্রশস্ত স্কন্ধের রেখাকে ক্রমশ ক্ষীণায়মান করিয়া সিংহকটিতে রূপায়িত করিয়া পৌরুষের ব্যঞ্জনা প্রকাশ করা হইয়াছে। এ-ক্ষেত্রেও প্রতিমার যৌবনপুষ্ট দেহ, দেহভঙ্গী এবং ভাবাভিব্যক্তিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহীতার সুউচ্চারিত আভাস কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম ভাব-কল্পনা ও অভিব্যক্তির সঙ্গে সুস্পষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহীতার এইরূপ অপরূপ সমন্বয় শিল্পের ক্ষেত্রে সুদুর্লভ। বলা বাহুল্য, ইহার মূলে সক্রিয় ছিল ইন্দ্রিয়ভোগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আনন্দ এবং এই আনন্দ ও অভিজ্ঞতার প্রশস্ত অঙ্গন ছিল কামযোগ ও তান্ত্রিকসাধনার জগৎ। কিন্তু, এই প্রত্যক্ষ আনন্দ ও অভিজ্ঞতাকে যখন ধ্যানসূত্রানুযায়ী নৈর্ব্যক্তিক অধ্যাত্ম ভাবনা কল্পনায় রূপান্তরিত করা হয়, তখন প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ভোগের ইঙ্গিত বা তাৎপর্য আর থাকে না, শুধু তাহার দূরাগত ধ্বনিটুকু থাকে মাত্র। সাধারণত, ধ্যানের সূত্র এবং দূরাগত এই ধ্বনি এই দুয়ের উপরই ছিল শিল্পীদের নির্ভর। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়াভিজ্ঞতাকে যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে নৈর্ব্যক্তিক অধ্যাত্ম-ভাবনায় রূপান্তরের বিভিন্ন প্রয়াসকে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধকগণ বিভিন্ন ধ্যানে ও সাধনে প্রায় কতকগুলি গাণিতিক সূত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। এই এক একটি ধ্যান বা সাধন এক একটি দেবদেবীর বিশিষ্ট রূপকল্পনা; তাহাতে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে বিশিষ্ট দেবদেবীর ও তাঁহার মণ্ডলের, তাঁহাদের রচনা ও বিন্যাসের, তাঁহাদের বিভিন্ন অংশের পরিমিতির, ভঙ্গীর ও রূপের, মাপ ও মানের। শিল্পীরা সাধারণত সকলেই এই সব নির্দেশ নিষ্ঠার সহিত মানিয়া

চলিতেন ; কিন্তু এই সুবিস্তৃত ও পুংখানুপুংখ অনুশাসনের সীমায় আবদ্ধ থাকিয়াও প্রতিভাবান শিল্পী কোনো কোনো ক্ষেত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের রূপসৃষ্টির আদর্শে প্রবুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রশক্তি শিল্পীরাও কেহ কেহ পরে নূতনতর দৃষ্টির কিছু কিছু দিশা লাভও করিয়াছেন। সাধারণত, বাস্তব শারীর বিজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা, ভারতীয় শিল্পের অন্যান্য পর্বে যেমন, এ-পর্বেও তেমনই কোথাও উৎকট হইয়া দেখা দেয় নাই; কিন্তু অন্যদিকে একই সঙ্গে প্রতিমাগুলির অলংকার ও অলংকরণে যে বাস্তব নিষ্ঠা ও কারুকার্যের যে অপরিমেয় সূক্ষ্মতা দৃষ্টিগোচর, তাহা বিস্ময়কর।

বলিয়াছি, শারীর বিজ্ঞানের বাস্তবতার প্রতি শিল্পীদের দৃষ্টি কখনো আকৃষ্ট হইত না, কিন্তু বিশিষ্ট মানবদেহের যে বিশেষ ধর্ম, তাহার অন্তর্লীন অভিজ্ঞতার যাহা ব্যঞ্জনা, তাহার সুষ্ঠু সুমিত প্রকাশে কোথাও কোনো ব্যত্যয় ঘটে নাই। সে প্রকাশ প্রতিমাগুলির বিশিষ্ট ভঙ্গ ও ভঙ্গীতে, বিশেষ চালচলনে, অর্থবহ স্থিতি বা গতিতে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সাধকের ধ্যানদৃষ্টিই সক্রিয়, এবং সেই দৃষ্টি প্রায় গাণিতিক সূত্রাকারে গ্রথিত। পাল ও সেন-পর্বের মূর্তিকলায় যে ভঙ্গ, ভঙ্গী এবং মুদ্রার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহার বীজ উপ্ত হইয়াছিল গুপ্তপর্বের শিল্পকলায় ; কিন্তু প্রাচ্য-ভারতের এই চারি-পাঁচশত বৎসরের শিল্প সেই বীজের সমস্ত ফল-সম্ভাবনাকে একটি একটি করিয়া নিঃশেষ সার্থকতায় পরিপূর্ণতা দান করিয়াছে। দুইটি স্থিতভঙ্গীর উল্লেখ করিতেছি, একটি সমপদস্থান, অপরটি বজ্রপর্যঙ্কাসন। দুইটি ভঙ্গীই উচ্চস্তরের অধ্যাত্ম যোগসাধনা দ্বারা নিয়মিত। বিষম ক্রোধ, চরম প্রলোভন, গভীর দুঃখ ও বিষাদ, পরিপূর্ণ সুখ ও আনন্দ, পরমা শান্তি ও অস্থির চাঞ্চল্য সব কিছুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সব কিছুর কেন্দ্রে বাস করিয়াও যে অবিচল দৃঢ়তা, এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল বস্তুজগতের মধ্যে যে শাশ্বত অপরিবর্তনীয়তা তাহা এই দুই ভঙ্গীর মধ্যে ব্যক্ত। অথচ, মূল কেন্দ্র প্রতিমা যেখানে সমপদস্থানক ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান বা বজ্রপর্যঙ্কাসনে আসীন, সেইখানে তাহার আনুসঙ্গিক পার্শ্বদেবতা ও অনুচররূপে নানা লাস্যভঙ্গিমায় যে-সব দেবদেবীমূর্তি খচিত, নৃত্যশীল ভঙ্গিমায় লীলাচ্ছলে নভোমার্গে যে-সব কিন্নরী সঞ্চরমান, পৃষ্ঠপটে রেখা-কল্পনার যে ছন্দিত লীলায়িত ভঙ্গী, তাহাদের মধ্যে সংসারের নিত্যচঞ্চল চলমান রূপ প্রত্যক্ষ। এই নিত্যসঞ্চরমান লীলায়িত রূপের কেন্দ্রে স্থানক বা আসীন যে কোনো অবস্থায় মূল প্রতিমার মুখমণ্ডল ও দেহব্যঞ্জনা স্মিতহাস্যে বিকশিত, স্থির, প্রশান্ত, গম্ভীর, অচঞ্চল, সমাহিত এবং রূপান্তরের অতীত। বারবার বলিতে বাধা নাই, এই ভাবদৃষ্টি যৌগিক দৃষ্টি। যাহা হউক, নবম-দশম-একাদশ শতকে পার্শ্বদেবতা ও অলংকরণের সঙ্গে মূল মূর্তির একটা ভারসাম্য এবং একটা যুক্তিগত সামঞ্জস্য বর্তমান ছিল। দ্বাদশ শতকে পার্শ্বদেবতাদের অস্থির চাঞ্চল্য এবং অলংকরণ-রেখার অশান্ত আবেগ মূল মূর্তির প্রশান্তিকে, তাহার সমাধিকে অতিক্রম ও বিপর্যস্ত করিয়াছে।

অন্যান্য দণ্ডায়মান ভঙ্গীর মধ্যে ঈষৎ আভঙ্গ ও ত্রিভঙ্গ এবং উপবিষ্ট ভঙ্গীর মধ্যে ললিতাসন বা মহারাজলীলাসন উল্লেখযোগ্য। এই সব ভঙ্গ ও ভঙ্গিমায় সহজ আত্ম-সমাহিত লালিত্য পরিস্ফুট। তাহা ছাড়া, গতিশীল সক্রিয়তা গন্ধর্বকিন্নরীদের নৃত্যময় ও উড্ডীয়মান ভঙ্গীতে প্রত্যক্ষ, এবং বীর্য ও দৃঢ়তা সমান প্রত্যক্ষ বরাহ-বিষ্ণুর এবং অন্যান্য দেবদেবীর আলীঢ় ও প্রত্যালীঢ় ভঙ্গিমায়। এই সব প্রত্যেকটি ভঙ্গ ও ভঙ্গীই শান্ত সমাহিত অভিজ্ঞতা ও ধ্যানযোগ হইতে সঞ্জাত। শিল্পীর মানসে বরাহ-বিষ্ণু বা সঞ্চরণশীল গন্ধর্বের যে রূপ ধরা দিয়াছে, রেখায় ও ডৌলে খচিত প্রাণবন্ত ভঙ্গী তাহার একদিক মাত্র, যাহা ক্ষণিকের একটি ভঙ্গী প্রকৃতপক্ষে তাহা গভীর ধ্যানের একটি রূপ। এই রূপকে শিল্পে গতিচ্ছন্দে প্রাণপ্রবাহে প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। সেই জন্যই, যে-ভঙ্গীতে বীরত্বের ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট, যেমন মহিষমর্দিনী প্রতিমায় বা বরাহ-বিষ্ণু প্রতিমায়, সে-ভঙ্গীতেও মুখাবয়বে কোনো সমতুল বীরত্বের ব্যঞ্জনা নাই, সে মুখ প্রশান্ত, আনন্দ-দীপ্ত; বীরত্বের এবং উজ্জীবনের ব্যঞ্জনা শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিন্যাসে, দেহভঙ্গীতে। কোন দেব বা দেবীর ভাব ও ভঙ্গী কিরূপ হইবে তাহা যে নিয়মিত ছিল ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতা এবং ধ্যানসূত্রদ্বারা তাহাই শুধু নয়, সেই দেব বা দেবীর বিশেষ ভঙ্গী ও বিন্যাসের অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা যে কি তাহাও সাধনসূত্রেই নির্ণীত। সুতরাং বিগ্রহ ও সাধনসূত্র উভয়ই উভয়ের ব্যাখ্যার সহায়ক।

নির্মাণকলার বিবর্তন ৭৫০—১২৫০

ডৌল ও গড়নের বিবর্তনের দিক হইতে অষ্টম শতকীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে এমন প্রতিমার সংখ্যা খুব বেশি নয়। বর্ধমান বরাকরে প্রাপ্ত দুইটি দেবী প্রতিমা, মানভূম-বোরামে প্রাপ্ত একটি প্রতিমা, এবং দিনাজপুর-কাকদীঘিতে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণুপ্রতিমা, অন্যান্য অনেক প্রতিমার সঙ্গে এই চারিটি মূর্তি অষ্টম শতকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। হ্রস্ব গুরুভার দেহে এবং মুখাবয়বের ভঙ্গীতে সমকালীন মাগধী তক্ষণশৈলীর লক্ষণ সুস্পষ্ট। বিরলালংকার দেহসজ্জা এবং ডৌলের কমনীয়তাও পাল-পর্বের প্রথম পর্যায়ের শিল্পাদর্শের। এই শতকের ধাতব প্রতিমাগুলিতেও একই লক্ষণ দৃষ্টিগোচর।

লিপি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বাঙলার যে-ক'টি প্রতিমাকে নিঃসংশয়ে পাল ও সেন-পর্বের বলিয়া চিহ্নিত করা যায় তাহাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। (প্রথম) মহীপালের রাজ্যাঙ্কের তৃতীয় বৎসরে প্রতিষ্ঠিত এবং ত্রিপুরা জেলার বাঘাউরা গ্রামে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণুমূর্তি; এই রাজারই চতুর্থ সম্বৎসরে স্থাপিত একটি গণেশ মূর্তি; চন্দ্রবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে রচিত একটি বিষ্ণু ও একটি সূর্য-প্রতিমা। তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালে নির্মিত একটি সদাশিব মূর্তি এবং লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে

রচিত এবং ঢাকার ডালবাজারে প্রাপ্ত একটি চণ্ডী-মূর্তি, এই কয়েকটি লিপি ও তারিখ-চিহ্নিত প্রতিমাই শৈলী-নির্দেশ ব্যাপারে আমাদের নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য বা দিগদর্শন-সহায়ক। ইহাদের সাহায্যে অল্পবিস্তর নিশ্চয়তায় বাঙলার সমসাময়িক শিল্পের গতি নির্দেশ করা সম্ভব; বিহারে আবিষ্কৃত প্রতিষ্ঠা-তারিখযুক্ত প্রতিমার সাহায্যেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। তবে, মনে রাখা দরকার, বিহার ও বাঙলার সমসাময়িক নির্মাণশৈলী ঠিক একই ধারা অনুসরণ করে নাই; গুপ্তধারা ও ঐতিহ্য বাঙলা অপেক্ষা বিহারে অধিকদিন সক্রিয় ছিল; পূর্ব-ভারতের আঞ্চলিক শৈলীর বিকাশ বাঙলায় দেখা দিয়াছিল বিহারের আগে। বস্তুত, অষ্টম শতকের শেষ নবম-শতকের সূচনা হইতেই পূর্বী শিল্পকলা বাঙলাদেশে তাহার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল; পরবর্তী তিন শতক ধরিয়া এই শৈলীই বিবর্তনের সাধরণ সূত্র ধরিয়া স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়াছে।

নবম শতক

দেবপাল, শূবপাল, নারায়ণপাল এবং গুর্জরপ্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের রাজত্বকালে রচিত কয়েকটি প্রস্তর ও ধাতব প্রতিমা বিহারে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মাংসল দেহ-রূপে গুপ্ত ঐতিহ্যের আপেক্ষিক কমনীয় ডৌল সুস্পষ্ট নৈর্ব্যক্তিকতায় প্রকাশিত; মুখের ভাব প্রশান্ত, কিন্তু দেহের মাংসল গড়নে ইন্দ্রিয়স্পর্শালুতার স্বাক্ষর। দেহভঙ্গী কোথাও কোথাও আড়ষ্ট; দেহের বহিরেখা দৃঢ়। এই দৃঢ় রেখাই উদ্বেলিত শক্তিকে সীমার বন্ধনে শক্ত করিয়া বাঁধিয়াছে; রূপায়নে যে শক্তিমত্তার পরিচয় তাহা এইখানেই। এই দৃঢ় বহিরেখার মধ্যে কোমল মাংসলতার আভাস ফুটাইয়া তোলাই নবম শতকীয় শিল্পাদর্শ। খুব কম নিদর্শনেই উন্নত ও গভীর মানস কল্পনার কোনো স্বাক্ষর আছে। ধ্যানের ও উপলব্ধির যাহা কিছু আভাস তাহা শুধু অর্ধনিমীলিত চক্ষু দু'টিতে এবং প্রশান্ত মুখমণ্ডলে; কিন্তু তাহাও প্রায় সবটাই প্রথাগত।

পৃষ্ঠপটটি সাধারণত শিরোদেশে প্রায় অর্ধগোলাকৃতি; কিন্তু দু'একটি ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ কোনান্বিত অগ্রভাগও দৃষ্টিগোচর। সিক্তবসনের মত পরিধেয়ের ভাঁজ দেহডৌলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, এবং ভাঁজগুলি সমান্তরাল তরঙ্গান্বিত রেখায় চিহ্নিত। দাঁড়াইবার ভঙ্গী হয় সমপদস্থানক না হয় আভঙ্গ বা ত্রিভঙ্গ; কিন্তু বসিবার ভঙ্গী প্রায় সর্বত্রই ললিতাসন। ভঙ্গীটি আরামের ব্যঞ্জনা বহন করে সত্য, কিন্তু মূর্তির রূপায়নে আরামের ব্যঞ্জনা স্বল্পই ব্যক্ত হইয়াছে। হস্ত, পদ, অঙ্গুলি ইত্যাদির বিন্যাস একান্তই শাস্ত্রনির্দিষ্ট; কিন্তু ইহাদের দেহের অলংকরণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষীণতা অথবা মাংসলতা ব্যক্তিগত রুচিনির্ভর, আর রেখার গতি ও মণ্ডনের দৃঢ়তা বা কমনীয়তা যৌথশিল্পদৃষ্টি ও রীতিনির্ভর। জানুদ্বয় সযত্নে খচিত এবং পদদ্বয়ের গড়নে ডৌলের নমনীয়তাও প্রত্যক্ষ। তরঙ্গান্বিত কুঞ্চিত

কেশদাম স্কন্ধের দুই পার্শ্বে নিয়মিত ছন্দে দুল্যমান ; দুল্যমান উত্তরীয়ও দৃঢ় নিয়মিত ছন্দে বাঁধা ; উভয় ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দ লীলার আভাস অনুপস্থিত। অলংকারগুলি ভারী এবং কারু-কার্যবিহীন ; পৃষ্ঠপটে আলংকারিক সাজসজ্জাও অপেক্ষাকৃত স্বল্প , সর্বত্র তাহা মণ্ডিতও নয়, শুধু রেখার আঁচড়ে চিহ্নিত।

দশম শতক

দৃঢ়, সুনির্দিষ্ট বহিরেখার মধ্যে মাংসল কমনীয়তার আদর্শ অতিক্রম করিয়া দশম শতকে দৃঢ় শক্তিগর্ভ স্থূল দেহ নির্মাণের আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিল এই শতকের মানবদেহ কল্পনায় আত্মসচেতন, অর্থাৎ যাহা সংযত শক্তিমত্তার ব্যঞ্জনা ডৌল ও গড়নেরমধ্যেসুস্পষ্ট , সচেতন শক্তির দৃঢ় সংযত প্রবাহ যেন ভিতর হইতে ঠেলিয়া সমগ্র দেহটিকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছে। কোনো কোনো নিদর্শনে কঠোর সংযমে এই প্রবাহোচ্ছ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে, এবং সে-সংযম এতই কঠোর যে, মনে হয়, দেহের সজীব মাংস যেন পাথরে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টি ও রীতি ঠিক তাহা নয় : বরং দৃঢ় সংযত ডৌলে ও মণ্ডনে সুকুমার মসৃণতার একটি উজ্জ্বল দীপ্তি ও প্রবাহ প্রত্যক্ষ, সমগ্র প্রতিমামণ্ডল ও পৃষ্ঠপটটির উপর যেন প্রাণের আনন্দ বিচ্ছুরিত, মুখমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সীমান্ত পর্যন্ত শক্তিগর্ভদেহের প্রাণপ্রাচুর্য পরিব্যাপ্ত। এই উদার বিরাট প্রাণময়তাই নবম শতকের কোমল মাংসলতাকে দশম শতকে অপরিমেয় শক্তিমত্তায় রূপান্তরিত করিয়াছে। সমগ্র দশম শতক জুড়িয়া বাঙলার তক্ষণশিল্পে এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ, বিশেষভাবে প্রস্তরশিল্পে। দিনাজপুর জেলার সুরোহর গ্রামে প্রাপ্ত ঋষভনাথ-প্রতিমা, ফরিদপুর জেলার উজানী গ্রামে প্রাপ্ত বুদ্ধ-মূর্তি, বগুড়া জেলার সিলিমপুরে প্রাপ্ত বরাহাবতার মূর্তি এই উক্তির সাক্ষ্য। ক্ষেত্রবিশেষে কোথাও কোথাও দেহের উচ্ছ্বসিত শক্তি কোমল কমনীয় রূপাদর্শের অন্তরালে কিছু ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে এবং রূপায়নে ইন্দ্রিয়গ্রাহীতার আভাসও স্পষ্ট , কিন্তু কোমল কমনীয়তাই হোক বা ইন্দ্রিয়গ্রাহীতাই হোক, দুইই দৃঢ় সংযত রেখাপ্রবাহ দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত।

অন্যান্য বিষয়ে দশম শতক মোটামুটি নবম-শতকের রূপ ও রীতিকেই বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে। পরিপূর্ণ মুখমণ্ডলের আকৃতি অবিকল এক ; দেহ সামান্য দীর্ঘায়ত, কিছু ক্ষীণায়তও বটে, এবং দেহের নমনীয়তা কিছুটা বর্ধমান। তাহার ফলে, দেহের রূপায়নে রেখার প্রয়োগ বাড়িয়াছে। এ-পর্বে ললিতাসন ও অর্ধপর্যঙ্কাসন ভঙ্গী প্রিয়তর। পদযুগলের মণ্ডন কঠিনতর, ঋজুতর এবং অপেক্ষাকৃত অনমনীয়। পটের বিন্যাস মোটামুটি এক, কিন্তু পটভূমির অলংকরণ সূক্ষ্মতর হইয়াছে এবং অলংকারের কারুকার্যেও পারিপাট্য বাড়িয়াছে। ওষ্ঠ ও নাসিকার, ভ্রূ ও চক্ষুদ্বয়ের, বসন ও অলংকারের রেখায় নবম-শতকীয়

তীক্ষ্ণতা অন্তর্হিত ; রেখা সুমার্জিত এবং ডৌলের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। পৃষ্ঠপটের উপরিভাগ সূক্ষ্মাগ্র এবং ঠিক তাহার নীচেই 'কীর্তিমুখ' অলংকার।

কলিকাতার আশুতোষ-চিত্রশালায় দশম শতকীয় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মূর্তি আছে। হুগলী জেলায় প্রাপ্ত লোকেশ্বর-প্রতিমা, অগ্রদিগুণে প্রাপ্ত একটি নারীর মুখমণ্ডল, সুন্দরবনে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণুপ্রতিমা এবং মহাপরিনির্বাণ বুদ্ধের একটি ফলক। এই প্রতিমাগুলিতে, অল্পবিস্তর ব্যতিক্রম সত্ত্বেও, একই দশম-শতকীয় আদর্শ প্রতিফলিত।

দশম শতক বাঙলা প্রতিমাশিল্পের সুবর্ণযুগ। অষ্টম শতকে প্রতিমাশৈলী কেন্দ্রবিচ্যুত, কর্দমশিথিল। নবম শতকেও মাংসল শৈথিল্য বিদ্যমান কিন্তু তাহাকে রেখার সীমানায় বাঁধিবার একটা চেষ্টা প্রত্যক্ষ। দশম শতকে কেন্দ্রচেতনায় সমগ্র দৃষ্টি জাগ্রত ; শিথিল মাংসল দেহে শক্তির আবির্ভাব, চারিত্রিক দৃঢ়তা ব্যঞ্জিত।

একাদশ শতক

একাদশ শতকে দৃঢ় শক্তিগর্ভ দেহে লাগিল রসমাধুর্যের স্পর্শ, কিছু সৌষ্ঠবের চেতনা। দেহরূপের ক্ষীণতার দিকেও প্রবণতা গেল বাড়িয়া। প্রথম-মহীপালের রাজ্যাঙ্কের তৃতীয় বৎসরে যে বিষ্ণুমূর্তিটি বাঘাউড়ায় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই সব লক্ষণ বিদ্যমান। এই মূর্তিটিকে পরবর্তী দুই তিন পুরুষের তক্ষণকলার মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। দশম শতকে যে গভীর ও প্রশস্ত গঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, এই শতকে তাহা ক্রমশ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইতে চলিয়াছে, এবং ক্ষীণদেহে কোমল পেলব গড়নের রীতি প্রাধান্য লাভ করিতেছে। পদযুগলের ঋজু কাঠিন্য ক্রমবর্ধমান, সাধারণ ভাবে দেহ-রেখার নমনীয়তাও ক্রমহ্রস্বায়মান। জানুর গড়ন ও মগনে নবম ও দশম শতকীয় মার্জিত নৈপুণ্য অন্তর্হিত ; শুধু একটি গভীর বক্ররেখায় জানু চিহ্নিত। বস্তুত, দেহের ঊর্ধ্ব-ভাগের মনোরম মাধুর্যময় গড়ন এবং প্রশান্ত উদার স্মিত মুখমণ্ডলের সঙ্গে দেহের নিম্ন-ভাগের ঋজু, কঠিন, অনমনীয় গড়নের কেমন যেন কোনো মিল নাই।

অন্যদিকে পৃষ্ঠপটের বৈচিত্র্য ও অলংকার ক্রমবর্ধমান। প্রতিমার অলংকরণ, সহচর দেবদেবীদের অলংকার-বৈচিত্র্য, বিচরমান গন্ধর্ব-কিন্নর, পটের অলংকার ও কারুকার্য ইত্যাদি ক্রমশ প্রতিমাকে অতিক্রম করিয়া অতিমাত্রায় স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ। তবু, একাদশ শতকের প্রথমার্ধে প্রতিমা ও পার্শ্বদেবতা, প্রতিমা ও পৃষ্ঠপটের মধ্যে একটা ভারসাম্য বিদ্যমান ; শেষার্ধের দিকে মূল প্রতিমার সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য ক্রমবর্ধমান অলংকার প্রাচুর্যে প্রায় ভারগ্রস্ত। শিল্পীর আনন্দ যেন এই প্রাচুর্যের মধ্যেই উদ্দীপ্ত। দ্বাদশ শতকে কিন্তু এই উদ্দীপ্ত প্রাচুর্যই ক্রমে হইয়া উঠিল শিল্পের বন্ধনরজ্জু।

কেশবিন্যাসে এবং উত্তরীয়ের রেখায় তরঙ্গায়িত ছন্দ, গভীর ত্রিভুঙ্গায়িত ডৌলে

ও তির্যক বা আলম্ব গভীর রেখায়, আলোছায়ায় স্পন্দিত লীলা। দেহভঙ্গী যেন ছাঁচে ঢালাই করা, কিন্তু মুখভঙ্গী সংবেদনশীল এবং গড়ন কোমল, সুকুমার। মুখাকৃতি যাহাই হউক, চিবুকের রেখাটি সজীব, ওষ্ঠদ্বয় প্রায় গোলাকৃতি, চক্ষুদ্বয় গভীর ও প্রশস্ত। বসন দেহের রেখা ও ডৌলের সঙ্গে একেবারে একাঙ্গীভূত, বস্ত্রাঞ্চল মনোরম তরঙ্গায়িত রেখায় খচিত। ভ্রূ-চিত্রণে কোনো কোনো নিদর্শনে বঙ্কিম রেখাটিকে দুইবার তরঙ্গায়িত করা হইয়াছে, অর্থাৎ ভ্রূ-র প্রান্তসীমায় আবার উপরের দিকে একটু ঢেউ খেলানো হইয়াছে, উদ্দেশ্য যে মাধুর্য ও সংবেদনশীলতার প্রকাশ তাহাতে আর সন্দেহ কি! এই সংবেদনশীল মাধুর্য এবং দীর্ঘায়ত ক্ষীণ, সৌষ্ঠবময় দেহই একাদশ শতকীয় মূর্তিকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অগ্রদিগুণে প্রাপ্ত উমা-মহেশ্বর প্রতিমা, সুন্দরবনের কঙ্কনদীঘির নবগ্রহ ফলক, সুন্দরবনে প্রাপ্ত বীণাবাদিনী সরস্বতী এই বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর।

দ্বাদশ শতক

এই ক্ষীণ দীর্ঘায়ত সৌষ্ঠবমাধুর্যময় দেহের মার্জিত শ্রী দ্বাদশ শতকে অলংকার ও পৃষ্ঠপটের অলংকরণের প্রাচুর্যে শুধু যে ভারগ্রস্তই হইয়া পড়িল তাহাই নয়, নবম শতকীয় মাংসল শৈথিল্যও পুনরাবর্তিত হইয়া দেহরূপকে ক্রমশ নির্জীব ভারগ্রস্ত জড়তায় মণ্ডিত করিয়া দিল। দেহডৌলের কোমল সজীবতা ও পেলব মাধুর্য ক্রমে বিদায় লইল। এই শতকের মূর্তিনির্মাণ কলার স্বাক্ষর দেখিতেছি তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালে খচিত রাজীবপুরে প্রাপ্ত সদাশিব-মূর্তিতে এবং লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার ডালবাজারে প্রাপ্ত চণ্ডী-প্রতিমায়।

প্রতিমা, পাদপীঠ, কাঠামো ও পৃষ্ঠপটের বিন্যাস এই শতকে অপরিবর্তিত; দেহকাণ্ডের ক্ষীণ দীর্ঘায়ত ধারাও গোড়ার দিকে অব্যাহত। কিন্তু মুখাবয়বের স্মিত সংবেদনশীলতা আর নাই; তাহারজায়গায় দেখা দিয়াছে অকারণ গাম্ভীর্যের ভার। অলংকরণ ছাড়া মার্জিত ভ্রূ-যুগলের আর যে কোনো উদ্দেশ্য আছে এমন মনে হয় না; পদযুগল তাহার সমস্ত কমনীয়তা হারাইয়া যেন দুইটি স্তম্ভে পরিণত হইয়াছে। পৃষ্ঠপটের ত্রিকল্প বা চতুর্কল্প বিভাগে অসংখ্য গুরুভার পার্শ্বদেবতা, সুপ্রচুর অলংকরণ অথচ সেই অলংকরণ সমগ্র মূর্তির রূপকল্পনার সঙ্গে কোনো অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত নয়; সর্বত্র অকারণ ঘনবিন্যস্ত বাহুল্য। সব মিলিয়া সমগ্র প্রতিমা-পটটিকেই যেন ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রতিমার দৈহিক গঠনে কমনীয়তার কোনো অভাব নাই, কিন্তু সে-কমনীয়তা যেন মদির, অবশ, নির্জীব। বঙ্কিমায়িত ভঙ্গীর সাক্ষ্য সুপ্রচুর কিন্তু সে ভঙ্গীতে লীলায়িত গতির ব্যঞ্জনা নাই। বসনপ্রান্ত ও অঞ্চল তরঙ্গায়িত, গন্ধর্ব ও কোনো কোনো

পার্শ্বদেবতার দেহভঙ্গীতে ক্রীড়ালীলার প্রকাশও গোচর ; বসনের বহুল রেখাবিন্যাস, পরিধেয় ও কেশ-বিন্যাসের অলংকরণ প্রাচুর্য গভীর আলোছায়ার বৈচিত্র্যখচিত অলংকার ও পটদৃশ্য প্রভৃতি সত্ত্বেও জীবনের স্বতোদৃপ্ত ও সুস্পষ্ট উজ্জ্বল স্বাক্ষর এ-পর্বের মূর্তি-রচনায় অনুপস্থিত। ভোগব্যায়ত সুপূর্ণ ওষ্ঠাধর, ধনুকাকৃতি ভ্রূযুগল এবং সুস্মিত মুখ-মণ্ডল সত্ত্বেও মুখাবয়ব তীক্ষ্ণ, প্রায় ত্রিকোণাকৃতি ও কঠিন ; সমস্ত মুখমণ্ডলে কোনো গভীর আত্মিক ব্যঞ্জনার চিহ্নমাত্র নাই। দশম-একাদশ শতকের মূর্তিকলায় যে ধ্যান গম্ভীর প্রশান্ত শ্রীযুক্ত মুখমণ্ডলের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, সে মুখ বিগত ; ধ্যান গম্ভীর প্রশান্তির স্থান লইয়াছে গভীর আনন্দসম্ভোগের মদির পরিতৃপ্তি। এই সম্ভোগের মদির পরিতৃপ্তির মাধুর্যই লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাঙ্কের তৃতীয় বৎসরে রচিত চণ্ডীর মুখমণ্ডলে। বস্তুত এই পর্বের প্রতিমা-কলায় সর্বত্র একান্ত ইহগত ভোগবাসনার মদির মাধুর্যের ব্যাপ্তি দুর্বল কামনার মোহময় বিলাস। তাহা সত্ত্বেও এখানে সেখানে নবতর শিল্প-প্রেরণা ও শিল্পাদর্শের পরিচয় একেবারে নাই, এমন নয়। দুই একটি নিদর্শনে পরিপূর্ণ মণ্ডলায়িত কাঠামোর মধ্যে অমার্জিত অথচ শক্তিগর্ভ শিল্পক্রিয়ার প্রয়াস সুস্পষ্ট, এবং অলংকারবাহুল্য এবং নিখুঁত বিন্যাস সত্ত্বেও এই শিল্পক্রিয়ার মধ্যে একটা সচেতন শক্তি ও মর্যাদা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সজীবতা স্বপ্রকাশ। এই শক্তি, মর্যাদা ও সজীবতা বাঙলার প্রতিমাকলাকে চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত হইতে হয়তো বাঁচাইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইল না ; সমসাময়িক সামাজিক বাতাবরণে এই শক্তি, মর্যাদা ও সজীবতা কোথাও ছিল না। তাহা থাকিলে এবং অবকাশ পাইলে হয়তো এই শিল্পকলা নব নব অভিজ্ঞতার ও চেতনার আশ্রয়ে নূতন পথ ও আদর্শের সন্ধানলাভ করিতে পারিত। কিন্তু ইসলামের দ্রুত অভিযান সমস্ত আশা-ভরসার পথ মরুঝড়ে ঢাকিয়া দিল।

দ্বাদশ শতকের প্রতিমাকলা প্রধানত সেন বর্মণ পর্বের শিল্পাদর্শের এবং সমাজাদর্শের অনুপ্রেরণায় রচিত ও লালিত। এই আমলের প্রতিমাগুলিতে যে, ইহগত, একান্ত পার্থিব সুখৈশ্বর্যের ব্যঞ্জনা, সেই একই ব্যঞ্জনা সেন-বর্মণ রাজসভার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। ধর্মগত বিষয়বস্তু সত্ত্বেও শিল্প ও সাহিত উভয়ই পার্থিব ভোগচেতনা এবং জৈব কামনা-বাসনা দ্বারা মণ্ডিত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বা গোবর্ধনের সপ্তশতী তো সমসাময়িক শিল্পেরই সাহিত্যিক প্রতিরূপ। সন্দেহ নাই, ইহার মূল ধর্মগত প্রেরণা কিছুটা ছিল, কিন্তু এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ করা চলে না যে, যাহা মূলে ছিল অধ্যাত্মপ্রেরণা তাহা রাজসভার ইহগত ভোগবাসনার স্পর্শে একান্ত ইহগত ভাবনা-কল্পনায় বিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। সূক্ষ্ম কমনীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা বাঙলার শিল্পকলার প্রধান আদর্শ বলিয়া আগেও পরিগণিত হইত, কিন্তু সেন-বর্মণ আমলে তাহা একান্ত দেহগত কামনার মদিরমাধুর্যে পর্যবসিত হইল।

এই আমলের প্রতিমাকলার এই ঐহিক ভাবদৃষ্টির মূলে ভিন্নপ্রদেশী ভাবকল্পনার প্রভাব

থাকা কিছু বিচিত্র নয়। সমসাময়িক দক্ষিণী প্রতিমা-শিল্পেও একই ঐহিক ভোগসমৃদ্ধির এবং গুরুভার অলংকরণের প্রাধান্য। অবশ্য, বাঙলার প্রতিমাকলায় যে কমনীয়তা, সজীবতা ও সংবেদনশীলতা প্রত্যক্ষ দক্ষিণী শিল্পে তাহা নাই ; স্মরণ রাখা প্রয়োজন, বাঙলার এই কমনীয়, সজীব ও সংবেদনশীল শিল্পাদর্শ পূর্বতন পাল-প্রতিমাকলার উত্তরাধিকার।

সাধারণ কয়েকটি মন্তব্য

নবম হইতে দ্বাদশ শতক এই চারিশত বৎসরে বাঙলাদেশে অসংখ্য প্রস্তর ও ধাতব প্রতিমা রচিত হইয়াছিল; তাহার স্বল্পাংশমাত্র আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শিল্পশৈলীর যে ধারাবাহিক বিবর্তনের কথা বলিলাম, প্রত্যেকটি প্রতিমাই যে সেই ধারা অনুসরণ করিয়াছে এমন নয় ; ব্যতিক্রমও আছে প্রচুর। তবু, এই ধারাই সাধারণ প্রবহমান ধারা। কাল কালান্তরে প্রবেশ করে ; কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরবর্তী কালের লক্ষণ আগের কালেই আত্মপ্রকাশ করে, আবার কোনো কোনো নিদর্শনে অতীত কালের বৈশিষ্ট্যও সমসাময়িক কালে অমলিন থাকিয়া যায়। বস্তুত, কোনো দুই কালপর্বের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভেদরাখা টানা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, যে কলা গতিশীল তাহাতে একই ভাবাদর্শ বা ভঙ্গিমার পুনরাবৃত্তি আশা করা যায় না ; সাধারণ শিল্পাদর্শেও ব্যতিক্রম দেখা যায়। একই যুগে, এমন কি একই রাজার স্বল্পস্থায়ী শাসনকালেও বিচিত্র মুখাবয়ব, বিভিন্ন নির্মাণরীতি, মণ্ডনকৌশল, এমন কি ভিন্নতর সৌন্দর্যবোধের সাক্ষাতও পাওয়া যায়। কিছুটা কারণ ভৌগোলিক সন্দেহ নাই ; স্থানভেদে রুচির ভেদ, রীতির ভেদ, এবং সেই হেতু উত্তর-বঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণ-বঙ্গের, পশ্চিম-বঙ্গের সঙ্গে পূর্ব-বঙ্গের প্রতিমাকলায় কিছুটা রূপ-পার্থক্য অনিবার্য। কিন্তু মোটামুটি মানদণ্ড এক এবং অভিন্ন, সমস্তই একই শিল্পাদর্শের সৃষ্টি। এই চারি শতকের বাঙলাদেশে নানা বিভিন্ন জাতি ও জনের বাস, নানা ভিন্ন প্রদেশী লোকের ; কোনো কোনো প্রতিমার মুখাকৃতি ও গঠনে বিশিষ্ট জন-বৈশিষ্ট্যও সেই হেতু প্রত্যক্ষ। কোনো কোনো নিদর্শনে তীক্ষ্ণ মঙ্গোলীয় প্রভাব সুস্পষ্ট ; এই ভোট ব্রহ্ম বা মোঙ্গোলীয় মুখবৈশিষ্ট্যের পশ্চাতে সমসাময়িক ইতিহাসের প্রেরণা সক্রিয় বলিয়া মনে হয়। শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি এবং গঠনরীতিও কিছুটা এই পার্থক্যের মূলে, সন্দেহ নাই। বাঙলার সমসাময়িক লোকায়ত শিল্পও পাশাপাশি বর্তমান ছিল ; তাহার সঙ্গে উচ্চকোটি শিল্পাদর্শ ও রীতির একটা যোগাযোগ ছিল, এমনও অসম্ভব নয়, এবং দুইই একে অন্যের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়তো হইয়াছিল। তবু মোটামুটি বলা যায়, উচ্চস্তরের প্রতিমাশিল্প শাস্ত্রবন্ধন হইতে কখনও একেবারে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ১৫৭৯ শকে উৎকীর্ণ একটি পার্বতী-মূর্তি

(রাজসাহী-চিত্রশালা) এবং বরিশালে প্রাপ্ত আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের চতুর্ভুজা একটি জগদ্ধাত্রী-প্রতিমায় (আশুতোষ-চিত্রশালা) সমসাময়িক শিল্পের নির্জীব, আনুষ্ঠানিক, প্রতিমালক্ষণ-শাস্ত্রশাসিত শিল্পাদর্শের লক্ষণ সুস্পষ্ট।

এই সুদীর্ঘ চারিশত বৎসরের শিল্পরূপের প্রবাহ গভীর বিরোধী ভাবতরঙ্গে আবর্তিত। এই প্রবাহের গতি কখনও সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়স্পর্শালু মাংসলতার দিকে, কখনও পরোক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক ইন্দ্রিয়ব্যঞ্জনার দিকে; কিন্তু দুইটি গতিই একই শাস্ত্রশাসনদ্বারা নিয়মিত। একটি অপরূপ মানসদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া এই শিল্পকলার বিকাশ; এই মানসদ্বন্দ্বজনিত বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্যই এই চারিশত বৎসর শিল্পকলার প্রধান লক্ষণ। একদিকে ইহগত, দৈহিক, ইন্দ্রিয়গত কামনা-বাসনার সত্য, অন্যদিকে নৈর্ব্যক্তিক কামনা-বাসনার উপলব্ধির সত্য। একদিকে তান্ত্রিক সাধনার দেহবাদ, যে-সাধনা এই রক্তমাংসের দেহকেই পরমার্থিক ঐশ্বর্যের আকর বলিয়া ধ্যান করে, অন্য দিকে আত্মাসন্ধানী ব্রাহ্মণ্য সাধনা যে-সাধনা মানুষের রক্তমাংসে গড়া দেহের অন্তর্নিহিত অপরূপ দেবত্বকে রূপমণ্ডিত করিবার স্পর্ধা রাখে—এই দুই বিরোধী ভাবাদর্শের সংঘাতাবর্তে এই চারি শতকের শিল্পপ্রবাহ আন্দোলিত। এই দুই ভাবাদর্শের সংঘাতের ভিতর দিয়াই এই চারি-শতকের প্রতিমাকলা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে। প্রথম পর্বে দেহের সহজ সরস কমনীয়তা এবং ভঙ্গী, বিরল সাজসজ্জা, অলংকার ও আড়ম্বর। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক কমনীয়তা ও ভঙ্গী অস্থির ও চঞ্চল হইতে আরম্ভ করে, সাজসজ্জা ও অলংকরণ ক্রমশ বাহুল্যমণ্ডিত হইতে থাকে। সরল ও প্রশান্ত দেহভঙ্গী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ চঞ্চল ও লাস্যময় দেহভঙ্গীতে রূপান্তর দৃঢ় সরল রেখায় অগ্রসরমান। পরিণামে মাত্রাহীন আতিশয্য সমস্ত শিল্পাদর্শকে অবশ্য নির্জীব মদিরতায়, পল্লবিত অলংকারাড়ম্বরে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সমসাময়িক সাহিত্যে কামনা-বাসনার আতিশয্য, উচ্ছ্বসিত পল্লবিত বাক্য ও ব্যঞ্জনাবিহীন লাস্যভঙ্গী সমসাময়িক শিল্পেরই প্রতিরূপ এবং দুইই ধ্বংসোন্মুখ ক্ষীয়মাণ সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ঘোষণা। এই ক্ষীয়মাণ সংস্কৃতির উপর যবনিকা টানিয়া দিল ইস্‌লামাভিযান। কিন্তু যবনিকা পতনের পূর্ব মুহূর্তে যে-প্রাণ এই শিল্পদেহে স্পন্দিত হইতেছিল সে-প্রাণ দুর্বল, তাহার শক্তি আর কিছু ছিল না।

৪

চিত্রকলা। আনুমানিক ১০০০—১২৫০ খ্রীষ্ট শতক

প্রাচীন বাঙলার কোনো স্থানেই এ যাবৎ প্রাক্‌পালযুগের চিত্রকলার কোনো নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ফা-হিয়েনের বিবরণীতে একটি ইঙ্গিত আছে যাহাতে মনে হয় খ্রীষ্টোত্তর চতুর্থ শতকে তাম্রলিপ্তিতে (এবং বোধ হয় বাঙলার অন্যত্রও) চিত্রশিল্প-রচনার অভ্যাস পরিচিত ও প্রচলিত ছিল। তাহা ছাড়া, সমসাময়িক ভারতবর্ষে অন্যত্র যেমন, বাঙলাদেশেও বোধ হয় তেমনই লোকায়ত সংস্কৃতিতে পটচিত্র, ধূলিচিত্র প্রভৃতি অজ্ঞাত ছিল না। তাহারই ধারা প্রবাহমান দেখিতে পাওয়া যায় অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের বাঙলাদেশের জড়ানো পটের ছবিতে, আলপনায়, ফরিদপুর-যশোহর-বীরভূম-বাঁকুড়া মেদিনীপুর-কালিঘাটের বিচ্ছিন্ন পটের নানা চিত্রে। যাহাই হউক, প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র ও সাহিত্য-গ্রন্থাদি হইতে জানা যায়, বিহার-মন্দিরের প্রাচীনগাত্র চিত্রশোভিত করার শাস্ত্রীয় নির্দেশ একটা ছিল; কাজেই অনুমান করা কঠিন নয় যে, ভারতের অন্যান্য প্রান্তের মত প্রাচীন বাঙলার অনেক বিহার-মন্দিরের প্রাচীরগাত্রই চিত্রদ্বারা শোভিত ছিল। কিন্তু বিহার-মন্দিরই যেখানে ধ্বংসের হাত এড়াইতে পারে নাই সেখানে প্রাচীর-চিত্রের-নিদর্শন আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিবার কথা নয়। প্রাচীন পটচিত্র বা ধূলিচিত্রের কোনো নিদর্শনও এ-যাবৎ আমরা জানি না।

বাঙলার চিত্রকলার প্রাচীনতম যে-সব নিদর্শন এ পর্যন্ত জানা গিয়াছে তাহা প্রায় সমস্তই একাদশ ও দ্বাদশ শতকের, এবং প্রত্যেকটিই পাণ্ডুলিপি-চিত্র, অর্থাৎ তালপাতায় বা কাগজে হাতের লেখা পুঁথি অলংকরণোদ্দেশ্যে আঁকা ছবি। স্বভাবতই ছবিগুলি স্বল্পায়তন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বল্পায়তন পাণ্ডুলিপি-চিত্রের যাহা বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ সূক্ষ্ম রেখার ধীর অথচ তীক্ষ্ণগতি, সূক্ষ্ম ও ঘন কারুকার্য, বিন্যাসের ঘনত্ব ও গভীর ভাবনা কল্পনার অনুপস্থিতি প্রভৃতি এই পাণ্ডুলিপি চিত্রগুলিতে নাই। সেই জন্যই ইংরাজিতে miniature বলিতে যাহা আমরা বুঝি, এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলি সেই বস্তু নয়। আয়তন ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলির ভাবনা-কল্পনার আকাশ বিস্তৃত ও গভীর, পরিকল্পনা বৃহৎ, রেখার ডৌল ও বিস্তার দীর্ঘায়ত, রঙের বিন্যাস ও মণ্ডণ প্রশস্তায়িত। এই দীর্ঘ, প্রশস্ত ও বৃহৎ বিস্তার একান্তই বৃহদায়তন প্রাচীর-চিত্রের। বস্তুত, প্রাচীর-চিত্রের লক্ষণই এই পাণ্ডুলিপি চিত্রগুলিরও লক্ষণ; প্রাচীর-চিত্রই যেন পাণ্ডুলিপি-পত্রের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে স্বল্পায়তনে অঙ্কিত। সমসাময়িক বাঙলার, এক কথায় পূর্ব-ভারতের পাণ্ডুলিপি-চিত্রের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ইহারা আকারে ক্ষুদ্র, চরিত্রে বৃহদায়তন; ক্ষুদ্র চিত্রের বৈশিষ্ট্য ইহাদের মধ্যে অনুপস্থিত।

এ-পর্যন্ত চিত্র-সম্বলিত পাণ্ডুলিপি প্রায় কুড়ি-বাইশখানা পাওয়া গিয়াছে, ইহাদের মধ্যে মাত্র একখানা কাগজের পাতায় লেখা (আশুতোষ-চিত্রশালা), এবং ছবিও কাগজের পাতায় আঁকা—লেখার মাঝখানে সমান্তরালে ; অন্য সব ক'টিই তালপাতার পুঁথি। কাগজের পাতার পুঁথিটি বাঙলাদেশে কাগজ ব্যবহারের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন। এই পাণ্ডুলিপি গুলির অধিকাংশই পাওয়া গিয়াছে নেপালে, কয়েকটি বাঙলাদেশে, এবং কয়েকটি বাঙলার বাহিরে অন্যত্র (যেমন, কুলু উপত্যকা-প্রবাসী স্বেতোস্লাভ রোয়েরিক মহাশয়ের সংগ্রহের একটি সুবৃহৎ পাণ্ডুলিপি)। তবে ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটিই যে দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে পূর্ব ভারতে, বিশেষ ভাবে বাঙলাদেশে লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল, চিত্রশৈলী এবং তারিখ সম্বলিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপিই তাহার প্রমাণ। এ-পর্যন্ত যে ক'টি চিত্র-সম্বলিত পাণ্ডুলিপির খবর আমরা জানি সে গুলি এখানে তালিকাগত করা যাইতে পারে।

চিত্র-সম্বলিত পাণ্ডুলিপির তালিকা

১-২। পালরাজ মহীপালদেবের রাজত্বের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরে অনুলিখিত ও চিত্রিত অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার দুইটি পাণ্ডুলিপি (কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ১৪৬৪ নং এবং কলিকাতা-রয়্যাল-এসিয়াটিক সোসাইটির ৪৭১৩ নং পাণ্ডুলিপি)।

৩। পালরাজ রামপালের শাসনকালের ৩৯তম বৎসরে অনুলিখিত ও চিত্রিত অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতার একটি পাণ্ডুলিপি (এক সময়ে এই পুঁথিটি ব্রেণ্ডেনবুর্গ সাহেবের সংগ্রহে ছিল)।

৪-৫। দুইটি অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতার পাণ্ডুলিপি (রাজসাহী-বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সংগ্রহ) ; ইহার একটি পাণ্ডুলিপি লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল বর্মণরাজ হরিবর্মার রাজত্বের ১৯তম বৎসরে। অন্যটিতে কোনো তারিখ নাই, তবে চিত্রশৈলী-সাক্ষ্যে মনে হয় দ্বাদশ শতকের কোনো সময়ে এই পাণ্ডুলিপিটি লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল।

৬। কলিকাতা রয়্যাল-এসিয়াটিক-সোসাইটি-গ্রন্থাগারের একটি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার পাণ্ডুলিপি (এ-১৫ নং) ; খ্রীষ্টোত্তর ১০৭১ অব্দে লিখিত ও চিত্রিত।

৭-৮। রাজসাহী-বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির গ্রন্থাগারে রক্ষিত কারণ্ডব্যূহ এবং বোধিচর্যাবতারের দুইটি পাণ্ডুলিপি। একটিতেও তারিখ নাই, তবে শৈলী-সাক্ষ্যে মনে হয় দ্বাদশ শতক।

৯। বোস্টন-চিত্রশালার ২০৫৮৯ নং পাণ্ডুলিপি ; পালরাজ (তৃতীয় ?) গোপালদেবের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে লিখিত ও চিত্রিত।

১০। জাপানের সোয়ামু-া পাণ্ডুলিপি। তারিখ নাই, তবে পালশিল্পের এবং সমসা য়িক নগরী অক্ষরের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

১১। লণ্ডন-ব্রিটিশ-মুাজিয়মের একটি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার পাণ্ডুলিপি পালরাজ (তৃতীয়?) গোপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত ও চিত্রিত (OR 6902)।

১২-১৩। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগারে রক্ষিত পঞ্চরক্ষার একটি পাণ্ডুলিপি; এই পাণ্ডুলিপিটি পাল-রাজ নরপালের চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত ও চিত্রিত। আরও একটি অজ্ঞাতনামা-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি (Add No 1643); লিখন ও চিত্রণের তারিখ ১০১৫ খ্রী।

১৪। কলিকাতা রয়্যাল-এসিয়াটিক-সোসাইটি-গ্রন্থাগারে রক্ষিত অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞা-পারমিতার একটি পাণ্ডুলিপি (৪২০৩ নং); লিখন ও চিত্রণের তারিখ নেপালী সম্বৎ ২৬৮=১১৪৮ খ্রী।

১৫। কলিকাতা রয়্যাল-এসিয়াটিক-সোসাইটি-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ৯৭৮৯ নং পাণ্ডুলিপি; পাল-রাজ গোবিন্দপালের অষ্টাদশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত ও চিত্রিত।

১৬। কলিকাতা অজিত ঘোষ-সংগ্রহের একটি পাণ্ডুলিপি; নাম ও তারিখ অজ্ঞাত; চিত্রশৈলীতে পাল-আমলের পূর্ব-ভারতীয় স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

১৭। কুলু-উপত্যকা-প্রবাসী স্বেতোস্লাভ রোয়েরিক মহাশয়ের সংগ্রহে একশত ছাব্বিশটি চিত্রসহ গণ্ডব্যূহের একটি সুদীর্ঘ পাণ্ডুলিপি। তারিখ অজ্ঞাত; কিন্তু চিত্রশৈলীতে পাল-আমলের পূর্ব ভারতীয় স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

১৮। কলিকাতা রয়্যাল-এসিয়াটিক-সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত শিবপূজা ও শৈবধর্ম সম্বন্ধীয় একাধিক শৈবগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি; এই পাণ্ডুলিপির কাঠের পাটার ভিতরের দিকে আঁকা দশ-বারোটি ছবি। তারিখ অজ্ঞাত, তবে শৈলীসাক্ষ্যে পাল-পর্বের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

১৯। অক্‌স্‌ফোর্ড বড্‌লেয়ান্‌ গ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি এই পাণ্ডুলিপিগুলি ছাড়া আরও দুইচারিখানা চিত্রিত পাণ্ডুলিপি ইতস্তত জ্ঞাত থাকা বিচিত্র নয়। তাহা ছাড়া, মাঝে মাঝে নূতন নূতন চিত্রিত পাণ্ডুলিপির খবরও পাওয়া যায়।

এ-তথ্য পরিষ্কার যে, একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি ছাড়া উপরোক্ত প্রত্যেকটি পাণ্ডুলিপিই বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় এবং প্রায় সকল চিত্রই মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান ধর্মমতসম্মত দেবদেবীর প্রতিকৃতি। একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি শৈবধর্ম সম্পর্কিত এবং উহার চিত্রগুলি লিঙ্গ ও ব্রাহ্মণ্যদেবদেবীর প্রতিরূপ। এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলি ছাড়া তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ স্বল্পায়তন রেখাচিত্রের খবরও আমরা জানি; এই রেখাচিত্র তিনটিও একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় চিত্র-শিল্পের নিদর্শন হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাদের বিষয়বস্তু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী।

কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য

বলিয়াছি, প্রায় সকল চিত্রই মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান ধর্মসম্মত দেবদেবীর প্রতিকৃতি। কায়সাধনের নির্দিষ্ট ধ্যানানুযায়ী বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দেবদেবী, যথা, লোকনাথ, তারা, মহাকাল, অমিতাভ, অবলোকিত, মৈত্রেয়, বজ্রপাণি, আকাশগর্ভ প্রভৃতি ও তাঁহাদের সহচর-সহচরীদের প্রতিমাই পাণ্ডুলিপি পত্রের সীমার মধ্যে রঙে ও রেখায় রূপায়িত। এই চিত্রগুলির সাহায্যে বজ্রযান-তন্ত্রযান সাধনে বর্ণিত দেবদেবীদের অনেকের পরিচয় সহজতর হয়; বিশেষত ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আছেন সমসাময়িক ভাস্কর্যে যাঁহাদের পরিচয় পাওয়া যায় না। কয়েকটি ছবিতে দেখিতেছি, জাতকের কাহিনী বা বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনীও চিত্ররূপ লাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক অভিজাত নায়ক, ধর্মযাজক এবং বিত্তশালী শ্রেণীর লোকদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই এই সব পাণ্ডুলিপি অনুলিখিত ও চিত্রগুলি রূপায়িত হইত। সুতরাং সমসাময়িক ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলার যাহা সামাজিক প্রেরণা ও পরিবেশ, চিত্রকলার ক্ষেত্রেও তাহাই।

বর্তমানে বাঙলা ভাষাভাষী লোকদের যে ভৌগোলিক সীমা, সব পাণ্ডুলিপিই যে সেই সীমার মধ্যেই লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল, এ-কথা জোর করিয়া বলা যায় না। কয়েকটি পাণ্ডুলিপি বিহারে এবং কয়েকটি আবিষ্কৃত হইয়াছে নেপালে; হয়তো লেখা ও আঁকার কাজটাও সেখানেই হইয়া থাকিবে; কিন্তু শৈলী-প্রমাণের দিক্ হইতে স্বীকার করিতেই হয়, ভৌগোলিক সীমাগত এই পার্থক্য চিত্রশৈলীতে কোনো পার্থক্য রচনা করে নাই। বস্তুত, বাঙলা-বিহার-নেপালের সমসাময়িক চিত্রশিল্প একই শিল্পধারার সৃষ্টি বলিলে অনৈতিহাসিক কিছু বলা হয় না। কয়েকটি পাণ্ডুলিপি তো নিঃসংশয়ে বাঙলাদেশেই লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল, (যেমন, হরিবর্মার ঊনবিংশ রাজ্যাঙ্কের পাণ্ডুলিপিটি); ইহাদের চিত্রগুলির সঙ্গে বিহার বা নেপাল বা পূর্ব-ভারতে অন্যত্র আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপি-চিত্রের মূলগত পার্থক্য কোথাও কিছু নাই। এই চিত্রশিল্প একান্তই প্রাচ্য-ভারতীয় চিত্রশিল্পধারার সৃষ্টি এবং সে-ধারার কেন্দ্র ছিল পাল-ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বাঙলা দেশ, এবং কিয়দংশে বিহার।

বলিয়াছি, এই চিত্রগুলিতে পাণ্ডুলিপি-চিত্রণের বিশেষ স্বতন্ত্র কোনো ভঙ্গীর পরিচয় নাই। চীন, ইরাণ, মধ্যযুগীয় য়ুরোপ বা মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে স্বল্পায়তন পুঁথিচিত্রের যে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়, তাহার সঙ্গে এই পাণ্ডুলিপি চিত্রগুলির কোথাও কোন মিল নাই। বস্তুত, এই চিত্রগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি প্রাচীর-চিত্র; প্রাচীর-চিত্রকেই যেন ধরা হইয়াছে পুঁথিচিত্রের সীমার মধ্যে। আর একটি তথ্যও একটু লক্ষণীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুর সঙ্গে চিত্রগুলির বিষয়বস্তুর বিশেষ কোনো যোগ নাই; চিত্রগুলি সাধারণত কোনো কোনো মন্দিরের অথবা দেবদেবীর

অথবা উভয়েরই প্রতিরূপ মাত্র। ইহাদের উদ্দেশ্য পুঁথির শোভাবর্ধন করা, বিষয়বস্তুকে উজ্জ্বল করা নয়।

ছবিগুলিতে যে-সব রং ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার মধ্যে হরিতালের হলুদ, খড়ি-মাটির সাদা, গাঢ় নীল (অজন্তার পাথুরে নীল নয়), প্রদীপের শীষের কালো, সিঁদুর লাল এবং সবুজ। এই সবুজ অজন্তা-চিত্রে ব্যবহৃত ঘন উজ্জ্বল সবুজ নয়; বোধ হয় হলুদ এবং নীলে মিশ্রিত সবুজ। প্রয়োজনানুযায়ী একই রঙের গাঢ়তার তারতম্য আছে, ভিন্ন রঙের ব্যবহারও আছে; সর্বোচ্চ স্তরে সাদা, সর্বনিম্নে কালো। কিন্তু যত বৈচিত্র্যই থাকুক, দেবদেবীর রং সর্বত্রই সাধনসূত্রানুযায়ী নিয়মিত ও নির্ধারিত। সাধারণ ভাবে রঙের বিন্যাস অজন্তা-চিত্রের রীতি ও আদর্শানুযায়ী। অজন্তার মত এ-ক্ষেত্রেও রঙের ব্যবহারে ডৌলের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে; বস্তুত, মণ্ডলায়িত ডৌল এই চিত্রগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে, অজন্তার রঙের পরিমিত সঙ্গতির কোনো পরিচয় এই চিত্রগুলিতে নাই। বহিরেখা সর্বদাই কালো অথবা লাল রঙে টানা, এবং ভারতীয় চিত্রের সাধারণ রীতি অনুযায়ী সর্বত্রই বহিরেখাটি টানা হইয়াছে আগে সরু তুলিতে, এবং পরে দেওয়া হইয়াছে ভিতরকার রঙের প্রলেপ স্থূলতর তুলির সাহায্যে।

চিত্র-বিন্যাসের রীতি অনেকটা ভাস্কর্য-বিন্যাসের রীতিই অনুসরণ করিয়াছে। মূল প্রতিমাটি পার্শ্বপ্রতিমাগুলির চেয়ে আকারে বড় এবং সাধারণত অলংকৃত পটভূমি বা দীর্ঘায়ত বা অর্ধগোলাকৃতি প্রভামণ্ডলের পটে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট, অথবা মন্দিরের অলিন্দে স্থাপিত। মূল প্রতিমার দেহকাণ্ডের দুই পাশে এক বা দুই সারিতে, সরল রেখায় বা চক্রাকারে মণ্ডলের অন্যান্য দেবদেবীরা বিন্যস্ত। যে-সব ক্ষেত্রে মূল প্রতিমা কাঠামোর এক পার্শ্বে সে-সব ক্ষেত্রে পার্শ্ব-দেবতারা সারি সারিতে বা অর্ধচক্রাকারে অন্য পার্শ্বে বিন্যস্ত। শূন্যস্থান বড় একটা নাই; যে-সব স্থানে আছে সেখানে বিচরমান বা উড্ডীয়মান সহচর-সহচরী, লতাপাতা, অলংকার প্রভৃতির সাহায্যে বৈচিত্র্য রূপায়িত।

তারিখ-সম্বলিত পাণ্ডুলিপিগুলির সাহায্যে এই চিত্রগুলির একটা ধারাবাহিক বিচার চলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে চিত্রশৈলীর বিবর্তনের কোনো ইতিহাস উদ্ধার করা কঠিন। মোটামুটি ভাবে একাদশ ও দ্বাদশ শতকের এই সৃষ্টি-প্রচেষ্টার মধ্যে শিল্পের যে-রূপ প্রত্যক্ষ তাহা অবিচল ও নির্দিষ্ট। বিবর্তমান কোনো প্রবাহ ইহাদের মধ্যে ধরা প্রায় যায় না বলিলেই চলে। ছবিগুলি দেখিলে এবং একটু বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, এই চিত্ররীতি ও শৈলী একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের বিবর্তিত রূপ, এবং বহুদিন সুঅভ্যস্ত। এই সুবিস্তৃত দেশের অন্যত্র নানাস্থানে যে শিল্পরূপ ও রীতি প্রাচীর-গাত্রে অথবা পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় বহুদিন সুঅভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, যে রূপ ও রীতি বাঘ-অজন্তা-এলোরার গুহাগাত্রে স্বাক্ষর রচনা করিয়াছে তাহাই প্রাচীন বাঙলার এই পাণ্ডুলিপি-চিত্র-গুলিতেও ধরা পড়িয়াছে। ইহারা চলমান ভারতীয় চিত্রশিল্প-প্রবাহেরই একটি অচ্ছেদ্য

ধারা এবং সেই ধারারই অন্যতম নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশ। তবে, এ-কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার্য যে, একাদশ-দ্বাদশ শতকে পৌঁছিয়া সে-ধারা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, নূতন স্রোত সঞ্চার আর কিছু দেখা যাইতেছে না, নূতনতর সৃষ্টির সম্ভাবনা কমিয়া আসিয়াছে; ঐতিহ্যের বাহক হিসাবেই যেন ইহাদের মূল্য।

চিত্রশৈলী

মহীপালের রাজ্যাঙ্কের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরে লিখিত ও চিত্রিত পাণ্ডুলিপি দুইটির ছবিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে। ষষ্ঠ বৎসরে চিত্রিত ছবিগুলিতে (কলিকাতা -এসিয়াটিক সোসাইটি, ৪৭১৩ নং পাণ্ডুলিপি) শিল্পীর দৃষ্টি রঙের ঘন মণ্ডলায়িত ডৌলের প্রতি যতটা সজাগ ঠিক ততটাই সজাগ তরঙ্গায়িত ও প্রবাহমান রেখার ডৌলের দিকে। বহিরেখার সুপূর্ণ ডৌলের প্রতি সঙ্গতি রাখিয়া অন্যান্য রেখাগুলিকে সূক্ষ্ম বা গভীর করা হইয়াছে। দেহ এবং মুখাবয়বে যেখানে প্রয়োজন সেখানে সাদা রঙের সাহায্যে উচ্চতম স্তর দেখান হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে কোথাও কোনো স্বচ্ছ সূক্ষ্ম মণ্ডণ বা ভাব-ব্যঞ্জনার কোনো পরিচয় নাই; মুখ ও দেহভঙ্গী লাবণ্যবিহীন, কঠিন; সমস্ত রূপায়ণই একান্ত ভাবে রেখানির্ভর। এই রাজারই পঞ্চম বৎসরে চিত্রিত কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছবিগুলিতে রঙের ঘন মণ্ডলায়িত ডৌলের কোনো চেষ্টা প্রায় নাই বলিলেই চলে, থাকিলেও খুব ক্ষীণ; তুলি টানা হইয়াছে কঠিন সমতলে উচ্চাবচ বা নতোন্নত ইঙ্গিত-রচনার কোনো চেষ্টাই প্রায় করা হয় নাই। প্রতিমার প্রকৃত ভঙ্গী এবং অবস্থান যাহাই হউক না কেন, দেহাবয়ব ও মুখমণ্ডল সর্বদাই কঠিন; শুধু রেখা-প্রবাহের সাহায্যে কিছুটা নমনীয়তার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে মাত্র! কিন্তু এই প্রথাবদ্ধ, সমতল এবং তরল রঙের প্রলেপ মণ্ডলায়িত ডৌলসমৃদ্ধ রেখার বিন্যাসকে বিশেষ স্পর্শ করে নাই। বস্তুত, এই পাণ্ডুলিপির চিত্রগুলির তরল ও সমতল পটভূমিতে মণ্ডলায়িত রেখাপ্রবাহই একমাত্র আকর্ষণীয় বস্তু।

সদ্যোক্ত কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি চিত্রগুলি সম্বন্ধে যে-কথা বলা হইল সে-কথা বোস্টন চিত্রশালার পাণ্ডুলিপি-চিত্র, সোয়ামুরা পাণ্ডুলিপি-চিত্র, ব্রেওেনবুর্গ পাণ্ডুলিপি-চিত্র, অজিত ঘোষ-সংগ্রহের পাণ্ডুলিপি-চিত্র এবং রাজসাহী-চিত্রশালার পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলি সম্বন্ধেও বলা চলে, অবশ্য খুবই সাধারণ ভাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ব্রেওেনবুর্গ-পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ চিত্রে রঙের মণ্ডণ অত্যন্ত ক্ষীণ, প্রলেপ অত্যন্ত তরল। কিন্তু রেখাগুলি পূর্ণ মণ্ডলায়িত, এবং অপরূপ মাধুর্য ও সংবেদনশীলতায় জীবন্ত; বিন্যাসও নিখুঁত। অথচ, এই পাণ্ডুলিপিতেই এমন কতকগুলি ছবি আছে যেখানে রঙের মণ্ডলায়িত ডৌল প্রত্যক্ষ, এবং সঙ্গে সঙ্গে রেখার ডৌলও। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একই পাণ্ডুলিপির চিত্রমালায় রঙের মণ্ডলায়িত ডৌল এবং ডৌলবিহীন তরল সমতল

রঙের প্রলেপ একই সঙ্গে পাশাপাশি বিদ্যমান; উভয় ক্ষেত্রেই তরঙ্গায়িত ও প্রবহমান রেখার সমৃদ্ধ ডৌল উপস্থিত। এই বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট এবং আরো সমৃদ্ধ অভিজ্ঞান দেখা যায় শ্বেতোস্লাভ্ রোয়েরিক সংগ্রহের গণ্ডব্যূহ-পাণ্ডুলিপির অনেকগুলি চিত্রে।

কলিকাতা এসিয়াটিক-সোসাইটির এ-১৫নং পাণ্ডুলিপির চিত্রাবলী তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ এবং উচ্চাঙ্গের। রঙের মণ্ডণায়িত রূপায়ণ রীতি এ-ক্ষেত্রেও উপস্থিত, তবে ক্ষীণ এবং বৈচিত্র্যবিহীন, কিন্তু যতখানি আছে ততখানি সুবিন্যস্ত এবং মনোরম। রেখার মণ্ডণায়িত গতির প্রবহমানতা পরিপূর্ণ অব্যাহত। ভাব-ব্যঞ্জনায় এবং ভঙ্গীর লালিত্যেও এই চিত্রগুলি সমৃদ্ধ।

বস্তুত, প্রবহমান রেখার এই মণ্ডণায়িত গতিই এই ছবিগুলির মেরুদণ্ড। কিন্তু কোনো কোনো পাণ্ডুলিপি-চিত্রে এই রেখাই হইয়া পড়িয়াছে দুর্বল অনিশ্চিত এবং ভঙ্গুর, যেমন, কেম্‌ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়েরর ১৬৪৩ নং পাণ্ডুলিপিতে, কলিকাতা-এসিয়াটিক-সোসাইটির ৪২০৩নং পাণ্ডুলিপিতে। পূর্ব-ভারতীয় শিল্পাদর্শের এবং রীতির স্বাক্ষর উভয় নিদর্শনেই উপস্থিত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও রঙের মণ্ডণায়িত ডৌল এবং রেখার সমৃদ্ধ মণ্ডণায়িত গতি দুইই স্তিমিত ও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; রেখা তো ভঙ্গুর এবং নির্জীব বলিলেই চলে। প্রতিমার ভঙ্গী কঠিন, বিন্যাস স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন; বস্তুত, একই চিত্রে একটি প্রতিমা আর একটি প্রতিমার সঙ্গে কোনো আত্মিক যোগসূত্রে যেন আবদ্ধ নয়। কলিকাতা এসিয়াটিক-সোসাইটির ৯৭৮৯-এ নং পাণ্ডুলিপির চিত্রগুলি কালক্রমের দিক্ হইতে বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন। শিল্পশৈলীর দিক হইতে এই চিত্রগুলিকে বাঙলার সমসাময়িক প্রস্তর-প্রতিমাশিল্পের চিত্রিত প্রতিলিপি বলা যাইতে পারে। রেখা ও রঙের মণ্ডণায়িত ডৌলই এই চিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য, এবং সেই হিসাবে পূর্বতন রেগুেনবুর্গ ও এসিয়াটিক-সোসাইটির এ-১৫নং পাণ্ডুলিপির চিত্রগুলির সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ।

এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, প্রাচ্য-ভারতীয় এই চিত্রকলা বহিরঙ্গ এবং অন্তর্নিহিত সত্তার দিক হইতে সমসাময়িক প্রতিমা-শিল্পের চিত্রিত প্রতিলিপি মাত্র। প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ-প্রতিমায় যেমন, এই যুগের আলোচ্য চিত্রগুলিতেও তেমনই নির্দিষ্ট বঙ্কিম রেখার নিয়ন্ত্রণে মূর্তি মণ্ডণায়িত; রেখার প্রবহমান তরঙ্গ দেহ-কাঠামো, নাভিবৃত্ত এবং করাঙ্গুলিতে সুস্পষ্ট। পাথরে এবং ধাতুতে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করা হইয়াছে সুদৃঢ় বস্তু-পদার্থের নমনীয় রূপান্তরের সাহায্যে, চিত্রে তাহাই সম্ভব হইয়াছে রঙের মণ্ডণের সাহায্যে। চিত্রের প্রতিমাগুলির মুখাবয়ব ও ভঙ্গী, দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্থান ও ভঙ্গী প্রভৃতি একটু যত্নের সঙ্গে বিশ্লেষণ করিলে সহজেই সমসাময়িক প্রস্তর-প্রতিমাশিল্পের সহিত এই চিত্রশিল্পের পারিবারিক সাদৃশ্য ধরা পড়িয়া যায়।

মূলগত আদর্শের দিক হইতে এই চিত্রশিল্প বাঘ-অজন্তা-এলোরা গুহার প্রাচীর-চিত্রৈতিহ্যের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ, এবং এই ঐতিহ্যের আশ্রয়েই রচিত। এই

শিল্পাদর্শের দুইটি দিক ; একটি ক্লাসিক্যাল, অপরটি মধ্যযুগীয়। এই নামকরণ দু'টির অর্থ আজ পরিষ্কার এবং সর্বজনগ্রাহ্য। ক্লাসিক আদর্শের প্রধান বৈশিষ্ট্য রং ও রেখার পরিপূর্ণ মণ্ডলায়িত ডৌলে সমৃদ্ধ রূপায়ণ ; মধ্যযুগীয় আদর্শের প্রধান নির্ভর তীক্ষ্ণ, ডৌলবিহীন রেখা, এবং তরল সমতল রঙের প্রলেপ। এলোরায় এই দুই আদর্শই পাশাপাশি সক্রিয় ; একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় প্রাচ্য-ভারতীয় চিত্রশিল্পেও তাহাই। তাহার ফলে আদর্শ ও রীতির একটা সংমিশ্রণও ঘটিয়াছে। এই সংমিশ্রণের ফলে ক্লাসিক আদর্শের দৈহিক কাঠামোর গভীর, সমাহিত ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ রেখার বিবর্তন ঘটে, এবং অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গায়িত প্রবাহে বহুরেখার সামঞ্জস্য যে সব ভঙ্গী মূর্ত হইত সে-সব ভঙ্গী দৃঢ়, তীক্ষ্ণ ও কঠিন ভঙ্গীতে রূপান্তর লাভ করে।

মধ্যযুগীয় রীতি ও আদর্শ

এলোরার চিত্রে এবং সমসাময়িক রাজপুতানার ভাস্কর্যে রেখানির্ভর পরিকল্পনার প্রথম সূত্রপাত, এবং এই সংমিশ্রণের প্রকাশ দেখা গেল অষ্টম শতকে। কিন্তু মধ্যযুগীয় আদর্শের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক প্রকাশ ধরা পড়ে পশ্চিম-ভারতে, বিশেষ ভাবে গুজরাট অঞ্চলে, দশম, একাদশ-দ্বাদশ শতক হইতেই। তবে, মধ্যযুগীয় শিল্পাদর্শের এই গতি একান্ত ভাবে পশ্চিম-ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাঙলাদেশে সুন্দরবনে ও চট্টগ্রামে দুই তিনটি তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ রেখাচিত্র পাওয়া গিয়াছে। এই চিত্রগুলি একান্ত তীক্ষ্ণ, ডৌলবিহীন রেখানির্ভর এবং রেখার সঙ্গে রেখার যোজনা তীক্ষ্ণ কৌণিক। ইহাদের রেখার চরিত্র এবং বিন্যাসের সঙ্গে এলোরার কোনো কোনো চিত্রের এবং গুজরাটী জৈন পুঁথিচিত্রের আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ। একাদশ-দ্বাদশ শতকের ভাস্কর্যেও কোথাও কোথাও এই ধরনের রেখার বিন্যাস দৃষ্টিগোচর, যেমন ওড়িশায় ও মধ্যভারতে, রাজপুতানা ও গুজরাটে। এই নূতনতর শিল্পরীতি ও আদর্শের প্রাচীনতর ইতিহাস যাহাই হউক, এবং যেখানেই ইহার প্রাথমিক উদ্ভব দেখা দিক্ না কেন একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকেই ইহা একটি সর্বভারতীয় রীতি ও আদর্শ বলিয়া স্বীকৃত ও অভ্যস্ত হইয়াছিল। সমসাময়িক বাঙলার প্রস্তর ও ধাতব-ভাস্কর-শিল্পে এই নূতন রীতি ও আদর্শের স্পর্শ কিছু লাগে নাই, কিন্তু সমসাময়িক চিত্রকলার পক্ষে ইহার প্রভাব কাটাইয়া চলা সম্ভব হয় নাই। এই প্রভাব যে শুধু সদ্যোক্ত তাম্রপট্টের রেখাচিত্রগুলিতেই তাহা নয়, পূর্বালোচিত কোনো কোনো পুঁথিচিত্রেও সুস্পষ্ট, বিশেষ ভাবে যে পাণ্ডুলিপিগুলির চিত্রণ ও রচনা নেপালে। পূর্ব-ভারত হইতে এই প্রভাব নেপালে এবং ব্রহ্মদেশেও বিস্তার লাভ করে।

এই মধ্যযুগচিহ্নিত রেখানির্ভর চিত্র-পরিকল্পনা যে-তিনটি তাম্রপট্টোৎকীর্ণ রেখাচিত্রে পূর্ণ পরিণতরূপে দৃষ্টিগোচর, তাহার একটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন আচার্য কুমারস্বামী তাঁহার Portfolio of Indian Art-গ্রন্থে ; ইহার প্রতিচিত্রও তিনি প্রকাশ

করিয়াছেন। ইহার তারিখ আনুমানিক একাদশ শতক। দ্বিতীয়টি রাজা ডোম্মন-পালের সুন্দরবনপট্টোলীর পশ্চাদপটে উৎকীর্ণ। তৃতীয়টি চট্টগ্রাম-জেলার মেহার-গ্রামে প্রাপ্ত দেববংশীয় জনৈক রাজার পট্টোলীর উপরিভাগে উৎকীর্ণ। শেষোক্ত দুইটিরই তারিখ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক এবং দুইটিই অধুনা আশুতোষ-চিত্রশালায় রক্ষিত। উভয় চিত্রেই তীক্ষ্ণ রেখার দ্রুত রূপায়ণ, এবং সে-রূপায়ণে সজীব প্রবহমানতা অব্যাহত; অবিচ্ছিন্ন গতিও অক্ষুণ্ণ। তবে, বেশ বুঝা যায়, যেখানেই সামান্য সুযোগও পাইয়াছেন শিল্পী সেইখানেই চঞ্চল বঙ্কিম রেখাপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, অকিঞ্চিৎকর বিষয়বস্তুতেও এমন একটা অহেতুক প্রাণময়তা ও রেখাপ্রাচুর্য পরিস্ফুট বিষয়বস্তুর সঙ্গে যাহার কোনো সঙ্গতি দেখা যায় না। বস্তুত, এই রেখা-পরিকল্পনা কোনো গভীর উপলব্ধি বা প্রেরণা হইতে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয় না। সম্ভবত, এই অস্বাভাবিক ও সঙ্গতিবিহীন প্রাচুর্য ও প্রাণময়তার ফলেই পার্শ্ব হইতে রচিত অস্বাকৃতি অথবা ত্রি-চতুর্থাংশ চিত্রিত মুখমণ্ডলের রেখা চঞ্চুবৎ সুতীক্ষ্ণ নাসিকায় অথবা কৌনিক চিবুকে, তীক্ষ্ণ ধনুকাকৃতি ভ্রূ অথবা দীর্ঘায়ত বঙ্কিম ঊর্ধ্বোষ্ঠে পরিণতি লাভ করিয়াছে। মনে হয়, শিল্পী যেন তীক্ষ্ণ দ্রুত রেখার বিলাসে প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, কারণ রঙের মণ্ডলায়িত রূপায়ণ যেখানে নাই সেখানে শিল্পীর হাতে রেখাই বিষয়বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন। চঞ্চল ও দীর্ঘায়ত বঙ্কিম রেখাসৃষ্টির প্রচেষ্টার মধ্যে এই কামনা প্রত্যক্ষ। এমন কি প্রতিমার সম্মুখভঙ্গী চিত্রণের সময়ও মুখমণ্ডলকে সম্পূর্ণ রেখানির্ভর করিয়াই আঁকা হইয়াছে, এবং শিল্পী যেখানেই তীক্ষ্ণ ভাব সঞ্চারের অবকাশ পাইয়াছেন সেখানেই রেখাগুলিতে ভীষণ চাঞ্চল্য ও পুনরাবৃত্তি দেখা দিয়াছে। মেহারে প্রাপ্ত রেখাচিত্রটিতে অবশ্য অধিকতর শক্তির বিকাশ; তাহার প্রধান কারণ, এই চিত্রটির রেখা-রূপায়ণ খানিকটা মণ্ডলায়িত। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও মধ্যযুগীয় শিল্পরীতি ও আদর্শের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

প্রাচ্য-ভারতীয় এই রীতি ও আদর্শের সঙ্গে সমসাময়িক পশ্চিম-ভারতীয় চিত্রাঙ্কন রীতি ও আদর্শের সাদৃশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তবে, পার্থক্যও সমান প্রত্যক্ষ। পশ্চিম-ভারতীয় অঙ্কনরীতিতে রেখা অত্যন্ত বেশি তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল, কোনো গুলি প্রায় জ্যামিতিক চিত্রের মত সূক্ষ্ম, ভগ্ন অথবা ভঙ্গুর রেখা একান্ত প্রাণহীন, আবেগহীন। প্রাচ্য-ভারতীয় পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলির কিংবা তাম্রপট্টোৎকীর্ণ রেখাচিত্রগুলির লালিত্যময়, আবেগময় রেখার সংবেদনী ক্ষমতা পশ্চিমী রেখার নাই। পশ্চিমী রেখা কঠিন ও সমতল চিত্রভূমিকে তাহার নির্দিষ্ট বন্ধনীর মধ্যে শুধু আবদ্ধ করিয়া রাখে মাত্র; প্রাচ্য-ভারতের আবেগময় সংবেদনী রেখা বন্ধনীবদ্ধ চিত্রভূমির মণ্ডলায়িত রূপটিকে প্রকাশ করে। রেখা-বিন্যাসের এই ঐতিহ্য শুধু যে নেপালে ও ব্রহ্মদেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহাই নয়, মধ্যযুগের

শেষপাদেও এই ঐতিহ্য বাঙলা-আসাম-ওড়িশায় বাঘ-অজন্তার বিশুদ্ধ আদর্শের পাশাপাশি নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। আধুনিক কালে কলিকাতার কালীঘাটের পটে অজান্তার রেখা-রচনার রীতি ও আদর্শ উজ্জীবিত ছিল বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত ; আর মধ্যযুগীয় আদর্শ বলবত্তর ছিল ফরিদপুর-যশোহর-মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-বীরভূমের জড়ানো পটে। এ-ক্ষেত্রেও বাঙলার চিত্রকলা কোনো বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা নয়, বরং সমসাময়িক সর্বভারতীয় চিত্ররীতি ও আদর্শের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি অধ্যায় মাত্র।

৫

স্থাপত্য শিল্প

প্রাচীন বাঙলার কুটীর, প্রাসাদ, বিহার, মন্দির প্রভৃতি সম্বন্ধে উপাদানের অভাবে সবিস্তারে কিছু বলিবার উপায় নাই। অথচ, অন্তত পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া লিপিমালায় ও সমসাময়িক সাহিত্যে নানাপ্রকারের সমৃদ্ধ ঘরবাড়ী, রাজপ্রাসাদ, স্তূপ, বিহার, মন্দির প্রভৃতির উল্লেখ ও স্বল্পবিস্তর বিবরণ সুপ্রচুর। পঞ্চম শতকে ফা-হিয়েন এবং সপ্তম শতকে য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ বাঙলার সর্বত্র অসংখ্য স্তূপ, বিহার ও দেবমন্দির প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। লিপিমালায় ভূভূষণ, পর্বতশৃঙ্গস্পর্ধী, স্বর্ণকলসশীর্ষ, মেঘবর্ত্মাবরোধী নানা মন্দিরের উল্লেখ বিদ্যমান। সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি-চিত্রে রঙে ও রেখায় নানা স্তূপ ও মন্দিরের প্রতিচিত্র রূপায়িত। সমসাময়িক তক্ষণ-ফলকেও নানা আকৃতি-প্রকৃতির গৃহ, স্তূপ ও মন্দিরের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। অথচ, আজ আর এই সব ঘরবাড়ী, বিহার-মন্দিরের কিছুই অবশিষ্ট নাই, মাটির ধূলায় প্রায় সবই গিয়াছে মিশিয়া, অথবা তাহাদের ধ্বংসাবশেষ বনে জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মাত্র দুই চারিটি একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় মন্দির সকল বাধা-বিরোধ-উপেক্ষা তুচ্ছ করিয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছে ; দুই চারিটির ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার ও সংস্কার করা হইয়াছে প্রত্নবিলাসী মনের আনন্দ-বিধান বা ঐতিহাসিকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য।

ধ্বংসের কারণ সহজবোধ্য। কাঠ, বাঁশ বা ইট যাহাই হোক্, এই উষ্ণ জলীয় বৃষ্টিস্নাত পলিমাটির দেশে কিছুই কালের সঙ্গে সংগ্রামে বেশিদিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। বাংলা দেশ পাথরের দেশ নয় ; অধিকাংশ বিহার-মন্দির ইত্যাদি এবং কিছু কিছু সমৃদ্ধ প্রাসাদ ইটে নির্মিত হইত ; কিন্তু ইটও কালজয়ী হইয়া আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। তাহার উপর আবার মানুষের লোভ ও লুণ্ঠন-স্পৃহা প্রকৃতির সঙ্গে হাত মিলাইয়া ধ্বংসলীলায় মাতিয়াছে। পরধর্মদ্বেষী বিধর্মীরাও

অনেক বিহার মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিয়াছেন। প্রাচীনতম হিন্দু ও বৌদ্ধ-মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার কিছু কিছু অংশ পরবর্তী কালের মসজিদ, চবুতরা, দরবার-গৃহ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। গৌড়-পাণ্ডুয়া, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানের মধ্যযুগীয় প্রত্নাবশেষ একটু মনোযোগে বিশ্লেষণ করিলেই তাহা ধরা পড়িয়া যায়।

সাধারণ স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত এমন কি সমৃদ্ধ লোকেরাও নিজেদের বসবাসের জন্য যে সব ঘরবাড়ী প্রাসাদ ইত্যাদি রচনা করিতেন তাহারও উপাদান ছিল খড়, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি; পার্থক্য যাহা ছিল তাহা শুধু আয়তন ও অলংকরণের, সমৃদ্ধি ও জটিলতার। উচ্চবিত্ত লোকদের ইট ব্যবহারের সামর্থ্য ছিল না, এমন নয়; ইটের তৈরি ছোটবড় ঘরবাড়ী নিশ্চয়ই কিছু কিছু ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে যুক্তিটা ছিল এই যে, পঞ্চভূতে রচিত এই নশ্বর ক্ষণস্থায়ী মানবদেহের আশ্রয়ের জন্য সুচিরকালস্থায়ী গৃহের কি-ই-বা প্রয়োজন! সে-প্রয়োজন যদি কাহারও থাকে তাহা দেবতার, কারণ দেবদেহের তো কোনো বিনাশ নাই, এবং সুচিরস্থায়ী আবাসের প্রয়োজন তো তাঁহারই। যাহাই হউক, মানুষের বসবাসের জন্য তৈরি গৃহের আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার মত খুব উপাদান আমাদের নাই; তবে, কিছু কিছু উৎকীর্ণ মৃৎ ও প্রস্তর-ফলকের সাক্ষ্যে কতকটা আভাস ধরিতে পারা কঠিন নয়। সাম্প্রতিক বাঙলাদেশের পল্লীগ্রামে আজও বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপর চতুষ্কোণ নক্সার ভিত্তিতে মাটির দেয়াল বা বাঁশের চাঁচারীর বেড়ায় ঘেরা যে ধরনের ধনুকাকৃতি দোচালা, চৌচালা, আটচালা ঘর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ধরনের বাঙলা-ঘর রচনাই ছিল প্রাচীন রীতি। এই আকৃতি-প্রকৃতিই ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে গৌড়ীয় বা বাঙলা রীতি নামে খ্যাত, এবং তাহাই পরবর্তী কালে মধ্যযুগীয় ভারতীয় স্থাপত্যে বাঙলার দান বলিয়া গৃহীত ও স্বীকৃত হইয়াছিল। এই গঠন ও আকৃতিই ঊনবিংশ শতকে 'বাঙলো—বাড়ী' নামে ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজে পরিচিতি লাভ করে। এই ধরনের গৌড়ীয় রীতির আবাস-গৃহই গরীবের কুটীর হইতে আরম্ভ করিয়া ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত ছিল; পার্থক্য যাহা ছিল তাহা শুধু সমৃদ্ধি ও অলংকরণের। দ্বিতল-ত্রিতল গৃহও এই রীতিতেই নির্মিত হইত; উপরের চাল বিন্যস্ত হইত ক্রমহ্রস্বায়মান ধনুকাকৃতি রেখায়। কোনো কোনো মন্দিরও ঠিক এই গৌড়ীয় রীতিতেই নির্মিত হইত; বস্তুত, একাধিক প্রস্তর ফলকে এই ধরনের মন্দির উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙলার স্থাপত্যের সুসংবদ্ধ ইতিহাস রচনা করিবার মত উপাদান স্বল্পই। ধ্বংসস্তূপে পরিণত বা অর্ধভগ্ন যে দুই চারিটি বিহার-মন্দির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তাহারই ভগ্নাংশগুলি আহরণ করিয়া, এবং মৃৎ ও প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ ও

পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠায় চিত্রিত মন্দিরাদির আকৃতি-প্রকৃতির সাক্ষ্য একত্র করিয়া একটি সমগ্র রূপ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, প্রত্নসাক্ষ্য যাহা কিছু আছে তাহা একান্তই বিহার-দেউল ইত্যাদি সম্বন্ধে ; স্থাপত্যের অন্যান্য দিক্ সম্বন্ধে বলিবার মত উপাদান একেবারে নাই বলিলেই চলে।

প্রাচীন বাঙলার ধর্মগত বাস্তু মোটামুটি তিন শ্রেণীর : স্তূপ, বিহার ও মন্দির। স্তূপ ও বিহার সাধারণভাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সঙ্গে জড়িত, বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে। প্রাচীন বাঙলায় জৈন-স্তূপের একটি মাত্র সংশয়িত উল্লেখ জানা যায় এবং জৈন বিহারের একটি মাত্র নিঃসংশয় উল্লেখ। এই বিহারটি ছিল উত্তর-বঙ্গের পাহাড়পুরে ; স্তূপটিও বোধ হয় উত্তর-বঙ্গেই ; আর সমস্ত স্তূপ এবং বিহারই বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়ে রচিত।

স্তূপ

ধর্মগত স্থাপত্যের কথা বলিতে গেলে স্তূপের কথাই বলিতে হয় সর্বাগ্রে। স্তূপ প্রাক্ বৌদ্ধ যুগের ; বৈদিক আমলেও দেহাস্থি প্রোথিত করিবার জন্য শ্মশানের উপর মাটির স্তূপ তৈরি হইত। কিন্তু এই স্থাপত্যরূপকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেন বৌদ্ধরাই। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে স্তূপ তিন প্রকারের (১) শারীর ধাতু স্তূপ—এই শ্রেণীর স্তূপে বুদ্ধদেবের এবং তাঁহার অনুচর ও শিষ্যবর্গের শরীরাবশেষ রক্ষিত ও পূজিত হইত ; (২) পরিভোগিক ধাতু স্তূপ—এই শ্রেণীর স্তূপে বুদ্ধদেব কর্তৃক ব্যবহৃত দ্রব্যাদি রক্ষিত ও পূজিত হইত ; (৩) নির্দেশিক বা উদ্দেশিক স্তূপ—বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের জীবনেতিহাসের সঙ্গে জড়িত কোনো স্থান বা ঘটনাকে উদ্দেশ্য করিয়া বা তাহাকে নির্দেশ বা চিহ্নিত করিবার জন্য এই শ্রেণীর স্তূপ নির্মিত হইত। পরবর্তী কালে স্তূপ মাত্রই বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়, এবং সেই ভাবেই সমগ্র বৌদ্ধসমাজের পূজা লাভ করে। তাহা ছাড়া, বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলিতে পূজা দিতে আসিয়া নৈবেদ্য বা নিবেদনরূপে ছোট বড় স্তূপ নির্মাণ করিয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও একটা সাধারণ রীতি হইয়া দাঁড়ায়। এই স্তূপগুলিকে বলা হইত নিবেদন-স্তূপ।

কিন্তু যে-শ্রেণীর স্তূপই হোক বা যে উদ্দেশ্যেই তাহা রচিত হউক না কেন, আকৃতি-প্রকৃতি ও গঠনপদ্ধতিতে ইহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। একেবারে আদিতে স্তূপ বলিতে গোলাকার একটি বেদীর উপর অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি অণ্ড ছাড়া কিছুই বুঝাইত না। অণ্ডটির ঠিক উপরেই থাকিত হর্মিকা ; এই হর্মিকা-বেষ্টনীর মধ্যে একটি ভাণ্ডে রাখা হইত শারীর বা পরিভোগিক ধাতু ; পর্বদিবসে ধাতুসহ এই ভাণ্ডটি নীচে নামাইয়া ভক্ত পূজারীদের দেখান হইত, পুরোভাগে রাখিয়া গণযাত্রা করা হইত। এবং যেহেতু ধাতুগর্ভ এই ভাণ্ডটিই ছিল পূজা ও শ্রদ্ধার বস্তু সেই হেতু ইহাকে রৌদ্রবৃষ্টি

হইতে রক্ষা করিবার জন্য, হর্মিকার ঠিক উপরেই থাকিত একটি ছত্রাবরণ। কালক্রমে ছোটই হোক্ আর বড়ই হোক্, প্রত্যেকটি অঙ্গকে পৃথক পৃথকভাবে লম্বিত করিয়া সমগ্র স্তূপটিকেই লম্বিত, সুউচ্চ করিয়া গড়িয়া তুলিবার দিকে একটা ঝোঁক সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে, এবং তোরণ, বেষ্টনী ও নানা অলংকরণ প্রভৃতি সংযোজিত হইতে আরম্ভ করে। সপ্তম-অষ্টম শতক নাগাদ নিম্ন ও গোলাকৃতি বেদীটি একটি গোল এবং লম্বিত মেধিতে পরিণতি লাভ করে; তাহার উপরকার অণ্ডটিও প্রমাণানুযায়ী ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে। উচ্চতা আরও বাড়াইবার জন্য বেদীর নীচে আবার একটি সুউচ্চ চতুষ্কোণ ভিত্ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা দিতে আরম্ভ করে; আর হর্মিকার উপর ক্রম-হ্রস্বায়মান ছত্রের সংখ্যা একটি দুইটি করিয়া বাড়িতে বাড়িতে সমগ্রতায় একটি সূচাগ্র শিখরের আকৃতি লাভ করে। তাহার ফলে স্তূপের প্রাথমিক, অর্থাৎ নিম্নবেদীর উপর অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি অণ্ডের যে স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল; অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে সমান মূল্য পাইয়া অণ্ডের প্রাধান্য নষ্ট হইয়া গেল, এবং স্তূপ আর যথার্থত স্তূপ থাকিল না, বিভিন্ন অঙ্গ মিলিয়া লম্বিত এবং কৌণিক একটি শিখরের আকৃতি ধারণ করিল। বাঙলাদেশে যে কয়েকটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে আমরা পরিচিত ইহাদের সমস্তই স্তূপ-স্থাপত্যের বিবর্তনের এই স্তরের, অর্থাৎ একেবারে শেষ স্তরের এবং ইহাদের প্রত্যেকটিই নিবেদন-স্তূপ। য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ অবশ্য বলিতেছেন, বাঙলাদেশের সর্বত্র তিনি নৃপতি অশোকের পোষকতায় বুদ্ধদেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত অনেকগুলি স্তূপ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এ-তথ্য খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে, খুব সম্ভব বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নানা সময়ে উদ্দেশিক স্তূপ বাঙলার নানা স্থানে নির্মিত হইয়াছিল নানা জনের পোষকতায়; য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ হয়তো এই সব স্তূপই কিছু কিছু দেখিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আর ইহাদের কিছুই অবশিষ্ট নাই।

সংখ্যায় বা আকৃতি-প্রকৃতির বৈচিত্র্যে সমসাময়িক বিহার-প্রান্তের অসংখ্য নিবেদন-স্তূপগুলির সঙ্গে বাঙলার স্বল্প সংখ্যক নিবেদন-স্তূপের কোনো তুলনাই হয় না। ব্রোঞ্জ-ধাতুতে ঢালাই করা কিংবা পাথর কুঁদিয়া গড়া কয়েকটি স্বল্পায়তন নিবেদন-স্তূপ বাঙলার নানাস্থানে পাওয়া গিয়াছে; এ-গুলিকে ঠিক স্থাপত্য-নিদর্শন বলা চলে না, তবু সমসাময়িক বাঙলার স্তূপ-স্থাপত্যের আকৃতি-প্রকৃতি বুঝিতে হইলে ইহাদের আলোচনা করিতেই হয়। কয়েকটি ইটের তৈরি অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন স্তূপের ধ্বংসাবশেষও বাঙলার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়; আকৃতি-প্রকৃতির দিক হইতে বিহারের সমসাময়িক স্তূপ-স্থাপত্যের সঙ্গে ইহাদের বিশেষ কোনো পার্থক্য কিছু নাই।

ঢাকা জেলার আস্রফপুর-গ্রামে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের একটি স্বল্পায়তন নিবেদন-স্তূপ বোধ হয় বাঙলার সর্বপ্রাচীন (আ সপ্তম-শতক) স্তূপ-নিদর্শন। রাজসাহী জেলায় পাহাড়পুর এবং চট্টগ্রাম জেলার ঝেওয়ারী গ্রামেও দুইটি ব্রোঞ্জের ক্ষুদ্রাকৃতি নিবেদন স্তূপ

পাওয়া গিয়াছে। এই ধরনের স্তূপের প্রতিকৃতি বাঙলার সমসাময়িক প্রস্তরফলকেও উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আকৃতি-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিবার কিছু নাই।

পাথরে কুঁদিয়া তৈরি একটিমাত্র নিবেদন-স্তূপের খবর আমরা জানি; এই স্তূপটি যোগী-গুফায় প্রতিষ্ঠিত। প্রথম দর্শনে ইহাকে স্তূপ বলিয়াই মনে হয় না। ভিত্, বেদী, মেধি, অণ্ড, হর্মিকা, ছত্রাবলি প্রভৃতি সব কিছুরই গতি এমন উর্ধ্বমুখী যে সমগ্র স্তূপটিকে মনে হয় যেন একটি ক্রমহ্রস্বায়মান গোলাকৃতি স্তম্ভ, এবং স্তম্ভটিরই অংশে খাঁজ কাটিয়া কাটিয়া যেন স্তূপটির বিভিন্ন অংশের রূপ দেওয়া হইয়াছে। চতুষ্কোণ হর্মিকাটি তো যেন একান্তই একটি গোলাকৃতি আমলক-শিলায় পরিণত।

সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি-চিত্রেও কয়েকটি স্তূপের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। কেম্‌ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পাণ্ডুলিপিতে (১০১৫ খ্রী) বরেন্দ্রভূমির মৃগস্থাপন স্তূপের একটি চিত্র আছে; সপ্তম শতকে এই স্তূপটির কথাই বোধ হয় ই-ৎসিঙ্ উল্লেখ করিয়াছেন। আর একটি পাণ্ডুলিপি পত্রে বরেন্দ্রভূমির "তুলাক্ষেত্রে বর্ধমান-স্তূপ"-এর একটি চিত্র আছে। এই বর্ধমান স্থান নাম নয়, খুব সম্ভব জৈন-তীর্থংকর বর্ধমানের নাম, এবং যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই স্তূপটিই প্রাচীন বাঙলায় জৈন-স্তূপের একমাত্র জ্ঞাত নিদর্শন। তৃতীয় আর একটি স্তূপের ছবি আছে আর একটি পাণ্ডুলিপিতে। অলংকরণ-সমৃদ্ধির কথা বাদ দিলে আকৃতি-প্রকৃতির দিক হইতে সব ক'টি স্তূপ প্রায় একই প্রকারের। খাঁজকাটা চতুষ্কোণ ভিত্, ধাপে ধাপে তৈরি বেদী, পদ্মাকৃতি মেধি, ক্রমহ্রস্বায়মান অণ্ড ও ছত্রাবলী প্রত্যেকটি স্তূপেরই বৈশিষ্ট্য।

রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে, বিশেষভাবে সত্যপীরের ভিটায়, এবং বাঁকুড়া জেলার বহুলারায় খননাবিষ্কারের ফলে ইটের তৈরি কয়েকটি নিবেদন-স্তূপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এই ধরনের স্বল্পায়তন নিবেদন-স্তূপগুলি হয় পৃথক পৃথক, না হয় একই ভিতের উপর সারি সারি সাজানো, বা একই ভিতের উপর একটি বৃহত্তর স্তূপের চারদিকে চক্রাকারে ছোট ছোট স্তূপের বিন্যাস। এই ধরনের স্তূপ প্রায় সমস্তই দশম-একাদশ দ্বাদশ শতকের এবং ভিত্ ছাড়া ইহাদের আর কিছুই প্রায়ই অবশিষ্ট নাই, অর্থাৎ ইহাদের ভূমি-নক্‌সা ছাড়া আর কিছু বুঝিবার কোনো সুযোগ নাই। এই ভূমি-নক্‌সা কোনো কোনো ক্ষেত্রে চতুষ্কোণ বা গোলাকার, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চতুষ্কোণ ভিতের চারদিকে, ঠিক মধ্যখানে একটি একটি করিয়া চতুষ্কোণ সংযোজিত; তাহার ফলে সমগ্র ভূমি-নক্‌সাটি যেন একটি ক্রুসের আকার ধারণ করিয়াছে। ভিত্‌গুলি প্রায়ই বেশ উঁচু এবং অনেক নিদর্শনে ক্রমহ্রস্বায়মান স্তরে স্তরে বিভক্ত। ভিতের দেয়ালের গায়ে নানা বুদ্ধমূর্তি। এই রূপ ও বিন্যাসের দিক হইতে, বস্তুত সকল দিক হইতেই সমসাময়িক বিহারের নিবেদন-স্তূপগুলির সঙ্গে ইহাদের কোনোই পার্থক্য নাই। খননাবিষ্কারের ফলে দেখা গিয়াছে, এই স্তূপগুলির

গর্ভে অসংখ্য বৌদ্ধসূত্রোৎকীর্ণ মাটির শীলমোহর রক্ষিত থাকিত। বৌদ্ধ বিশ্বাসানুযায়ী এই সূত্রগুলিই ধর্মশরীর, এবং দেহাবশেষের পরিবর্তে এই ধর্মশরীরই স্তূপগর্ভে রক্ষা করা নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

স্তূপ স্থাপত্যে বাঙলাদেশ নূতন কোনো বৈশিষ্ট্য রচনা করে নাই বলিয়াই মনে হয়; নূতন সমৃদ্ধির সংযোজনাও নাই। বৃহদাকৃতি স্তূপ-রচনার কোনো চেষ্টাও বোধ হয় ছিল না। বস্তুত নৈবেদ্য বা নিবেদন উদ্দেশ্য ছাড়া, স্ব-স্বতন্ত্র স্থাপত্য নিদর্শন হিসাবে স্তূপ গড়িয়া তুলিবার উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোনো চেষ্টা বোধ হয় প্রাচীন বাঙলায় কিছু ছিল না, অন্তত প্রত্নসাক্ষ্যে তেমন প্রমাণ কিছু নাই। স্থাপত্য হিসাবে স্তূপ প্রাচীন বাঙলার চিত্ত আকর্ষণ করে নাই, অন্তত যে-সব নিদর্শন আমরা দেখিতেছি তাহাতে সে-প্রমাণ নাই। অথচ, প্রায় সমসাময়িক কালে ব্রহ্মদেশের রাজধানী পাগান-নগরে দেখিতেছি, স্তূপ রচনার কি সমৃদ্ধি, কি ঐশ্বর্য! প্রায় একই ধরনের কিন্তু সুবিস্তৃত ভূমি-নকসার উপর সুউচ্চ ভিত্ স্তরে স্তরে ক্রমহ্রস্বায়মান হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে; তাহার উপর সুবৃহৎ সুউচ্চ গোলাকৃতি মেধি, মেধির উপর ঘণ্টাকৃতি অণ্ড, অণ্ডের উপর চতুষ্কোণ হর্মিকা, এবং হর্মিকার উপর ক্রমহ্রস্বায়মান ছত্রাবলী। পাগানের স্তূপের বিভিন্ন অঙ্গের রূপ ও বিন্যাস রচনা ও নির্মাণরীতিতে একই যুক্তি অনুসরণ করিয়াছে, অথচ পাগান স্তূপ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে শুধু তাহার বৃহদায়তন দিয়া, কল্পনার বিরাটত্ব দিয়া। তুলনায় বাঙলা-বিহারের সমসাময়িক স্তূপ-স্থাপত্যকে যেন খেলেনার বস্তু বলিয়া মনে হয়, শুধু যেন নিয়মরক্ষা! তাহার কারণ সহজবোধ্য। মহাযান-বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে স্তূপের সম্বন্ধ স্বল্পই; তাহা ছাড়া, নিবেদন-স্তূপ তা যথার্থত স্তূপই নয়, স্তূপের মৌলিক উদ্দেশ্যও বহন করে না।

স্তূপের পরই বিহারের কথা বলিতে হয়। স্তূপ যদি ছিল পূজার প্রতীক, শ্রদ্ধার বস্তু, বিহার ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাসস্থল, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার, নিয়মসংযম-পালনের আশ্রয়। আদিম বৌদ্ধ বা জৈন বিহার পাহাড় কুঁদিয়া তৈরি গুহা মাত্র। সাধারণত একই পাহাড়ে যেখানে খানিকটা সমতল ভূমি আছে তাহার তিনদিক ঘিরিয়া সমান-অসমান গুহার সারি; সেই পাহাড়েরই অন্যত্র সুবিধানুযায়ী এবং প্রয়োজনানুযায়ী আরও কয়েকটি গুহা। এই গুহাগুলি ভিক্ষুদের আবাস-স্থল, বৃহত্তর একটি বা দু'টি গুহা সম্মেলন-স্থল বা পূজা-স্থল, সমতল আঙ্গিনাটি সভা-স্থল, এবং সব কিছু লইয়া একটি বিহার। কিন্তু এই ধরনের বিহার-রচনা ঠিক স্থাপত্য নয়, নির্মাণগত কোনো বুদ্ধি বা সৌন্দর্যের কোনো প্রেরণা এ-ক্ষেত্রে সক্রিয় নয়। পাহাড় কুঁদিয়া এই ধরনের বিহার রচনা ছাড়া ইট বা পাথরের ভিত্ ও কাঠামোর উপর বাঁশ, কাঠ ইত্যাদির সাহায্যে বিহার রচনার একটা চেষ্টাও ছিল, এবং সে-ক্ষেত্রে বিন্যাসের একটা যুক্তিও সক্রিয় ছিল। মাঝখানে সুবিস্তৃত অঙ্গন; সেই অঙ্গনের চারিদিক ঘিরিয়া কক্ষশ্রেণী; এক একদিকের

কেন্দ্র-কক্ষটি বৃহত্তর ; অঙ্গনের এক কোণে কূপ ও স্নানাচমনস্থান ; এবং বিহারে ঢুকিবার একটিমাত্র প্রবেশদ্বার।

বৌদ্ধ ও জৈন সংঘের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধ বৃহদায়তন বিহারের প্রয়োজন দেখা দেয়, এবং ইঁটের সাহায্যে সেই বিহার-রচনার সূচন হয়, সদ্যোক্ত বাঁশ-কাঠে নির্মিত বিহারের বিন্যাস অনুযায়ী। একতল বিহারে যখন কুলাইল না তখন দ্বিতল, ত্রিতল, এমন কি নবতল পর্যন্ত বিহার নির্মিত হইতে আরম্ভ করিল, এবং গোড়ায় যে বিহার ছিল ভিক্ষুদের আবাসস্থল মাত্র সেই বিহারই হইয়া উঠিল বিরাট জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার, ধর্মকর্ম-সাধনার কেন্দ্র।

প্রাচীন বাঙলায়ও এই ধরনের ছোট-বড় বিহার ছিল অনেক, এবং ইহাদের কথা আগেই অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এই সব বিহারের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় য়ুয়ান-চোয়াঙ্-কথিত পুণ্ড্রবর্ধনের পো-সি-পো বা ভাসু-বিহার এবং কর্ণ-সুবর্ণের লো-টো-মো-চিহ্ বা রক্তমৃত্তিকা-বিহারের বর্ণনায়। ভাসু-বিহারের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর মহাস্থানের সন্নিকটে বৃহৎ একটি স্তূপে, রক্তমৃত্তিকা-বিহারের ধ্বংসাবশেষ মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটির সন্নিকটে রাক্ষসডাঙ্গায়।

সোমপুর-বিহার

খননাবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছে রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে অন্তত দুইটি বিহার ছিল। ৪৭৮-৭৯ খ্রীষ্ট তারিখের একটি লিপিতে জানা যায়, এই স্থানের বট-গোহালী বা গোয়াল-ভিটায় আচার্য গুহনন্দীর একটি জৈন-বিহার ছিল, আর অষ্টম শতকের শেষার্ধে যে সোমপুরের শ্রীধর্মপাল-মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং পরবর্তী কালে এই বিহারের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দেশে-দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এ-তথ্য তো সুবিদিত। জৈন বিহারটির ভূমি-নক্সা ও আকৃতি-প্রকৃতি কি ছিল তাহা জানিবার কোনো উপায় আজ আর নাই। কিন্তু সুবিস্তৃত ধর্মপাল-বিহারটির নক্সা ও আকৃতি-প্রকৃতি দৃষ্টিগোচর। এত বৃহৎ ও সমৃদ্ধ বিহার ভারতবর্ষের এক নালন্দা ছাড়া আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই ; ইহার মহাবিহার নাম যথার্থ এবং সার্থক। বিস্তৃতভাবে এই বিহারের বর্ণনা দিবার স্থান ও সুযোগ নাই, তবু কিছুটা পরিচয় লইতেই হয়।

প্রত্যেক দিকে প্রায় ৯০০ ফিট, এমন একটি সমচতুষ্কোণ জুড়িয়া বিহারটি বিস্তৃত, এবং দৃঢ় সুপ্রশস্ত বহিঃপ্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। এই প্রাচীর ঘেঁষিয়া ভিতরের দিকে সারি সারি প্রায় ১৮০টির উপর কক্ষ ; প্রত্যেক দিকের কেন্দ্রের কক্ষটি বৃহত্তর। কক্ষসারির সম্মুখ দিয়া সুপ্রশস্ত বারান্দা লম্বমান হইয়া চলিয়া গিয়াছে চারিদিক ঘিরিয়া ; কেন্দ্রের সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দা হইতে নামিলেই সুপ্রশস্ত অঙ্গন, এবং অঙ্গনের একেবারে কেন্দ্র-স্থলে সুউচ্চ সুবৃহৎ মন্দির। বারান্দার প্রান্তে সিঁড়ির উপরই স্তম্ভশ্রেণী ; এই স্তম্ভ-

শ্রেণী ও কক্ষের দেয়ালের উপর ছাদ। বহিঃপ্রাচীরে প্রশস্ততা এবং স্তম্ভশ্রেণীর ঘন সন্নিবেশ দেখিয়া মনে হয় বিহারটির একাধিক ছিল তল, এবং কেন্দ্রীয় মন্দিরের উচ্চতা ও সমৃদ্ধির সঙ্গে প্রমাণ রক্ষা করিয়া সমগ্র বিহারটির উচ্চতা ও সমৃদ্ধি নিরূপিত হইয়াছিল।

বিহার মন্দিরে প্রবেশের প্রধান তোরণ ছিল উত্তর দিকে। সমতল ভূমি হইতে সুপ্রশস্ত সোপানশ্রেণী বাহিয়া উপরে উঠিয়া সুবৃহৎ একটি দরজা পার হইলেই সম্মুখে স্তম্ভসমৃদ্ধ সুপ্রশস্ত একটি কক্ষ; সেই কক্ষটি সোজা পার হইয়া গেলে দক্ষিণ দিকের কেন্দ্রে একটি ক্ষুদ্রতর দ্বার। এই দ্বার দিয়া ঢুকিতে হয় আর একটি স্তম্ভযুক্ত ক্ষুদ্রতর কক্ষে। কক্ষটির পরই লম্বমান বারান্দা; এই বারান্দা ধরিয়া চতুর্দিকের কক্ষশ্রেণী সমানে ঘুরিয়া আসা যায়, আর সোপান বাহিয়া নীচে নামিলেই সুপ্রশস্ত অঙ্গন; একেবারে চোখের সম্মুখে সুউচ্চ মন্দিরের সম্মুখ দৃশ্য। প্রবেশের প্রধান তোরণটি ছাড়া উত্তর দিকের প্রায় পূর্বতম প্রান্তে আর একটি ছোট তোরণ। পূর্বদিকের বৃহত্তর কেন্দ্রীয় কক্ষের ভিতর দিয়া ভিতর-বাহিরে যাওয়া আসা করিবার আরও একটি খিড়কী-তোরণ বোধ হয় ছিল আবাসিকদের ব্যবহারের জন্য। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যাতায়াতের কোনো পথই ছিল না।

এই চতুঃসংস্থান-সংস্থিত সুবৃহৎ বিহার মন্দিরটিকে বিপুলশ্রীমিত্রের নালন্দা-লিপিতে বিশেষিত করা হইয়াছে বসুধার একতম নয়নানন্দ বলিয়া। খননাবিষ্কারের ফলে বিহারটির যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর তাহাতে এই বিশেষণ অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না। বলা বাহুল্য, এই সুবৃহৎ বিহার একদিনে নির্মিত হয় নাই, এবং ইহার প্রায় চারি শতাব্দীর সুদীর্ঘ জীবনে একাধিকবার সংস্কার ও সংযোজনের প্রয়োজনও হইয়াছিল। তবু, এ-তথ্য অনস্বীকার্য বলিয়া মনে হয় যে, গোড়া হইতেই এই বিহারের নক্সা, বিন্যাস ও আকৃতি-প্রকৃতি যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের বুদ্ধি ও কল্পনায় বিহারটির সামগ্রিক রূপের একটা সুস্পষ্ট ধারণা সক্রিয় ছিল এবং নির্মাণ, সংস্কার ও সংযোজনকালে বা তাহার ফলে সেই রূপটির কোনো ব্যত্যয় ঘটে নাই। তাহা ছাড়া এ-ও মনে হয়, সামগ্রিক নির্মাণ কার্যটি একটানা একবারেই হইয়াছিল, পরবর্তী কালে সংস্কার প্রয়োজন হইলেও সংযোজনের প্রয়োজন বোধহয় বিশেষ কিছু হয় নাই। সূচনায় বিহারের কক্ষগুলি বাসগৃহ রূপেই ব্যবহৃত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ কক্ষের সমৃদ্ধ অলংকরণ দেখিয়া মনে হয়, পরবর্তী কালে আবাসিক ভিক্ষু সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় সেই কক্ষগুলি বোধ হয় পূজাগৃহ রূপেই ব্যবহৃত হইত।

এই সুবৃহৎ বিহার-মন্দিরের ব্যবস্থা-কর্ম পরিচালনার জন্য একটি দপ্তর ছিল, এবং সে দপ্তর-গৃহটি ছিল প্রধান প্রবেশ তোরণের পাশেই। তল হইতে তলে, কক্ষ হইতে কক্ষে, অঙ্গন হইতে অঙ্গনে জল-নিঃসরণের একটি প্রণালী সুদীর্ঘ পথ বাহিয়া বাহিয়া

বিহার-মন্দিরটির সমস্ত জল নিষ্কাশিত করিত বিহার-সীমার ভিতরেই একটি ক্ষুদ্রাকৃতি দীর্ঘিকায়। কক্ষশ্রেণীর মাঝে মাঝে, সুপ্রশস্ত অঙ্গনের নানা স্থানে ছোট ছোট মন্দির, নিবেদন-স্তূপ, কূপ, স্নানাচমনাগর, অশনস্থান ইত্যাদি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

নালন্দা, শ্রাবস্তি প্রভৃতি স্থানের সুবৃহৎ বিহার-প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে, মনে হয়, সোমপুর-বিহারটির সাধারণ নক্‌সা ও বিন্যাস ছিল প্রায় একই ধরনের, আদর্শ এবং উদ্দেশ্যও ছিল একই। কিন্তু, সন্দেহ নাই, পাহাড়পুরের মতন সুসমৃদ্ধ, সুবৃহৎ ও সুবিন্যস্ত বিহার এ-পর্যন্ত আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই ; বোধ হয় ছিলও না, অন্তত প্রত্নসাক্ষ্যে বা লিপি ও সাহিত্য-সাক্ষ্যে তাহা জানা যায় না।

৬

মন্দির-স্থাপত্য

লিপি ও সাহিত্য-সাক্ষ্যে জানা যায়, প্রাচীন বাঙলায় মন্দির নির্মিত হইয়াছিল অসংখ্য ; কিন্তু একাদশ দ্বাদশ শতকের কয়েকটি ভগ্ন, অর্ধভগ্ন মন্দির ছাড়া এই অসংখ্য মন্দিরের কিছুই আর অবশিষ্ট নাই। অথচ ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে মন্দিরেই যাহা কিছু বাঙলার বৈশিষ্ট্য। বাঙলার মন্দিরই যবদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের বিশিষ্ট মন্দির-স্থাপত্যের মূল প্রেরণা। সমসাময়িক লিপিমালা ও সাহিত্যে প্রাচীন বাঙলার কোনো কোনো মন্দিরের সমৃদ্ধির বর্ণনা দৃষ্টিগোচর , কোনো কোনো মন্দিরের আপেক্ষিক প্রসিদ্ধিও ছিল, সন্দেহ নাই। এমন দুই চারিটি মন্দিরের প্রতিকৃতি দেখা যায় সমসাময়িক পাণ্ডুলিপিচিত্রে এবং তক্ষণফলকে, যেমন রাঢ়া ও পুণ্ড্রবর্ধনের বুদ্ধ-মন্দির, বরেন্দ্রের তারা-মন্দির, সমতট, বরেন্দ্র, নালেন্দ্র, রাঢ়া এবং দণ্ডভুক্তির লোকনাথ-মন্দির। এই সব মন্দিরের প্রতিকৃতির আকৃতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রাচীন বাঙলায় মোটামুটি চারিটি বিভিন্ন শৈলীর মন্দির-নির্মাণরীতি প্রচলিত ছিল। রীতি ও শৈলীর এই বিভিন্নতা ভূমি-নক্‌সানির্ভর নয়, বস্তুত, প্রত্যেকটি রীতিতেই ভূমি-নক্‌সার যুক্তি ও বিন্যাস প্রায় একই ধরনের। এই বিভিন্নতা প্রধানত গর্ভগৃহের উপরিভাগ অর্থাৎ ছাদ বা চালের রূপ ও আকৃতিনির্ভর। সদ্যোক্ত চারিটি রীতি নিম্নোক্ত ভাবে তালিকাগত করা যাইতে পারে।

(১) ভদ্র বা পীড় দেউল। এই রীতিতে গর্ভগৃহের চাল ক্রমহ্রস্বায়মান পিরামিডাকৃতি হইয়া ধাপে ধাপে উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। ধাপ বা স্তর সংখ্যায় তিনটি, পাঁচটি বা সাতটি। সর্বোচ্চ এবং ক্ষুদ্রতম স্তরের উপরে আমলক ও চূড়া। এই ভদ্র বা পীড় দেউলই ওড়িশার রেখ বা শিখর-মন্দির সমূহের সম্মুখভাগের জগমোহন বা ভোগমণ্ডপ।

(২) রেখ বা শিখর দেউল। এই রীতিতে গর্ভগৃহের চাল ঈষদ্‌বক্র রেখায় শিখরাকৃতি হইয়া সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। শিখরের উপরি-ভাগে আমলক ও চূড়া। এই রেখ বা শিখর দেউল উত্তর-ভারতীয় এবং ওড়িশার নাগর পদ্ধতির মন্দিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় যুক্ত।

(৩) স্তূপযুক্ত পীড় বা ভদ্র দেউল। এই ধরনের দেউলে চালের ক্রমহ্রস্বায়মান পিরামিডাকৃতি স্তরের উপরে একটি স্তূপ। স্তূপটির উপর চূড়া।

(৪) শিখরযুক্ত পীড় বা ভদ্র দেউল। এই ধরনের দেউলের চালের ক্রমহ্রস্বায়মান পিরামিডাকৃতি স্তরের উপর একটি শিখর। শিখরের উপর চূড়া।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এই চার বিভিন্ন রীতির প্রত্যেকটির স্থাপত্য-নিদর্শন আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই ; তৃতীয় ও চতুর্থ রীতির মন্দিরের কোনো নিদর্শন আমরা আজও জানি না, যদিও ঐ ধরনের মন্দির ছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। প্রথমোক্ত রীতির নিদর্শনও জানি, নিঃসংশয়ে তাহা বলা যায় না ; তবে, দ্বিতীয় রীতির মন্দিরের কয়েকটি নিদর্শন আজও দৃষ্টিগোচর।

(১) প্রথমোক্ত রীতির, অর্থাৎ, ভদ্র বা পীড় দেউল যে প্রাচীন বাঙলার সুপ্রচুর ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় অগণিত প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ মন্দিরের প্রতিকৃতি গুলিতে। এই রীতির প্রাথমিক রূপটি দেখিতেছি ঢাকা আস্রফপুরে প্রাপ্ত সপ্তম শতকের ব্রোঞ্জনির্মিত একটি ফলকে। চারিটি খাঁজকাটা কাঠের স্তম্ভের উপর ঢালু ক্রমহ্রস্বায়মান দু'টি চাল, তাহার উপর সুন্দর একটি চূড়া। ইহাই এই রীতির মন্দিরের মূল রূপ ; এই রূপই ক্রমশ আরও সমৃদ্ধ এবং জটিল হইয়াছে। একটি একটি করিয়া ঢালু চালের সংখ্যা গিয়াছে বাড়িয়া ; সর্বোচ্চ চালটির উপর চূড়ার নীচেই গ্রীবাদেশের গোলাকৃতি অণ্ডটি ক্রমশ আমলক শিলায় বিবর্তিত হইয়াছে, এবং গ্রীবানিম্নের চালটির (ঘাড়চক্রের) চারিকোণে চারিটি ঝম্পসিংহ-মূর্তির অলংকরণ সংযোজিত হইয়াছে। ভূমি-নক্‌সা সাধারণত চতুষ্কোণ রথাকৃতি ; প্রত্যেক দিকের বিলম্বিত রেখাটি কেন্দ্রীয় অংশটির সম্মুখ দিকে বাড়াইয়া দিয়া রথের আকৃতি দান করা হইয়াছে। এই ধরনের রথাকৃতি ভূমি-নক্‌সার উপর দুই বা ততোধিক ঢালু ক্রমহ্রস্বায়মান চালের মন্দির মধ্যযুগের বাঙলাদেশেও সুপ্রচলিত রীতি ছিল, সন্দেহ নাই। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের অনেক মৃৎফলকে এই ধরনের মন্দিরের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। প্রায় সমসাময়িক কালের ইষ্টকনির্মিত এই রীতির মন্দিরের একাধিক নিদর্শন (যেমন বাঁকুড়া জেলার এক্তেশ্বর মন্দিরের নন্দীমণ্ডপ) আজও দৃষ্টিগোচর। লোকায়ত বাঙলার দ্বিতল বা ত্রিতল খড়ের চালের রূপ হইতেই যে এই রীতির উদ্ভব, তাহাতে সন্দেহের কোনো কারণ নাই। যাহাই হউক, প্রাচীনতর রূপের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর একমাত্র প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ প্রতিকৃতি-চিত্রেই দৃষ্টিগোচর ; মন্দিরাবশেষ কিছু নাই বলিলেই চলে। হিলিতে

প্রাপ্ত এবং ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত কল্যাণ-সুন্দর শিবমূর্তির ফলকে, চব্বিশপরগণা-কুলদিয়ায় এবং রাজসাহীর-বরিয়ার সূর্যমূর্তির ফলকে, বিক্রমপুরের মঞ্জুসম্ভব মূর্তির ফলকে, ঢাকা-মধ্যপাড়ায় বুদ্ধমূর্তি-ফলকে, বিরোলের উমা-মহেশ্বর প্রতিমা-ফলকে, এবং রাজসাহী-কুমারপুরের একটি সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উৎকীর্ণ প্রতিকৃতিতে এই রীতির মন্দিরের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলি ধরিতে পারা খুব কঠিন নয়।

(২) দ্বিতীয়োক্ত রীতির অর্থাৎ রেখ বা শিখর-দেউলের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন বোধ হয় বর্ধমান-বরাকরের ৪নং মন্দিরটি। এই মন্দিরটি পাথরে তৈরি; নীচু ভিত্তির উপর গর্ভগৃহটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, এবং গর্ভগৃহের উপর খর্বাকৃতি একটি রেখ বা শিখরের চাল। গোড়া হইতেই শিখরের ক্রমবক্র রেখাটি উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে; শিখরের উপর একটি বৃহৎ আমলক-শিলা। শিখরের পগ রেখাগুলি সুতীক্ষ্ণ ও সুকঠোর সারল্যে নিয়ন্ত্রিত। স্থাপত্যরূপের দিক হইতে এই মন্দিরটি ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দিরের সমকালীন, অর্থাৎ অষ্টম শতকীয়।

এই রেখ-দেউলের বিবর্তনের পরবর্তী স্তরটি ধরা পড়িয়াছে তিনটি ক্ষুদ্রায়তন নিবেদন-মন্দিরে; এই তিনটির দুইটি পাথরে তৈরি (একটি দিনাজপুরে এবং আর একটি রাজসাহী নিমদীঘিতে প্রাপ্ত), তৃতীয়টি ব্রোঞ্জে গড়া (এবং চট্টগ্রাম জেলায় ঝেওয়ারীতে পাওয়া)। আকৃতি-প্রকৃতি এবং বিবর্তনের দিক হইতে এই তিনটিই সমকালীন, সন্দেহ নাই। রেখাকৃতি ভূমি-নক্সার উপর গর্ভগৃহ; গর্ভগৃহের চারদিকে চারিটি ত্রিবলীত তোরণ বা কুলুঙ্গি; চালে ক্রমবক্রাকৃতি শিখর এবং শিখরের শীর্ষে সংকীর্ণ গ্রীবার উপর আমলক। বিবর্তনের এই স্তরেও পগরেখা তীক্ষ্ণ ও সরল, তবে শিখরের অঙ্গে চৈত্য-গবাক্ষের অলংকার। পাথরের নিদর্শন দুইটিতে গর্ভগৃহ ও শিখরের মাঝখানে দুই বা তিনস্তরে মণ্ডপায়িত রেখা, কিন্তু ব্রোঞ্জ-নিদর্শনটিতে তাহা নাই।

বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে প্রায় চারি পাঁচটি ভগ্ন ও অর্ধভগ্ন নিদর্শন বিদ্যমান—বর্ধমানের দেউলিয়া-গ্রামে একটি ইটের তৈরি মন্দির, বাঁকুড়া জেলার বহুলারা-গ্রামের ইটের তৈরি সিদ্ধেশ্বর-মন্দির, বাঁকুড়া জেলার দেহার-গ্রামের পাথরে তৈরি সরেশ্বর ও সল্লেশ্বর-মন্দির, এবং সুন্দরবনের জটার-দেউল। প্রথম চারিটি মন্দিরের অত্যন্ত ভগ্নদশা; পঞ্চম মন্দিরটির এমন সংস্কার-সংরক্ষণ করা হইয়াছে যে, ইহার মূল আকৃতি-প্রকৃতিই গিয়াছে বদলাইয়া। এই মন্দিরগুলির ভূমি-নক্সা, গর্ভগৃহ, শিখর ও অলংকরণ প্রভৃতির বিশ্লেষণ করিলে সহজেই ধরা পড়ে, সদ্যোক্ত শিখরাকৃতি নিবেদন-মন্দিরগুলির সঙ্গে ইহাদের মৌলিক পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই, তবে এই মন্দিরগুলি আয়তনে ও অলংকরণে আরও সমৃদ্ধতর, আকৃতি-প্রকৃতিতে আরও জটিলতর। মৌলিক পার্থক্যের মধ্যে শুধু দেখিতেছি, শিখরের পগরেখাগুলির তীক্ষ্ণতা বর্জিত করিয়া একটু গোলাকার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে সমগ্র শিখরটিরই আকৃতি হইয়া পড়িয়াছে খানিকটা

গোলাকার। তাহা ছাড়া, মূল শিখরের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রাকৃতি শিখরালংকারের সজ্জা সংযোজিত হইয়াছে, এবং প্রবেশ তোরণের দিকে একটি অলিন্দও যোগ করা হইয়াছে। দেউলিয়ার মন্দিরটি বোধ হয় এই পাঁচটির মধ্যে সর্বপ্রাচীন, এবং ইহার কিছুকাল পরেই বহুলাবার সিদ্ধেশ্বর-মন্দির। এই দুইটি মন্দিরেই শিখরের পগরেখা গর্ভগৃহের ভূমি পর্যন্ত আলম্বিত, এবং রেখার তীক্ষ্ণতা মার্জিত ও গোলায়িত। বহুলারার সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরটির গর্ভগৃহের বহিঃপ্রাচীরে কুলুঙ্গির অলংকার, এবং শিখরের কেন্দ্রীয় রথটিতে ক্ষুদ্রাকৃতি শিখরালংকার। এই মন্দির দু'টি বোধ হয় দশম-একাদশ শতকীয়। দেহারের সরেশ্বর ও সল্লেশ্বর-মন্দির দুইটির গর্ভগৃহের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, তবে, গর্ভগৃহের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয়, এই দুটি মন্দিরও বহুলাবার সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরের সমসাময়িক। সুন্দরবনের জটার দেউলটিও বোধ হয় একই কালের, কিন্তু যুক্তিহীন, জ্ঞানহীন সংস্কার ও সংযোজনার ফলে মন্দিরটির মৌলিক রূপ আজ আর কিছু বুঝিবার উপায় নাই, তবে পুরাতন এবং সংস্কারপূর্ব একটি আলোকচিত্র হইতে মনে হয়, এই দেউলটিও অনেকটা সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরের মতনই ছিল, তবে শেষোক্ত মন্দিরের শিখরের রেখা বোধ হয় ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি বক্র।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় বর্ধমান-বরাকরের ১, ২ ও ৩ নং মন্দির তিনটিকে দ্বাদশ শতকীয় বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোনো সঙ্গত কারণ নাই বস্তুত গঠনরীতির দিক্ হইতে এই তিনটির একটিও চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের আগেকার মন্দির বলিয়া মনে হয় না। বর্ধমান-গৌরাঙ্গপুরের ইছাই-ঘোষের দেউলটি সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে; এই মন্দিরটি যেন আরও পরবর্তী। তবে, মধ্যযুগেও যে বাঙলাদেশে রেখ বা শিখর-দেউল নির্মিত হইত, বিশেষভাবে পশ্চিম-বাঙলায়, এই মন্দিরগুলি তাহার প্রমাণ।

প্রাচীন বাঙলার রেখ বা শিখর-দেউলগুলি বিশ্লেষণ করিলে সহজেই ইহাদের সঙ্গে ভুবনেশ্বরের শত্রুঘ্নেশ্বর, পরশুরামেশ্বর, মুক্তেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের সাদৃশ্য ধরা পড়িয়া যায়, এবং কালের দিক হইতে যে ইহারা সমকালীন তাহা বুঝা যায়। স্পষ্টতই ইহারা লিঙ্গরাজ-মন্দিরের পূর্ববর্তী। তাহা ছাড়া, বাঙলার মন্দিরগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়ে; ওড়িশার মন্দিরগুলির মত এই মন্দিরগুলির কোনো জগমোহন বা ভোগমণ্ডপ কিছু নাই, আমলক-সহ শিখর-শীর্ষ গর্ভগৃহই দেউলের একমাত্র অঙ্গ; অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে জগমোহনের পরিবর্তে সম্মুখ দিকের দেয়ালে একটি অলিন্দের সংযোজন আছে। ওড়িশার লিঙ্গরাজ ও পরবর্তী মন্দিরগুলির ভূমি-নক্সায়ও অলংকরণে যে বৈচিত্র্য ও জটিলতা তাহাও বাঙলার মন্দিরগুলিতে নাই। বস্তুত, বাঙলার মন্দিরগুলি ক্ষুদ্রকার হইলেও খুব মার্জিত ও সংযত রুচির পরিচয় বহন করে; চৈত্য-গবাক্ষ ও ক্ষুদ্রায়তন শিখরালংকার ছাড়া এই মন্দিরগুলির বিশেষ আর কোনো অলংকরণ নাই।

(৩) স্তূপশীর্ষ ভদ্র বা পীড় দেউলের নিদর্শন প্রাচীন বাঙলায় খুব বেশি দেখা যায় না। তবে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি-চিত্রে নালেন্দ্র নামক স্থানের লোকনাথ-মন্দিরের একটি প্রতিকৃতি আছে। এই প্রতিকৃতিতে এই ধরনের মন্দিরের অন্তত একটি নিদর্শন দৃষ্টিগোচর। চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের উপর ক্রমহ্রাস্যমান ঢালু চালের কয়েকটি স্তর, তাহার উপর একটি বৃহদায়তন স্তূপ, এবং প্রত্যেকটি স্তরের চারিটি কোণে কোণে একটি একটি করিয়া ক্ষুদ্রাকৃতি স্তূপের অলংকরণ। ইট বা পাথরের তৈরি এই রীতির কোনো দেউল নির্মাণের কোনো সাক্ষ্য আমাদের সম্মুখে নাই তবে নির্মিত যে হইত তাহার প্রমাণ এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রটি। ব্রহ্মদেশ-পাগানের অভয়দান এবং পাটোথাম্যা-মন্দির (একাদশ শতক) দুটির স্থাপত্যরূপ ও রীতির পশ্চাতে যে এই ধরনের মন্দিরের অনুপ্রেরণা বিদ্যমান, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই।

(৪) শিখরশীর্ষ পীড় বা ভদ্র-দেউলেরও নির্মাণ-নিদর্শন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই, তবে একটি পাণ্ডুলিপি-চিত্রে পুণ্ড্রবর্ধনের বুদ্ধ-মন্দিরের যে প্রতিকৃতি আছে, এবং কয়েকটি প্রস্তর-ফলকে যে ধরনের কয়েকটি মন্দির উৎকীর্ণ আছে তাহাতে অনুমান করা চলে যে, এই শিখরশীর্ষ পীড় বা ভদ্র দেউলও বাঙলাদেশে সুপরিচিত সুপ্রচলিতও ছিল। এই ধরনের মন্দিরে চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের উপর স্তরে স্তরে ক্রমহ্রাস্যমান চাল এবং সর্বোচ্চ চালটির উপর বক্র রেখার একটি শিখর, শিখরের উপর আমলক-শিলা; বৌদ্ধমন্দির হইলে আমলক-শিলার উপর একটি অতি ক্ষুদ্রকায় স্তূপের প্রতীক। শিখরের আকৃতি কোথাও হ্রস্ব, কোথাও দীর্ঘায়ত। ব্রহ্মদেশের পাগান নগরে একাদশ দ্বাদশ শতকীয় থাট্‌বিঞ্ঞু, টিহ্-লো-মিন্‌হ্-লো, শোয়েগু-জ্যি ও অন্যান্য অনেকগুলি মন্দিরের পশ্চাতে প্রাচীন বাঙলার এই ধরনের মন্দিরের অনুপ্রেরণা বিদ্যমান।

পাহাড়পুরের মন্দির

প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর গ্রামে এক বিরাট ধ্বংসস্তূপ উন্মোচন করিয়া একটি বিপুলকায় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। চারিদিকের কক্ষসারি লইয়া সুবিস্তৃত বিহারের ধ্বংসাবশেষ, তাহারই সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। মন্দিরের চাল নাই, চূড়া নাই, চারিদিকের প্রাচীর পড়িয়াছে ভাঙিয়া; প্রদক্ষিণ পথ, পূজাকক্ষ, সমস্তই ইটে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; তবু এই বিরাট ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইহার গঠনরেখা ও রীতি ধীরে ধীরে অনুসরণ করিলে ইহার সামগ্রিক আকৃতি-প্রকৃতি ক্রমশ চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে। তখন স্বীকার করিতে বাধা থাকে না, এই মন্দির প্রাচীন বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিস্ময়। ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে এই মন্দির গরিমায় উজ্জ্বল এবং রূপে ও রীতিতে তুলনাহীন না হইলেও এই জাতীয় আর্যাবর্তজাত সকল সর্বতোভদ্র মন্দিরের পুরোভাগে ইহার স্থান।

ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্রে 'সর্বতোভদ্র' নামে একশ্রেণীর মন্দিরের উল্লেখ ও পরিচয় আছে। এই ধরনের মন্দির চতুষ্কোণ এবং চতুঃশালগৃহ, অর্থাৎ ইহার চারিদিকে চারিটি গর্ভগৃহ, এবং সেই গৃহে প্রবেশের-জন্য চারিদিকে চারিটি তোরণ। শাস্ত্রানুযায়ী এই ধরনের মন্দির হইত পঞ্চতল, প্রত্যেক তলের ষোলোটি কোণ অর্থাৎ চতুষ্কোণের প্রত্যেকটি বাহু সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া এক এক দিকে চারিটি (চারিদিকে ষোলোটি) কোণ রচনা, প্রত্যেক তল ঘিরিয়া প্রদক্ষিণ পথ এবং প্রাচীর ; সমগ্র মন্দিরটি অলংকৃত হইত অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতি শিখর ও চূড়ায়। পাহাড়পুরের সুবিস্তৃত মন্দিরটি এই সর্বতোভদ্র মন্দিরের উজ্জ্বল নিদর্শন। এই ধরনের সর্বতোভদ্র মন্দির ভারতের নানাস্থানে নিশ্চয়ই নির্মিত হইয়াছিল, নহিলে বাস্তুশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ থাকিবার কথা নয় ; কিন্তু এক পাহাড়পুর ছাড়া ভারতবর্ষে আর কোথাও এই ধরনের মন্দির আজ আর দৃষ্টিগোচর নয়, আর কোনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বোধ হয় মন্দির-স্থাপত্যের এই রূপ ও রীতি ভারতবর্ষে বহুল প্রচারিত ও অভ্যস্ত হইতে পারে নাই ; তবে এই রূপ ও রীতি যে বহির্ভারতে, অন্তত প্রাচীন যবদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের মনোহরণ করিয়াছিল, এ-সম্বন্ধে সুপ্রচুর সাক্ষ্য বিদ্যমান। ব্রহ্মদেশে প্রাচীন পাগান নগরের চতুঃশাল থাট্‌বিঞ্‌ঞু বা সর্বজ্ঞ, সোয়েগু-জ্যি, টিহ্‌-লো-মিন্‌হ্‌-লো প্রভৃতি মন্দিরের পশ্চাতে এই ধরনের সর্বতোভদ্র মন্দিরের অনুপ্রেরণা ছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। যবদ্বীপে প্রাম্বানাম নগরীর প্রাচীন লোরো-জোংরাং মন্দির, শিব-মন্দির প্রভৃতিও একই অনুপ্রেরণায় কল্পিত ও গঠিত। কালের দিক হইতে অষ্টম-শতকীয় পাহাড়পুর-মন্দির ইহাদের সকলের আদিতে।

স্বর্গত কাশীনাথ দীক্ষিত ও অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী মহাশয়দের আলোচনা-গবেষণার ফলে পাহাড়পুর মন্দিরের মৌলিক রূপ, প্রকৃতি ও গঠন আজ ধরিতে পারা সহজ হইয়াছে। এই সুবৃহৎ মন্দির উত্তর-দক্ষিণে ৩৫৬½ ফিট ও পূর্ব-পশ্চিমে ৩১৪¼ ফিট বিস্তৃত। মূলত মন্দিরটির ভূমি-নক্‌সা চতুষ্কোণ ; প্রত্যেক দিকের বাহু সম্মুখ দিকে একাধিকবার (তিনবার) বিস্তৃত করিয়া অনেকগুলি কোণের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং সমগ্র নক্‌সাটিকে সমান্তরালে প্রসারিত করা হইয়াছে চারিদিকে। মূল চতুষ্কোণ নক্‌সাটির সমগ্র ভূমির উপর একটি শূন্যগর্ভ বিরাটকায় চতুষ্কোণ স্তম্ভ সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে ; ইহারই সর্বোচ্চে স্থাপিত ছিল মন্দিরের শীর্ষ, কিন্তু সে-শীর্ষ এবং স্তম্ভটিরও উপরের অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে ; কাজেই শীর্ষটি কি শিখরাকৃতি ছিল, না ছিল স্তূপাকৃতি তাহা নির্ণয়ের কোনো উপায় আজ আর নাই। শূন্যগর্ভ দৈত্যকায় স্তম্ভটির দেয়াল অতি প্রশস্ত, কারণ চারিদিকের সমান্তরাল প্রসারের চাপ ও ভারের অনে-কাংশ পড়িত এই দেয়ালের উপর। এই চতুঃসংস্থান-সংশ্লিষ্ট স্তম্ভটিই সমগ্র মন্দিরটির কেন্দ্র, ইহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রত্যেকটি ক্রমহ্রস্বায়মান স্তর এবং স্তরোপরি প্রদক্ষিণ পথ ও প্রাচীর চতুঃশালগৃহ, মণ্ডপ প্রভৃতি সমস্তই কল্পিত, রচিত ও প্রসারিত। ভিত্তিস্তর বাদ দিলে

মন্দিরটির সর্বসুদ্ধ ক'টি ক্রমহ্রস্বায়মান স্তর ছিল, বলা কঠিন। শাস্ত্রানুযায়ী সর্বসুদ্ধ পাঁচটি স্তর বা তল থাকিবার কথা; হয়তো তাহাই ছিল, কিন্তু আপাতত ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে ভিত্তিস্তরসহ মাত্র তিনটি। মন্দিরটি চতুর্মুখ, অর্থাৎ সর্বতো-ভদ্র হওয়া সত্ত্বেও ইহার প্রবেশ তোরণ উত্তর দিকে। অঙ্গন হইতে সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলেই ভিত্তিস্তরের সমতলে একটি সুপ্রশস্ত চত্বর; এই চত্বর অতিক্রম করিলেই দক্ষিণতম প্রান্তে বেষ্টনী প্রাচীরের তোরণ ভেদ করিয়া ভিত্তিস্তরের সর্বতোভদ্র প্রদক্ষিণ-পথে প্রবেশ। প্রদক্ষিণ-পথটি ঘুরিয়া চলিয়া গিয়াছে মন্দিরের চারিদিকে, এবং পথটির প্রান্ত বাহিয়া বেষ্টনী-প্রাচীর। এই প্রদক্ষিণ-পথের যে কোনো দিক হইতে সোপান-শ্রেণী বাহিয়া হ্রস্বায়িত প্রথম তলে বা স্তরে আরোহণ করা যায়; এই স্তরেও একই প্রকারের প্রদক্ষিণ-পথ, বেষ্টনী-প্রাচীর, তদুপরি এক একদিকে এক একটি করিয়া মণ্ডপ। প্রথম তলে হইতে সোপান বাহিয়া দ্বিতীয় তলে আরোহণ করিলেই স্পষ্টত বুঝা যায়, এই তলই সর্বপ্রধান তল, কারণ এই তলই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ, এই তলেই কেন্দ্রস্থিত শূন্য-গর্ভ স্তম্ভটির চারিদিকে চারিটি গর্ভগৃহ এবং প্রত্যেক গর্ভগৃহের সম্মুখে এক একটি করিয়া বৃহৎ মণ্ডপ। সন্দেহ নাই, এই চারিটি গর্ভগৃহই ছিল প্রধান দেবগৃহ বা পূজাগৃহ, এবং ইহাদেরই সম্মুখের মণ্ডপে পূজারীরা নৈবেদ্য ইত্যাদি লইয়া সমবেত হইতেন। মণ্ডপ ও দেবগৃহ দক্ষিণে রাখিয়া চারিদিক ঘিরিয়া প্রদক্ষিণ-পথ এবং বেষ্টনী-প্রাচীর। এই তলের উপরে আর কোনো তল ছিল কিনা, এবং সেই তলে কোনো পূজাগৃহ ছিল কিনা, বলা কঠিন। ইহার উপর আর যাহা কিছু ছিল সমস্তই ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই এই মন্দিরের উপরিভাগের আকৃতি-প্রকৃতি কি ছিল তাহা লইয়া কল্পনা-জল্পনা করা চলে, কিন্তু নিঃসংশয়ে কিছু বলা চলে না।

কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন, পাহাড়পুরে বোধ হয় একটি চতুর্মুখ জৈন-মন্দির ছিল, এবং এই চতুর্মুখ জৈন মন্দিরটিই বোধ হয় ছিল পাহাড়পুর মন্দিরের মূল অনুপ্রেরণা। এ-অনুমান মিথ্যা না-ও হইতে পারে। এই ধরনের চতুর্মুখ বা সর্বতোভদ্র মন্দির ব্রহ্মদেশের প্রাচীন পাগান-নগরীতেও নির্মিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ বিদ্যমান। আনন্দ, সর্বজ্ঞ, টিহ্-লো-মিন্হ-লো প্রভৃতি মন্দিরেও দেখা যায়, কেন্দ্রে একটি বিরাটকায় চতুষ্কোণ স্তম্ভ সোজা উঠিয়া গিয়াছে উপরের দিকে এবং তাহার শীর্ষে শিখর বা স্তূপ। এই স্তম্ভটির চারিদিকের চারিমুখে প্রত্যেক তলে চারিটি সুউচ্চ সুবৃহৎ কুলুঙ্গি কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে; প্রত্যেক কুলুঙ্গিতে বুদ্ধ প্রতিমা। প্রত্যেক দিকের তোরণদ্বার হইতে একটি সুদীর্ঘ অলিন্দ পথ সোজা চলিয়া গিয়াছে প্রতিমার সম্মুখ পর্যন্ত; দুই দিকে সমান্তরালে আরো দুইটি অলিন্দ, এবং এই অলিন্দ-রেখ শ্রেণী ভেদ করিয়া কেন্দ্রীয় স্তম্ভটির চারদিক ঘিরিয়া একাধিক প্রদক্ষিণ-পথ চলিয়া গিয়াছে। পাহাড়পুর-মন্দিরের বিন্যাসের সঙ্গে পাগানের এই জাতীয় মন্দিরগুলির বিন্যাসের

সমগোত্রীয়তা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। এ-কথা সত্য যে, পাহাড়পুর-মন্দিরের কেন্দ্রীয় স্তম্ভে কোনো কুলুঙ্গি কাটা নাই; কিন্তু তাহার পরিবর্তে চারিদিকের দেয়ালের সম্মুখেই স্থাপনা করা হইয়াছে চারিটি গর্ভগৃহ ও মণ্ডপ। আসল কথা হইল কেন্দ্রীয় স্তম্ভটি এবং তাহাকে ঘিরিয়া চারিদিকের পূজাস্থান ও প্রদক্ষিণ পথ। এই রূপ চতুর্মুখ সর্বতোভদ্র মন্দিরের রূপ, এবং এই রূপই পাহাড়পুরে, পাগানে এবং লোরো-জোংরাংএ দৃষ্টিগোচর।

পোড়ামাটির ইটে, কাদার গাঁথুনীতে পাহাড়পুর-মন্দির তৈরি। বহিঃপ্রাচীরের দেয়ালের স্কন্ধে কিছু কিছু অলংকরণ এবং অগণিত পোড়ামাটির ফলক ছাড়া ঐশ্বর্য প্রচারের আর কোনো চেষ্টা নাই। মহাস্থানের গোকুল এবং গোবিন্দভিটার স্তূপেও কিছু কিছু এই ধরনের অলংকরণ ও মৃৎফলক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুরের ভিত্তিপ্রাচীরগাত্রে প্রস্তরফলক-নিদর্শনও অপ্রচুর নয়। এই সুবৃহৎ মন্দির একদিনে নির্মিত হয় নাই, বলাই বাহুল্য; বহুদিনের অনবসর চেষ্টায় এত বড় মন্দির নির্মাণ সম্ভব। পরবর্তীকালে নানা সময়ে নানা সংযোজনও হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমগ্র মন্দিরটির পরিকল্পনায় ও গঠনে এমন একটি সুসম সংহত সমগ্রতা আছে যে, মনে হয় মন্দিরটি আগাগোড়া একই ভাবনা-কল্পনার সৃষ্টি, এবং মোটামুটি একই সময়ে নির্মিত। খুব সম্ভব, নরপতি ধর্মপালই ইহার পোষক এবং তাঁহারই রাজত্বকালে সোমপুরের এই মন্দির ও বিহার রচিত হইয়াছিল। এই মন্দির ও বিহার প্রাচীন বাঙলার গৌরব।

প্রাচীন বাঙলা ও বহির্ভারতের মন্দির

পাহাড়পুর-মন্দিরের সঙ্গে বহির্ভারতের পাগান, লোরো-জোংরাং প্রভৃতি স্থানের কোনো কোনো শ্রেণীর মন্দিরের সমগোত্রীয়তার কথা বলিয়াছি। কিন্তু শুধু পাহাড়পুর মন্দিরই নয়। প্রাচীন বাঙলার যে কয়েকটি রূপ ও রীতির মন্দিরের কথা কিছু আগে বলিয়াছি সে-সব রূপ ও রীতির মন্দিরের সঙ্গে বহির্ভারতের বিশেষভাবে ব্রহ্মদেশের এবং যবদ্বীপের অনেক মন্দিরের একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সে-সব মন্দিরের তুলনা করিলে প্রাচীন বাঙলার মন্দিরগুলির আকৃতি-প্রকৃতিও অনেকটা পরিষ্কার হইতে পারে। যে ক্রমহ্রস্বায়মান ঢালু চালের ভদ্র বা পীড় রীতির মন্দিরের কথা আগে বলিয়াছি, ব্রহ্মদেশে এই রীতি এক সময়ে সুপ্রচলিত ছিল, এবং পরেও সমস্ত মধ্যযুগ জুড়িয়া কাঠে ও ইটে, বেশির ভাগ কাঠে, এই ধরনের 'পায়াথাট' বা প্রাসাদ-মন্দির প্রচুর নির্মিত হইত। পাগানের আনন্দ-মন্দিরের অনেকগুলি প্রস্তরফলকে পঞ্চতলে, সপ্ততলে, এই ধরনের মন্দির উৎকীর্ণ আছে। এই পাগানেরই বিদগ তাইক (ত্রিপিটক-) মন্দির ও মিমালউং চ্যঙ্ মন্দির (একাদশ ও দ্বাদশ শতক) এই

ধরনের মন্দিরের সুস্পষ্ট নিদর্শন। ক্ষুদ্রাকৃতি এবং একটি মাত্র পাথরে তৈরি এই ধরনের মন্দির যবদ্বীপের চণ্ডী-পানাতরমের প্রাঙ্গনে দুই চারিটি আজও বিদ্যমান। বলিদ্বীপে ও ব্রহ্মদেশে তো এই ধরনের ভদ্র বা পীড় দেউল আজও নির্মিত হয়, তবে সাধারণত কাঠে। এই ভদ্র বা পীড় শ্রেণীর মন্দির ছাড়া চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের উপর স্তূপ বা শিখরশীর্ষ ভদ্র বা পীড় দেউল তো প্রাচীন ব্রহ্মদেশের চক্তই হরণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, এবং তাহা প্রায় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক হইতেই। প্রোম-হ্‌মজ্জার ষষ্ঠ সপ্তম শতকীয় বেবে, লেমেথ্‌না, ইয়াহানদা-। প্রভৃতি মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া পাগানের একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় স্তূপশীর্ষ পাটোথাম্যা ও অভয়দান এবং শিখরশীর্ষ আনন্দ, সর্বজ্ঞ থিট্‌সোযাদা, টিহ্‌-লো মিনক-লো মন্দির পর্যন্ত সমস্তই এই ধরনের দেউলের সুউজ্জ্বল নিদর্শন। তাহা ছাড়, হ্‌মা ও পাগানের প্রচুর মৃৎ ও প্রস্তর-ফলকে এই ধরনের মন্দিরের উৎকীর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান। যবদ্বীপের স্তূপশীর্ষ চণ্ডী-পাওন মন্দিরও এই রীতিরই অন্যতম নিদর্শন। বলা বাহুল্য, প্রাচীন প্রাচ্যদেশ বিশেষভাবে প্রাচীন বাঙলাদেশই এই সব বহির্ভারতীয় প্রচেষ্টার মূল অনুপ্রেরণা।

উপরোক্ত চারিপ্রকারের মন্দিরশৈলী ছাড়া খননাবিষ্কারের ফলে প্রাচীন বাঙলার আরও কয়েকটি এমন মন্দিরের অস্তিত্ব জানা যায় যাহা কোনো শ্রেণী-চিহ্নে চিহ্নিত করা যায় না। এই মন্দিরগুলির যে কিছু সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, এমন নয়, তবু ইহাদের কথা না বলিলে মন্দির-কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। দিনাজপুর জেলার বৈগ্রামে যে-মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান সে-মন্দিরটি বোধ হয় ৪৪৮-৪৯ খ্রী তারিখের গুপ্তপট্টোলীকথিত শিবনন্দী-মন্দির। ভূমি নক্‌সা হইতে মনে হয়, ইহার গর্ভগৃহ ছিল চতুষ্কোণ এবং চারিদিক ঘিরিয়া ছিল প্রদক্ষিণ-পথ; পশ্চিম দিকে ছিল ইহার প্রবেশ তোরণ। চালের কি যে ছিল রূপ বলিবার কোনো উপায় নাই। গুপ্ত-আমলের এক ধরনের মন্দিরে যে প্রদক্ষিণ-পথযুক্ত চতুষ্কোণ গর্ভগৃহ এবং সমতল চালের রীতি প্রচলিত দেখা যায়, এই মন্দিরটি সেই রীতির হওয়া বিচিত্র নয়।

মহাস্থানের আশে পাশেও দুই চারিটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার বৈরাগী-ভিটায় পাল আমলের দুইটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান; ইহাদের মধ্যে একটির ভূমি-নক্‌সা যে প্রাচীন বাঙলার সুঅভ্যস্ত ও সুপরিচিত প্রসারিত চতুষ্কোণ, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। মহাস্থানের গোবিন্দ-ভিটায়ও কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর; ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মন্দির গুপ্ত-আমলের হওয়াও অসম্ভব নয়, কিন্তু আজ আর ইহাদের মৌলিক রূপ সম্বন্ধে কিছুই বলিবার উপায় নাই। এই স্থানেরই গোকুল-পল্লীতে, সুবৃহৎ মেড়স্তূপে এক সময় একটি অতিকায় মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল; খননাবিষ্কারের ফলে আজ শুধু তাহার ভিত্তিভূমির কঙ্কটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই

ভিত্তিভূমির বিন্যাস ঠিক একটি মাকড়সার জালের মতন করিয়া বোনা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ কোষকক্ষের সমষ্টি মাত্র। একটু মনোযোগে বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে দেরী হয় না যে, এই কোষকক্ষের জালের পরিকল্পনা শুধু বৃহৎ পরিকল্পনার একটি মন্দিরের ভিত্তিভূমিকে দৃঢ় করিয়া গড়িবার জন্য। মন্দিরটির ভূমি-নক্সা শুধু ধরা যায়, আর কিছুই বিদ্যমান নাই। বহু বাহুবিশিষ্ট এই ভূমি-নক্সার বহু কোণ, এবং ইহাদের মধ্যে বিধৃত একটি সুবৃহৎ বৃত্ত। এই বৃত্তের চারিপাশ ঘিরিয়া নিরেট চারিটি সুপ্রশস্ত দেয়াল, এবং এই দেয়াল চারিটির উপরই ছিল মন্দিরটির স্থাপনা। দেয়াল এবং বৃত্তের ফাঁক ভরাট করা হইয়াছে, সমান্তরালে দেয়ালের পর দেয়াল গাঁথিয়া এবং মাটি ভরাট করিয়া। এ-সমস্তই, যে মন্দিরটির ভিত্ সুদৃঢ় করিয়া গড়িবার জন্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সুবৃহৎ মন্দিরের কি যে ছিল আকৃতি-প্রকৃতি তাহা, বুঝিবার এতটুকু উপায় আজ আর নাই।

সমসাময়িক ওড়িশার ভুবনেশ্বরে বা পুরী-কোনারকে, বা মধ্য-ভারতের খাজুরাহোতে, ব্রহ্মদেশের পাগানে বা যবদ্বীপের প্রাম্বানাম-পানাতরমে, কাম্বোজের অঙ্কোর-থোমে বা দক্ষিণ-ভারতের কাঞ্চীপুরে বা অন্যত্র যে সুবিস্তৃত মন্দির-নগরীর কথা আমরা জানি, প্রাচীন বাঙলার কোথাও সে ধরনের সুবিস্তৃত মন্দির নগরীর পরিচয় পাইতেছি না। প্রত্নসাক্ষ্যই হোক্ আর সাহিত্য বা লিপি-সাক্ষ্যই হোক্, সমস্ত সাক্ষ্যেরই ইঙ্গিত যেন বিচ্ছিন্ন দুই চারিটি মন্দিরের দিকে, এবং সে-মন্দিরও খুব বৃহদায়তন নয়। বস্তুত, এক পাহাড়পুর এবং গোকুলের মন্দির দু'টি এবং হয়তো আরও দুই চারিটি ছাড়া বৃহৎকল্পিত, বিস্তৃতায়তন মন্দিরের কথা বড় একটা জানা যায় না, অন্তত প্রত্নসাক্ষ্যে তেমন প্রমাণ নাই। মনে হয়, অধিকাংশ মন্দিরই ছিল স্বল্পায়তন। বস্তুত প্রাচীন বাঙলায় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বৃহৎ দুঃসাহসী কল্পনা-ভাবনা, বৃহৎ কর্মশক্তি বা গভীর গঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় খুব বেশি নাই; গ্রাম্য কৃষিনির্ভর জীবনে সে-সুযোগও ছিল স্বল্পই। স্থাপত্যেই শুধু নয়, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রেও প্রাচীন বাঙালী খুব বৃহৎ দুঃসাহসী কল্পনা-ভাবনার দিকে কোথাও অগ্রসর হয় নাই, খুব প্রশস্ত ও গভীর গঠনকর্মে নিজের প্রতিভাকে নিয়োজিত করে নাই। ইহার কারণ দুর্বোধ্য নয়। তাহার কৃষিনির্ভর জীবনের অর্থসম্বল ছিল পরিমিত, চিত্তসমৃদ্ধি ছিল ক্ষীণায়ত, এবং বৃহৎ, গভীর, দুঃসাহসী জীবনের গভীর ও ব্যাপক উল্লাসের কোনো গভীর ও প্রশস্ত স্পর্শ সে-জীবনে লাগে নাই। কাজেই শিল্পেও সে-পরিচয় নাই।

চতুর্দশ অধ্যায়ের পাঠপঞ্জী

কল্যাণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙলার ভাস্কর্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৬ ; ক্ষিতিমোহন সেন, লোচনের রাগতরঙ্গিনী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, চর্যাগীতি, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫২ ।

Banerji, R. D., Eastern Indian School of Medieval sculpture, Delhi, 1933 ; Dikshit, K. N., Excavations at Paharpur, Archaeolc-gical Survey of India, Memoir no. 55, Delhi, 1938 ; French, J. C., The Art of the Pala Empire of Bengal, Oxford, 1928 ; Ganguli, Manomohan, Handbook to the Sculptures in the Museum of the Vanigya Sāhitya Parishad, Calcutta, 1922 ; Kramrisch, Stella, "Pala and Sena Sculpture", ih Rupam, October, 1929, Calcutta ; "Nepalese Paintings", Journal of the Indian Society of Oriental Art, I, p. 129 ff. ; "Indian Terracottas", ibid, VII, p. 89 ff. ; Saraswati, S. K., "Early Sculpture of Bengal" ; Journal of the Department of Letters, Calcutta University, XXX ; "Temples of Bengal", Journal of the Indian Society of Oriental Art, II, p. 130 ff., Dacca University, History of Bengal, I, 1943, p. 483 ff. (Chap. on Art) : Rama-chandran, T. N., "Recent Archaeological discoveries along the Mainamati and Lalmai ranges", B.C. Law Festschrift Volume, II, p. 213 ff.

এ-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর প্রাচীন বাঙলার শিল্পকলা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য 'গ্রন্থ' একটি মাত্রই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে, এবং তার উল্লেখ আমি ইতিপূর্বেই করেছি ; সেটি হ'চ্ছে সরসীকুমার সরস্বতী রচিত "পালযুগের চিত্রকলা" (আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা ৯, ১৯৯৮)। মৎলিখিত একটি ইংরেজি সুবৃহৎ গ্রন্থ আজ গত নয় বৎসর যাবৎ মুদ্রণাধীন , তার নাম Eastern Indian Bronzes (Lalit Kala Akademi, New Delhi)। প্রকাশোন্মুখ এই গ্রন্থটিতে প্রাচীন বাঙলার ধাতব প্রতিমার এবং সাধারণ ভাবে ভাস্কর্যশিল্পের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে। এ-দু'টি গ্রন্থ ছাড়া চন্দ্রকেতুগড়ও তাম্রলিপ্তের মৃৎশিল্প সম্বন্ধে, ময়নামতী, ভরতপুর ও রাজবাড়ী ডাঙ্গার স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধে ও প্রত্নস্থানগুলির উৎখনন সম্বন্ধে, পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও পশ্চিম বাঙলার অন্যান্য প্রত্নাশ্মীয়পর্বের প্রত্নস্থানের উৎখনন সম্বন্ধে নানা ছোট-খাট বিবরণী প্রচারপুস্তিকা, নিবন্ধ ইত্যাদি নানা জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিশিষ্টের নানা জায়গায় এ-গুলির উল্লেখ করা হয়েছে, নানা প্রসঙ্গে। পৃথক পৃথক ভাবে নামোল্লেখ সবক্ষেত্রে সম্ভব নয়, কিন্তু সকলের কাছেই আমি আমার ঋণ স্বীকার করছি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইতিহাসের ইঙ্গিত

ইতিহাসের যুক্তি দিয়া এই গ্রন্থের সূচনা, সেই যুক্তিকেই বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি পর পর তেরোটি অধ্যায় জুড়িয়া। এই সুবিস্তৃত তথ্যবিবৃতি ও আলোচনার ভিতর হইতে ইতিহাসের কোন্ কোন্ ধারা সুস্পষ্ট মোটা রেখায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, নিরবচ্ছিন্ন সমগ্র প্রবাহটির কোথায় কোন বাঁক দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এই সুবিস্তৃত কালখণ্ড পরবর্তী কালখণ্ডের জন্য কি কি বস্তু উত্তরাধিকার স্বরূপ রাখিয়া যাইতেছে, ভবিষ্যতের কোন্ নির্দেশ দিয়া যাইতেছে এক কথায় এই সুবৃহৎ গ্রন্থ ভেদ করিয়া ইতিহাসের কোন্ ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিতেছে গ্রন্থশেষে একটি অধ্যায়ে তাহার আলোচনা উপস্থিত করা হয়তো অসঙ্গত নয়। এতক্ষণ ছিলাম ঘনবৃক্ষবিন্যস্ত গহন অরণ্যের মধ্যে; এখন দূরে দাঁড়াইয়া বাহির হইতে সমস্ত অরণ্যটির আকৃতি প্রকৃতি এবং উহার সমগ্র জীবন-প্রবাহের ধারাটি সংক্ষেপে একটু ধরিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এই চেষ্টার উদ্দেশ্য প্রাচীন বাঙালীর জীবন-প্রবাহের উপরিভাগের ছোটবড় তরঙ্গগুলির পরিচয় লওয়া নয়, সে কাজ তো সুদীর্ঘ গ্রন্থ জুড়িয়াই করিয়াছি। বরং আমার উদ্দেশ্য, সেই প্রবাহের গভীরে কোন্ আবর্ত ঘূর্ণ্যমান, কোন অনুকূল ও প্রতিকূল অন্তঃস্রোতের সঞ্চরণ, কোন্ কোন্ শক্তি সক্রিয় তাহা জানা ও বুঝা, সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ ও বস্তুপুঞ্জকে সংহত করিয়া একটি গভীর ও সমগ্র দৃষ্টিতে দেখা, প্রাচীন বাঙালী জীবনের মৌলিক ও গভীর চরিত্রটিকে ধরিতে চেষ্টা করা। এই জানা ও বুঝা, দেখা ও ধরা ঐতিহাসিকের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

এই গ্রন্থের যুক্তিপর্যায় অনুসরণ করিয়াই একে একে তাহা করা যাইতে পারে। কিন্তু আলোচ্য প্রসঙ্গে আমি আর কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করিব না, করিবার প্রয়োজনও নাই, কারণ সে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ এই গ্রন্থের পূর্বোক্ত তেরোটি অধ্যায়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। আমার মন্তব্যগুলি প্রায় সমস্তই প্রত্যক্ষভাবে সে-সব সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, তবে কিছু কিছু এমন মন্তব্যও আছে যাহা শুধু সাক্ষ্য প্রমাণের পরোক্ষ ইঙ্গিত অথবা যাহা অনুমানসিদ্ধ মাত্র। ইতিহাসে এই ধরনের ইঙ্গিত বা অনুমানের স্থান নাই, এমন বলা চলে না।

কৌম চেতনা

আজ আমরা যাহাদের বাঙালী বলিয়া জানি তাহারা সকলেই একই নরগোষ্ঠীর লোক নহেন এ-তথ্য সর্বজনবিদিত; বিচিত্র নরগোষ্ঠীর লোক লইয়া বৃহত্তর বাঙালী জনের

গঠন। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, বাঙলা-দেশে বহুদিন পর্যন্ত ইহাদের অধিকাংশই ছিল কৌমবদ্ধ গোষ্ঠীবদ্ধ জন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইহারা একান্ত কৌমজীবনেই অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। এক একটি কোম এক একটি বিশিষ্ট স্থান লইয়া মোটামুটি ভাবে স্ব-স্বতন্ত্রপরায়ণ স্ব-সম্পূর্ণ জীবন যাপন করিত, অন্য কোমের সঙ্গে যোগাযোগ বড় একটা থাকিত না, বিধিনিষেধের বাধাও ছিল নানা প্রকারের। তাহার ফলে এই সব বিচিত্র কোমের মধ্যে বৃহত্তর জনচেতনা বলিয়া কিছু গড়িয়া উঠিবার সুযোগ বিশেষ ছিল না। সমাজগঠনে তাহা প্রভাব তো দূরের কথা। পরবর্তী কালে সভ্যতা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, নানাপ্রকারের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের ফলে এই সব বিচিত্র কোমের মধ্যে নানাপ্রকারের আদান-প্রদান চলিতে থাকে, এবং তাহারই ফলে বৃহত্তর অঞ্চলকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ কোমের একত্র সমবায়ে বৃহত্তর কোমের (বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ, পুণ্ড্রাঃ, সুহ্মাঃ ইত্যাদির) উদ্ভব ঘটে। কিন্তু বৃহত্তর কোম বা এই সব জন গড়িয়া ওঠার পরও কৌমসত্তা ও কৌমস্মৃতি কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসে এই কৌমচেতনা পূর্বাপর সর্বত্র সক্রিয়, সমাজের বর্ণ, বৃত্তি ও শ্রেণী বিন্যাসে, অর্থ উৎপাদন ও বণ্টনে, গ্রাম ও নগরের বিভিন্ন পল্লীর বিন্যাসে, রাষ্ট্রগত ক্রিয়াকর্মে, এমন কি যুদ্ধবিগ্রহে, ধর্মকর্মে, এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই কৌমচেতনার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ কোম এবং গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের সমস্ত ভাবনা কল্পনা, সমস্ত ক্রিয়াকর্ম আবর্তিত হইত। অন্তত, প্রাচীন বাঙলার শেষ পর্যন্ত এই কৌমচেতনা সমভাবে বিদ্যমান, এমন কি মধ্যযুগেও। এখনও তাহা নাই এমন বলা চলে না। বস্তুত, বাঙলাদেশের ইতিহাসের গভীরে তাকাইয়া যদি বলা যায়, এই কৌমস্মৃতি ও কৌমচেতনা আজও বহমান তাহা হইলে খুব অন্যায় বলা হয় না।

আঞ্চলিক চেতনা

কৌমস্মৃতি ও কৌমচেতনার সঙ্গে প্রায় অঙ্গাঙ্গী জড়িত আঞ্চলিক স্মৃতি ও আঞ্চলিক চেতনা। রাঢ়াঃ, সুহ্মাঃ, গৌড়াঃ, পুণ্ড্রাঃ প্রভৃতি যে সব জনদের কথা সাহিত্যে ও লিপি-মালায় পড়িতেছি, সে-সব জনেরাও তো এক একটি অঞ্চলকে আশ্রয় করিয়া ক্রমশ রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব পৃথক পৃথক ক্ষুদ্র বৃহৎ জনপদকে একটি বৃহত্তর প্রান্ত বা দেশখণ্ডে একত্র ও সমন্বিত করিয়া তাহাকে একটা সমগ্র রূপ দিবার সজাগ চেষ্টা অন্তত শশাঙ্কের সময় হইতেই দেখা দিয়াছিল এবং পাল পর্বে পাল-সম্রাটেরা ও পরবর্তী কালে সেন-রাজারাও এ-সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাধারণভাবে প্রান্ত বা দেশের সামগ্রিক ঐক্যচেতনা জনসাধারণের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, অন্তত প্রাচীন বাঙলায়

তেমন প্রমাণ বিশেষ নাই। পাল ও সেন-বংশের রাজারা যখন গৌড়েশ্বর বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন তখনও সাহিত্যে ও লিপিমালায়, তথা জনসাধারণের চিত্তে যে সব স্মৃতি ও চেতনা সক্রিয় তাহা বিশিষ্ট জনাশ্রিত বিশেষ বিশেষ জনপদের—রাঢ়ের, পুণ্ড্রের, সুহ্মের, বরেন্দ্রের, বঙ্গের, হরিকেলের, সমতটের। বস্তুত, প্রাচীন বাঙালী নিজেদের আঞ্চলিক জানপদ সত্তাকে বৃহত্তর দেশ বা প্রান্তসত্তায় মিশাইয়া দিতে বা দু'য়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করিতে শেখে নাই। আজও যে তাহা খুব সহজ হইয়াছে, এমন বলা চলে না। বস্তুত স্থানীয় আঞ্চলিক সত্তা ও বৃহত্তর দেশসত্তার বিরোধ শুধু যে বাঙলার ইতিহাসেই সক্রিয় এমন নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের বৃহত্তর ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তাহাই, এবং কোনো কোনো ঐতিহাসিক ইতিপূর্বেই তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। একদিকে আমাদের চিন্তানায়ক, ধর্মগুরু এবং রাষ্ট্রবিধাতাদের কেহ কেহ সর্বভারতীয় চেতনাবোধটিকে সদাজাগ্রত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, নানা উপায়ে; অন্যদিক ইঁহাদেরই অনেকে আবার আমাদের আঞ্চলিক সংকীর্ণ বুদ্ধিকে নানাভাবে পরিতুষ্ট ও পরিপোষণ করিয়াছেন। আমাদের ধর্ম ও অধ্যাত্ম-জীবনে একদিকে যেমন ঐক্য ও সাম্যের জয়গান তেমনই অন্যদিকে আবার নানা ভেদ বৈষম্যের এবং অনৈক্যের সৃষ্টি। যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসে আঞ্চলিক চেতনা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, এবং এই চেতনার ফলেই সেই ইতিহাসে দেশের বা প্রান্তের সামগ্রিক বোধ কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এই আঞ্চলিক চেতনাই শশাঙ্ক বা পাল ও সেন-রাজাদের চেষ্টাকে পরিণামে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল।

পূর্বোক্ত-কৌমচেতনা ও সদ্যোক্ত আঞ্চলিক চেতনা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে প্রধানত দুইটি কারণে—একটি কারণ ধনোৎপাদনপদ্ধতিগত, আর একটি রাষ্ট্রবিন্যাসগত।

এই দুই চেতনার পুষ্টির কারণ, ভূমিনির্ভর কৃষিজীবন

প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের একেবারে আদিতে সামাজিক ধনের প্রধান উৎস ছিল শীকার, কৌম কৃষি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্প। দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ মোটামুটি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় দ্বিতীয়-প্রথম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত উন্নতপ্রণালীর কৃষি এবং গৃহশিল্প অর্থোৎপাদনের বড় উপায় ছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রধানতম উপায় ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। কিন্তু শেষ পর্যায়ে, অর্থাৎ অষ্টম শতক হইতে আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত বাঙালী জীবন একান্তই ভূমি ও কৃষিনির্ভর। মোটামুটি ভাবে বলা চলে, স্বল্প কয়েকটি শতাব্দী ছাড়া বাঙলাদেশের ঐকান্তিক কৃষি ও ভূমি-নির্ভরতা কখনও ঘুচে নাই। ভূমি স্থির ও অবিচল, এবং সেই ভূমিকে আশ্রয় করিয়া যাঁহাদের জীবন ও জীবিকা তাঁহারা ভূমির অঞ্চলটিকে এবং সেই অঞ্চলের মানবগোষ্ঠীটিকে আঁকড়াইয়া থাকিবেন, উঁহাদের কেন্দ্র করিয়াই তাঁহাদের ভাবনা-কল্পনা আবর্তিত হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। অপর পক্ষে

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যনির্ভর জীবনে ভূমির প্রতি আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত শিথিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে বণিক, সার্থবাহ, সদাগরদের দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত; তখনকার দিনে এক একবার ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইত দূরদেশে, দেশান্তরে; গৃহের, পরিবারের, কোম ও গোষ্ঠীর বন্ধন স্বতই হইয়া পড়িত শিথিল, গ্রামের ও অঞ্চলের বন্ধন হইত শিথিলতর। কিন্তু গ্রাম্য কৃষিনির্ভর জীবনে হইত তাহার বিপরীত। কাজেই সেই জীবনে পরিবারের, কোমের ও অঞ্চলের চেতনার প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িবার কোনো সুযোগ সম্ভাবনাই ছিল না; বরং তাহা আরও লালিত ও পুষ্ট হইবার সুযোগই ছিল বেশি।

রাষ্ট্রবিন্যাসের ক্ষেত্রে কোমতন্ত্র ধীরে ধীরে রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হইয়াছিল, এ-কথা রাষ্ট্রবিন্যাস অধ্যায়ে বলিয়াছি। কিন্তু এই বিবর্তন বাঙলাদেশের সর্বত্র একই সময়ে একই সঙ্গে হয় নাই। পরাক্রমশালী রাজবংশের প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি কোম ও জন ধীরে ধীরে রাজতন্ত্রের সীমার মধ্যে আসিয়া স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু রাজতন্ত্র গড়িয়া ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের প্রায় অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সামন্ততন্ত্রও গড়িয়া উঠিয়াছিল। একটু বিশ্লেষণেই ধরা পড়িবে, এই সামন্তরা প্রায় সকলেই এক একজন পৃথক পৃথক এক একটি অঞ্চলের কোম বা জননায়ক, এবং সেই সেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের লোকদের প্রাথমিক আনুগত্য আঞ্চলিক ও কোমসামন্ত-নায়কটির প্রতি; দেশের বা প্রান্তের রাজা বা সম্রাট তাহাদের কাছে দূরাগত ধ্বনি মাত্র। বাঙলার ইতিহাসের আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিন্যাসের এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাহার ফলে কোমচেতনা ও আঞ্চলিক চেতনা লালন ও পুষ্টিলাভ করিবে ইহা কিছু বিচিত্র নয়।

২

ইতিহাসের অসম গতি historical lag তাহার কারণ

বলিয়াছি, ইতিহাসের প্রথম পর্বে আদিবাসী জীবন একান্ত কোমবদ্ধ। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব কোম ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র বৃহৎ জনে বিবর্তিত হইতে থাকে। সকল কোমই একই সঙ্গে একই সময়ে সভ্যতার অধিকার লাভ করে নাই; শতাব্দীর পর শতাব্দীতে অতি ধীরে ধীরে এক একটি কোম সভ্যতার অধিকার পাইয়াছে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক একটি স্তর অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। তাহার ফলে বাঙলা দেশের সর্বত্র এবং সমগ্র বাঙালী জীবন ব্যাপিয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির একই স্তর বা ক্রম বিস্তৃত নয়; এমন কি একই সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও নয়; আজও নয়, প্রাচীন কালেও ছিল না। সুবিস্তৃত বাঙালী সমাজের একটি অংশ যখন উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্যে নিরত, আর একটি অংশ হয়তো তখনো কাঠের ফলার লাঙলে বা হাত-খুরপির সাহায্যে

পাহাড়ের ঢালু গাত্র ধাপে ধাপে কাটিয়া সেখানে ধানের চাষ করিতেছে। একটি অংশ যখন বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিরত, উচ্চশ্রেণীর ধাতব মুদ্রায় কেনাবেচায় অভ্যস্ত, তখন হয়তো আর একটি অংশে মুদ্রা প্রচলিতই নয়, দ্রব্য-বিনিময়ে কেনাবেচা চলিতেছে, অথবা খুব বড় জোর কড়ির সাহায্যে। একটি অংশে যখন ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের প্রচলন, উচ্চশ্রেণীর মনন ও কল্পনার প্রসার, আর একটি অংশে তখনও ভূতপ্রেতবাদ, যাদুশক্তিতে বিশ্বাস, গাছপূজা, পাথরপূজা প্রভৃতি নিরঙ্কুশ ভাবে চলিতেছে। অথবা, পাশাপাশি বাস করিবার দরুন, একই সমন্বিত সমাজে বাস করিবার দরুন, একই অংশে একই সঙ্গে উন্নত ও আদিম কৃষি, ধাতব মুদ্রা ও বিনিময়ে কেনা বেচা, স্বর্ণমুদ্রা ও কড়ি, ব্রহ্মবাদ ও ম্যাজিক এমন অব্যাহত ও সহজভাবে চলিতেছে যেন ইহাদের মধ্যে বিরোধ কোথাও কিছু নাই! আজও যেমন প্রাচীন বাঙলায়ও তেমনই ছিল, বরং আরও বেশিই ছিল। ইহার কারণ খুব সহজবোধ্য। তবু, তাহা একটু ব্যাখ্যা করিয়া বলা যাইতে পারে, কারণ আমাদের সমাজে এই চেতনা আজও খুব সজাগ নয়।

আজিকার ভারতবর্ষে যে হিন্দুসমাজ ও ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দৃষ্টিগোচর তাহার ইতিহাস অনুসরণ করিলে দেখা যায়, এই সমাজ ও ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন স্তরের প্রাক্-আর্য ও অনার্য, কিছু কিছু বৈদেশিক নরগোষ্ঠীর সমাজ ও ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রাস বা আত্মসাৎ করিয়া করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে; আজও তাহার বিরাম নাই। যে প্রাক্-আর্য বা অনার্য কোন যে সভ্যতা বা সংস্কৃতি-স্তরের সেই অনুযায়ী বৃহত্তর হিন্দুসমাজে তাহার স্থান নির্ণীত হইয়াছে, এবং নানা বিধি বিধান দ্বারা সেই স্থানটিকে সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা সজ্ঞানে সচেতনভাবে পারিপার্শ্বিকের সুযোগ সুবিধা লইয়া, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ঘটনা ও আবর্তের সাহায্য লইয়া সেই সব বিধি-বিধানকে অগ্রাহ্য করিয়া বৃহত্তর সমাজে স্থান লইতে পারিয়াছে তাহারা ক্রমশ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতেও অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সচরাচর তাহার সুযোগ-সুবিধা খুব বেশি ছিল না; বিধি-বিধানের প্রাচীর ছিল সুদৃঢ়। তাহার ফলে বৃহৎ হিন্দুসমাজ ও ধর্মের, সভ্যতা সংস্কৃতির ভিতর নানা স্তর, নানা আকৃতি-প্রকৃতি নানা রূপ, নানা বৈচিত্র্য, কিন্তু সব কিছুই একটা বৃহত্তর সীমার মধ্যে একীকৃত ও বহুলাংশে সমন্বিত।

বাঙলাদেশ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলে, বরং আর্যস্থানবহির্ভূত পূর্ব প্রত্যন্ত দেশ বলিয়া একটু বেশিই বলা চলে। প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালী জীবনের সর্বত্র ইতিহাসের রথচক্র সমান গতিতে চলে নাই; ভূমিও তো সমতল নয়। তাহার ফলে আমাদের সমাজের ও জীবনের নানাস্থানে নানা অসমতা, অসংগতি; কোথাও গতি একেবারে স্তব্ধ ও নিরুদ্ধ, কোথাও খুব দ্রুত ও চঞ্চল, কোথাও আমরা চলিয়াছি সাম্প্রতিক প্রাগ্রসর পৃথিবীর সঙ্গে সমতালে, কোথাও পড়িয়া আছি প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতার মধ্যে। নানা স্তরের নানা অনুন্নত সমাজাংশকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির একই সূত্রে আনিয়া সমন্বয়ে

প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইতিহাসের গতিকে সহজ, সুসম ও সরল করিয়া দিবার কোনো বৈপ্লবিক চেষ্টা প্রাচীন বাঙলায় হয় নাই; আজ অবধি হয় নাই; এবং সেই জন্যই আজও অবনত বা অনুন্নত বর্ণ, শ্রেণী ও সংস্কৃতি-স্তর আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। ভাল মন্দ'র কথা নয়, ইতিহাসে যাহা ঘটিয়াছে বা ঘটে নাই, তাহাই বলিতেছি।

তবে, অবান্তর হইলেও এ-প্রসঙ্গে একটি কথা বলা উচিত। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, ভারতবর্ষের বাহিরে প্রায় সর্বত্রই সভ্য, সংস্কৃতিপুত মানবগোষ্ঠী চেষ্টা করিয়াছে বৃহৎ অনুন্নত আদিম মানবসমাজকে নানাপ্রকারে শোষণ ও পেষণ করিয়া নিঃশেষ করিতে, অথবা একপাশে ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিতে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্যাপকভাবে সে-চেষ্টা কখনও হয় নাই, এ-কথা মোটামুটি নিঃসংশয়ে বলা চলে; তবে, কখনও কখনও কোথাও কোথাও হয় নাই, অবশ্য এমন বলা যায় না। বাঙলাদেশ ভারতের পূর্বপ্রত্যন্ত দেশগুলির অন্যতম, এবং এদেশে আদিবাসী কৌমসমাজের প্রতাপ এবং প্রাবল্যও ছিল বেশি। কাজেই, এদেশে মধ্যভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনৈতিক বন্ধন কখনও আদিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং সমাজ ও অর্থনৈতিক বন্ধনকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারে নাই, ব্যাপকভাবে সে-চেষ্টাও কেহ করে নাই। যত নিম্নেই হোক, বিধি-বিধানের বাধা-নিষেধের যত সুদৃঢ় প্রাচীর গড়িয়াই হোক, হিন্দুসমাজ নিজের বৃহৎ সীমার মধ্যে তাহাকে স্থান দিয়াছে, তাহাকে ধারণ ও পোষণ করিয়াছে; তাহার ফলে একটা বৃহৎ সমন্বয়ও গড়িয়া তুলিয়াছে, যত ধীরে ধীরেই হোক্ এবং অসম গতিতেই হোক্।

তবু, স্বীকার করিতেই হয়,

যারে তুমি নীচে ফেল, সে তে মারে বাঁধিবে যে নীচে।
পশ্চাতে ফেলিছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে॥

কবি তো এখানে ইতিহাসের যুক্তির কথাই বলিতেছেন। সভ্যতা সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের বৃহৎ মানবগোষ্ঠীকে লইয়া যে বাঙালী-সমাজ, সে-সমাজের নিম্ন ও পশ্চাতের স্তরগুলি যে প্রতি মুহূর্তেই উচ্চতর স্তরকে নিম্নে ও পশ্চাতে টানিতেছে– প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগে টানিয়াছে, আজও টানিতেছে। এই স্তব্ধ, উপলব্যাহত গতি ইতিহাসের রথকে সম ও দ্রুততালে অগ্রসর হইতে দেয় নাই, সমাজদেহকে পঙ্গু ও রুগ্ন করিয়া রাখিয়াছে।

প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের এই অসম গতি পুষ্ট ও লালিত হইয়াছে প্রাচীন বাঙালীর বর্ণ ও শ্রেণী-বিন্যাসের সহায়তায়। আমাদের প্রাচীন বর্ণ-বিন্যাস বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, উহার বিভিন্ন স্তর নির্ণীত হইয়াছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী, বৃত্তির স্তরচেতনা, অর্থাৎ উচ্চনীচ ভাবানুযায়ী। এই স্তরগুলি প্রত্যেকটি নানা বিধি-বিধান, বাধা-নিষেধের বেড়ার ঘেরা; সে-বেড়া ডিঙাইয়া উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ

হওয়া খুব সহজ নয়। কারণ, তাহার সঙ্গে আবার শ্রেণী-চেতনাও জড়িত। শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারের তারতম্যও আবার নির্ভর করিত এই বর্ণ, বৃত্তি ও শ্রেণী বিন্যাসের উপর। কাজেই একবার যাহার স্থান সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনো একটা বিশেষ স্তরে নির্ণীত হইয়া গিয়াছে, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার স্থান ছাড়িয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই; ইতিহাসও সেখানে স্তব্ধ ও নিরস্ত হইয়া গিয়াছে।

শ্রেণীবিন্যাস-অধ্যায়ে বলিয়াছি, প্রাচীন বাঙলায় তথা ভারতবর্ষের সর্বত্রই শ্রেণী-চেতনার চেয়ে বর্ণচেতনা কৌমচেতনা ছিল প্রবল। আর, শ্রেণীর সঙ্গে তো বর্ণ ও বৃত্তি অঙ্গাঙ্গী জড়িতই ছিল। বর্ণ ও বৃত্তি যেখানে অনেকাংশে জন্মগত সে-ক্ষেত্রে শ্রেণীও কতকাংশে অচল, অনড় হইবে, ইহা তো খুবই স্বাভাবিক। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সক্রিয় বিরোধ এই অনড়, অচল অবস্থাকে ভাঙিয়া চুরিয়া বর্ণ ও বৃত্তিগত বাধা-নিষেধের প্রাচীর কিছুটা ধ্বসাইতে পারিত, সেই সক্রিয় বিরোধের কোনো প্রমাণ, এমন কি সে-সম্বন্ধে সজ্ঞান চেতনার সাক্ষ্যও প্রাচীন বাঙলায় কিছু উপস্থিত নাই। যখন যে-শ্রেণী সামাজিক ধন যে-পরিমাণে বেশি উৎপাদন করিয়াছে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সেই পরিমাণে তাহারা প্রভাব অর্জন ও বিস্তার করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই পরিমাণে তাহারা অগ্রসর হইতে পারে নাই, সে-ক্ষেত্রে তাহারা স্বীকৃতিও লাভ করে নাই। আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব সত্ত্বেও শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও ভাবনা-কল্পনার ক্ষেত্রে তাহারা নিম্নে ও পশ্চাতেই থাকিয়া গিয়াছে। কারণ, সেই স্থান তাহাদের বর্ণ ও বৃত্তিদ্বারা নির্দিষ্ট।

বর্ণ, বৃত্তি ও শ্রেণীগত যে-সব-বাধা ইতিহাসের গতিকে শ্লথ বা নিরস্ত করিয়াছে সে-সব বাধার প্রাচীর কিছুটা ভাঙিয়া পড়িতে পারিত যদি আমাদের সামাজিক ধনোৎপাদন পদ্ধতির উন্নত পরিবর্তন কিছু ঘটিত। আদিম কৌম জীবন ও সমাজের প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল উন্নততর কৃষি ও উন্নততর শিল্পের প্রবর্তনে। তারপর যে বৃহত্তর জীবন ও সমাজের পত্তন হইল তাহারও প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িতে পারিত যদি আমাদের প্রাচীন কৃষি ও শিল্পের উন্নততর বিবর্তন কিছু ঘটিত। কিন্তু তাহা ঘটে নাই। মাঝখানে কয়েকটি সুদীর্ঘ শতাব্দী বাঙলাদেশ ব্যবসা-বাণিজ্য আশ্রয় করিয়া একটা বৃহত্তর জীবনের আস্বাদন লাভ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিছু বাধাবন্ধন তাহাতে কাটিয়াছিল, ইতিহাসের গতিও কিছুটা বেগ ও প্রেরণা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও ব্যবসা-বাণিজ্য যাঁহারা করিতেন তাঁহারা সাধারণত বৃত্তি ও বর্ণ সীমাকে স্বীকার করিয়াই করিতেন। তাঁহাদের শ্রেণীচেতনা ছিল বর্ণ ও বৃত্তিচেতনার অধীন। কাজেই জীবন ও সমাজের মৌলিক পরিবর্তন তাহাতে কিছু হয় নাই এবং সমাজ-প্রবাহের এখানে ওখানে বিস্তৃত জলাশয়, বদ্ধস্রোত খালবিল প্রভৃতি থাকিয়াই গিয়াছে।

৩

প্রাচীন বাঙালীর গ্রাম-কেন্দ্রিক জীবন ও গ্রামীণ সংস্কৃতি

বাঙলার ইতিহাসের আদিপর্বে—এবং শুধু আদিপর্বেই নয়, সমস্ত মধ্যযুগ ব্যাপিয়া এবং বহুলাংশে এখনও—বাঙালী জীবন প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক, এবং বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রামীণ। গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন এবং তাহার সমস্ত ভাবনা-কল্পনা আবর্তিত হইত। কিছুদিন আগে পর্যন্তও ইহাই ছিল আমাদের জীবনের সব চেয়ে বড় কথা। ইহার কারণ বুঝিতে পারা কঠিন নয়।

প্রথম কারণ আমাদের কোমবদ্ধ আদিম জীবনধারা, যে জীবনে প্রধান জীবনোপায় শিকার ও কৃষি এবং খুব ছোট ছোট গৃহশিল্প, এবং যাহার সমাজ-গঠনের প্রধান আশ্রয় গোষ্ঠী ও পরিবার। স্বভাবতই এই ধরনের জীবন শস্য ফলাইবার মাঠ, নদনদী, খাল-বিলের জলাশয় এবং অরণ্যকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া ওঠে, এবং এইভাবে গ্রামের পত্তন হয়। কৌমজীবনে পরিবার ও গোষ্ঠীবন্ধন স্বভাবতই প্রবল; এবং যেহেতু আমাদের মধ্যে কৌমচেতনা আজও সক্রিয়ভাবে বহমান, সেই হেতু বৃহত্তর জনসমাজ গঠিত হওয়ার পরও আমাদের গ্রামকেন্দ্রিক ভাবনা-কল্পনা এবং সমাজবন্ধন কখনও ঘুচে নাই। কারণ, কৌমচেতনার আশ্রয়ই হইতেছে গ্রাম; এক একটি গ্রামকে আশ্রয় করিয়াই তো একটি প্রাচীন গাঞী, গোষ্ঠী, এবং গাঞী ও গোষ্ঠী বদ্ধ বিভিন্ন পরিবার।

কিন্তু এই গ্রামকেন্দ্রিকতার প্রধান কারণ আমাদের সামাজিক ধনোৎপাদন পদ্ধতি। নানা অধ্যায়ে বলিয়াছি, আমাদের প্রধান জীবনোপায়ই ছিল কৃষি এবং ছোট ছোট গৃহশিল্প। কৃষি একান্তই ভূমিনির্ভর। ছোট ছোট গৃহশিল্পে যাঁহারা নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহারাও প্রধানত না হউন আংশিকত কৃষকই, এবং তাঁহারাও সেই জন্যই একান্ত ভূমি-সংলগ্ন জীবনেই অভ্যস্ত ছিলেন। কৃষিভূমি তো সমস্তই গ্রামে; বস্তুত কৃষিভূমিকে আশ্রয় করিয়াই তো গ্রামগুলি গড়িয়া উঠিত। এই ভূমিই আবার গোষ্ঠী ও পরিবার-বন্ধনের আশ্রয়, অথবা একেবারে উল্টাইয়া বলা চলে, এক এক ভূম্যাংশ আশ্রয় করিয়াই এক একটি গোষ্ঠী ও পরিবার; এবং যেহেতু সেই ভূমি অনড়, অচল এবং সেই ভূমিই সকলের জীবিকাশ্রয়, সেই হেতু গোষ্ঠী এবং পরিবারও স্থির এবং গোষ্ঠী ও পরিবারবন্ধনও দৃঢ়। তীর্থ পর্যটন, শিক্ষাদীক্ষা আহরণ, ধর্মপ্রচার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে যাইবার কোনো প্রয়োজন কাহারও হইত না; জীবিকা সংগ্রহ হইত গ্রামেই, এবং গ্রামগুলি সাধারণত ছিল স্ব-নির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই ধরনের উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতিতে জীবন গ্রামকেন্দ্রিক হইবে ইহা কিছু বিচিত্র নয়, এবং যেহেতু জীবন গ্রামকেন্দ্রিক সেই হেতু আমাদের সংস্কৃতিও গ্রামীণ।

এক.ধিক অধ্যায়ে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, খ্রীষ্টোত্তর প্রথম-দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তত ষষ্ঠ সপ্তম শতক পর্যন্ত, বিশেষ ভাবে চতুর্থ হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী বাঙলাদেশ উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের অন্যান্য প্রান্তের সুবিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান অংশীদার হইয়াছিল এবং তাহার ফলে তাহার ঐকান্তিক কৃষি ও ভূমি-নির্ভরতায় কিছুটা বোধ হয় ভাঁটা পড়িয়াছিল। বৃহত্তর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে গ্রাম ছাড়িয়া অন্তত কিছু কিছু লোককে কমবেশি সময়ের জন্য বিদেশে যাপন করিতে হইত ; তাহার ফলে তাহাদের গ্রামকেন্দ্রিক গোষ্ঠী ও পরিবারবন্ধনও কিছুটা শিথিল হইয়া পড়িত, সন্দেহ নাই। যুদ্ধবিগ্রহ এবং হয়তো রাজকীয় কাজকর্মের প্রয়োজনেও কিছু কিছু লোককে স্বল্পকালের জন্য হইলেও দেশের বাহিরে যাপন করিতে হইত। তাহার ফলেও কর্ম ও ভাবনা-কল্পনার পরিধি কিছুটা বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং ধীর-মন্থর গ্রাম্য জীবনস্রোতে বাহির হইতে কিছু তরঙ্গাভিঘাত লাগিয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য গ্রাম্য গৃহশিল্পও নিশ্চয়ই কিছু কিছু বিস্তৃত হইয়া থাকিবে, এবং বৃহত্তর যৌথশিল্পগুলি নগরগুলিতে স্থানান্তরিতও হইয়াছিল। প্রধানত এই সব প্রয়োজনেই, এবং কিছুটা রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রয়োজনে প্রাচীন বাঙলায় কিছু কিছু নগরের পত্তন হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণভাবে. বাঙালীর কৃষিনির্ভরতা কখনও একেবারে ঘুচে নাই ; বণিক-ব্যবসায়ীরাও দেশ বিদেশ ঘুরিয়া গ্রামেই ফিরিয়া আসিতেন এবং অর্জিত ও সংগৃহীত ধন গ্রামেই ব্যয়িত ও বণ্টিত হইত, পরিবার ও গোষ্ঠীকে আশ্রয় করিয়া। নগরের যৌথশিল্পগুলিরও যোগান যাইত গ্রাম হইতেই এবং সে-অর্থের অন্তত একটা বৃহৎ অংশ গ্রামেই ফিরিয়া আসিত। এই সব কারণে বাঙলায় যে-সব নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল সেগুলিকেও আকৃতি-প্রকৃতিতে বৃহত্তর ও সমৃদ্ধতর গ্রাম ছাড়া আর কিছু বলা চলে কিনা সন্দেহ। কিন্তু অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলায় এবং উত্তর-ভারতের প্রায় সর্বত্রই বৃহত্তর ব্যবসা-বাণিজ্যস্রোতে ভাঁটা পড়িয়া যায়, এবং বাঙালী জীবন আবার একান্তভাবে কৃষিনির্ভর হইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। তাহার ফলে জীবনে ঐকান্তিক গ্রামকেন্দ্রিকতাও বাড়িয়া যায়, এবং আদিপর্বের শেষের দিকে ও মধ্যযুগে তাহা ক্রমবর্ধমান। বৃহত্তর, সংগ্রামমুখর, উল্লাস-উত্তরোল জীবনের স্পর্শও সেইজন্যই বাঙালীর গ্রামীণ সংস্কৃতির স্রোতে কোনো বৃহৎ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে নাই, তাহার তটরেখাকে প্রসারিত বা প্রবাহকে গভীর গম্ভীর করিতে পারে নাই। বৃহত্তের, গভীরতার এবং ভাব ও মননসমৃদ্ধির যেটুকু পরিচয় প্রাচীন বাঙালীর সংস্কৃতিতে দৃষ্টিগোচর তাহা সর্বভারতীয় সংস্কৃতি এবং বৃহত্তর শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যগত জীবনোপায়ের দান।

৪

এই গ্রন্থের নানা অধ্যায়ের আলোচনায় সমাজেতিহাসের একটি ইঙ্গিত অত্যন্ত প্রশস্ত ভাবে ধরা পড়িয়াছে। আমার মনে হয়, এই ইঙ্গিতটিই প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ইঙ্গিত। সেই জন্যই এই ইঙ্গিতটিকে সংহত সমগ্রতায় এখানে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিতেছি : এই ইঙ্গিত সামাজিক ধনোৎপাদন ও বণ্টনপদ্ধতিগত, সামাজিক ধনের গতি ও প্রকৃতিগত।

সামাজিক ধনের উৎপাদন ও বণ্টন

খ্রীষ্টপূর্ব-শতকীয় বাঙলার আদিম কৌমস্তরে সামাজিক ধনের উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি কি ছিল ও তাহার ক্রমবিবর্তন কি ভাবে হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে, আদিম সমাজের গতি-প্রকৃতি অনুযায়ী কি হওয়া সম্ভব সে-সম্বন্ধে অনুমান করা খুব কঠিন নয়; তাহা এই গ্রন্থেরই নানা অধ্যায়ে ব্যক্ত করিয়াছি। কাজেই, সেই সুদূর কালসম্বন্ধে অনুমানসিদ্ধ তথ্যের পুনরুক্তি এখানে আর করিতেছি না। তবু, একথা বলা বোধ হয় প্রাসঙ্গিক যে, মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া আনুমানিক খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতক পর্যন্ত গাঙ্গেয় ও প্রাচ্য ভারতবর্ষের প্রধান ধনোৎপাদন উপায় ছিল কৃষি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ও যৌথ গৃহশিল্প এবং কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য। ধন কেন্দ্রীকৃত হইত বড় বড় গৃহপতিদের এবং শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহদের হাতে। জাতকের গল্প ও অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে নানা প্রমাণ এ-সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত, এবং মনীষী রিচার্ড ফিক্ তাহা খুব ভাল করিয়াই দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের পুরাপুরি সুবিধাটা গাঙ্গেয় ও প্রাচ্য-ভারত অপেক্ষা বেশি পাইত উত্তর, পশ্চিম ও মধ্যভারত। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, পুণ্ড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্তি, পাটলীপুত্র প্রভৃতি সত্ত্বেও প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দরগুলি ছিল বেশির ভাগই উত্তর-পশ্চিমে, মধ্য-ভারতে এবং বিশেষ ভাবে পশ্চিম-ভারতের সমুদ্রোপকূলে। বস্তুত, সমসাময়িক ভারতবর্ষের সমস্ত বাণিজ্যপথগুলির গতি একান্তই পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম-মুখী। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা যতই থাকুক, শ্রেষ্ঠীসার্থবাহদের কথা যতই পড়া যাক্, প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে বাকী থাকেনা যে, অন্তত গাঙ্গেয় ও প্রাচ্য-ভারতের জীবন ছিল একান্তই কৃষিকেন্দ্রিক। ব্যবসা-বাণিজ্য সাধারণত বোধ হয় বিনিময়েই চলিত; চিহ্নাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন যথেষ্ট ছিল, পাওয়াও গিয়াছে প্রচুর, কিন্তু তাহার ভিতর স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা প্রায় দেখিতেছি না। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, ব্যবসা-বাণিজ্য সত্ত্বেও আধুনিক ধনবিজ্ঞানের ভাষায় আমরা যাহাকে বলি বাণিজ্যসাম্য বা ব্যালেন্স অফ্ ট্রেড তাহা ভারতবর্ষের স্বপক্ষে ছিল না, অথবা থাকিলেও স্বর্ণ এবং রৌপ্য (মুদ্রার আকারেই হোক্ আর তালের আকারেই হোক্)

কেন্দ্রীকৃত হইয়া থাকিত মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, গৃহপতি প্রভৃতি এবং রাষ্ট্রের হাতেই, অর্থাৎ সামাজিক ধন সমাজের সকল স্তরে বণ্টিত হইত না, ছড়াইয়া পড়িবার বেশি উপায় ছিল না ; উদ্বৃত্ত ধনের পরিমাণও বোধ হয় খুব বেশি ছিল না।

বাঙলাদেশ গাঙ্গেয় ভারতের অন্যতম পূর্বপ্রত্যন্ত দেশ। পুণ্ড্রবর্ধনের মত বাণিজ্য-নগর এবং তাম্রলিপ্তির মতন বন্দর-নগর তাহার ছিল সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও উত্তর-ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙলার এবং তদানীন্তন বাঙালীর স্থান খুব বেশি ছিল বলিয়া মনে হয় না, কারণ বাঙালীর সমাজ তখনও একান্তই কৌমবদ্ধ ; সর্বভারতীয় সভ্য জীবনের তরঙ্গাভিঘাত তখনও ভাল করিয়া সেই সমাজে লাগেই নাই। বহুদিন পর্যন্ত বাঙলাদেশ ছোট ছোট গৃহশিল্প, পশুপালন ও কৃষিলব্ধ জীবনোপায়েই অভ্যস্ত ছিল। কিছু কিছু বহির্দেশী ব্যবসা-বাণিজ্য যাহা ছিল তাহা উত্তর-গাঙ্গেয় ভারতের সঙ্গে তুলনীয় নয়, এমন কি খুব উল্লেখযোগ্যও বোধ হয় নয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবর্তন ও সামাজিক ধন

খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের মাঝামাঝি হইতেই ভারতবর্ষের সর্বত্র এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন আরম্ভ হয়, এবং সামাজিক ধন উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া, জীবনধারণের মান উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে ভারতবর্ষ যথার্থত সোনার ভারতে পরিণতি লাভ করে ; এই দুই শতাব্দী জুড়িয়া যথার্থত এবং আক্ষরিক অর্থে ভারতবর্ষে স্বর্ণযুগের বিস্তৃতি। এই বিবর্তন-পরিবর্তনের প্রধান কারণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি। বস্তুত, এই কয়েক শতক ধরিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমবর্ধমান, এবং এই ব্যবসা-বাণিজ্যই সামাজিক ধনোৎপাদনের প্রধান উপায়। খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের মাঝামাঝি হইতে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত সুবিস্তৃত রোম-সাম্রাজ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। তাহার আগেও বহুশতাব্দী ধরিয়া পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে জলপথে ভারতবর্ষের একটা বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল ; এই দেশগুলিতে ভারতীয় নানা দ্রব্যাদির চাহিদাও ছিল ; কিন্তু বাণিজ্যটা প্রধানত ছিল আরব বণিকদের হাতে। কিন্তু মোটামুটি ৫০ খ্রীষ্ট তারিখ হইতে নানা কারণে রোম-সাম্রাজ্য এবং ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে এই বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইবার সুযোগ লাভ করে, এবং দেশে ধনাগমের একটি স্বর্ণদ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয়। বস্তুত, এই বাণিজ্য ব্যাপারে সাক্ষাৎভাবে আমাদের দেশ এত লাভবান হইতে আরম্ভ করে, এত রোমক সোনা বহিয়া আসিতে আরম্ভ করে যে, দ্বিতীয় শতকে ঐতিহাসিক প্লিনি অত্যন্ত দুঃখে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যে-ভাবে ভারতবর্ষে সোনা বহিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে এ-ভাবে বেশি দিন চলিলে সমস্ত রোমক সাম্রাজ্য স্বর্ণহীন, রক্তহীন হইয়া পড়িবে। সিন্ধুদেশের সমুদ্রোপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গা-বন্দর ও তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত সমস্ত

উপকূল বহিয়া কুড়িটিরও বেশি ছোট বড় সামুদ্রিক বন্দর, প্রতি বন্দরে বৈদেশিক বাণিজ্যোপনিবেশ। এই সব বন্দর, বিশেষভাবে পশ্চিম ভারতের ভৃগুকচ্ছ, সুরাষ্ট্র, কল্যাণ প্রভৃতি বন্দর আশ্রয় করিয়া জাহাজে জাহাজে রোমক সোনার স্রোত বহিয়া আসিত সমুদ্রতীরস্থ ভারতবর্ষের সর্বত্র। বস্তুত, পশ্চিম-ভারতের এই স্বর্ণদ্বারের অধিকার লইয়াই তো শক সাতবাহন সংগ্রাম, দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্তের পশ্চিম-ভারত অভিযান, স্কন্দগুপ্তের বিনিদ্র রজনী যাপন। কারণ, এই দ্বার করচ্যুত হওয়ার অর্থই হইতেছে দেশে ধনাগমের একটি প্রশস্ত পথ বন্ধ হওয়া। দক্ষিণ-ভারতের দ্বার ছিল অনেক ; কাজেই দুর্ভাবনার কারণ ছিল না ; কিন্তু উত্তর-ভারতের প্রধান পথ ঐ গুজরাটের বন্দরগুলি, আর স্বল্পাংশে গঙ্গা ও তাম্রলিপ্তি বন্দর। এই বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যলব্ধ স্বর্ণই গুপ্ত আমলের স্বর্ণ-যুগের ভিত্তি। এই সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মনন ও কল্পনা, ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলা ও সাহিত্যে ভারতীয় জীবনের যে বিস্তৃতি, বৃহত্তর গভীরতর জীবনের যে আস্বাদন তাহার মূলেও যে বহুলাংশে এই স্বর্ণ বা সামাজিক ধন, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। এই সুবৃহৎ বাণিজ্যই বৃহৎ ও গভীর চেতনা সঞ্চারের মূলে, জীবনধারণের মানকে উন্নত স্তরে উত্তীর্ণ করিবার মূলে ; এই মান উন্নত না হইলে, চেতনা সঞ্চারিত না হইলে সাংস্কৃতিক জীবন উন্নত হয় না।

শুধু এই সামুদ্রিক বাণিজ্যই নয়। বহু প্রাচীন কাল হইতেই উত্তর-পূর্ব চীনের পূর্বতম সমুদ্রোপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য-এশিয়ার মরুভূমি পার হইয়া পামীরের উষ্ট্রপৃষ্ঠ বাহিয়া আফগানিস্তানের ভিতর দিয়া ঈরাণ-দেশ অতিক্রম করিয়া একেবারে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ আন্তরেশীয় প্রান্তাতিপ্রান্ত পথ সেই পথ দিয়াও একটা বৃহৎ বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। প্রথম-চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পশ্চিমাভিযানের ফলে ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম এই পথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং তাহার কিছুদিন পর হইতেই নানা বিদেশী বণিককুলের সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে ভারতবর্ষ ধনাগমের এক নূতন পথ খুঁজিয়া পায়। খ্রীষ্টপূর্ব ও খ্রীষ্টোত্তর প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে শক-কুষাণ অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে এই পথ বিস্তৃততর এবং বাণিজ্য গভীরতর হয় এবং তাহার ফলে দেশে স্বর্ণপ্রবাহের আর একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়। পঞ্চম শতকে হূণাভিযানের পূর্ব পর্যন্ত এই দ্বার উন্মুক্তই ছিল, কিন্তু হূণেরা মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের এই সম্বন্ধ বিপর্যস্ত করিয়া দেয়।

এই সুবিস্তৃত এবং সুপ্রচুর লাভজনক বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যই প্রত্যক্ষভাবে দেশের শিল্পকে, বিশেষভাবে দেশের বস্ত্র ও গন্ধশিল্পকে, দন্ত ও কাষ্ঠশিল্পকে অগ্রসর করিয়া দেয়, কোনো কোনো কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়াইয়া কৃষিকেও অগ্রসর করে। এই সবের ফলে বাণিজ্যলব্ধ ধন সমাজের নানাস্তরে বণ্টিত হইতে আরম্ভ করে, এবং সাধারণ কৃষক এবং গ্রামবাসী গৃহস্থেরও জীবনের মান অনেকাংশে উন্নত হয়। সাধারণ গৃহস্থের ভাণ্ডারেও স্বর্ণমুদ্রা এই যুগেরই সামাজিক লক্ষণ।

এই সুবিস্তৃত বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য, এই কয়েক শতাব্দী জুড়িয়া ভারতবর্ষের সর্বত্র সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন ; বিশেষত তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতেই এই সুবর্ণমুদ্রা একেবারে নিকষোত্তীর্ণ খাঁটী সুবর্ণমুদ্রা, এবং তাহার ওজন বাড়িতে বাড়িতে প্রথম-কুমার গুপ্তের আমলে এই মুদ্রা একেবারে চরম শিখরে উঠিয়া গিয়াছে ; ধাতবমূল্যে, শিল্পমূল্যে, আকৃতি-প্রকৃতিতে এই মুদ্রার সত্যই কোনো তুলনা নাই। এই কয়েক শতকের রৌপ্যমুদ্রা সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। এ-তথ্যও উল্লেখযোগ্য যে, এই সুবর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার নাম যথাক্রমে দীনার ও দ্রম্ম ; এবং এই দুইই এই যুগের লাভজনক বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতীক। আর, এই যুগে নগর-সভ্যতার বিস্তার ও সমৃদ্ধ নাগরিক আদর্শের যে-পরিচয় বাৎসায়নের কামসূত্রে দেখিতেছি তাহা তো প্রত্যক্ষভাবে এই সামাজিক ধনের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

উত্তর-ভারতের পূর্ব প্রত্যন্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও এই সুবৃহৎ বৈদেশিক, বিশেষভাবে সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাঙলাদেশ অন্যতম অংশীদার হইয়াছিল, এবং সেই বাণিজ্যলব্ধ সামাজিক ধনের কিছুটা অধিকার লাভ করিয়াছিল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তি বাঙলার সমৃদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর ; খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতকের আগে হইতেই এই বন্দরদ্বয়ের কথা নানাসূত্রে শোনা যাইতেছে, আমদানী-রপ্তানীর খবরও পাওয়া যাইতেছে। বাঙলাদেশ, বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গ গুপ্তাধিকারে আসিবার পর হইতেই বৃহত্তর ভারতবর্ষের সঙ্গে তাহার যোগসূত্র আরও ঘনিষ্ঠ হয় এবং এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ক্রমশ আরও বাড়িয়াই চলে। বস্তুত, পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে দেখিতেছি উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে গ্রামের সাধারণ গৃহস্থও ভূমি কেনাবেচা করিতেছেন স্বর্ণমুদ্রায়। স্বর্ণমুদ্রাই যে এ-যুগের মুদ্রামান, এ-সম্বন্ধে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না। তাহা ছাড়া, বাঙলা দেশের সর্বত্র এই যুগে দেখিতেছি, শাসনাধিকরণগুলিতে রাজপাদোপজীবী ছাড়া আর যে তিনজন থাকিতেন তাঁহাদের একজন নগরশ্রেষ্ঠী, একজন প্রথম সার্থবাহ, একজন প্রথম কুলিক, অর্থাৎ প্রত্যেকেই শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিনিধি। সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্র শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যকে কতখানি মূল্য দিত তাহা এই তথ্যে সুস্পষ্ট।

বস্তুত, কিছুটা পরিমাণে কৃষিনির্ভরতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ ও বাঙলার এই কয়েক শতকের সমাজ প্রধানত ও প্রথমত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পনির্ভর, অর্থাৎ ধনোৎপাদনের প্রথম ও প্রধান উপায় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি অন্যতর উপায় মাত্র। তাহা ছাড়া, যেহেতু বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাই ছিল বেশি সেই হেতু ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ অর্থ শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহকুল এবং রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকৃত হওয়ার পরও মোটামুটি একটা বৃহৎ অংশ শিল্পীকুলের হাতেও গিয়া পৌঁছিত। অধিকন্তু, গ্রামবাসী গৃহস্থের ভূমি কেনাবেচায় স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন দেখিয়া মনে হয়, গৃহপতি এবং কৃষক

সমাজেও উৎপাদিত ধনের কিছু অংশ আসিয়া পড়িত। ইহারই প্রত্যক্ষ ফল জীবন-ধাবণের মানের উন্নতি ও প্রসার এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি।

কিন্তু ৪৭৫ খ্রীষ্ট শতকে বিরাট বোম-সাম্রাজ্য ভাঙ্গিযা পড়িল ; পূর্ব-পৃথিবীব সঙ্গে তাহাব ব্যবসা-বাণিজ্য বিপর্যস্ত হইয়া গেল। তবু, যতদিন পর্যন্ত মিশব দেশ ও আফ্রিকাব পূর্ব কূলে কূলে সাম্রাজ্যেব ধ্বংসাবশেষ যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল ততদিন তাহাকে আশ্রয করিয়া বিগত সুদীর্ঘ পাঁচ শতাব্দীর সুবিস্তৃত বাণিজ্যেব অবশেষ আবও কিছুদিন বাঁচিযা রহিল ; সে-জৌলুস বা সে-সমৃদ্ধি বহুলাংশে কমিযা গেল, সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে অন্তর্হিত হইল না। সমস্ত ষষ্ঠ-শতক এবং সপ্তম-শতকের অর্ধাংশ প্রায় এই ভাবেই চলিল, কিন্তু ইতোমধ্যেই মহম্মদ-প্রবর্তিত ইস্‌লামধর্মকে আশ্রয করিযা আববদেশ আবার ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং ৬০৬-৭ খ্রী তারিখেব পর একশত বৎসরের মধ্যে স্পেন হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে চীনদেশের উপকূল পর্যন্ত আরব বাণিজ্যতরী ও নৌবাহিনী সমস্ত ভূমধ্য-সাগর, লোহিত-সাগর, ভারতমহাসাগর এবং প্রশান্ত-মহাসাগর প্রায় ছাইয়া ফেলিল। ৭১০ খ্রীষ্ট শতকে পশ্চিম-ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম আশ্রয় সিন্ধুদেশ চলিয়া গেল আরব বণিকের হাতে, এবং সিন্ধু-গুজরাটের স্বর্ণদ্বার প্রায় বন্ধ হইয়া গেল বলিলেই চলে। বোম-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ফলে ভূমধ্যসাগবীয় ভূখণ্ডে ভারতীয় শিল্প ও গন্ধ দ্রব্যাদির চাহিদাও গেল কমিয়া। অন্যদিকে পূর্ব-ভারতে তাম্রলিপ্তির বন্দরও একাধিক কারণে বন্ধ হইয়া গেল।

এই দুই শত বৎসরের বাণিজ্যিক অবস্থার সদ্যোক্ত বিবর্তন-পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ছাপ পড়িয়াছে সমসাময়িক স্বর্ণমুদ্রার উপর, কারণ, আমি আগেই বলিয়াছি, প্রাচীন ভাবতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রার উন্নত বা অবনত অবস্থা বা অপ্রচলন আমাদের সমৃদ্ধ বা অবনত বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্যোতক। ইতিহাসের যে-পর্বে বৈদেশিক বাণিজ্য-সমতার লাভ আমাদের পক্ষে, আধুনিক পরিভাষায় আমবা যে পরিমাণে favourable trade balance আহরণ করিয়াছি তখন সেই পরিমাণে আমাদের স্বর্ণমুদ্রা উন্নত ও সমৃদ্ধ, প্রচলন বিস্তৃত ; যখন তাহা নাই তখন স্বর্ণমুদ্রাও নাই, অথবা থাকিলেও তাহার নিকষমূল্য, ওজনমূল্য এবং শিল্পমূল্য আপেক্ষিকত কম। রৌপ্যমুদ্রা সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে, ষষ্ঠ ও সপ্তম-শতকের উত্তর-ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাসে। এই দুই শতক জুড়িয়া মুদ্রার ক্রমাবনতি কিছুতেই ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। প্রথম দেখা যাইবে স্বর্ণমুদ্রার ওজন ও নিকষমূল্য ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে ; দ্বিতীয় স্তরে স্বর্ণমুদ্রা নকল ও জাল হইতেছে ; তৃতীয় স্তরে রৌপ্যমুদ্রা স্বর্ণমুদ্রাকে হটাইয়া দিতেছে, চতুর্থ স্তরে রৌপ্যমুদ্রা অবনত হইতেছে, পঞ্চম স্তরে রৌপ্যমুদ্রাও অন্তর্হিত। ভারতবর্ষের সর্বত্রই যে একেবারে একই সময়ে বা একেবারে সুনির্দিষ্ট স্তরে স্তরে এইরূপ হইয়াছে তাহা নয় ; কোথাও কোথাও হয়তো গচ্ছিত স্বর্ণ বা স্বর্ণমুদ্রা পরবর্তী কালে গলাইয়া

নূতন স্বর্ণমুদ্রা চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সে-চেষ্টা বেশিদিন চলে নাই বা পরিণামে সার্থক হয় নাই, বা তাহার ফলে উচ্চ শ্রেণীর ধাতবমুদ্রার যে গতিপ্রকৃতির কথা এইমাত্র বলিলাম তাহারও ব্যত্যয় বিশেষ হয় নাই।

ধনসম্বল অধ্যায়ে বাঙলাদেশে মুদ্রার বিবর্তন সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি; এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিব না। সেই বিবরণ-বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট ধরা যায় যে, মুদ্রার এই ক্রমাবনতির প্রধান ও প্রথম কারণ বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি। সেই অবনতির হেতু একাধিক। সে-সব কারণ এই গ্রন্থেই নানাস্থানে উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছি। ব্যবসা-বাণিজ্যের এই অবনতিতে শিল্প-প্রচেষ্টারও কিছুটা অবনতি ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই, গুণ বা নিপুণতার দিক্ হইতে না হউক, অন্তত পরিমাণের দিক্ হইতে। কারণ, বহির্দেশে যে-সব জিনিসের চাহিদা ছিল সে-সব চাহিদা কমিয়া গিয়াছিল; তাহা ছাড়া এই বাণিজ্যে দেশের বণিকদের প্রত্যক্ষ অংশ যখন পরোক্ষ অংশে পরিণত হইয়া গেল তখন সঙ্গে সঙ্গে লাভের পরিমাণ কিছুটা কমিয়া যাইবে ইহা কিছু বিচিত্র নয়। এই সব কারণে সমাজে কৃষি-নির্ভরতা বাড়িয়া যাওয়া খুবই স্বাভাবিক, এবং অষ্টম শতক হইতে দেখা যাইবে গাঙ্গেয় ভারতে, বিশেষভাবে বাঙলাদেশে ঐকান্তিক কৃষিনির্ভরতা ক্রমবর্ধমান, এবং আদিপর্বের শেষ অধ্যায়ে, অর্থাৎ অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের বাঙলাদেশ একান্তই কৃষিনির্ভর, অর্থাৎ কৃষিই ধনোৎপাদনের প্রথম ও প্রধান উপায়, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য অন্যতম উপায় হইলেও তেমন লাভবান নয়, অর্থাৎ বাণিজ্য-সমতা দেশের স্বপক্ষে আর নাই; পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী দ্বীপ ও দেশগুলির সঙ্গে কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য থাকা সত্ত্বেও নাই।

ঐকান্তিক ভূমি ও কৃষিনির্ভরতার রূপান্তর

অষ্টম শতকের গোড়া হইতেই পূর্ব ভূমধ্য-সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশান্ত-মহাসাগর পর্যন্ত ভারতবর্ষের সমগ্র বৈদেশিক সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য আরব ও পারসীক বণিকদের হাতে হস্তান্তরিত হইয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সে-প্রভাব ক্রমবর্ধমান। দক্ষিণ-ভারত বহুদিন পর্যন্ত, কতকাংশে হইলেও, এই আরব বণিকশক্তির সঙ্গে (এবং পূর্ব-সমুদ্রে চীনা বণিক-শক্তির সঙ্গেও) কিছুটা পরিমাণে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া নিজেদের বাণিজ্যলব্ধ ধনের ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু উত্তর-ভারতে তাহা সম্ভব হয় নাই। তাহার সমস্ত পথই গিয়াছিল রুদ্ধ হইয়া; এবং তাহার ফলে বাঙলাদেশও এই বৃহৎ বাণিজ্যসম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। তবু প্রাচ্যদেশের বাঙলা-বিহার পালরাজাদের আমলে একটা সজ্ঞান, সচেতন চেষ্টা করিয়াছিল স্থলপথে হিমালয়শায়ী কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, ভুটান, সিকিম প্রভৃতি দেশের সঙ্গে একটা বাণিজ্য-সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে, এবং

কিছুদিনের জন্য অন্তত কিছুটা পরিমাণে সে-চেষ্টা সার্থকও হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই ধরনের একটা চেষ্টা পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ প্রভৃতির সঙ্গেও হইয়াছিল। কিন্তু কোনো চেষ্টাই যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করিয়া এই পর্বের বাঙলার ঐতিহাসিক কৃষিনির্ভরতা ঘুচাইতে পারে নাই, বরং তাহা ক্রমবর্ধমান হইয়া পাল-আমলের শেষের দিকে এবং সেন-আমলে বাঙলাদেশকে একেবারে ভূমিনির্ভর, কৃষিনির্ভর গ্রাম্যসমাজে পরিণত করিয়া দিল! এই পর্বে যে স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, এমন কি কোনো প্রকার ধাতব মুদ্রার সাক্ষাৎই আমরা পাইতেছি না, ইহার ইঙ্গিত তুচ্ছ করিবার মতন নয়।

এই ঐকান্তিক ভূমি ও কৃষিনির্ভরতা প্রাচীন বাঙলার সমাজ জীবনকে একটা স্বনির্ভর স্বসম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত স্থিতি ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়াছিল, এ-কথা সত্য ; গ্রাম্য জীবনে এক ধরনের বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত সুখশান্তিও রচনা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহা সমগ্র জীবনকে বিচিত্র ও গভীর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করিতে পারে নাই, বৃহৎ জনসাধারণের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনমানকে উন্নত করিতে পারে নাই ; ইতিহাসের কোনো পর্বে কোনো দেশেই তাহা সম্ভব হয় নাই, হওয়ার কথাও নয়। আমি আগে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, আমাদের কৌম ও আঞ্চলিক চেতনার প্রাচীর যে আজও ভাঙ্গে নাই তাহার অন্যতম কারণ এই একান্ত ভূমিনির্ভর কৃষিনির্ভর জীবন। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিচিত্র ও গভীর সংগ্রামময়, বিচিত্র বহুমুখী অভিজ্ঞতাময় এবং বৃহত্তর মানবজীবনের সঙ্গে সংযোগময় জীবনের যে ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি, যে উল্লাস ও বিক্ষোভ, বৃহতের যে উদ্দীপনা তাহা স্বল্প পরিসর গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর জীবনে সম্ভব নয়। সেখানে জীবনের ছন্দ শান্ত, সীমিত, তাল সমতাল ; সে-জীবনে পরিমিত সুখ ও পারিবারিক বন্ধনের আনন্দ ও বেদনা, সুবিস্তৃত উদার মাঠ ও দিগন্তের, নদীর ঘাট ও বটের ছায়ার সৌন্দর্য।

যাহাই হউক, বাঙলাদেশের আদিপর্বের শেষ অধ্যায় এই ভূমি ও কৃষিনির্ভর সমাজ-জীবনই মধ্যপর্বের হাতে উত্তরাধিকারস্বরূপ রাখিয়া গেল, আর রাখিয়া গেল তাহার প্রাচীনতর পর্বের সমৃদ্ধ শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যের সুউচ্চারিত স্মৃতি। সেই স্মৃতি মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে বহমান। আমাদের প্রাচীন গ্রামবিন্যাস, রাষ্ট্রবিন্যাস, শ্রেণী ও বর্ণবিন্যাস, শিল্প ও সংস্কৃতি, ধর্মকর্ম সমস্তই বহুলাংশে সদ্যোক্ত গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর সমাজ-জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৫

প্রাচীন বাঙলার রাজবৃত্ত ও রাষ্ট্র জীবনের ধারার কথা এই গ্রন্থের দু'টি অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই সুবিস্তৃত বিশ্লেষণ হইতে কয়েকটি ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ধরা পড়ে।

সমাজ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে যেমন, পূর্ব প্রত্যন্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় জীবনেও তেমন? সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে বাঙলাদেশের একটা যোগাযোগ সর্বদা ছিল, এবং ভারতীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহার বড় একটা অংশও ছিল। মৌর্য সম্রাটদের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত সে-সম্বন্ধ কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই; বস্তুত, প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধু অবাঙালীর ইতিহাস নয়। পঞ্চম ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বাঙলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস মধ্য-ভারতের বাম বাহু প্রসারণের ইতিহাস এবং তাহার ফলে বাঙলার কৌম রাষ্ট্রীয় জীবনে কি পরিবর্তন-বিবর্তন হইয়েছে তাহারই ইতিহাস। এই পরিবর্তন-বিবর্তনের কোনো বিবরণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই, তবে প্রান্তের বাহির হইতে কোনো ক্ষমতাবান্ রাজশক্তি যখন অপরিণত কৌমকেন্দ্রিক খণ্ড খণ্ড সংস্থার দিকে হাত বাড়াইয়া বৃহত্তর পরিধির ভিতর সেগুলিকে টানিয়া লইতে চায় তখন স্বাভাবিক কারণেই কি পরিবর্তন-বিবর্তন ঘটিতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। যাহাই হউক, ষষ্ঠ শতকের শেষ ও সপ্তম শতকের গোড়া হইতেই বাঙলাদেশ দুই বাহু বাড়াইয়া উত্তর-ভারতের বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্মুখর স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়ে, এবং ক্রমে ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের সাধারণ রাজনৈতিক জীবনে নিজের একটি বিশিষ্ট স্থান করিয়া লয়। অষ্টম ও নবম শতকের বহুলাংশ জুড়িয়া যে তিনটি প্রধান রাষ্ট্রশক্তি সর্বভারতীয় প্রভুত্ব ও প্রাধান্যের জন্য লড়িয়াছিল তাহার মধ্যে একটির কেন্দ্র ছিল বাঙলাদেশে ও আশ্রয় ছিল পাল-রাজবংশ। খুব সম্ভব, এই সময় কিংবা ইহার কিছু আগে, মাৎস্যন্যায়ের কালে বাঙলাদেশ নিজের সন্তানদের ক্রোড়বিচ্যুত করিয়া পাঠাইয়াছিল পঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে নূতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। দশম শতকে বরেন্দ্রভূমির গদাধর রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয়-কৃষ্ণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া দক্ষিণ-ভারতে বেলারি জেলায় একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই শতকে প্রথম-মহীপালের রাজ্য ও রাষ্ট্রশক্তি উত্তর ভারতের অন্যতম শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। একাদশ শতক হইতে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সম্বন্ধ বাড়িয়া যায়, এবং ক্রমশ বাঙলাদেশ দক্ষিণী রাষ্ট্রীয় প্রভাবের কবলে জড়াইয়া পড়ে। তাহারই ফলে সেন-বংশের প্রতিষ্ঠা। যাহাই হউক, একদিকে বাঙলার সীমা ডিঙ্গাইয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করা এবং তাহাকে সৃষ্টি ও শক্তি সম্ভাবনায় পূর্ণ করিয়া তোলা যেমন বার বার বাঙালীর পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল, তেমনই জয় পরাজয়ের ভিতর দিয়া বাঙলাদেশ ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যোগরক্ষা করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই। শুধু রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়াই নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধর্ম ও সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়াও বাঙলাদেশ নিখিল ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিত, কাশ্মীর হইতে সিংহল এবং গুজরাট হইতে কামরূপ পর্যন্ত। ভারতবর্ষের বাহিরে—তিব্বতে, ব্রহ্মদেশে, সুবর্ণদ্বীপে, পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী অন্যান্য দেশ ও দ্বীপগুলিতেও—তাহার যোগাযোগ নানাসূত্রে বিস্তার

লাভ করিয়াছিল। কাজেই, প্রান্তীয় দেশ বলিয়া প্রাচীন বাঙলাদেশ শুধু তাহার পুকুরপাড়ে, বটের ছায়ে, ঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিজের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ লইয়া একান্ত আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করিত, এমন মনে করিবার কোনো কারণ নাই।

রাষ্ট্রীয় সত্তার স্বাতন্ত্র্য

খ্রীষ্টোত্তর তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙালার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে ওঠাপড়া ভাঙ্গাগড়ার শেষ নাই। কিন্তু ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়া বাঙলাদেশ একটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ ছিল—সে তাহার রাষ্ট্রীয় সত্তার স্বীকৃতি। গুপ্ত-পর্বে যখন এই দেশ উত্তরভারতীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত তখনও এই আদর্শ একেবারে বিস্মৃত নয়। কিন্তু শশাঙ্কের সময় হইতেই এ-সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়িয়া যায়। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প-গ্রন্থে যখন গৌড়তন্ত্রের কথা পড়িতেছি তখন তাহার মধ্যেও এই সচেতনতার আদর্শই সুপরিস্ফুট। পরবর্তীকালে তো স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তার আদর্শ ক্রমশ আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষত পাল-আমলে। এই স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তার চেতনাই বাঙলার রাষ্ট্রীয় চেতনা। নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব, নানা রাষ্ট্রীয় কলকোলাহল এই চেতনাকে বারবার বিপর্যস্ত করিয়াছে, কিন্তু বারবারই বাঙলাদেশ সেই আদর্শকে ফিরিয়া পাইতে চেষ্টাও করিয়াছে। প্রাচীন বাঙালীর এই আদর্শের, তথা রাষ্ট্রীয় সচেতনতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মাৎস্যন্যায়োৎপীড়িত বাঙালীর গোপালদেবকে রাজপদে নির্বাচন। এই ধরনের সচেতনতা এবং রাষ্ট্রীয় শুভবুদ্ধির দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরল।

অথচ এই আদর্শ খণ্ডিতও হইয়াছে বারবার নানা আঞ্চলিক চেতনাসঞ্জাত অনৈক্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে, এবং তাহার ফলে বারবার জাতীয় জীবন বিপন্নও হইয়াছে। এই অনৈক্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বের মূলে যে শক্তি ছিল সক্রিয়, তাহা সামন্ততন্ত্রের। বস্তুত আঞ্চলিক সামন্তরাই বাঙালীর অপরিমেয় রাষ্ট্রীয় সম্ভাবনাকে বারবার ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন, এবং বাঙালীকে নেতৃত্ব ও সংঘশক্তিতে স্থায়িভাবে কখনও সবল ও সমৃদ্ধ হইতে দেন নাই, দীর্ঘস্থায়ী অখণ্ড রাজ্য এবং রাষ্ট্রও গড়িতে দেন নাই।

যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙালীর স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তার চেতনা যত প্রবলই হউক না কেন, সে-চেতনা তাঁহার সর্বভারতীয় চেতনাকে নিরস্ত করিয়া রাখে নাই; অন্তত শশাঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মপাল-দেবপাল পর্যন্ত ভারতবুদ্ধি অক্ষুণ্ণ। প্রান্তীয় স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও রাজনৈতিক দৃষ্টিটি ভারতব্যাপী। কিন্তু, পাল-পর্বের দ্বিতীয় পর্যায় হইতেই যেন রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে, নিজের প্রান্তীয় স্বতন্ত্র সত্তা এবং প্রান্তীয় লাভক্ষতিটাই যেন বড় হইয়া দেখা দিতেছে। বৈদেশিক মুসলিম অভিযাত্রীরা যখন সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও পঞ্জাব অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে, উত্তর-ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন হিন্দুরাজশক্তি যখন মুসলিম অভিযাত্রীদের ঠেকাইয়া রাখিবার প্রাণান্তকর সংগ্রামে

রত তখন মহীপালের আচরণ, অথবা পরে গাহড়বাল রাজশক্তিকে দুর্বল করিবার মধ্যে লক্ষ্মণসেনের যে-আচরণ তাহাতে তো মনে হয় ভারতবুদ্ধি অপেক্ষা প্রান্তীয় সচেতনতাটাই ছিল প্রবলতব, অন্তত এই পর্বে।

ধর্ম ও রাষ্ট্র

প্রাক্-আর্য নানা কৌম ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা মত, পথ ও অনুষ্ঠান, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম প্রভৃতির নানা আদর্শ ও আচাব উচ্চকোটি ও লোকায়ত স্তরের বাঙালী জীবনে প্রচলিত ছিল। ধর্মমত ও পথ লইয়া বাদ-বিসংবাদ কলহ-কোলাহল ছিল না এমন বলা যায় না; ধর্মমত বা বিশ্বাস বা বিশেষ কোনো সম্প্রদায়গত আচারানুষ্ঠানের জন্য কেহ কখনো হয়তো রাজার বা রাষ্ট্রের রোষাবর্ষণও করিয়া থাকিবেন, যদিও প্রাচীনতর কালে তেমন প্রমাণ কিছু জানা নাই। রাজা এবং রাজবংশের লোকেরা যে যাঁহার ইচ্ছা ও বিশ্বাসানুযায়ী এক এক ধর্মের অনুসবণ করিতেন, পোষকতাও করিতেন; হয়তো কখনো কখনো অন্যধর্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া অনিষ্ট সাধনের চেষ্টাও করিয়া থাকিবেন। সব সময়ই যে পরধর্মবিদ্বেষ হেতুই তাহা হইত, এমনও বলা যায় না; কখনো কখনো তাহার পশ্চাতে অনুক্ত রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কারণও সক্রিয় থাকিত, সন্দেহ নাই। তৎসত্ত্বেও সাধারণভাবে এ-কথা বলা চলে যে, রাজা বা রাজবংশের ব্যক্তিগত ধর্ম যাহাই হউক না কেন, তাহাতে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের নীতি, আদর্শ ও সংস্কার কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই; জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও রাজার বা রাজবংশের ধর্ম দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় নাই। অন্তত পাল-পর্ব পর্যন্ত এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ। সেন-বর্মণ পর্বে খুব সম্ভব এই আদর্শের ব্যত্যয় কিছু ঘটিয়াছিল; এই পর্বের একাধিক রাষ্ট্রনায়ক পরধর্ম সম্বন্ধে যে-ভাষা ব্যবহার ও যে মনোবৃত্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এই সন্দেহ জাগা কিছু বিচিত্র নয়, এবং হয়তো তাহার ফলে রাষ্ট্রে ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে ধর্মগত সংকীর্ণতার কিছুটা স্পর্শ লাগিয়া থাকিবে। তাহার প্রমাণ যে একেবারে নাই, এমন নয়।

পতন ও অবসানের হেতু

বাংলাদেশে, তথা সমগ্র উত্তর-ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র ও রাজত্বের পতন ও অবসানের প্রধান কারণ ব্যক্তিগত সাহস বা শৌর্যবীর্যের অভাব নয়; সে-কারণ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব এবং সংঘ-শক্তির অভাব, এবং তাহার হেতু একাধিক। কৌমচেতনা, আঞ্চলিক চেতনা, সামন্ততন্ত্র, বর্ণবিন্যাসের অসংখ্য স্তরভেদ, সংকীর্ণ স্থানীয় রাষ্ট্রবুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই তাহার মূলে; এ-সব কথা বিস্তৃত ব্যাখ্যার কোনো অপেক্ষা রাখে না। দ্বিতীয়ত, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া প্রাচীন বঙ্গদেশে, তথা ভারতবর্ষে চিরাচরিত চতুরঙ্গবল-রণপদ্ধতির কোনো

পরিবর্তন ঘটে নাই। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজান্দারের অভিযান ও রণপদ্ধতি হইতে যে উন্নততর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল, ভারতবর্ষ তাহা করে নাই। প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া সৈন্যচালনা এবং চতুরঙ্গবলসজ্জা ও ব্যবহারের পদ্ধতি মোটামুটি একই থাকিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে দুর্ধর্ষ মুস্‌লিম অভিযাত্রীরা যখন বিদ্যুদ্‌গামী অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া বর্শা ও তরবারী হাতে শ্লথগতি হস্ত্যাশ্বরথপদাতিক বাহিনীর ব্যূহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত তখন সৈন্যাধ্যক্ষ বা সেনাবাহিনীর ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত শৌর্যবীর্য বিশেষ কোনো কাজে লাগিত না, বিপর্যয় ঘটিত অতি সহজেই। তৃতীয়ত, বহুদিন একটি সুপ্রাচীন সমৃদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির এবং সুপ্রতিষ্ঠিত, সুবিন্যস্ত সমাজ ও রাষ্ট্রবিন্যাসের মধ্যে জীবনযাপনের ফলে ভারতবাসীর দেহমনে এক ধরনের সনাতনী নিশ্চিন্ততা ও ভাগ্যনির্ভরতার ধূসর আকাশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। অন্যদিকে, যে-সব মুসলিম অভিযাত্রীর দল তরঙ্গের পর তরঙ্গে ভারতবর্ষের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল তাহারা বয়সে নবীন; মরু ও পাহাড়ের প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষ্টনে তাহাদের দেহমন দৃঢ় ও কঠোর; খাদ্য ও ধনলুণ্ঠন তাহাদের অন্যতম জীবনোপায়; নূতন জীবনভূমি আবিষ্কারে তাহারা বদ্ধপরিকর; পরধর্মের প্রতি তাহাদের অপরিমেয় বিদ্বেষ, এবং সর্বোপরি তাহারা সংগ্রামোন্মত্ত। দশম হইতে দ্বাদশ শতকে উত্তর-ভারতে যে নিরবসর সংগ্রাম তাহা দুই ভিন্নমুখী, বিপরীত চরিত্রের জীবনপ্রবাহের সংগ্রাম। ভারতবর্ষের জীবনপ্রবাহ অন্যতর প্রবাহকে ঠেকাইতে পারিত যদি তাহার নেতৃত্ব থাকিত, সংঘশক্তি থাকিত, রণপদ্ধতি উন্নততর হইত, রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি দূরপ্রসারী হইত, জাতীয় চরিত্র আত্মশক্তিনির্ভর হইত, সমাজবিন্যাসে ভেদবুদ্ধি না থাকিত, এবং দেহগত বিলাসব্যসনে সমাজ নিরক্ত, নির্বীর্য না হইত। এ-সব কথার সবিস্তার আলোচনা রাজবৃত্ত ও অন্যান্য প্রসঙ্গে করিয়াছি; এখানে আর পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই। দ্বাদশ শতকের বাঙলাদেশে কোনো প্রকার প্রতিরোধের মনোবৃত্তি যে ছিল না তাহা সুস্পষ্ট। বিজয়ী যবনবীরের প্রশস্তি গাহিয়া উমাপতিধর যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই তাহার একমাত্র প্রমাণ নয়। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ এখন যে-রূপে পাইতেছি তাহা খুব প্রাচীন না হইলেও তাহাতে তুর্কী-বিজয়ের অব্যবহিত পরে বাঙ্গালী হিন্দুর মনোভাবের একটু পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম হৈলা যবনরূপী শিরে পরে কাল টুপী
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান
ব্রহ্ম হৈলা মহম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেগম্বর
মহেশ হইল বাবা আদম
দেখিয়া চণ্ডিকা দেবী তেঁহ হইল হায়া বিবি।

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, জাতির মানসক্ষেত্র নানাভাবে আগে হইতেই এই বিপর্যয়ের জন্য

প্রস্তুত হইতেছিল। মুসলিম অভিযাত্রীরাই তো কল্কি-অবতার, এবং অশ্বারূঢ় এই অবতারের আগমনের জন্য দূরদৃষ্টিহীন সংকীর্ণবুদ্ধি ভাগ্যনির্ভর ধর্মোপদেষ্টারা আগে হইতেই দেশের লোকের চিত্তভূমি তৈরি করিতেছিলেন। মুসলমানেরা যখন আসিয়া পড়িলেন তখন বিহ্বল বিক্ষিপ্ত জনচিত্তকে বুঝাইতে কষ্ট হইল না যে, ইহাই বিধাতার আমোঘ বিধান, কল্কি-অবতার তো আসিবেনই! দেশের ভিতরে এই অবস্থা; আর, বাহির হইতে অভিযানের পর অভিযানে যাঁহারা আসিতেছিলেন তাঁহাদের কাছেও যে এই অবস্থা একেবারে অজ্ঞাত ছিল, এমন মনে হয় না। সোমনাথ-মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচ্য-ভারতের বিহার ধ্বংস ও লুণ্ঠন যে শুধু রক্তের নেশায় এবং ধনরত্নের লোভেই, হয়তো তাহা নয়; অন্য উদ্দেশ্যও হয়তো ছিল, এবং সে-উদ্দেশ্য জাতির নিগূঢ় চেতনার গভীর স্থানটিতে আঘাত হানিয়া তাহাকে নিরাশ, বিহ্বল ও বিপর্যস্ত করিয়া দেওয়া। সজ্ঞান সচেতন উদ্দেশ্য যে তাহাই ছিল এমন কোনো প্রমাণ নাই; কিন্তু ফলত যে তাহাই হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সমাজদৃষ্টির সংকীর্ণতা

শেষ পর্যায়ে সামাজিক দৃষ্টি যে সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছিল তাহার প্রমাণ তো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; নানাপ্রসঙ্গে তাহা উল্লেখও করিয়াছি। পাল-পর্বের মাঝামাঝি পর্যন্তও দেখিতেছি, বাঙলাদেশ আন্তর্দেশিক বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করিয়া এবং কিছুটা ব্যবসা-বাণিজ্যকে আশ্রয় করিয়া দেশবিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিল তাহার ফলে রাষ্ট্রের দৃষ্টি কখনো একান্তভাবে প্রান্তীয় স্থানীয় সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে পারে নাই, গ্রামের ও নগরের সমাজও একান্তভাবে কূপমণ্ডূকতাকে এবং ঐকান্তিক ভাগ্যনির্ভরতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া, বর্ণ-বিন্যাস ও ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে সবিস্তারে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, পাল-পর্বের শেষ পর্যায়ে, বিশেষভাবে সেন-বর্মণ পর্যায়ে মধ্যভারতীয় স্মৃতিশাসন এবং দক্ষিণী-রক্ষণশীল মনোবৃত্তি ক্রমশ বাঙলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়া বাঙালীর সমাজকে স্তরে উপস্তরে ভাগ করিয়া এবং সমাজে পুরোহিত-প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজের ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। তাহার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন উত্তরোত্তর প্রান্তীয় সীমার মধ্যেই নিজের সার্থকতা লাভের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিল। নানাদিক্ হইতে ব্যাহত হইয়া জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত হইয়া ভাগ্যনির্ভরতা অর্থাৎ জ্যোতিষ এবং নানাপ্রকারের বিধিনিষেধই তাহার প্রধান আশ্রয় হইয়া দাঁড়াইল! দিগ্বিদিকে বিচ্ছুরিত হইবার, নানা কর্মে লিপ্ত হইবার সুযোগ যেখানে নাই সেখানে জীবন আত্মকেন্দ্রিক হইবে, ভাগ্যনির্ভর হইবে, রক্ষণশীল হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়! বিচিত্র সংগ্রাম, বিচিত্র প্রচেষ্টা, ব্যবসা-বাণিজ্য, দুঃসাহসিক আবিষ্কার-অভিযান, ধ্যান মনন, অপরিমেয় শক্তি, উদ্যম, বিশ্বাস প্রভৃতি

যেখানে নিরস্ত ও নিঃসুযোগ, জীবন যেখানে বিধিবদ্ধ ও গতানুগতিক সেখানে ভাগ্য এবং পরাজয়ী মনোবৃত্তি রাষ্ট্র এবং সমাজের দৃষ্টিকে গ্রাস করিবে, ইহাই তো স্বভাবের নিয়ম। এই ভাগ্যনির্ভরতা এবং জীবনের স্তিমিত গতি প্রধানতম সমর্থন পাইয়াছিল সমসাময়িক সমাজের ঐকান্তিক ভূমি ও কৃষিনির্ভরতা হইতে। দিনের পর দিন রৌদ্র-বৃষ্টিঝড়, প্রকৃতির নানা ভ্রুকুটি প্রভৃতির সঙ্গে লড়িয়া যে-কৃষক মাঠে সোনার শস্য ফলায় এবং হঠাৎ যখন একদিন দুই দণ্ডের শিলাবৃষ্টির ফলে সেই সোনার ধান ঝরিয়া যায় মাটিতে মিশিয়া, অথবা অনাবৃষ্টি ব. অতিবৃষ্টিতে যায় ধ্বংস হইয়া, এবং তখন যাহার আশ্রয় করিবার মত অন্য জীবনোপায় কিছু নাই, প্রতিকারের শক্তিও যাহার নাই সে তো ভাগ্যনির্ভর হইবেই, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইবেই। তাহা ছাড়া, কৃষিনির্ভর জীবন তো স্বাভাবিক কারণেই আঞ্চলিক ও রক্ষণশীল, এবং পরিবার-গোষ্ঠী-গ্রাম-প্রান্ত লইয়াই সে-জীবন স্বয়ংসম্পূর্ণ ; বৃহত্তর, পরিব্যাপ্ত এবং বৈচিত্র্যময় উন্মুখর জীবনের প্রয়োজনও তাহার কাছে স্বল্প। এই ধরনের জীবনের শান্ত, স্নিগ্ধ, স্তিমিত সৌন্দর্য মাধুর্য নিশ্চয়ই আছে, এবং বাহির হইতে শক্তিমান, প্রখর ও প্রবল জীবনস্রোতের আঘাত কিছু না লাগিলে এই জীবনের আয়ু অর্থাৎ স্থায়িত্ব এবং শক্তিও কিছু কম নয়, কিন্তু তেমন আঘাত যখন লাগে তখন বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী ; এবং বিপর্যয়ের ফলে রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজশক্তি দুয়েরই ভিতর ফাটলও অনিবার্য। ত্রয়োদশ শতকে বাঙালী-জীবনের বিপর্যয় এই কারণেই। কিন্তু বিপর্যয় যাহারা ঘটাইল সেই মুসলিম অভিযাত্রীরা সামরিক শক্তিতেই শুধু দুর্ধর্ষ ছিলেন ; তাহারা যখন শাসক অর্থাৎ রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়া বসিলেন তখন কিন্তু গ্রাম-কেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর জীবনে কোনো পরিবর্তন দেখা দিল না, জীবনের নূতন কোনো বিস্তারও ঘটিল না, না শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যে না দুঃসাহসী কোনো আবিষ্কার-অভিযানে, না ধ্যানে না মননে। কাজেই মধ্য-পর্বের সুদীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়িয়া বাঙালীর ভাগ্য বা দৈবনির্ভরতাও ঘুচিল না, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসও ফিরিয়া আসিল না।

৬

নানা সূত্রে নানা অধ্যায়ে বলিয়াছি, আর্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধনের প্রবাহ বাঙলা দেশে আসিয়া লাগিয়াছে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে, এবং যখন লাগিয়াছে তখনও খুব সবেগে, সবিস্তারে লাগে নাই। প্রবাহটি কখনো খুব গভীরতা বা প্রসারতা লাভ করিতে পারে নাই ; সাধারণত বর্ণসমাজের উচ্চতর স্তরে এবং অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত, মার্জিত ও সংস্কৃত সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাহা আবদ্ধ ছিল, বিশেষত আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি। একমাত্র আর্য বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতিই সদ্যোক্ত সীমার বাহিরে কিছুটা বিস্তার লাভ করিয়াছিল,

কিন্তু তাহা আরও পরবর্তী কালে—সপ্তম-অষ্টম শতকের পর হইতে। তাহা ছাড়া, আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবাহ গঙ্গার পশ্চিম তীর পর্যন্ত, অর্থাৎ মোটামুটি পশ্চিম-বঙ্গে যদি বা কিছুটা বেগবান ছিল, গঙ্গার পূর্ব ও উত্তর-তীরে সে-প্রবাহ ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গিয়াছে, বিস্তৃতি এবং গভীরতা উভয়ত।

প্রাচীন বাঙলায় আর্যপ্রবাহ ক্ষীণ

ইহার কারণ একাধিক। প্রথমত, বাঙলা দেশ প্রত্যন্ত দেশ বলিয়া আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবাহ এত দূরে আসিয়া পৌঁছিতে সময় লাগিয়াছে। দ্বিতীয়ত, বহুদিন পর্যন্ত বাঙলা দেশের প্রতি আর্যমানসের একটা উন্নাসিকতা, একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব সক্রিয় ছিল। এদেশে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পরও সে উন্নাসিকতা একদিনে, একেবারে কাটিয়া যায় নাই, তাহার কারণ, যে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে এই ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার সেই ধর্ম ও সংস্কৃতির শুচিতা রক্ষার একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা। তৃতীয়ত, বাঙলার স্থানীয় আদিম, কৌমবদ্ধ মানব-সমাজও বহুদিন পর্যন্ত আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি খুব শ্রদ্ধিতচিত্ত ছিল না, বরং সক্রিয় বিরোধিতাও করিয়াছে, যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছে সে-স্রোত ঠেকাইয়া রাখিতে। তাহার পর পরাভব যখন অনিবার্য হইয়াছে তখনও সেই মানবসমাজ একেবারে স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয় নাই ; নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধন পরিত্যাগ করিয়া আর্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধন পুরাপুরি মানিয়া লয় নাই, বরং দিনের পর দিন ধরিয়া বুঝাপড়া করিয়া একটা সমন্বয় গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। মধ্যগাঙ্গেয় ভারত যে-ভাবে আর্য, বিশেষভাবে আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পুরাপুরি মানিয়া লইয়াছে বাঙলা দেশ সে-ভাবে তাহা করে নাই। ভারতবর্ষের বুকে যে কয়টি অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির উদ্ভব ও প্রসার লাভ করিয়াছে তাহার প্রত্যেকটিই মধ্যগাঙ্গেয় ভারতের অর্থাৎ আর্যাবর্তের সীমার বাহিরে। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রভৃতি যে বর্তমানে বিহারের সীমার মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল, এবং পরবর্তী কালে তন্ত্রধর্ম, বজ্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতির উদ্ভবও যে আর্যাবর্তের সীমার বাহিরে, ইতিহাসের এই ইঙ্গিত তুচ্ছ করিবার মতন নয়। বস্তুত, বাঙলা দেশ আর্যধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও, ব্রাহ্মণ ও উচ্চতর দুই একটি সম্প্রদায়ের বাহিরে এই ধর্ম ও সংস্কৃতির বন্ধন শিথিল, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা কুণ্ঠিত। চতুর্থত, বাঙলা দেশে নানা নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে, প্রচুর রক্তমিশ্রণের ফলে এবং নানা ঐতিহাসিক কারণে জাতভেদ-বর্ণভেদের বৈষম্য আর্যাবর্ত বা দক্ষিণ-ভারতের মতো এত কঠোর হইয়া উঠিতে পারে নাই ; বস্তুত বাঙলার সমাজবন্ধনে তথাকথিত শূদ্র জাতির লোকদেরই প্রাধান্য। আজও বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যের সংখ্যা স্বল্প। বর্ণবিন্যাসে ও সামাজিক আচার-

বিচারে যাহা কিছু কঠোরতা বা আর্য ব্রাহ্মণ্য সনাতনত্বের যে আদর্শ বাঙলায় আজও সক্রিয় তাহা প্রধানত দক্ষিণী সেন-বংশীয় রাজাদের প্রভাবে ও আনুকূল্যে, এবং গৌণত মধ্য-ভারতীয় আর্য ব্রাহ্মণ্যাদর্শের প্রেরণায়।

সনাতনত্বের প্রতি বাঙালীর বিরাগ

এই সব কারণে বাঙালীর ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধনে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা মধ্যগাঙ্গেয় ভারত, অর্থাৎ আর্য-ভারত হইতে পৃথক। আর্য ভারতবর্ষ সনাতনত্বের আদর্শে স্থির ও অবিচল, সমস্ত আচারানুষ্ঠান, অধ্যাত্ম সাধনা, সমাজ ও পরিবার বন্ধন প্রভৃতি সমস্তই সেখানে শাস্ত্র দ্বারা শাসিত। আর্য ভারত রক্ষণশীল, যাহা সে পাইয়াছে তাহা সে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়। মধ্যগাঙ্গেয় ভারতের মন তাই বহুলাংশে পরিবর্তন বিমুখ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে মধ্যগাঙ্গেয় ভারতের ধর্মে রাষ্ট্রে বা সমাজে কোনো বৈপ্লবিক আলোড়ন দেখা দেয় নাই, বা দিলেও তাহা সার্থক রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই, ইতিহাসের এ-তথ্য বিস্ময়কর, কিন্তু দুর্বোধ্য নয়। ইহার প্রধান কারণ, আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সনাতনী ও রক্ষণশীল মনোভাব। বাঙলা দেশে হইয়াছে তাহার বিপরীত। মহাযানী বৌদ্ধধর্মের বজ্রযানী-মন্ত্রযানী-কালচক্রযানী ও সহজযানী রূপান্তর; সহজযানে সহজ মানবতার এবং প্রাণধর্মের আবেদন; ব্রাহ্মণ্য শক্তিধর্মের তান্ত্রিক রূপান্তর; বৈষ্ণবধর্মে বিশুদ্ধ ভক্তিরস ও হৃদয়াবেগের সঞ্চার; শিব ও উমার ভাবকল্পনায় পারিবারিক জামাতা-কন্যার রূপ ও আবেগ সঞ্চার, দুর্গা, তারা, ষষ্ঠী, মারীচী, পর্ণশবরী প্রভৃতি মাতৃকাতন্ত্রের দেবীদের প্রতি শ্রদ্ধা, আবেগ ও অনুরাগ; শিব ও বিষ্ণুর মতন দেবতাকেও ঘনিষ্ঠ মানব সম্বন্ধে বাঁধিয়া তাঁহাদের প্রতি পারিবারিক আত্মীয়তার এবং মানবী লীলার আবেগ সঞ্চার, তান্ত্রিক কায়াসাধনের প্রতি অনুরাগ এবং সেই সাধনের রীতিপদ্ধতি; শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞানচর্চায় বুদ্ধি ও যুক্তি অপেক্ষা প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের প্রাধান্য; বাঙলার ব্যবহার-শাস্ত্রে দায়াধিকারের আদর্শ ও ব্যবস্থা; বাঙলার পরিবার ও সমাজবন্ধন প্রভৃতি সমস্তই আর্যমানসের দিক হইতে বৈপ্লবিক ও সনাতনত্বের বিরোধী। দুঃসাহসী সমন্বয়, স্বাঙ্গীকরণ ও সমীকরণ যেন বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য; সনাতনত্বের প্রতি একটা বিরাগ যেন বাঙলার ঐতিহ্য ধারায়। ইহার মূল প্রধানত বাঙালীর জনগত ইতিহাসে, কিছুটা তাহার ভৌগোলিক পরিবেশে, তাহার নদনদীর ভাঙ্গাগড়ায়, কিছুটা ইতিহাসের আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যে। বাঙালীর বৃত্তি যথার্থত বৈতসী; যে-আদর্শ, যে-ভাবস্রোতের আলোড়ন, ঘটনার যে-তরঙ্গ যখন আসিয়া লাগিয়াছে, বাঙলা দেশ তখন বেতস-লতার মত নুইয়া পড়িয়া অনিবার্য বোধে তাহাকে মানিয়া লইয়াছে, এবং ক্রমে নিজের মত করিয়া তাহাকে গড়িয়া লইয়া, নিজের ভাব ও রূপদেহের মধ্যে তাহাকে সমন্বিত ও সমীকৃত করিয়া লইয়া আবার বেতস লতার

মতই সোজা হইয়া স্ব-রূপে দাঁড়াইয়াছে। যে দুর্মর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি বেতস গাছের, সেই দুর্মর প্রাণশক্তিই বাঙালীকে বারবার বাঁচাইয়াছে।

বাঙালীর দেবায়তনে দেবীদের প্রাধান্য

সাম্প্রতিক বাঙলার বিচিত্র ধর্মকর্মানুষ্ঠানের গভীরে একটু দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, এদেশে দেবতাদের চেয়ে দেবীদের সমাদর ও প্রতিষ্ঠা বেশি; মধ্যযুগেও তাহাই ছিল। প্রাচীন বাঙলা সম্বন্ধে এ-কথা হয়তো সমান প্রযোজ্য নয়; কারণ, প্রতিমা-সাক্ষ্যে দেখা যায়, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় দেবায়তনে দেবমূর্তির সংখ্যাই বেশি। তবু মধ্যপর্ব ও সাম্প্রতিক পর্বে দেবীদের যে প্রাধান্য তাহার সূচনা যেন আদিপর্বেই দেখা দিয়াছিল। আদিম কৌম সমাজের মাতৃকাতন্ত্রের দেবীদের প্রাধান্য কৌম সমাজে তো ছিলই; বিচিত্র নামে তাঁহারা নানাস্থানে পূজাও লাভ করিতেন। পরে যখন আর্য-ব্রাহ্মণ্য পুরুষ-প্রকৃতি ধ্যান সুপ্রতিষ্ঠিত হইল তখন সেই মাতৃকাতন্ত্রের দেবীরা প্রকৃতি বা শক্তিরূপিণী বিভিন্ন দেবীর সঙ্গে, বিশেষভাবে দুর্গা ও তারার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেলেন। যাহাই হউক, আদিপর্বের শেষ পর্যায়ে দেখিতেছি দুর্গা, তারা, ষষ্ঠী, হারীতী, মনসা, মারীচী, চুণ্ডা, পর্ণশবরী প্রভৃতি, বিশেষভাবে দুর্গা ও তারা ক্রমশ সমাদৃতা ও সুপ্রতিষ্ঠিতা হইতেছেন, এবং তারার ধ্যানে তাঁহাকে একই সঙ্গে বেদমাতা অর্থাৎ সরস্বতী, গিরিজা অর্থাৎ উমা বা দুর্গা, পদ্মাবতী এবং বিশ্বমাতা বলিয়া আহ্বান করা হইয়াছে। এই ক্রমবর্ধমান মাতৃকাতন্ত্রের প্রাধান্য আদিম মাতৃতান্ত্রিক কৌম সমাজাদর্শের এবং কৌম মানসের পুনর্ঘোষণা, সন্দেহ কি!

নারী বা মাতৃকাতন্ত্র

প্রাচীন বাঙলার প্রতিমা-সাক্ষ্যে দেখা যায়, উমা-মহেশ্বরের যুগল মূর্তিরূপ এবং শিবের বৈবাহিক বা কল্যাণসুন্দর রূপ সমসাময়িক বাঙালীর চিত্তহরণ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া দুর্গা বা দেবীও নানা রূপ ও নানা নামে পূজা লাভ করিতেছিলেন। শিব-গৌরীর বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া মধ্যযুগীয় বাঙলা-সাহিত্যে যে-ধরনের পারিবারিক ও সংসারগত ভাবকল্পনা বিস্তৃত তাহার আভাসও প্রাচীন কালেই পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে একদিকে যেমন সমসাময়িক বাঙালীর হৃদয়াবেগ ও চিত্তের স্পর্শালুতা প্রত্যক্ষগোচর তেমনই অন্যদিকে বাঙালী চিত্তে নারীর প্রাধান্য ও নারীভাবনার প্রসারও সমান প্রত্যক্ষ। আর, বজ্রযান-সহজযান প্রভৃতি ধর্মের কায়সাধন তো নারী বা শক্তি ছাড়া সম্ভবই নয়। তাহা ছাড়া, রাধাকৃষ্ণের রূপ ও ধ্যান-কল্পনার মধ্যেও এই নারীভাবনা অনিবার্যভাবে সক্রিয়। অর্থাৎ, কোনো দেবতাই যে দেবী ছাড়া সম্পূর্ণ নহেন, নর যে নারী ছাড়া সম্পূর্ণ নহে কেবল তাহাই নয়; সে-ভাবনা তো পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য দেবায়তন-কল্পনার

মধ্যেই ছিল, কিন্তু নারীকে শক্তিস্বরূপিনী বলিয়া দেখা ও ভাবা, সৃষ্টিরহস্যের মূল বলিয়া কল্পনা করা—ইহার মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ, সংসারগত ইন্দ্রিয়ালুতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত অনস্বীকার্য, এবং এই ইঙ্গিত প্রাচীন-ভারতের, বিশেষভাবে বাঙলায় সৃষ্টি এবং আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের দান। কৃষ্ণ-রাধা কল্পনার রাধাই হইতেছেন শিবের শক্তি, বজ্রযানীর নিরাত্মা, সহজ-যানীর শূন্যতা, কালচক্রযানীর প্রজ্ঞা। এই কৃষ্ণ রাধার কল্পনা তো একান্তই প্রাচীন বাঙলার শেষ পর্যায়ের রচনা। বস্তুত, বাঙালী চিত্তের গভীরে যেন সেই অনার্য আদিম তমসাচ্ছন্ন তন্ত্রসাধনার নিগূঢ় কামনা; তাহার তাড়নাতেই যেন সমস্ত ধর্মমতের গড়ন। সাংখ্যধ্যান-কথিত পুরুষ-প্রকৃতি কল্পনার এই যে তান্ত্রিক রূপান্তর, সনাতন আর্য মানসে ইহার আবেদন স্বল্প, অথচ বাঙলাদেশে এই ভাবনা অত্যন্ত সত্য ও ব্যাপক। গোপন দেহযোগ বা কায়াসাধন, নারীসাধন, শবসাধন, শূন্যধ্যান, দেহতত্ত্বের অভিনব ব্যাখ্যা, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্মেরই শাক্ত তান্ত্রিক রূপে ভীষণ ও ভয়াল সাধন-পদ্ধতি প্রভৃতিতে সর্বত্রই অধ্যাত্ম জীবনের একটি বিশেষ ভঙ্গি বর্তমান যাহা আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অনুপস্থিত।

বাঙালীর হৃদয়াবেগ। প্রাণধর্ম ও ইন্দ্রিয়ালুতা

প্রাচীন বাঙলীর হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতার ইঙ্গিত তাহার প্রতিমা-শিল্পে এবং দেবদেবীর রূপ-কল্পনায় ধরা পড়িয়াছে এ-কথা অন্যত্র বলিয়াছি, একটু আগেও ইঙ্গিত করিয়াছি। মধ্যযুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে, সহজিয়া সাধনায়, বাউলদের সাধনায় যে বিশুদ্ধ ভক্তিরস ও হৃদয়াবেগের প্রসার, তাহার সূচনা দেখা গিয়াছিল আদি পর্বেই, এবং তাহা শুধু বৌদ্ধ বজ্রযানী, সহজযানীদের মধ্যেই নয়, তান্ত্রিক শক্তি সাধনার মধ্যেই নয়, বৈষ্ণব সাধনায়ও বটে। এই হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতা যে বহুলাংশে আদিম নরগোষ্ঠীর দান তাহা আজিকার সাঁওতাল, শবর, প্রভৃতিদের জীবনযাত্রা, পূজানুষ্ঠান, সামাজিক আচার, স্বপ্ন কল্পনা, ভয়-ভাবনার দিকে তাকাইলে আর সন্দেহ থাকে না। আর্য ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ ও জৈন সাধনাদর্শে কিন্তু এই ঐকান্তিক হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতার এতটা স্থান নাই। সেখানে ইন্দ্রিয়-ভাবনা বস্তুসম্পর্কবিচ্যুত, ভক্তি জ্ঞানানুগ, হৃদয়াবেগ বুদ্ধির অধীন। বস্তুত, বাঙলার অধ্যাত্ম সাধনার তীব্র আবেগ ও প্রাণবন্ত গতি সনাতন আর্য ধর্মে অনুপস্থিত।

এই হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতা প্রাচীন বাঙালী জীবনের অন্য দিকেও ধরা পড়িয়াছে। মধ্যযুগে দেখিতেছি, দেবই হউন আর দেবীই হউন, বাঙালী যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছে তাঁহাদের মর্ত্যের ধূলায় নামাইয়া পরিবার-বন্ধনের মধ্যে বাঁধিতে এবং ইহগত সংসার কল্পনার মধ্যে জড়াইতে, হৃদয়াবেগের মধ্যে তাঁহাদের পাইতে ও ভোগ করিতে, দূরে রাখিয়া শুধু পূজা নিবেদন করিতে নয়। এই কামনার সূচনা আদি পর্বেই

দেখা যাইতেছে। ষষ্ঠী, মনসা, হারীতী, কৃষ্ণ-যশোদা প্রভৃতির রূপ কল্পনায়ই যে এই ভাবনা অভিব্যক্ত তাহাই নয়; কার্তিকের শিশুলীলা বর্ণনা, পিতা শিবের বেশভূষা অনুকরণ করিয়া শিশু-কার্তিকের কৌতুক, দরিদ্র শিবের গৃহস্থালীর বর্ণনা, নেশাগ্রস্ত শিবের সংসারে উমার দুঃখ এবং জামাতা ও কন্যারূপে শিব ও গৌরীকে সমস্ত হৃদয়াবেগ দিয়া আপন করিয়া বাঁধা, সপরিবারে বিষ্ণু ও শিবকে প্রত্যক্ষ করা প্রভৃতির মধ্যেও একই ভাবনা সক্রিয়।

বাঙালীর দায়াধিকার ও স্ত্রীধন

বাঙলার ব্যবহার-শাস্ত্রে দায়াধিকারের যে আদর্শ ও ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে স্ত্রী-ধনের যে স্বীকৃতি ও বিধিব্যবস্থা জীমূতবাহনের দায়ভাগ-গ্রন্থে বর্ণিত এবং পরে রঘুনন্দন কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সমর্থিত তাহার পশ্চাতেও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের এবং সেই পরিবার-বন্ধনের স্মৃতি বহমান। আর্য সমাজ ও পরিবার-ব্যবস্থায় দায়ভাগ ব্যবস্থার প্রচলন নাই; সেখানে মিতাক্ষরার রাজত্ব।

৭

মানবতার প্রতি প্রাচীন বাঙালীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ

যে হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতার কথা এই মাত্র বলিলাম তাহারই রূপান্তরে পাইতেছি মানবতার প্রতি প্রাচীন বাঙালীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। এই যে দেবদেবীদেরও মাটির ধূলায় নামাইয়া পরিবার-বন্ধনের মধ্যে বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে ইহগত মানবিক আবেগে দেখা ও পাওয়া, ইহার মধ্যে তো উষ্ণ মানবপ্রীতির আভাসই সুস্পষ্ট। সদুক্তিকর্ণামৃত, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, প্রাকৃতপৈঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে বাঙালীকবিকুল রচিত হরিভক্তি, গঙ্গাস্তব, শিবস্তোত্র প্রভৃতি বিষয়ক যে-সব শ্লোক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং যাহাদের দুই একটি এই গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছি তাহাদের বিশুদ্ধ ভক্তিরস ও হৃদয়াবেগ একান্তই মানবিক রসে অভিসিঞ্চিত। এই গ্রন্থগুলির বাঙালী কবি রচিত অসংখ্য প্রকীর্ণ শ্লোকে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের ও আনন্দবেদনার যে সূক্ষ্ম স্পর্শালু বোধ সুস্পষ্ট গোচর, চর্যাগীতির গুহ্য সংকেতময় অধ্যাত্ম পদগুলিতেও সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের নানা মানবী লীলার যে-পরিচয় তাহার মধ্যেও তো একই মানবিক আবেদন সমান প্রত্যক্ষ। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৃৎফলক-গুলি সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে, এবং কোনো কোনো প্রতিমাফলক সম্বন্ধেও। বাঙলার প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্রশাসিত প্রতিমাশিল্পেও মানসিক ইন্দ্রিয়ালুতা এবং হৃদয়াবেগ যতটা ধরা পড়িয়াছে, এমন যেন আর কোথাও নয়। ধর্মগত এবং শাস্ত্রশাসিত ব্যাপারেও একান্ত মানবিক রসের সঞ্চার, মানবিক আবেগ ও আবেদনের অভিসিঞ্চন প্রাচীন বাঙলার

সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ভারতের অন্যান্য প্রান্তের সুবিস্তৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের অনেক স্থানে এই ধরনের মানবিক আবেদন প্রত্যক্ষ, বিশেষ ভাবে মহাভারতের নানা কাহিনীতে, ভাস ও কালিদাসের রচনায়। কিন্তু প্রাচীন বাঙলার ধর্মকর্মে, শিল্পে ও সাহিত্যে এই মানবিক আবেদন যতটা বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট, সেখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট সুখদুঃখের প্রতিও গভীর অনুরাগ যে-ভাবে ধরা পড়িয়াছে, এমন আর কোথাও যেন নয়। বস্তুত, বাঙলার সাধনায় দেবতারা ধরা দিয়াছেন মানুষের বেশে, মানুষের মত হইয়া; মানুষের মাপেই যেন দেবতার পরিমাপ। তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থেই নানা স্থানে নানা সূত্রে সংগ্রহ করা হইয়াছে। মানবিকতার প্রতি বাঙালী চিত্তের এই আকর্ষণের আভাস প্রাচীন কালেই নানাদিকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

মানবতার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ উপনিষদ্ধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট। বৈষ্ণব ভাগবদ্ধর্মেও এই শ্রদ্ধা ও অনুরাগের ধারা বহমান। মহাভারতেও তাহাই; সেখানে তো স্পষ্টই বলা হইয়াছে, মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীব আর কেহ নাই। কিন্তু সাধারণ ভাবে ও সামগ্রিক দৃষ্টিতে আর্য ভরতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সাধনায় সর্বশ্রেষ্ঠ জীব এই মানুষের স্থান প্রধানত গৌণ। দেবতা ও শাস্ত্র সেখানে মানুষের প্রায় সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া বিস্তৃত। যাহাই হউক, বাঙলাদেশে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এবং বাঙালীর ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনায় মহাভারতের বাণী যেন আবার নূতন করিয়া শোনা গেল, এবং সাধক কবি চণ্ডিদাসের কণ্ঠে তাহা মূর্তিলাভ করিল: 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। কিন্তু চণ্ডিদাস বলিলেন সেই কথাই যাহা ছিল প্রাচীন বাঙালীর চিত্তের গভীরে, তাহার সাধনায়, বিশেষভাবে সহজযানী সিদ্ধাচার্যদের আদর্শ ও ভাবকল্পনায়। এই সিদ্ধাচার্যরা বর্ণ, শ্রেণী, ধর্ম ও আচারানুষ্ঠানের ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে মানুষের যে মানব-মহিমা তাহার সুস্পষ্ট ঘোষণা জানাইয়াছেন। বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, আগম কোনো কিছুরই অভ্রান্ততায় ইঁহারা বিশ্বাস করিতেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মহাযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান, জৈনধর্ম, নাথধর্ম কোনো কিছুতেই ইঁহাদের শ্রদ্ধা ছিল না, যোগী-সন্ন্যাসীদের প্রতি ছিল ইঁহাদের নিদারুণ অবজ্ঞা। বৈরাগ্য ইঁহারা সাধন করিতেন না, বলিতেন বিরাগাপেক্ষা পাপ আর কিছু নাই, সুখ অপেক্ষা পুণ্য নাই। শরীরের মধ্যেই অশরীরীর গুপ্তলীলা, এই মানবদেহেই মোক্ষের বাস, মানুষই সকল সাধনার পরমাদর্শ, পরমাশ্রয়। ভবিষ্য-পুরাণের ব্রাহ্মখণ্ডেও জাতভেদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ যুক্তি দিয়া জাত-বর্ণের ঊর্ধ্বে মানুষের আপন মহিমারই জয়গান করা হইয়াছে। বজ্রসূচিকোপনিষদেও একই ঘোষণা। দোহাকোষের টীকায় তো সুস্পষ্টই বলা হইয়াছে, সকল লোকই একজাতি, ইহাই সহজ ভাব। এই জাতি যে মানবজাতি তাহাতে আর সন্দেহ কি!

৮

বাঙালী চিত্তের নীরস বৈরাগ্য-বিমুখতা

এই উদার মানবতারই অন্যতম দিক হইতেছে প্রাচীন বাঙালীর ঐহিক বস্তুনিষ্ঠা, মানব-দেহের প্রতি এবং দেহাশ্রয়ী কায়াসাধনার প্রতি অপরিমেয় অনুরাগ, সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন মুহূর্তের ও পরিবার বন্ধনের প্রতি সুনিবিড় আকর্ষণ, রূপ ও রসের প্রতি তাহার গভীর আসক্তি। সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন মুহূর্তের প্রতি বাঙালীর অনুরাগ ময়নামতী-পাহাড়পুরের মৃৎশিল্পে, সদুক্তিকর্ণামৃত, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় এবং প্রাকৃতপৈঙ্গল-গ্রন্থের নানা বিচ্ছিন্ন শ্লোকে, চর্যাগীতির পদগুলিতে, এবং তাহার লোকায়ত ধর্মকর্মের আচারানুষ্ঠানে বারবার অভিব্যক্ত। এই সুখদুঃখময় জীবনের প্রতি একটা গভীর আসক্তি প্রাচীন বাঙালীর প্রতিমাশিল্পের ও সাহিত্যের ইন্দ্রিয়স্পর্শালুতা এবং হৃদয়াবেগের মধ্যেও ধরা না পড়িয়া পারে নাই। এই আসক্তি ও আবেগ হইতেই আসিয়াছে ঐহিক বস্তুনিষ্ঠা এবং নীরস বৈরাগ্যের প্রতি বিরাগ ও অশ্রদ্ধা। প্রাচীন সাহিত্যের নানা স্থান হইতে এই ইহনিষ্ঠার অনেকগুলি শ্লোকসাক্ষ্য নানাসূত্রে উল্লেখ করিয়াছি। যে বৈরাগ্য দুঃখের আকর বলিয়া মানব সংসারের প্রতি মানুষের চিত্তকে বিমুখ করিয়া দেয়, মানব-জীবনের বিচিত্রলীলাকে মায়া বলিয়া তুচ্ছ করিতে শেখায়, পঞ্চভূতনির্মিত ও পঞ্চেন্দ্রিয়-সমৃদ্ধ এই দেহকে ক্লেদকৃমিকীটের আবাস বলিয়া ঘৃণা করিতে এবং দেহকে নানা উপায়ে ক্লিষ্ট ও নির্যাতন করিতে শেখায় সেই নীরস বৈরাগ্যের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ বাঙালীর নাই, আজও নাই, মধ্যযুগেও ছিল না, এবং যতদূর ধরিতে বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীনকালেও ছিল না। যাহার সৃষ্টির ধারা হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতার দিকে, নীরস বৈরাগ্যের প্রতি তাহার সেই শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ থাকিতে পারে না। বস্তুত, প্রাচীন বাঙালীর ধর্মসাধনায় এই ধরনের নীরস বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের স্থান যেন কোথাও নাই। বিশুদ্ধ স্থবিরবাদী বৌদ্ধধর্ম বাঙলাদেশে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। দিগম্বর জৈন-ধর্মের কিছু প্রসার এদেশে ছিল বটে, কিন্তু খুবই সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে এবং তাঁহারা কখনও সাধারণ ভাবে বাঙালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। সহজযানী সিদ্ধাচার্যরা তো তাঁহাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপই করিয়াছেন! ব্রাহ্মণ্যধর্মী একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীরাও ছিলেন; তাঁহারাও যে খুব সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। মহাযানী শ্রমণ ও আচার্যদের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহারা তো নীরস বৈরাগী ছিলেন না, মানব-জীবন ও মানব সংস্কারকে অস্বীকারও করিতেন না। নিজেরা সংসার-জীবন-যাপন তাঁহারা করিতেন না এ-কথা সত্য, কিন্তু সমস্ত প্রাণী জগতের প্রতি তাঁহাদের করুণা এবং মৈত্রীভাবনা তাঁহাদের জীবন ও ধর্মসাধনাকে একটি অপূর্ব স্নিগ্ধ রসে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। আর, বজ্রযানী, মন্ত্রযানী, কালচক্রযানী এবং সহজযানীদের ধর্ম-

সাধনার ভিত্তিই তো ছিল দেহযোগ বা কায়াসাধনা, এবং তাহার পথ ও উদ্দেশ্যই হইতেছে এই দেহ এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়কুলকে আশ্রয় করিয়া দেহ-ভাবনার ঊর্ধ্বে উন্নীত হওয়া। নাথধর্ম, কাপালিকধর্ম, অবধূতমার্গ, বাউলমার্গ প্রভৃতি সমস্তই মোটামুটি একই ভাবকল্পনা ও সাধনপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই ইঁহাদের সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য নীরস, ইহবিমুখ আত্মনিপীড়নের বৈরাগ্য নয়; দেহবন্ধনের মধ্যেই ইঁহাদের মোক্ষ বা বৈরাগ্যসাধনা, ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে অতীন্দ্রিয়ের উপলব্ধি, আসক্তির মধ্যেই নিরাসক্তির কামনা --দেহকে, ইহাসক্তিকে অস্বীকার করিয়া নয় কিংবা তাহা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াও নয়। জীবন-রসরসিকের যে পরম বৈরাগ্য সেই রূপ ও রসসমৃদ্ধ বৈরাগ্য, গৃহীমনের পরম বৈরাগ্যই প্রাচীন বাঙালীর চিত্তহরণ করিয়াছিল; সেই হেতুই বাংলাদেশে বজ্রযান-মন্ত্রযান-কালচক্রযান-সহজযান-নাথধর্ম প্রভৃতির এত প্রসার ও প্রতিপত্তি এবং সেই জন্যই বৈষ্ণব সহজিয়া সাধক-কবিদের ধর্ম, আউল-বাউলদের ধর্ম এবং দেহাশ্রিত তন্ত্রধর্মের প্রতি, দেহযোগের প্রতি, ইহযোগের প্রতি বাঙালীর এত অনুরাগ।

অরূপের ধ্যান ও বিশুষ্ক বন্ধ্যা জ্ঞান-সাধনায় বাঙালীর অরুচি। বেদান্ত চর্চায় বাঙালীর বিরাগ

বস্তুত, অরূপের ধ্যান এবং বিশুষ্ক জ্ঞানময় অধ্যাত্ম সাধনার স্থান বাঙালী চিত্তে স্বল্প ও শিথিল। বাঙালী তাঁহার ধ্যানের দেবতাকে পাইতে চাহিয়াছে রূপে ও রসে মণ্ডিত করিয়া; তাঁহার সন্ধান বিশুদ্ধ বিশুষ্ক জ্ঞানের পথে ততটা নয় যতটা রূপের ও রসের পথে, অর্থাৎ বোধ ও অনুভবের পথে। প্রাচীন বাংলার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রতিমা-শিল্পে, যে-সব ধর্মকে বাঙালী হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে সেই সব ধর্মের মধ্যে এবং যে-ভাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহার মধ্যে এই উক্তির প্রমাণ প্রত্যক্ষ। বাঙালীর ভক্তি যে জ্ঞানানুগ নয়, হৃদয়ানুগ, আবেগপ্রধান, তাহা সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে বাঙালী কবির দেবস্তুতি রচনায়, তাহা সদুক্তিকর্ণামৃতেই হউক, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় বা প্রাকৃতপৈঙ্গলেই হোক, রাজকীয় লিপি-মালায়ই হোক আর সাধনস্তোত্রেই হোক। আর, প্রাচীন বাংলার প্রতিমাশিল্পের ইন্দ্রিয়ালুতা এবং আবেগবাহুল্য তো একান্ত সুস্পষ্ট। সে-শিল্পসাধনা একান্তই রূপের ও রসের সাধনা। লোকায়ত ধর্মের আচারানুষ্ঠান সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে; সে-ক্ষেত্রে তো অরূপ ও বিশুষ্কজ্ঞান-সাধনার কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আর, মহাযান হইতে বিবর্তিত যত ধর্মমত ও পথ তাহাদের সব ক'টিরই সাধনা তো একান্তই রূপ ও রসাশ্রয়ী। এ-তথ্য লক্ষ্যণীয় যে, বিশুদ্ধ মহাযানী বিজ্ঞানবাদ বা মধ্যমক দর্শন বাংলাদেশে বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ্য সাধনার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সেই সব মত ও পথই চিত্তের নিকটতর করিয়া গ্রহণ করিয়াছে যাহার প্রধান আশ্রয় রূপ ও রস, অর্থাৎ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ভাবকল্পনার ধারা। ঠিক এই কারণেই বেদান্ত চর্চায় এবং বৈদান্তিক সাধনায় প্রাচীন বাঙালীর যেন

অরুচি। ইহার অর্থ এ-নয় যে, বেদ-বেদান্তের চর্চা ও সাধনা বাংলাদেশে একেবারে ছিল না ; ছিল বই কি, লিপিমালায় কিছু কিছু প্রমাণও আছে। কিন্তু সে চর্চা ও সাধনা বাংলাদেশে সমাদৃত হয় নাই, প্রতিষ্ঠাও লাভ করিতে পারে নাই। বেদান্ত ও ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের চর্চায় শুকশিষ্য, শঙ্করাচার্যের পরমগুরু গৌড়পাদ, ন্যায়কন্দলী রচয়িতা শ্রীধরভট্ট, উদয়ন প্রভৃতি কয়েকজন প্রখ্যাত পণ্ডিত অল্পবিস্তর সর্বভারতীয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু এ-তথ্য লক্ষণীয় যে গৌড়পাদকারিকা, সাংখ্য-কারিকা বা ন্যায়কন্দলী বাংলাদেশে সমাদর লাভ করে নাই। ন্যায়কন্দলীর মত গ্রন্থের একটি টীকাও যে বাংলাদেশে রচিত হয় নাই, এ-তথ্যের ইঙ্গিত লক্ষণীয়। তাহা ছাড়া, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে আছে, দক্ষিণ-রাঢ়বাসী জনৈক ব্রাহ্মণ কাশীতে গিয়া সেখানে বেদান্তচর্চার বাহুল্য দেখিয়া বিদ্রুপ করিয়া বলিতেছেন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা অসিদ্ধ বিরুদ্ধার্থজ্ঞাপক বেদান্ত যদি শাস্ত্র হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধরা কি অপরাধ করিল! মীমাংসার চর্চাও বাংলাদেশে হইত ; শ্রীধরভট্ট, উদয়ন, অনিরুদ্ধ, ভবদেব-ভট্ট, হলায়ুধ প্রভৃতি নাম তো ভারতপ্রসিদ্ধ। অনিরুদ্ধ ও ভবদেব দুইজনই কুমারিলভট্টের মীমাংসা সম্বন্ধীয় মতামতের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তাহার উপর গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, মীমাংসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বাংলাদেশে বেশি রচিত হয় নাই ; এবং গৌড়মীমাংসক বলিতে উদয়ন শুধু শ্রীধরভট্টকেই চিহ্নিত করিয়া থাকুন আর গৌড়ীয় মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ সকল পণ্ডিতকেই বুঝাইয়া থাকুন, উদয়ন ও গঙ্গেশ উপাধ্যায় যে বলিতেছেন, গৌড়মীমাংসক যথার্থ বেদজ্ঞানবিরহিত ছিলেন, এ-তথ্যের ইঙ্গিত একেবারে নিরর্থক নয়। বস্তুত, শুধু ধর্মসাধনায় নয়, ব্যাপকভাবে অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে বিশুষ্ক, যুক্তিধর্মী, বন্ধ্যা জ্ঞানচর্চা বাঙালীর চিত্তকে সমগ্রভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

বাঙালীর সৃজন প্রতিভার মূল উৎস। শক্তি ও দুর্বলতা

অথচ, প্রাচীন বাঙালী নিছক জ্ঞানের চর্চা করে নাই বুদ্ধির অস্ত্রে শান দেয় নাই, এ-কথাও সত্য নয়। মহাযান বৌদ্ধ ন্যায়ের চর্চায় বাংলাদেশ সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ব্যাকরণ চর্চা, অভিধান চর্চা, চিকিৎসা বিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্র চর্চা ও রচনায় সর্বভারতীয় বিদ্যার ভাণ্ডারে প্রাচীন বাংলাদেশের দান তুচ্ছ করিবার মত নয়। ন্যায়, ব্যবহার ও ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও অভিধান চর্চা তো একান্তই নিছক জ্ঞান ও যুক্তিক্ষমতার চর্চা এবং সেই ক্ষমতার বলেই প্রাচীন বাঙালীর বুদ্ধি একটা শাণিত দীপ্তিও লাভ করিয়াছিল, যে-দীপ্তি ধরা পড়িয়াছে ন্যায়ের তর্কে, ধর্ম ও ব্যবহার শাস্ত্রের যুক্তিতে, ব্যাকরণের ও অভিধানের নূতন ও মৌলিক সূত্র রচনায়। সে-দীপ্তিই দেখিতেছি মধ্য-যুগে নব্যন্যায়ের চর্চায় এবং সাধারণভাবে বাঙালীর ন্যায় ও ব্যবহারকুশলতায়। কিন্তু,

আসল কথা হইতেছে, বাঙালী তাহার এই বুদ্ধির দীপ্তিকে সৃষ্টিকার্যে নিয়োজিত করে নাই। যেখানে জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়া নবতর গভীরতর জীবন সৃষ্টির আহ্বান সেখানে, অর্থাৎ শিল্প ও সাহিত্য-সাধনায়, ধর্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনায় সে মননের উপর নির্ভর করে নাই, বুদ্ধি ও যুক্তির নৌকায় ভর করে নাই। বরং সেখানে সে আশ্রয় করিয়াছে তাহার সহজ প্রাণশক্তি, হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতাকে, এবং ইহাদেরই, প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বুদ্ধিকে তত উদ্রিক্ত করে না যতটা স্পর্শ করে হৃদয়কে, প্রাণকে। এই প্রাণধর্ম, হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতাই বাঙালীর সৃষ্টি-প্রতিভার মূল ; ইহারাই তাহার শক্তি, ইহারাই আবার তাহার দুর্বলতাও।

৯

প্রাচীন বাঙালীর সৃষ্টির ধারায় গভীর মনন, প্রশস্ত ভাবনা-কল্পনার অভাব

ভাব-কল্পনা ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাচীন বাঙালীর অনুরাগ, আগেই দেখিয়াছি, জীবনের ছোটখাট সুখদুঃখ-আনন্দবেদনার দিকে, দৈনন্দিন সংসারের বিচিত্র লীলার দিকে। সেখানে হৃদয়াবেগ প্রাণধর্ম ও ইন্দ্রিয়ালুতার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তির রূপক্ষেত্র স্বল্পায়তন। ভারতবর্ষের অন্যত্র—বাঘ, অজন্তা, এলোরায়—বিস্তৃত গুহাপ্রাচীর-গাত্রে দীর্ঘায়ত মণ্ডিত রেখায় ও গভীর রঙের মণ্ডিত প্রলেপে শিল্পীর গভীর ও প্রসারিত ভাব-কল্পনা ও বুদ্ধি রূপায়িত ; দেবদেবী, মানুষ, পশুপক্ষী, নিসর্গ-প্রকৃতি সকলে মিলিয়া সেখানে জীবনের সুগভীর সুবিস্তৃত সমৃদ্ধি। বাঙালী শিল্পী ছবি আঁকিয়াছেন স্বল্পায়তন পুঁথিপত্রের সীমার মধ্যে ; সেই ছবিতে কলাকৌশলের কোনো শৈথিল্য বা দুর্বলতা নাই, কিন্তু ভাব-কল্পনার কোনো সমৃদ্ধিও নাই, না মননের গভীরতায়, না বিস্তৃতিতে। দেবতা, মানুষ, প্রকৃতি সবই আছে সেই ছবিতে, আবেগ-গভীরতা ও সূক্ষ্ম অনুভূতির ঐশ্বর্যও কম নয় ; কিন্তু সমস্তই যেন স্বল্পতার মধ্যে, সীমিত রূপায়তনের মধ্যে অভিব্যক্ত, জীবনের আবর্তিত বিস্তৃতি ও মননের গভীরতার পরিচয় সেখানে নাই। প্রাচীন বাঙালী মন্দির-বিহার প্রভৃতিও গড়িয়াছে, কিন্তু ভুবনেশ্বর, খাজুরহো বা দক্ষিণ-ভারতের মত প্রসারিত, বিস্তৃতায়তন মন্দির-নগরী গড়ে নাই, এবং বিহার বা মন্দির যাহা গড়িয়াছে, এক পাহাড়পুর এবং অন্য দুই একটি স্থান ছাড়া আর কোথাও সে-মন্দির বা বিহার খুব বৃহদায়তন নয়, আকাশচুম্বীও নয় ; অধিকাংশ মন্দিরই ছিল স্বল্পায়তন। বস্তুত, প্রাচীন বাঙলার স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বৃহৎ দুঃসাহসী কল্পনা-ভাবনা, বৃহৎ কর্মশক্তি বা গভীর গঠন নৈপুণ্যের পরিচয় বিশেষ নাই। শুধু স্থাপত্যের ক্ষেত্রেই নয়, ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও প্রাচীন বাঙালী খুব বৃহৎ দুঃসাহসী মনন ও কল্পনা-ভাবনার দিকে কোথাও অগ্রসর হয় নাই। সারনাথের বুদ্ধ-প্রতিমায়, মধ্যভারতে উদয়গিরির ভাস্কর্যে, এলিফাণ্টা

ও এলোরার ভাস্কর্যে, দক্ষিণ-ভারতের নটরাজ-প্রতিমায় যে গভীর দুঃসাহসী মনন ও ভাবনা-কল্পনার বিস্তার, ভাব ও আয়তন উভয়ত, বাঙলার ভাস্কর্যে তাহার পরিচয় কোথাও বিশেষ নাই। কিন্তু, সূক্ষ্ম কমনীয়তা, হৃদয়ের আবেগ এবং ইন্দ্রিয়ালুতার গভীরতায় আবার তাহার তুলনা বিরল; তবে এ-সমস্তই স্বল্পায়তনে, সংকীর্ণ ভাবসীমায় সীমিত। মৃৎফলক শিল্পও পরস্পর বিচ্ছিন্ন; দীর্ঘায়ত একটি কাহিনীর রূপায়ন নয়, ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন টুকরা টুকরা জীবনচিত্র পর পর চলিয়াছে প্রাচীরগাত্র জুড়িয়া; বিস্তৃতায়ত গভীর জীবনের পরিচয় সেখানে নাই। মৃৎফলক-শিল্পে হয়তো তাহা সম্ভবও নয়। সে-ক্ষেত্রে শিল্পদৃষ্টির জন্মই বিচ্ছিন্ন ক্ষণিক মুহূর্তের মধ্যে। যাহা হউক, এই স্বল্পায়ত এবং সীমিত সৃষ্টিভাবনার কারণ কি তাহার আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি, এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিব না। সংক্ষেপে শুধু বলা যায়, প্রাচীন বাঙালীর কৃষিনির্ভর জীবনের সমৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা ছিল পরিমিত, চিত্তসমৃদ্ধি ছিল ক্ষীণায়ত, বৃহৎ, গভীর, মননসমৃদ্ধ দুঃসাহসী জীবনের প্রশস্ত কোনো স্পর্শ সে-জীবনে লাগে নাই। কাজেই শিল্পেও সে-পরিচয় নাই।

সৃষ্টিভাবনার এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছে ছোট ছোট গীতি-কবিতার প্রতি প্রাচীন বাঙালীর অনুরাগের মধ্যেও। প্রাচীন বাঙালী কোনো মহাকাব্য রচনা করে নাই, সার্থক, বৃহৎ ও গভীর ভাবকল্পনার কোনো নাটকও নয়। ধোয়ীর পবনদূত ও জয়দেবের গীত-গোবিন্দ তো গীতিকাব্যই, গোবর্ধনের সপ্তশতীও তাহাই। সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিত কিংবা শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতকেও বৃহৎ ও গভীর ভাবনা-কল্পনার কাব্য বলা চলেনা, যদিও ইহাদের পরিসর একেবারে তুচ্ছ করিবার মত নয়। বস্তুত, বৃহৎপরিসরের কাব্য, এমন কি ছোট ছোট, রসহীন অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, রূপকালঙ্কারবহুল কাব্য বোধ হয় প্রাচীন বাঙালীর খুব রুচিকর ছিলনা; তাহার বেশি রুচিকর ছিল অপভ্রংশ এবং প্রাকৃত গীতির পদ ও ছড়া, যে-ধরনের পদ ও ছড়া আমরা চর্যাপদ, দোহাকোষ, প্রাকৃতপৈঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া ছোট ছোট সংস্কৃত কবিতা, প্রকীর্ণ শ্লোক, গীতি-কবিতার মূল রূপটি অর্থাৎ সংকীর্ণ পরিসরে হৃদয়ের গভীর আবেগ ও প্রাণস্পর্শীতা যাহাদের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে, এমন শ্লোক ও খণ্ড কবিতাও বাঙালীর খুব প্রিয় ছিল, যেমন কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয় বা সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থের পদ ও শ্লোক। বস্তুত, এই ধরনের গীতিকবিতা-সংগ্রহ বা চয়নিকার ধারার উদ্ভব এই বাঙলাদেশেই, এবং মধ্যযুগে পদ্যাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বৈষ্ণব মহাজনদের পদসংগ্রহ এই ধারায়ই চলিয়া আসিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, গীতি-কবিতার প্রতি এই অনুরাগই মধ্যযুগীয় বাঙলা-সাহিত্যের বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর প্রসার ও সমাদৃতির মূলে। গীতি-কবিতাতেই যেন বাঙালীর প্রতিভা মুক্তি পাইয়াছে, এবং এই গীতি-কবিতাই বাঙালীর চিত্তে আজও সাড়া জাগায়। মহাকাব্যের বিরাট প্রসার ও গভীর আবর্ত যেন তাহার তত রুচিকর নয়। বস্তুত, প্রাচীন বাঙালীর

সাহিত্যে কোথাও মননের গভীর গাম্ভীর্য ও ভাবকল্পনার বিরাট প্রসার নাই ; তাহার পরিবর্তে আছে প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ালু গভীরতা এবং সীমিত ব্যাপ্তির মধ্যে ভাবানুভূতির তীব্রতা। ইহাই বাঙালীর সৃজন প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

উত্তরাধিকার

এ-পর্যন্ত যে-সব ইঙ্গিত ধরিতে চেষ্টা করিলাম তাহা বাঙালীর গভীর চরিত্র ও জীবন-দর্শনগত, যে চরিত্র ও জীবনদর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে বাঙালী-জনের গঠন, ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং ইতিহাসের আবর্তন-বিবর্তনের সম্মিলিত ফলে। এই চরিত্র ও জীবনদর্শন একাধারে প্রাচীন বাঙালীর শক্তি ও দুর্বলতা। তাহার সমাজ ও রাষ্ট্রবিন্যাসে, জীবন ও সংস্কৃতিতে এই শক্তি ও দুর্বলতা উভয়ই প্রতি-ফলিত, এবং লাভ এবং ক্ষতি দুইই সেই শক্তি ও দুর্বলতা অনুযায়ী।

আদিপর্বের বাঙালী যে-উত্তরাধিকার তাহার মধ্যপর্বের বংশধরদের হাতে তুলিয়া দিয়া গেল তাহার মধ্যে প্রধান ও প্রথম উত্তরাধিকার এই চরিত্র ও জীবনদর্শন। মধ্যপর্বে ইতিহাসের আবর্তনে এই চরিত্র ও জীবনদর্শনের কোন দিকে কতখানি অদল বদল হইবে সেই আলোচনা আদিপর্বে অবান্তর, কিন্তু এই উত্তরাধিকার লইয়াই মধ্যপর্বের যাত্রারম্ভ, এ-কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

সদ্যোক্ত চরিত্রও জীবনদর্শন ছাড়া আর যাহা উত্তরাধিকার তাহা এক এক করিয়া তালিকাগত করা যাইতে পারে। ক্ষতির ও ক্ষয়ের অঙ্কের দিকটাই আগে বলি।

ক্ষতি ও দুর্বলতার দিক

মুহম্মদ বখত্-ইয়ারের সফল নবদ্বীপাভিযানের ফলে গৌড়ে ও রাঢ়ে মুসলিম-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল, সন্দেহ নাই। সঙ্গে সঙ্গে এ-তথ্যও নিঃসন্দেহে যে, পূর্ব-বঙ্গে স্বাধীন সেনবংশ আরও প্রায় সার্ধশতাব্দী কালেরও বেশি রাজত্ব করিয়াছিলেন ; তাহা ছাড়া, ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্বাধীন, এবং গৌড়ে-রাঢ়ে ও দেশের অন্যত্র প্রায় স্বাধীন সামন্ত হিন্দু রাজবংশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আধিপত্য বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কেশবসেন বোধ হয় একাধিকবার যবন রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধও করিয়া থাকিবেন। কিন্তু যে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা এবং তাহার চেয়েও বড় কথা, বাঙালী ও বাঙলাদেশ যে সর্বব্যাপী মহতী বিনষ্টির সম্মুখীন হইয়াছিল সেই পরাধীনতা ও বিনষ্টির হাত হইতে বাঁচিতে হইলে যে চরিত্রবল, যে সমাজশক্তি এবং যে সুদৃঢ় প্রতিরোধ-কামনা থাকা প্রয়োজন সমসাময়িক বাঙালীর তাহা ছিলনা। কারণ, দ্বাদশ শতকের বাঙালাদেশ পরবর্তী দুই শতকের হাতে যে-সমাজবিন্যাস উত্তরাধিকার স্বরূপ রাখিয়া গেল সেই সমাজ জাত্-বর্ণ এবং অর্থনৈতিক শ্রেণী উভয় দিক্ হইতেই স্তরে স্তরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ; প্রত্যেকটি স্তর ও

স্তরাংশ সুদৃঢ় প্রাচীরে নিশ্ছিদ্র করিয়া গাঁথা ; এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাতায়াতে প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, এক স্তর অন্য স্তরের প্রতি অবিশ্বাসপরায়ণ, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একের স্বার্থ অন্যের পরিপন্থী।

দ্বিতীয়ত, সে-সমাজের চরিত্র শিথিল। ব্যাপক সামাজিক দুর্নীতির কীট ভিতর হইতে সামাজিক জীবনের সমস্ত শাঁস ও রস শুষিয়া লইয়া তাহাকে ফাঁপা করিয়া দিয়াছিল। এখন রাষ্ট্রে, ধর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে, দৈনন্দিন জীবনে যৌন অনাচার, নির্লজ্জ কামপরায়ণতা, মেরুদণ্ডবিহীন ব্যক্তিত্ব বিশ্বাসঘাতকতা, রুচিতারল্য এবং অলংকারবাহুল্যের বিস্তার।

তৃতীয়ত, সে সমাজ একান্তভাবে ভূমি ও কৃষিনির্ভর, এবং সেই হেতু উচ্চস্তরে ছাড়া বৃহত্তর বাঙালী সমাজ সাধারণভাবে দরিদ্র, এবং যেহেতু তাহার বিত্তশক্তি পরিমিত সেই হেতু বৃহত্তর সমাজের উদ্ভাবনী শক্তিও দুর্বল, জীবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা শিথিল।

চতুর্থত, সে-সমাজ, বিশেষত তাহার উচ্চতর স্তরগুলি একান্তভাবে ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন। এই আচ্ছন্নতায় দোষ ছিলনা যদি সেই ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টি প্রাগ্রসর সৃষ্টিপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইত। কিন্তু সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টি ধর্মশাস্ত্রের সুদৃঢ় বিধিবিধানে আঁট করিয়া বাঁধা, সে দৃষ্টি রক্ষণশীল এবং চলচ্ছক্তিহীন, অর্থহীন আচারবিচারের মরুবালিরাশির মধ্যে তাহা পথ হারাইয়াছে। অথচ, সামাজিক নেতৃত্বের বল্গার একটা রসি তাঁহাদেরই হাতে ; আর একটা দিক্ রাজা বা রাষ্ট্রের হাতে এবং সেই রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত প্রভৃতি-দেরই প্রাধান্য। যাঁহারা এই সব ধর্মশাস্ত্রের রচয়িতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁহারাই আবার প্রধান প্রধান রাজকর্মচারী।

পঞ্চমত, সে-সমাজ একান্তই ভাগ্য, অর্থাৎ জ্যোতিষনির্ভর ; এবং যেহেতু ভাগ্যনির্ভর সেই হেতু সেই সমাজে প্রতিরোধের ইচ্ছা ও শক্তি অত্যন্ত শিথিল, প্রায় নাই বলিলেই চলে। সমসাময়িক বাঙলার রাজা ও প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীরা অনেকেই নিজেরা জ্যোতিষ চর্চা করিতেন, দিনক্ষণ না দেখিয়া ঘর ছাড়িয়া এক পা' বাহির হইতেন না ; রাজসভায় জ্যোতিষী ও মৌহূর্তিকদের সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল ক্রমবর্ধমান। রাজা ও রাজসভার এবং উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর এই ভাগ্যনির্ভর মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে বৃহত্তর সমাজদেহে বিস্তারিত হইয়া এবং দেশের সমস্ত সংগ্রাম ও প্রতিরোধকামনার মূলোচ্ছেদ করিয়া দিয়াছিল। মুসলমানাধিপত্যের সূচনা ও ক্রম বিস্তারকে দেশ ভাগ্যের অমোঘ লিখন বলিয়াই গ্রহণ করিতে শিখিয়াছিল ; কাজেই প্রতিরোধ নিরর্থক।

ষষ্ঠত, সে-সমাজে অসংখ্য নরনারী ছিলেন যাঁহাদের ধর্মমত ও পথ এবং ধর্মের আচারানুষ্ঠান প্রভৃতি ছিল সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শের পরিপন্থী। এই সব নরনারী এমন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বাধ্য হইয়াই যাঁহাদের জীবনযাত্রা ছিল গোপন ; লোকচক্ষুর অন্তরালে রাত্রির অন্ধকারে ছিল তাঁহাদের যত ক্রিয়াকর্ম। গুহ্য, গোপন, রহস্যময় ছিল বলিয়াই ইঁহারা অনেকের চিত্তকে আকর্ষণও করিতেন। এই ধরনের গুহ্য, গোপন গোষ্ঠী

সকল দেশে সকল কালেই সমাজশক্তির অন্যতম প্রধান দুর্বলতা, কারণ, যে-শক্তি সমাজের নায়কত্ব করিতেছে তাহাকে দুর্বল করাই ইহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু, এই সব গুহ্য, গোপন গোষ্ঠীগুলির যে ধর্মমত ও পথ তাহা কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক মুক্তির বাণী বহন করিয়া আনে নাই। কাজেই সামাজিক দিক হইতে এই সব গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের বৈপ্লবিক সক্রিয়তা বিশেষ কিছু ছিল না। তাহা ছাড়া, গুহ্য রহস্যময় গোপনতার আড়ালে এই সব সম্প্রদায়ের ভিতর ও বাহিরে নানাপ্রকারের অসামাজিক যৌন আচারানুষ্ঠান এবং ধর্মের নামে নানা ব্যভিচারও বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল! তাহাও ভিতর হইতে সমাজকে পঙ্গু ও দুর্বল করিয়া দিয়াছিল, সন্দেহ কি?

সপ্তমত, সে-সমাজের নিম্নতর কৃষিজীবী স্তরগুলি ছিল একান্ত অবজ্ঞাত, হতচেতন ও সংকীর্ণ। যে-সব উচ্চতর স্তরের হাতে ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের নায়কত্ব তাহাদের দৃষ্টি-পরিধির মধ্যে এই স্তরগুলির কোনো স্থান ছিল না। স্বভাবতই সে-জন্য রাষ্ট্র ও সমাজ-নায়কদের প্রতি তাহাদের কোনো বিশ্বাস ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল না। সচেতন দায়িত্ববোধও ছিল না। গুহ্য রহস্যময় গোপন ধর্মসম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধেও এ-কথা সমান প্রযোজ্য। কাজেই ইহাদের মধ্যে বিপ্লব-বিদ্রোহের একটা বীজ সুপ্ত থাকিবে ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। হয়তো সুনিহিত সুষুপ্ত এই বীজটি সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে কোনো সচেতনতা ছিল না: জল ঢালিয়া, উত্তাপ সঞ্চার করিয়া সেই বীজ হইতে গাছ জন্মাইয়া ফুল ও ফল ফলাইবার মত সচেতন নেতৃত্ব কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণী গ্রহণও করে নাই; করিলে কি হইত বলা যায় না। বস্তুত, শ্রেণী-হিসাবে শ্রেণীচেতনা ছিল না বলিয়া নেতৃত্ব দিবার মত শ্রেণী গড়িয়াও উঠে নাই। একটা বৃহৎ, গভীর ব্যাপক সামাজিক বিপ্লবের ভূমি পড়িয়াই ছিল, কিন্তু কেহ তাহার সুযোগ গ্রহণ করে নাই। মুসলমানেরা না আসিলে কি ভাবে কি উপায়ে কি হইত, বলিবার উপায় নাই। যাহা অনুকূল অবস্থায় একটা সামাজিক বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করিতে পারিত তাহাই মুসলমানেরা রাষ্ট্রীয় অধিকার পাওয়ার ফলে অন্যতর খাতে বহিতে আরম্ভ করিল। এ-সমস্ত কথাই এই গ্রন্থের যথাস্থানে সবিস্তারে প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে বলিয়াছি; এখানে সংক্ষেপে ইঙ্গিতগুলি তুলিয়া ধরিলাম মাত্র।

কিন্তু ক্ষয় ও ক্ষতির কথা যদি বলিলাম, লাভের দিকটার কথাও বলি।

যে গুহ্য রহস্যময় গোপন সম্প্রদায়গুলির কথা একটু আগেই বলিয়াছি তাহাদের মধ্যে সমাজের একটা শক্তিও প্রচ্ছন্ন ছিল। সে-শক্তি মানবতার এবং সাম্যভাবনার শক্তি। পুনরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই যে, এই ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে, বিশেষভাবে সহজযানী প্রভৃতি বৌদ্ধ ও নাথসম্প্রদায় প্রভৃতির মধ্যে মানুষে মানুষে বর্ণ ও শ্রেণীগত বিভেদ-ভাবনা প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। তাহা ছাড়া, মানবতার একটা উদার আদর্শও ছিল ইঁহাদের মধ্যে সক্রিয়। এই উদার সাম্যভাবনা ও মানবতার আদর্শের স্থান সমসাময়িক,

অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শতকের ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শ ও সংস্কৃতির মধ্যে কোথাও ছিল না। অথচ, ইহার, অর্থাৎ এই সাম্যভাবনা ও মানবতার আদর্শেরও উপরই মধ্যযুগীয় বাঙলার বৃহত্তম ও গভীরতম ধর্ম ও সমাজ-বিপ্লবের অর্থাৎ চৈতন্যদেব প্রবর্তিত সমাজ ও ধর্মান্দোলনের প্রতিষ্ঠা। বস্তুত, দেশে দেশে যুগে যুগে মুক্ত মানব এই আদর্শের জন্যই সংগ্রাম করিয়াছে, এখনও করিতেছে, ভবিষ্যতেও করিবে। এই আদর্শেই মধ্যপর্বের হাতে আদিপর্বের শ্রেষ্ঠতম, বৃহত্তম উত্তরাধিকার।

লাভ ও শক্তির দিক

দ্বিতীয় উত্তরাধিকার, ভূমিনির্ভর কৃষিনির্ভর সমাজ। ঐকান্তিক ভূমি ও কৃষি-নির্ভরতার দুর্বলতার কথা নানাসূত্রে বলিয়াছি, কিন্তু তাহার একটা গভীর শক্তিও আছে, এবং সে-শক্তি অনস্বীকার্য। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর সমাজ প্রায় অনড়, অচল; তাহার জীবনের মূল মাটির গভীরে। সে-সমাজের সংস্কৃতি সম্বন্ধেও একই উক্তি প্রযোজ্য। বিশেষভাবে যে-সমাজে যতদিন পর্যন্ত গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিই ধনোৎপাদনের একমাত্র বা অন্তত প্রধানতম উপায় সেখানে ততদিন পর্যন্ত সেই জীবন ও সংস্কৃতির কোনো পরিবর্তন ঘটানো সহজে সম্ভব নয়—যদি উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তন কিছু না ঘটে, এবং তেমন বিবর্তন প্রাচীন বাঙলায় কিছু ঘটে নাই। এই শক্তির বলেই ভারতীয়, তথা বাঙলার সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা আজও অক্ষুণ্ণ, এবং এই শক্তিই জনসাধারণকে রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন, রাজবংশের সৃষ্টি ও বিলয় যুদ্ধবিগ্রহ, ধর্মের ও সমাজের সংঘাত প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া নিজের দৈনন্দিন জীবন-যাপন করিবার ক্ষমতা ও বিশ্বাস যোগাইয়াছে।

তৃতীয় উত্তরাধিকার, শক্তিধর্মের দিকে বাঙালীর ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ। এ তথ্য লক্ষণীয় যে, আদিপর্বের শেষের দিক্ হইতেই দুর্গা, কালী ও তারার প্রতিপত্তি বাড়িতেছিল, এবং এই তিন দেবীই যে শক্তির আধার, ঘনায়মান অন্ধকারে ইহারাই যে একমাত্র আশা ও ভরসা এ-বিশ্বাস যেন ক্রমশ বাঙালীচিত্তকে অধিকার করিতেছিল। বস্তুত, এই সময় হইতেই বাঙলার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাধনায় তান্ত্রিক শক্তিধর্মের প্রাধান্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার মত যে, মুসলমানাধিকারের কিছুকাল পরই শক্তিসাধক বাঙালীর অন্যতম বেদ কালিকাপুরাণ রচিত হয় এবং শক্তিময়ী কালী বাঙালীর অন্যতম প্রধান উপাস্যা দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হন। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের বাঙলার শ্মশানে কালীর উপাসনা করিয়াই বাঙালী ভয়-ভাবনার কিছুটা ঊর্ধ্বে উঠিতে, চিত্তে একটু সাহস ও শক্তি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই কালীই তাহার চণ্ডী, এবং সমস্ত মধ্যপর্বে চণ্ডীর প্রতাপ দুর্জয়!

চতুর্থ উত্তরাধিকার, সৃজ্যমান বাঙলাভাষা। ক্রমবর্ধমান এই ভাষাই একদিক্ দিয়া

ধীরে ধীরে জনসাধারণের মনকে মুক্তি দিতে আরম্ভ করিল। সংস্কৃতের সুদৃঢ় প্রাচীর যখন শিথিল হইল তখন জনসাধারণ আপন ভাষার মাধ্যমেই তাহাদের চিন্তাভাবনা স্বপ্নকল্পনাকে রূপদান করিবার একটা সুযোগ পাইল। বস্তুত, বাঙলার ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম দেশের লোক দেশী ভাষায় আপন প্রকাশ খুঁজিয়া পাইল; ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মন ও হৃদয়ের কথা শোনা গেল। মধ্যপর্বের গোড়ায় সেইজন্যই এই ভাষার প্রতি ব্রাহ্মণ এবং গোড়া ব্রাহ্মণ্য সমাজের একটা বিরাগ ও বিরোধিতা সক্রিয় ছিল, এবং সেই কারণেই এই ভাষার প্রতি মুসলমান-রাষ্ট্রশক্তি কিছুটা আকৃষ্টও হইয়াছিল। এই ভাষাই মধ্যপর্বে বাঙালীর অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে বিবর্তিত হইল।

ইতিহাসের কথা বলা শেষ হইল। কিন্তু ঐতিহাসিকও তো সামাজিক মানুষ; একটি বিশেষ কালে একটি বিশেষ সমাজ-সংস্থার মধ্যে তাহার বাস। তাহার কাজ পশ্চাতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া 'রাগদ্বেষবহির্ভূত হইয়া ভূতার্থ' বলা। কিন্তু সামাজিক মানুষ হিসাবে সেই ভূতার্থই তাঁহাকে তাঁহার সমসাময়িক সমাজকে দেখিবার ও বুঝিবার যথাযথ দৃষ্টি ও বুদ্ধি দান করে, এবং ভবিষ্যতের সমাজ-সংস্থা কল্পনা করিবার এবং গড়িবার প্রেরণা সঞ্চার করে। আবার, এই দৃষ্টি ও প্রেরণাই তাঁহাকে ভূত অর্থাৎ অতীত এবং ভূতার্থকে বুঝিতে, ধরিতে সাহায্য করে।

ঐতিহাসিকের ভাবনা

বলিয়াছি, মুসলিম-রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বের হিন্দুস্থানের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া প্রসিদ্ধ উর্দুভাষী কবি হালি বলিয়াছিলেন, 'ইধর হিন্দমে হরতরফ আন্ধেরা'—'এদিকে হিন্দুস্থানে তখন চারিদিকে অন্ধকার'! এ-কথার ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙলাদেশের পক্ষেও এ-কথা সমান প্রযোজ্য। বস্তুত, এদেশে বৈদেশিক মুসলিম-রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়; দৈবের অভিশাপও নয়; তাহা কার্য-কারণ সম্বন্ধের অনিবার্য শৃঙ্খলায় বাঁধা। তখন দেশের সমসাময়িক সমাজের যে-অবস্থা তাহার মধ্যে একটা বিরাট ও গভীর বিপ্লবাবর্তের নানা ইঙ্গিত নিহিতই ছিল। কিন্তু সজ্ঞান সচেতনতায় সেই ইঙ্গিতকে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহাকে সংহত করিয়া বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টায় নিয়োজিত করিবার নেতৃত্ব সমাজের ভিতর হইতে উদ্ভূত হয় নাই। এই ধরনের বিপ্লবাবর্ত আপনা হইতেই ঘটে না; ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকিলেও সময় মত বীজ না ছড়াইলে ফসল ফলে না। এদেশেও হইল তাহাই; সময় বহিয়া গেল, ফসল ফলাইবার কাজে কেহ অগ্রসর হইল না। তাহার দামও দিতে হইল; পঙ্গু ও দুর্বল, ক্ষীণায়ত ও শক্তিহীন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা বাহির হইতে এক একটি ধাক্কায় ধ্বসিয়া ধ্বসিয়া পড়িল এবং সেই সুযোগে বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়া গেল।

সমাজদেহে যতদিন জীবনীশক্তি থাকে ততদিন ভিতর-বাহির হইতে যত আঘাতই

লাগুক সমাজ আপন শক্তিতেই তাহাকে প্রতিরোধ করে ; প্রত্যাঘাতে তাহাকে ফিরাইয়া দেয়, অথবা জীবনের কোনো ক্ষেত্রে, বা কোনো পর্যায়ে পরাভব মানিলেও অন্য সকল ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে নূতনতর শক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া নিজেকেই শক্তিমান করিয়া তোলে। সমাজেতিহাসের এই যুক্তি প্রায় জৈব জীবনেরই বিবর্তনের যুক্তি। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস এই বিবর্তন-যুক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই যুক্তিতেই ভারতবর্ষ বারবার তাহার রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাকে নূতনতর সমাজশক্তিতে রূপান্তরিত করিয়াছে, সকল আপাতবিরুদ্ধ প্রবাহকে, বিরোধী শক্তিকে সংহত করিয়া তাহাকে নূতন রূপদান করিয়া নিজেকেই সমৃদ্ধ ও শক্তিমান করিয়াছে, সমাজদেহে জড়ের জঞ্জাল স্তূপীকৃত হইতে দেয় নাই।

কিন্তু নানা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে, ব্যক্তি, বর্ণ ও শ্রেণী-স্বার্থবুদ্ধির প্রেরণায় সমাজদেহ যখন ভিতর হইতে ক্রমশ পঙ্গু ও দুর্বল হইয়া পড়ে তখন ভিতরে ভিতরে জড়ের জঞ্জাল এবং মৃতের আবর্জনা ধীরে ধীরে জমিতে জমিতে পুঞ্জ পুঞ্জ স্তূপে পরিণত হয় ; জীবনপ্রবাহ তখন আর স্বচ্ছ সবল থাকে না, মরুবালিরাশির মধ্যে তাহা রুদ্ধ হইয়া যায়, অথবা পঙ্কে পরিণত হয়। সমাজদেহে তখন ভিতর-বাহিরের কোনো আঘাতই সহ্য করিবার মতন শক্তি ও বীর্য থাকে না, প্রত্যাঘাত তো দূরের কথা। বিবর্তনের যুক্তিও তখন আর সক্রিয় থাকে না ; বস্তুত, দান ও গ্রহণের, সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণের যে যুক্তি বিবর্তনের গোড়ায়, অর্থাৎ বিবর্তনের যাহা স্বাভাবিক জৈব নিয়ম তাহা পালন করিবার মত শক্তিই তখন আর সমাজদেহে থাকে না।

সমাজের এই অবস্থাই বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা করে ; বস্তুত, ইহাই বিপ্লবের ইঙ্গিত। কিন্তু ইঙ্গিত থাকিলেই, ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলেই বিপ্লব ঘটে না ; সেই ইঙ্গিত দেখিবার ও বুঝিবার মত বুদ্ধি ও বোধ থাকা প্রয়োজন, ক্ষেত্রে ফসল ফলাইবার মত প্রতিভা ও কর্মশক্তি, সংহতি ও সংঘশক্তি থাকা প্রয়োজন। নহিলে ইঙ্গিত ইঙ্গিতই থাকিয়া যায়, সময় বহিয়া যায়, বিপ্লব ঘটেনা। এমন অবস্থায় বাহির হইতে ঝড় আসিয়া যখন বুকের উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে তখন আর তাহাকে ঠেকানো যায়না, এক মুহূর্তে সমস্ত ধূলিসাৎ হইয়া যায়, বিপ্লবের ইঙ্গিত অন্যতর, নূতনতর ইঙ্গিতে বিবর্তিত হইয়া যায় ; ক্ষেত্রের চেহারাই অনেক সময় একেবারে বদলাইয়া যায়, একেবারে নূতন সমস্যা দেখা দেয়। আর, বাহির হইতে ঝড় না লাগিলে, যথাসময়ে বিপ্লব না ঘটাইলে, পঙ্গু ও দুর্বল, ক্ষীয়মান সমাজ-আপনা হইতেই তখন ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং একদিন জৈব নিয়মেই মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে। তখন আবার ভ্রূণাবস্থা হইতে, অর্থাৎ প্রায় আদিম অবস্থা হইতে নূতন সমাজদেহের উদ্ভব ঘটে। উভয় ক্ষেত্রেই দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ ধরিয়া পরবর্তী কালকে তাহার মূল্য দিয়া যাইতে হয়।

বাঙলা ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের গভীরে নানা দিক হইতে দেখিলে মনে হয়, বোধ হয় সেই মূল্যই আজও আমরা দিতেছি, এবং পূর্ণ মূল্য না দিয়া অগ্রসর হইবার উপায়ও বোধ হয় নাই।

॥ ১৫ অগস্ট, ১৯৪৯ ॥

পরিশিষ্ট "ক"

সংশোধন ও সংযোজন

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের যুক্তি

এ-অধ্যায়ে কোনো সংশোধন বা সংযোজন করা হচ্ছে না

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের গোড়ার কথা

(১) বাঙ্গালীর ইতিহাসে নরগোষ্ঠী ও জন

ভারতবাসীর ও বাঙ্গালীর নরগোষ্ঠী-গত আলোচনা ইতিমধ্যে আর বেশি অগ্রসর হয়নি'; বস্তুত পণ্ডিতদের মধ্যে এ-বিষয়ে গবেষণা আলোচনা-বিশ্লেষণে উৎসাহ ও ঔৎসুক্যে যেন একটু ভাঁটা পড়েছে বলে মনে হয়। যা' হোক, এ-বিষয়ে যাঁরা আরও জানতে আগ্রহী তাঁরা শ্রীযুক্ত অতুল সুর রচিত "বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়" (জিজ্ঞাসা, ক'লকাতা, ১৯৭৭) বইখানা পড়তে পারেন। এই ছোট বইখানাতে সাম্প্রতিকতম জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্যই সুশৃঙ্খলায় সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ভাবে এই লেখকের বই "বাঙলার সামাজিক ইতিহাস" (ক'লকাতা, ১৯৭৭) বইখানাও পাঠকদের কাজে লাগতে পারে বলে আমার ধারণা।

নরগোষ্ঠীর প্রসঙ্গটি উত্থাপন করছি একটু অন্য কারণে। এ-ব্যাপারে আমার চিন্তা বেশ কিছু দিন যাবৎ একটু অন্য খাতে বইছে, এবং আমারই মত অনেকের, অন্তত যাঁরা মানুষের সামাজিক ইতিহাস নিয়ে চিন্তা করেন, তাঁদের। Race অর্থাৎ নরগোষ্ঠী প্রাণীবাচক (zoological) শব্দ, সংস্কৃতিবাচক নয়। এ অর্থে বিশুদ্ধ কোনও 'race' বা নরগোষ্ঠীর কোথাও কিছু অস্তিত্ব কখনও ছিল, এমন তথ্য কারও জানা নেই। রক্তের গুণাগুণের এবং কতকগুলো বিশেষ শারীরসাদৃশ্যর উপর নির্ভর করে নৃতাত্ত্বিকেরা পৃথিবীর যাবতীয় মানুষকে কয়েকটি বিভিন্ন নরগোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন এবং বিভিন্ন পণ্ডিতেরা বিভিন্ন নামে তাদের চিহ্নিত করেছেন। বিশুদ্ধ ভূমধ্যীয়, অ্যালপীয় বা আদি-অস্ট্রেলয়েড্ বা ভেড্ডিড্ বা ইন্ডিডের কোথাও কেউ সাক্ষাৎ পেয়েছেন, এমন জানা নেই। নামকরণ-ক্রিয়াটি যে সাদৃশ্যের তারতম্য-নির্ভর, তা সহজেই অনুমেয়, অর্থাৎ, যে-সব মানবগোষ্ঠীর শারীর-পরিমিতি গণনা করা হয়েছে, বা রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে তারা সভ্য সমাজ থেকে যত দূরেই হোক, যত বন্য, যত আদিমই হোক না কেন, তাদের কারও মধ্যেই রক্তের অবিমিশ্র বিশুদ্ধতা তখন আর ছিল না, অল্পবিস্তর সংমিশ্রণ সর্বত্রই ঘটেছে। এই সংমিশ্রণই তারতম্যের হেতু। যা হোক, একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মানব সমাজে বিশুদ্ধ raceর অস্তিত্ব একান্তই প্রকল্পিত (hypothetical); এর বাস্তব অস্তিত্ব কখনও কোথাও কিছু ছিল, এমন কোনো প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত, নরগোষ্ঠীগত গবেষণা-আলোচনাদির সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে, কারণ পৃথিবীর কোথায়, কোন সমাজে কোন নরগোষ্ঠীর কতটা বিস্তৃতি কতটা প্রভাব তা ঐতিহাসিকের ও সমাজ-বিজ্ঞানীর জানা প্রয়োজন, দেশকালধৃত মানব-সমাজকে বুঝবার জন্যই। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি প্রয়োজন, কোথায় কখন কোন নরগোষ্ঠী বাস্তব, ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন-পরিবেশের প্রভাবে কি ভাবে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়ে নূতন রূপে

রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে। প্রধানত এই রূপান্তরই নরগোষ্ঠী থেকে জন-এ রূপান্তর, race থেকে people-এ। এবং জন বা people-রচনার সূচনা থেকেই যথার্থ ইতিহাসের ভিত্তি রচনার সূত্রপাত।

জন সাংস্কৃতিক শব্দ, প্রাণীবাচক নয়। যে-কোনও race বা নরগোষ্ঠীর বেশ কিছু সংখ্যক লোক কোনও একটা স্থানে স্থিত হয় কোনও এক কালে; তখন সেই কাল ও স্থানের প্রয়োজন-পরিবেশ, ব্যবহারিক-প্রাতিবেশিক রীতিপদ্ধতি ইত্যাদি অনুযায়ী বিশেষ এক জীবনচর্যায় তাদের অভ্যস্ত হ'তে হয়; কখনও কখনও নিজস্ব নরগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যতর নরগোষ্ঠীর সম্মুখীনও হ'তে হয়, ক্রমে ক্রমে রক্ত ও ভাষাসংমিশ্রণও ঘটে। স্থান ও কালের সাংস্কৃতিক প্রভাবে নরগোষ্ঠী তখন জন-এ বা people এ বিবর্তিত-পরিবর্তিত হয়, নরগোষ্ঠীগত পার্থক্য তখন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ভারতীয় ধ্যানধারণায় নরগোষ্ঠীর ধারণা নেই বললেই চলে, কিন্তু জন-এর ধ্যানধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রাচীন। প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থে, বিশেষ ভাবে মার্কণ্ডেয় পুরাণে, ভারতবর্ষের জন-সমূহের একটি তালিকা আছে; হয়ত তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু সুদীর্ঘ। লক্ষ্যনীয় এই যে, সর্বত্রই নামগুলি দেওয়া হয়েছে বহুবচনে, অর্থাৎ people অর্থে, যেমন মগধাঃ, অঙ্গাঃ ইত্যাদি। অঙ্গজন ও মগধজনের লোকেরা যেখানে বাস করেন সেই স্থানের নাম অঙ্গজনপদ, মগধ জনপদ। এই জন ও জনপদ রচনা ঋগ্বেদ রচনার কাল থেকেই, হয়ত তার আগে থেকেই দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তার কোনও লিখিত প্রমাণ নেই।

প্রাচীন বঙ্গদেশেও এই জন-দের কথাই লিখিত ইতিহাসের আদিতম পর্বে। বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ, সুহ্মাঃ, পুণ্ড্রাঃ এদের নিয়েই বাঙ্গালীর ইতিহাসের কথা শুরু। এদের আগে ছিল কোন জনেরা, তা আমাদের জানা নেই; অনুমান করা যেতে পারে শবর ও নিষাদ জনেরা, কোল্ল-ভিল্ল-কিরাত জনেরা। ইহারা কে কোন নরগোষ্ঠীর বা race-এর, এ-প্রশ্নের উত্তর প্রাচীন কোনও সাক্ষ্য প্রমাণেনেই।

২। বাঙ্গালীর প্রাক্ ও আদি ইতিহাস

[এই অনুচ্ছেদটি নাতিদীর্ঘ একটি অধ্যায় বলেও গণিত হ'তে পারতো, কিন্তু যেহেতু প্রাক্ ও আদি ইতিহাস ইতিহাসেরই গোড়ার কথা, সেই হেতু অনুচ্ছেদটিকে দ্বিতীয় অধ্যায়েই সংযোজন করা হ'লো।]

মূল গ্রন্থটি যখন রচিত ও প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সৃজ্যমান বাঙ্গালীর প্রাক ও আদি ইতিহাসের কোনও তথ্যই আমাদের জানা ছিল না বললেই চলে। গত পঁচিশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার যা হয়েছে তা গুণে ও পরিমাণে সুপ্রচুর। বাংলাদেশের আবিষ্কার প্রধানত ঐতিহাসিক কাল সংক্রান্ত, এবং

সে-আবিষ্কারের ফলে পঞ্চম খ্রীষ্ট শতাব্দী থেকে সুরু করে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালীর ইতিহাসের প্রচুর নূতন তথ্য ও তার অর্থনির্দেশ আমাদের গোচরে এসেছে। এ-গ্রন্থের এই পরিশিষ্টে যথাস্থানে তা উল্লিখিত হবে, অবশ্যই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ততায়।

তবে বিস্ময়কর আবিষ্কার ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে, এবং সে-আবিষ্কার অনুসরণ করে নূতন নূতন অনুসন্ধান আজও চলছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই যা পাঠক সাধারণের এবং বিশেষজ্ঞদের গোচরে এসেছে তার যোগফল বাঙালীর ইতিহাসে নূতন একটি অধ্যায় রচনার সূচনা করেছে, এমন একটি অধ্যায় যার শুরু খ্রীষ্টপূর্ব একহাজার বৎসরেরও আগে এবং যাকে বাঙালীর বাস্তব ইতিহাসের প্রাক্ ঊষা অধ্যায় বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এ-অধ্যায় পরম্পরাগত শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সাহিত্যধৃত অস্পষ্ট স্মৃতি বা কাহিনীর উপরও নয়; এ-অধ্যায় প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বাঙালী কৃষি-সমাজের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব উপাদান-উপকরণের উপর।

প্রাচীন রাঢ়দেশের কেন্দ্রভূমি বর্তমান বীরভূম ও বর্ধমান জেলা। এই দুই জেলার প্রাণপ্রবাহ ময়ুরাক্ষী-বক্রেশ্বর-কোপাই-অজয়-কুনুর-দামোদর নদনদীমালা। এই দুই জেলার সংলগ্ন সুবর্ণরেখা ও কংসাবতী বিধৌত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া। এই নদনদীগুলির প্রত্যেকটিরই উৎসস্থল বিন্ধ্য-শুক্তিমান কুলাচল দুটির পূর্বতম বিস্তৃতি ছোটনাগপুর-ওড়িশার নিম্নশায়ী পাহাড়গুলি। শীতে ও গ্রীষ্মে এই নদনদীগুলি শীর্ণকায়া, ক্ষীণধারা, কিন্তু বর্ষায় স্ফীতকায়া, খরস্রোতা, দুর্বার, ভীষণা ও দুকূলপ্লাবিনী। হাজার হাজার বছর ধরে প্রতি বর্ষার দুর্বার খরস্রোত ছোটনাগপুর-ওড়িশার পাহাড়গুলি থেকে ছোটবড় কাঁকর মেশানো লাল-গেরুয়া মাটি বয়ে এনে ঢেলে দিয়েছে নদীগুলির তীরে তীরে, প্লাবনের স্রোত সেই মাটিকে ঠেলে নিয়ে গেছে দূরে দূরান্তরে, কোথাও বেশি, কোথাও কম; যত দূরে তত কম, যত কাছে তত বেশি। বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের ইহাই ভূপ্রকৃতি; পশ্চিমবঙ্গের ইহাই পুরাভূমি। এই ভূমি কঠিন, রুক্ষ; প্রান্তর জুড়ে কাঁকর-লালমাটির ঢেউ, কোথাও কোথাও ছোটবড় পাথর-স্তূপের উৎক্ষেপ। জৈন আচারঙ্গ সূত্রের একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে, মহাবীর জিন এসেছিলেন রাঢ়দেশের কোন এক অঞ্চলে, যে অঞ্চলের নাম বলা হয়েছে বজ্রভূমি। বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার ভূমি যথার্থতই বজ্রভূমি।

অথচ, কিছু কিছু অংশ বাদ দিলে এই বজ্রভূমি আজও উর্বরা, শস্যপ্রসূ। গত পনেরো-বিশ বৎসরের প্রত্নানুসন্ধান ও উৎখননের ফলে আমরা আজ যেন জেনেছি, এই ভূমির প্রাণদাত্রী নদনদীগুলির তীরে তীরেই বাঙালীর প্রাচীনতম সংস্কৃতির অভ্যুদয় ঘটেছিল, বাঙালীর চাষবাস, ধান্য শস্যোৎপাদন, ঘরবাড়ী নির্মাণ, জীবনোপায়ের নানা পথ। এ-জানা সম্ভব হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে ও

বিভাগীয় অধিকর্তা, আমার প্রাক্তন ছাত্রদের অন্যতম, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের কৃতিত্বে। উৎখননের যত দোষত্রুটিই থাকুক, তাঁর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সঙ্গে যত মত-পার্থক্যই পণ্ডিতদের থাকুক, পরেশচন্দ্রই বাঙালীর ইতিহাসে এই নূতন অধ্যায় যোজনার প্রথম ও প্রধান নায়ক।

বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের অদূরেই অজয়তীরবর্তী বনকাটি গ্রাম। প্রায় তারই সংলগ্ন ইলামবাজার, একটু দূরেই অধুনা বিখ্যাত পাণ্ডুরাজার ঢিবি। প্রত্নানুসন্ধানের ফলে এই বনকাটিতে আবিষ্কৃত হ'য়েছে প্রত্নাশ্মীয়পর্বসুলভ অশ্মীভূত কাঠের এবং স্ফটিকের তৈরী অনেক ছোটবড় কারুযন্ত্র। দামোদর নদের তীরে বীরভানপুর গ্রাম। এই গ্রামের একটি স্থানে উৎখাননের ফলে অসংখ্য স্ফটিক ও অন্যান্য গুঁড়ো পাথরের তৈরী ক্ষুদ্রাশ্মীয় কারুযন্ত্র পাওয়া গেছে, তিনফুট মাটির নীচে। তারও নীচে নবাশ্মীয় পর্বের সমভূমিতে গোচর হয়েছে কয়েকটি গর্ত; গর্তগুলি যে বাঁশের বা কাঠের বা পাথরের খুঁটির তা সহজেই অনুমেয়। এ অনুমানেও বাধা নেই যে, খুঁটির উপর একটি চালও ছিল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এখানে ক্ষুদ্রাশ্মীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের একটি কারখানা ছিল। যাই হোক, প্রত্নানুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, এই উৎখনিত স্থানটির আশে পাশে প্রায় এক বর্গমাইল জুড়ে একটি ক্ষুদ্রাশ্মীয়পর্বের প্রত্নস্থান বিস্তৃত।

স্ফটিক ও অন্যান্য পাথরের তৈরী এই ধরনের ক্ষুদ্রাশ্মীয় কারুযন্ত্র পূর্বোক্ত পুরাভূমির নানা জায়গা থেকেই পাওয়া গেছে, কোথাও পরবর্তী কালের কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষের সঙ্গে, কোথাও বা কোনও অনুষঙ্গ ছাড়াই। ক্ষুদ্রাশ্মীয় কারুযন্ত্রের ব্যবহার মানব-ইতিহাসের নবাশ্মীয় পর্বের সঙ্গেই জড়িত, সন্দেহ নেই, কিন্তু টুকরো টাকরা এই সব বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু তথ্যাদি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে এখনও এমন কিছু আবিষ্কৃত হয়নি, একমাত্র বীরভানপুর গ্রাম ছাড়া, যার ফলে আমরা প্রাগৈতিহাসিক নবাশ্মীয় পর্বের বঙ্গীয় সমাজের মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারি। এ-পর্বের যা যা বিশিষ্ট লক্ষণ, যেমন শস্যোৎপাদনের প্রবর্তনা, বন্যপশুকে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করা, ইত্যাদির কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

আপেক্ষিক ভাবে সুস্পষ্ট ও কতকটা সুসংবদ্ধ রূপ প্রথম ধরা যায়, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা যাকে বলেন তাম্রাশ্মীয় পর্ব বা পর্যায়, সেই কাল থেকে। পশ্চিমবঙ্গে সেই পর্বের সূচনা খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ১৩০০/১২০০ বৎসর থেকে। নবাশ্মীয় পর্বের যে দু'চারটি লক্ষণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি এই তাম্রাশ্মীয় পর্বেও লক্ষ্য করা যায়; সেজন্য কোনও কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক এই পর্বকে নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় পর্ব বা পর্যায় বলেও চিহ্নিত করে থাকেন। এই হচ্ছে মানুষের সামাজিক ইতিহাসের সেই পর্ব যখন সে যন্ত্রপাতি নির্মাণে শুধু পাথর মাত্র আর ব্যবহার করছেনা, সঙ্গে সঙ্গে এবং ক্রমবর্ধমান পরিমাণে ধাতুও ব্যবহার করছে,

এবং সে ধাতু হ'চ্ছে তাম্র বা তামা এবং মিশ্রধাতু ব্রোঞ্জ। এই দুই ধাতুনির্মিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলেই সমাজের একটি নূতন রূপ দেখা দেয়; সে-রূপের প্রধান লক্ষণ চাষের প্রবর্তনা, স্থায়ী বসতি ও বাস্তুনির্মাণ, গৃহপশু পালন, সমাজ-নির্মাণ। এই নূতন রূপটি প্রথম ধরা পড়েছে পাণ্ডুরাজার ঢিবি উৎখননের ফলে। এই রূপই বাঙালীর আদি-ইতিহাসের রূপ।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির উৎখননের পদ্ধতি নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে কিছু মতবিরোধ যে আছে, সে-সম্বন্ধে আমি একেবারে অনবহিত নয়। তবু, আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমার ধারণা হয়েছে, এই উৎখনন-নির্গত প্রত্নতথ্যাদি মোটামুটি নির্ভরযোগ্য এবং তার আশ্রয়ে বাঙালীর আদি-ইতিহাসের একটা কাঠামো দাঁড় করানো কঠিন নয়।

যে-কোনও প্রত্নোৎখননের নিম্নতম স্তর প্রাসঙ্গিক প্রত্নেতিহাসের আদিতম বা প্রথম স্তর। পাণ্ডুরাজার ঢিবির এই আদিতম স্তর পলিময় পলিমাটির স্তর। এই স্তরের উপর পাওয়া গেছে নানা প্রকারের মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষের টুকরো টাক্‌রা যার ভেতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের ছোট ছোট টুকরো। সবচেয়ে উল্লেখ্য হচ্ছে, নরকঙ্কাল সমেত কয়েকটি শবসমাধি। এই কঙ্কালগুলির উপরার্ধ পাওয়া যায়নি', কিন্তু শবদেহগুলি যে পূর্বশিরে শায়িত ছিল, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। এই স্তরটি ঢাকা পড়েছে একটি শ্বেত-হরিদ্রাভ পাত্‌লা বালির আস্তরণে; উৎখনক অনুমান করেছেন, আস্তরণটি অজয়ের কোনও প্লাবনের পলিমাটি। আস্তরণটির উপর পাওয়া গেছে কিছু কাঠকয়লার টুকরো, কয়েকটি ক্ষুদ্রাশ্মের তৈরী কারুযন্ত্র এবং শ্বেতাভ চিত্ররেখাঙ্কিত ঘনধূসর রং-এর মৃৎপাত্রের কয়েকটি টুকরো।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় স্তরে আহৃত প্রত্নবস্তু ও প্রত্নতথ্য অর্থবহ। এ-স্তরে যে-সব প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে তার মধ্যে আছে নানা আকৃতি-প্রকৃতির ক্ষুদ্রাশ্মীয় কারুযন্ত্র, চিত্রিত এবং ছিদ্রকৃত লাল ও কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ, জলনালীযুক্ত মৃৎজলপাত্র, তামার তৈরী নানা অলংকার (তার ভেতর আছে পেঁচানো সর্পিল বালা, আংটি ও কাজল লাগাবার কাঠি) তামার মাছ ধরবার বঁড়শি ইত্যাদি। মৃৎপাত্রগুলির রং, গড়ন ও অলংকরণ, এগুলির আকৃতি-প্রকৃতি এবং তামার ব্যবহার, এ-সব লক্ষণ সন্দেহের কোনও অবকাশ রাখে না যে, রাঢ়ের এই অঞ্চল তখন মানব-সভ্যতার তাম্রাশ্মীয় পর্বে উন্নীত হয়েছে। তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় এই স্তরে বাস্তুনির্মাণের যে নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তার ভেতর। সরলরেখায় সুবিন্যস্ত অনেকগুলি গৃহতল এখানে গোচর হয়েছে; এই গৃহতল তৈরী করা হয়েছে গেরুয়া কাঁকর মাটি দিয়ে এবং তার উপর খুঁটি পোতার গর্তের চিহ্ন সুস্পষ্ট। একটি সরু বাঁধানো গলির কিছুটা চিহ্ন এখনও আছে; আর আছে একটি বিস্তৃত শব-সমাধিস্থান যেখানে পূর্ব-পশ্চিমশায়ী করে মৃতদেহ সমাধিস্থ

করা হ'তো। এই স্তরেই পাওয়া গেছে কিছু মাটির বড় বড় তাল যার উপর ছাপ লেগে আছে নলখাগড়ার, আর পাওয়া গেছে পোড়ামাটির টালির বড় বড় টুকরো। এ-অনুমানে বাধা নেই যে, এই স্তরের মানুষ যে-ঘরে বাস করতো তার বেড়া ছিল নলখাগড়ার যার উপর থাকতো মাটির আস্তরণ, আর চাল ছিল পোড়ামাটির টালির। উত্তর ভারতবর্ষের অন্যত্র তাম্রাশ্মীয় যুগের যে-সব লক্ষণ দেখা যায়, এই স্তরেও তার বেশ কিছু লক্ষণ স্পষ্টতই ধরা পড়েছে।

যে শব-সমাধিস্থানটির কথা এই মাত্র বলা হ'ল তার সমস্তর থেকে কুড়িয়ে নেয়া এক খণ্ড কাঠকয়লা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বীক্ষণাগারে পাঠানো হয়েছিল, তেজস্ক্রিয়-অঙ্গারক পরীক্ষা করে তার তারিখ নির্ণয়ের জন্য। সে-পরীক্ষায় যে-তারিখ নির্ণীত হয়েছে তা হ'চ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব ১২১০$\pm$১২০, অর্থাৎ ১২০ বৎসর কম বা বেশি খ্রীষ্টপূর্ব ১০১২ বৎসর। আদি-ইতিহাসের যুক্তিতেও এ-তারিখ সম্বন্ধে আপত্তি করবার কিছু নেই। এর অর্থ এই যে, পাণ্ডুরাজার ঢিবির আদিস্তরের তারিখ আনুমানিক আরও দু'শ বছর আগে, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ১২৫০।১২০০। অনুমান করা চলে, এই অঞ্চলেই এই সময় মানুষের প্রথম সমাজ-রচনার সুষ্ঠু প্রকাশ এবং সংস্কৃতির পথে প্রথম পদক্ষেপ।

এই উৎখননের তৃতীয় স্তরে বাস্তব সংস্কৃতির যে-সব উপাদান উপকরণ পাওয়া গেছে তা মোটামুটি দ্বিতীয় স্তরেরই মত। বস্তুত, আমার দৃষ্টিতে দ্বিতীয় ও তথাকথিত তৃতীয় স্তরে ভেদ কিছু আছে, এমন মনে হয় না। জলনালীযুক্ত মৃৎজলপাত্র, একপদী মৃৎভাণ্ড, নানা আকৃতি-প্রকৃতির চিত্রিত ও নকসাযুক্ত মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ, লোহিত ও কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুকরো, তামার তৈরী অলংকারাদি এবং প্রচুর ক্ষুদ্রাশ্মীয় যন্ত্রপাতিও পাওয়া গেছে। তা ছাড়া পাওয়া গেছে পশুর হাড় বা শিং-এর তৈরী কিছু যন্ত্র, কিছুটা বড় সূঁচ জাতীয়। এ-ধরনের সূঁচ দ্বিতীয় স্তরেও কিছু পাওয়া গেছে; কিন্তু এই তৃতীয় স্তরে এমন সংখ্যায় পাওয়া গেছে যাতে সন্দেহ হয়, এখানে এ-ধরনের যন্ত্র-নির্মাণের ছোটখাটো একটা কারখানাই বুঝি বা ছিল। পোড়ামাটির তৈরী একটি নারীমূর্তির দেহের কিয়দংশ এবং দু'টি বিজাতীয় পুরুষ-মূর্তির মাথাও পাওয়া গেছে এই স্তর থেকেই। রান্নার উনুনের নিদর্শনও আছে। কিন্তু তৃতীয় স্তরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও অর্থবহ আবিষ্কার হ'চ্ছে একদিকে মসৃণ তীক্ষ্ণাগ্র নবাশ্মীয় কয়েকটি celts এবং অন্যদিকে লোহার তৈরী ছোট কয়েকটি ফলা ও তীক্ষ্ণাগ্র সূঁচ। খুব তুচ্ছ পরিমাণে হ'লেও এই স্তরে লোহার এই ব্যবহার একটু বিস্ময়কর, বোধ হয়, সন্দেহজনক। এই তৃতীয় স্তরেই অনেকটা জায়গা জুড়ে প্রচুর ছাই-এর চাপ উৎখনকদের গোচরে এসেছে। এ থেকে তাঁরা অনুমান করেছেন, কোনও এক সময়ে বড় একটা অগ্নিকাণ্ডে এখানকায় অনেক ঘরবাড়ী পুড়ে গিয়েছিল; ছাইয়ের

ছাপ সেই অগ্নিদাহের। বিস্ময়কর কথা এই যে, এই ছাইএর চাপের উপরই পাওয়া গেছে আরও প্রচুর লোহার তৈরী যন্ত্রপাতি এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যাচ্ছে একেবারে নূতন ধরনের মৃৎপাত্রশিল্পের প্রচুর নিদর্শন, যা সাধারণত পাওয়া যায় ৬০০—২৫০ খ্রীষ্টপূর্ব কালের ভূগর্ভ স্তরে। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ মনে করেন, অগ্নিদাহের পর জায়গাটি পরিত্যক্ত হয়েছিল; পরে ৬০০-২৫০ খ্রীষ্টপূর্ব তারিখের ভেতর কোনও নূতন আগন্তুকেরা এখানে এসে বসবাস শুরু করেন; মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষগুলি তাদেরই সংস্কৃতির পরিচায়ক। কিন্তু লোহার যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র যা তৃতীয় স্তরে পাওয়া গেছে তা নিয়ে এ-ধরনের কোনও সন্দেহ নেই, অন্তত উৎখনকদের মনে; তাঁদের দৃঢ় ধারণা, খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক ১০০০ বৎসরের কাছাকাছি, তৃতীয় স্তরে একই সঙ্গে ক্ষুদ্রাশ্মীয় যন্ত্রপাতি, তামার অলংকারাদি এবং লোহার যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র একই সঙ্গে ব্যবহৃত হ'তো। উল্লেখ প্রয়োজন যে, লোহার অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে বাঁটসহ তীক্ষ্ণমুখ একটি ছোট তরোয়াল, নাতিক্ষুদ্র তীরের শিরাগ্র এবং একটি নাতিক্ষুদ্র bar celt। ব্যক্তিগত ভাবে আমি এ সম্বন্ধে উৎখনকদের মতামতে গভীর সন্দিহান। আমার ধারণা, তৃতীয় স্তরের লোহ-অভিজ্ঞান যা কিছু সমস্তই কিছুটা পরবর্তী কালের; নূতন ধরনের মৃৎপাত্র নিয়ে যে-সব নূতন আগন্তুক এসেছিল এখানে নূতন বসতি স্থাপন করতে তারাই নিয়ে এসেছিল লোহার ব্যবহার, লোহার যন্ত্রপাতি, লোহার অস্ত্রশস্ত্র। এবং এ-ব্যাপারটা খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০ শতকের আগে ঘটেছিল বলে একেবারেই আমার মনে হয় না।

আমার সন্দেহের প্রথম কারণ, পাণ্ডুরাজার ঢিবির উৎখননের চতুর্থ স্তরে লোহার তৈরী কোনও যন্ত্রপাতি, কোনও অস্ত্রশস্ত্র-নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়নি, যা, উৎখনকের যুক্তিতে, পাওয়া উচিত ছিল। অন্তত পরেশচন্দ্রের বিবরণে তার কোনও উল্লেখ নেই। তৃতীয় স্তরে লোহা ব্যবহারের প্রচলন থাকলে চতুর্থ স্তরে তার অভিজ্ঞান আরও অনেক বেশি থাকবার কথা; বস্তুত তা নেই। সন্দেহের দ্বিতীয় কারণ, ভারতবর্ষে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে লোহার ব্যবহারের সূচনা ও বিস্তৃতির দীর্ঘ ইতিহাস এবং অন্যদিকে মানব-সংস্কৃতির বিকাশে লোহা-ব্যবহারের প্রভাব ও প্রতিপত্তির ইতিহাস। এই উভয় ইতিহাসের আলোচনার স্থান এই গ্রন্থের পরিশিষ্টের পরিমিত সীমার মধ্যে সম্ভব নয়; হয়ত প্রয়োজনও নেই। শুধু এটুকু বলাই বোধ হয় যথেষ্ট যে, পশ্চিম এশিয়া থেকে শুরু করে লোহার ব্যবহার তক্ষশিলা ভেদ করে (খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক ১১০০-১০০০), পশ্চিম যুক্ত-প্রদেশের আত্রাঞ্জিখেরা হ'য়ে (আনুমানিক ৯০০), বিহার ছুঁয়ে (আনুমানিক ৮০০-৭০০) রাঢ়দেশে পৌঁছুতে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০'র আগে হ'বার কথা নয়। অবশ্য আমি অবহিত আছি যে, ছোটনাগপুর অঞ্চলে আকরিক লৌহবালুকা থেকে লোহা গলাবার আদিম একটা পদ্ধতি স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই ঢিবির তৃতীয় স্তরে পাওয়া লৌহ যন্ত্রগুলির লোহা এই আদিম

পদ্ধতিতে তৈরী লোহা বলে মনে হয় না। আমার ভুল হ'তে পারে, কিন্তু এই স্তরে লোহা ব্যবহারের যে-তারিখ (খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০) পরেশচন্দ্র ধার্য করতে চান সে-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ রয়ে গেল। আমার সন্দেহের তৃতীয় কারণ, বোলপুর-সন্নিহিত মহিষদলে লোহা ব্যবহারের তারিখ; তেজস্ক্রিয়-অঙ্গারক পরীক্ষায় এখানকার যে-তারিখ নির্ণীত হয়েছে তা খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০'র আগে নয়।

যাই হোক, পাণ্ডুরাজার ঢিবির চতুর্থ স্তরের উৎখনন-বিবরণ পড়ে আশংকা হয়, এখানকার ভূমিস্তর একাধিকবার বেশ আবর্তিত হয়েছে; কখন হয়েছে, বলা কঠিন। এই স্তরের দুই পর্যায়ে যে-সব প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে তা একই সংস্কৃতির লক্ষণে চিহ্নিত, এমন মনে হয় না। ত্রিকোণাকৃতি পোড়ামাটির বাটি, সাধারণ মৃৎভাণ্ড, লাল রং এর মৃৎপাত্র, মুদ্রিত অথবা খাদিত নানা নকসাযুক্ত মৃৎভাণ্ড, জলের ঝাঁঝরি, কয়েকটি পোড়ামাটির পশু ও স্ফীতবক্ষ নারীমূর্তি, সুবিন্যস্ত একসারি মাছ ও তার উপর তির্যক রেখায় খোদাই করা একটি মৃৎভাণ্ড প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ এই স্তর থেকে আহৃত হয়েছে। এ-সমস্তই অল্পবিস্তর পরিচিত ঐতিহাসিক কালের; এই সব বস্তু আদি-ইতিহাসের লক্ষণে চিহ্নিত নয়, এবং সে-ঐতিহাসিক কাল মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৩০০।২৫০ পর্যন্ত বিস্তৃত। চতুর্থ স্তরের একটি গর্তে কাল steatite পাথরের একটি গোল শীলমোহর পাওয়া গেছে; এই প্রত্নদ্রব্যটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। শীলমোহরটির উপর তিনভাগে বিভক্ত তিনটি উচ্চাবচ (relief) চিত্র যার বিষয় উদ্ধার করতে আমি অপারগ। পরেশচন্দ্র এই চিত্রগুলির একটা বর্ণনা দিয়েছেন; সে-বর্ণনা আমি ছবির সঙ্গে ঠিক মেলাতে পারছিনে। জনৈক ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক বলেছেন, শীলমোহরটির উৎস প্রাচীন মিনোয়া (Minoan) সংস্কৃতি। এ-উৎস আমি দেখতে পাচ্ছিনে, সংখেদে তা স্বীকার করছি। এই শীল-মোহরটির এবং একটি মৃৎফলকের অভিজ্ঞান, তমলুকে প্রাপ্ত কয়েকটি মৃৎভাণ্ডের ভগ্নাবশেষ, চব্বিশপরগণা জেলার হরিনারায়ণপুর ও চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত কয়েকটি শীল-মোহর ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষের মধ্যে পরেশচন্দ্র প্রাচীন ক্রিটিয় (Cretan) ও মিশরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির লক্ষণ লক্ষ্য করেছেন এবং তা থেকে অনুমান করেছেন, পাণ্ডুরাজার ঢিবির এবং বাঙালীর আদি-ইতিহাসের সংস্কৃতি ও জীবনচর্যা প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর ছিল, এবং সে ব্যবসাবাণিজ্য বৈদিশিক, ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে। এ-অনুমান যথার্থ কি অযথার্থ, তা বলা আমার পক্ষে আপাতত কঠিন, যেহেতু আমি পরেশচন্দ্র-কথিত সাদৃশ্যগুলি সম্বন্ধে কিছুটা সন্দিহান, এবং এই অনুমিত সাদৃশ্য ছাড়া এ-পর্বে এ-ধরনের বিস্তৃত বৈদিশিক বাণিজ্যের অন্য কোনও প্রমাণ এখনও দেখতে পাচ্ছিনে।

প্রাচীন রাঢ়ের, বিশেষভাবে পূর্বোক্ত নদনদীগুলির তীরে তীরে নানা জায়গায়

তাম্রাশ্মীয়-নবাশ্মীয় পর্বের নানা প্রত্ন-নিদর্শন পাওয়া গেছে, কিন্তু পাণ্ডুরাজার ঢিবির উৎখননই এই সব আবিষ্কারের সূচনায়। বস্তুত, এই ঢিবিই বাঙালীর আদি ইতিহাসের কুঞ্চিকা। এই কারণেই এই উৎখননের বিবরণ একটু সবিস্তারেই বলতে হ'লো।

এই উৎখনন-বিবরণের পরই বলতে হয় বোলপুর-সন্নিহিত কোপাই-তীরবর্তী মহিষদল গ্রামে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের উৎখননের কথা। এখানকার প্রথম স্তর একান্তই তাম্রাশ্মীয়। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে যেমন, এখানেও সেই মাটিরআস্তরণ-যুক্ত নলখাগড়ার দেয়ালওয়ালা ঘরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ, পাথরের ধারালো ফলার যন্ত্রপাতি, তামার তৈরী চ্যাপ্টা celt, কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ, লাল মৃৎপাত্রের টুকরো, নালিযুক্ত জলপাত্র। তা ছাড়া উল্লেখ্য হ'চ্ছে, এখানে পাওয়া গেছে বেশ কিছু পরিমাণে পোড়া ধান-চালের অঙ্গার। তেজস্ক্রিয় অঙ্গার পরীক্ষায় এই স্তরের তারিখ নির্ণীত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ১৯১৭ থেকে ৮৫৫'র ভেতর। দ্বিতীয় স্তরেও একই ধরনের মৃৎপাত্র-নিদর্শন তবে এই স্তরের পাত্রগুলির প্রকৃতি একটু স্থূল। কিন্তু এই স্তরের বিশিষ্ট লক্ষণ হ'চ্ছে লোহার আবির্ভাব। এই স্তরেও তেজস্ক্রিয় অঙ্গার পরীক্ষা হয়েছে; তারিখ পাওয়া গেছে খ্রীষ্টপূর্ব মোটামুটি ৭০০।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব সংস্থা অজয়-কুনুর-কোপাইর অববাহিকার নানা প্রত্নস্থানে প্রচুর প্রত্নানুসন্ধান করেছেন। বসন্তপুর, রাজার ডাঙ্গা, গোস্বামীখণ্ড, মঙ্গলকোট, গঙ্গাডাঙ্গা, কীর্ণাহার, চণ্ডীদাস-নান্নুর, বেলুটি, সুপুর, মন্দিরা, শালখানা, সুরথরাজার ঢিবি, যশপুর প্রভৃতি নানা জায়গায় প্রত্নানুসন্ধানে যা পাওয়া গেছে তা প্রায় সবই তাম্রাশ্মীয় পর্বের এবং মোটামুটি পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও মহিষদলের সাংস্কৃতিক জীবনের সমর্থক। বস্তুত, সন্দেহের কোনও কারণ নেই যে, এই অঞ্চলেই ইতিহাসের তাম্রাশ্মীয় পর্বের বাঙালী বসতিস্থাপন করে বাস্তু তৈরী করে শস্যোৎপাদনে, পশুপালনে এবং সমাজ-গঠনে প্রথম অভ্যস্ত হয়েছিল।

১৯১৭এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-সংস্থা বর্ধমান শহর থেকে ২৮-২৯ কিলোমিটার উত্তরে বড়বেলুন গ্রামের বানেশ্বরডাঙ্গায় কিছু প্রত্নোৎখনন করেছিলেন। এই খননেরও প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে তাম্রাশ্মীয় পর্বের বাস্তব সভ্যতার নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডক্টর শ্রীমতী অমিতা রায়ের সৌজন্যে এবং পরেশচন্দ্রের অনুগ্রহে পরেশচন্দ্রেরই রচিত এই খননের একটি সংক্ষিপ্ত (অপ্রকাশিত) বিবরণ আমার দেখবার সুযোগ হয়েছে। তাতে দেখতে পাচ্ছি, এখানে প্রাপ্ত নানা আকৃতি-প্রকৃতির মৃৎপাত্রাবশেষের প্রাচুর্য যেন পাণ্ডুরাজার ঢিবির চেয়েও বেশি। ক্ষুদ্রাশ্মীয় যন্ত্রপাতির ভগ্নাংশ, হাড় ও তামার তৈরী দ্রব্যাদি এবং ঘরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে, যেমন পাওয়া গেছে এই পর্বে পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও মহিষদলে। কিছু কিছু অভিজ্ঞান থেকে মনে হয়, এই পর্বে এখানকার মানুষ ধান চাষ করতো, মাছ

এবং পশু শীকারও করতো ; প্রচুর মাছ ও পশুর কাঁটা ও হাড় পাওয়া গেছে এই প্রত্নস্থানের প্রথম দুই স্তরেই। তৃতীয় স্তরে পাওয়া গেছে লোহা ব্যবহারের কিছু অভিজ্ঞান। চতুর্থ স্তরে ঐতিহাসিক পর্ব শুরু হয়ে গেছে।

১৯১৭এ ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ডক্টর অমিতা রায়-এর নেতৃত্বে এক বিস্তৃত প্রত্নানুসন্ধানাভিযান চালিয়েছিলেন ময়ূরাক্ষী-বক্রেশ্বর ও অজয়-কুনুর-দামোদরের অববাহিকার নানা অঞ্চলে। আমার প্রাক্তন ছাত্রী অমিতা রায় এই অভিযানের যে-প্রতিবেদন রচনা করেছেন তার একটি প্রতিলিপি তিনি আমায় ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন রাঢ়ের বিস্তৃত অংশে বাঙ্গালীর আদি-ইতিহাসের চেহারাটা কি ছিল তার একটি মোটামুটি সামগ্রিক পরিচয় এ-যাবৎ অপ্রকাশিত এই প্রতিবেদনটিতে পাওয়া যায়।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি, বানেশ্বরডাঙ্গা, মহিষদল, ভরতপুর ও অন্যান্য প্রত্নস্থান থেকে আদি-ইতিহাসের যে-চিত্র দৃষ্টিগোচর, ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযানের আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু সমস্তই সে-চিত্রকে আরও স্ফুটতর করেছে। তবে, এ-অভিযান থেকে মনে হচ্ছে, ময়ূরাক্ষী-বক্রেশ্বর-কোপাই-অজয়-কুনুর-দামোদরবিধৌত রাঢ়দেশেও তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির বিস্তার সর্বত্র সমান নয়। ময়ূরাক্ষী-বক্রেশ্বরের উপর দিকের প্রবাহে, অর্থাৎ বীরভূম জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে এ-সংস্কৃতির বিস্তার অপেক্ষাকৃত কম, মধ্য ও দক্ষিণাংশে বেশি, এবং পূর্বদিকে, অর্থাৎ বক্রেশ্বর-অজয়-দামোদরের সংযোগ স্থলের দিকে এগিয়ে গেলে মনে হয়, তাম্রাশ্মীয়-পর্বের লোকেরা যেন ক্রমশ সেইদিকেই বিস্তৃত হতে থাকে। যাই হোক, এ-বিষয়ে কোনও সংশয় নেই যে, তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল এই ময়ূরাক্ষী-বক্রেশ্বর-অজয়-কুনুর-দামোদরের অববাহিকা অঞ্চল। এই উর্বর, শস্যবহুল অঞ্চলের সঙ্গে জলপথে ও স্থলপথে দেশের ও বিদেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল, এ-সম্বন্ধেও সন্দেহ নেই, এবং এই কারণেই এই অঞ্চলে এতগুলি তাম্রাশ্মীয় প্রত্নস্থান ইতস্তত প্রকীর্ণ।

এই অঞ্চলে নবাশ্মীয় celts অনেকগুলি প্রত্নস্থান থেকেই পাওয়া গেছে, কিন্তু নবাশ্মীয় প্রাথমিক কৃষি-সংস্কৃতি থেকে কি করে তাম্রাশ্মীয় পর্বের বিবর্তিত বিস্তৃত কৃষি-সংস্কৃতির উদ্ভব হ'লো তার কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক অভিজ্ঞান আজও আমাদের জানা নেই। পাণ্ডুরাজার ঢিবির প্রথম স্তরের প্রত্নবস্তুর মধ্যেও এ সম্বন্ধে যা অভিজ্ঞান পাওয়া যায়, তা খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার নয় ; সেখানে নবাশ্মীয় ও তাম্রাশ্মীয় অভিজ্ঞান এমনভাবে মিশে আছে যে, তা থেকে সুস্পষ্ট কোনও ধারণা করা যায় না।

তাম্রাশ্মীয় পর্বের প্রধান লক্ষণ যে কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্র, অমিতা রায়-এর অভিযানের পর এ-সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে, এই ধরনের মৃৎপাত্রের বিস্তৃতি এ-অঞ্চলের সর্বত্র সমান নয়। যা' হোক, তাঁর এ-অনুমান হয়ত যথার্থ যে, তাম্রাশ্মীয় এই

সংস্কৃতিই গ্রাম্য-সমাজ সংঘটন ও উন্নততর, বিস্তৃততর কৃষিকর্মের দ্যোতক। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এই সংস্কৃতির সঙ্গে নাড়ীর যোগ ছিল গাঙ্গেয় ভারত, মধ্যভারত ও রাজস্থানের তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির। কিন্তু, এমনও তো হ'তে পারে যে, এই যোগাযোগটা ঘটেছিল গাঙ্গেয় ভারতের মাধ্যমে নয়, ওড়িশার মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে অমিতা রায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কিছু কিছু ক্ষুদ্রাশ্মীয় যন্ত্রপাতি এবং কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষের প্রতি, যা পাওয়া গেছে বীরভূম-বর্ধমানে নয়, পাওয়া গেছে কংসাবতী-বিধৌত মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায়, অর্থাৎ যার ইংগিত ওড়িশামুখী।

মহিষদল-উৎখননের প্রথম স্তরে তামার তৈরী ভাঙ্গা একটি কুড়োল মত জিনিস পাওয়া গেছে। ঠিক এই ধরনের তামার তৈরী কুড়ালোপম প্রত্নবস্তু কিছু কুড়িয়ে পাওয়া গেছে মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার নানা প্রত্নস্থান থেকে। ইতিহাসের আদি-পর্বে এই অঞ্চলে তামার তৈরী যন্ত্র, অস্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল, সন্দেহ নেই, কিন্তু এর পূর্বাপর ইতিহাস কি, এই বিশিষ্ট ধাতুশিল্পটির কি স্থান ছিল এই অঞ্চলের সমসাময়িক অর্থনৈতিক জীবনে, সে-সম্বন্ধে কোনও ধারণা করবার উপায় এখনও নেই।

অমিতা রায়-এর অভিযান-প্রতিবেদন থেকে একটি তথ্য যেন কিছুটা স্পষ্টতর হয়ে ধরা পড়েছে। দেখা যাচ্ছে, ময়ূরাক্ষী-বক্রেশ্বর-অজয় অঞ্চলে তাম্রাশ্মীয় পর্বের এবং লোহা-ব্যবহারকারী লোকদের পর নিরবচ্ছিন্ন জনবসতি আর যেন নেই। যে-কারণেই হোক, এ-অঞ্চল থেকে মানুষ যেন অন্যত্র সরে গেছে। কিন্তু অজয়-কুনুর-দামোদর-ভাগীরথী অঞ্চলের আদি-ঐতিহাসিক চিত্রটা যেন বেশ অন্য প্রকারের। এ-অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে বেশ একটু লক্ষ্যণীয় বৈষয়িক সমৃদ্ধি যেন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। পাণ্ডুরাজার ঢিবির তৃতীয় স্তরেই তা কিছুটা দেখা গেছে, কিন্তু তা স্পষ্টতর হয়েছে অজয়-কুনুর-ভাগীরথীর সংযোগস্থলের প্রত্নস্থানগুলিতে। এ-অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে, লৌহ-ব্যবহার-চিহ্নিত সমৃদ্ধ জনবসতি নিরবচ্ছিন্নতায় ঐতিহাসিক কালে এসে মিশে গেছে। খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক ৩০০ নাগাদ এই অঞ্চল যে সমসাময়িক উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এ-সম্বন্ধে সন্দেহের আর কোনও অবকাশ নেই। যে-সব প্রত্নবস্তু এ-অঞ্চলের প্রত্নস্থানগুলিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে, যেমন, উত্তর-ভারতীয় কৃষ্ণচিক্কণ মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ, নানা চিহ্নে মুদ্রিত মুদ্রা, ছোটবড় bead ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য, তার ভেতরই সে-সাক্ষ্য নিহিত। বস্তুত, খ্রীষ্টপূর্ব মোটামুটি ৩০০ থেকে শুরু করে খ্রীষ্ট-পরবর্তী ২০০ বৎসরের মধ্যে পূর্ব বীরভূম (যেমন, কোটাসুর গ্রাম) থেকে শুরু করে সমুদ্রশায়ী মেদিনীপুর, যেমন, তাম্রলিপ্ত বা তমলুক), নিম্নগাঙ্গেয় ২৪ পরগণা (যেমন, চন্দ্রকেতুগড়), ভাগীরথীধৃত

মুর্শিদাবাদ (যেমন, চিরুটি), গাঙ্গেয় উত্তরবঙ্গ (যেন, মহাস্থান গড়) পর্যন্ত যে একটি বিস্তৃত সমৃদ্ধ সমাজ-জীবন ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ গত ২৫/৩০ বৎসরের মধ্যে আহৃত হয়েছে, কিছু উৎখননের ফলে, অধিকাংশ প্রত্নানুসন্ধানের ফলে। কোটাসুর, চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানে প্রাপ্ত আরোপিত অলংকরণযুক্ত পোড়ামাটির শিল্পদ্রব্য, অজয় কুনুর-ভাগীরথীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে এবং নিম্নগাঙ্গেয় ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব-বীরভূমের বহু প্রত্নস্থলে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত উত্তর-ভারতীয় কৃষ্ণচিক্কণ মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ, চিহ্নমুদ্রিত মুদ্রা, ঢালাই করা তাম্রমুদ্রা, পোড়ামাটির ঝাঁঝরা, ধূসর মৃৎপাত্রের টুকরো, নানা রকমের পোড়ামাটির নরনারী ও পশুমূর্তি, খেলনা, কুণ্ডলীকৃত নকসাযুক্ত মৃৎপাত্র প্রভৃতি প্রত্নদ্রব্যের মধ্যেই সে-প্রমাণ সোচ্চারে বিদ্যমান। এ-অনুমানে বোধ হয় বাধা নেই যে, এই সমৃদ্ধ সমাজ-জীবন ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল প্রধানত মৌর্যযুগে বঙ্গদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রভাব-পরিধির অন্তর্ভুক্ত হবার সময় থেকে এবং এর মূলে ছিল ক্রমবর্ধমান লৌহ-যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং ধানচাষের বিস্তার। এর প্রস্তুতি-পর্বের শুরু অবশ্য তাম্রাশ্মীয় পর্ব থেকেই, বিশেষভাবে লোহার যন্ত্রপাতির প্রচলন (খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক ৭০০-৬০০) থেকে।

তৃতীয় অধ্যায়

দেশ-পরিচয়

এ-অধ্যায়ে সংযোজন করবার মতন উল্লেখ্য তথ্য ইতিমধ্যে বিশেষ কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। তবে, আগে চোখে পড়েনি এমন দু'চারিটি ছোট ছোট তথ্য ইতিমধ্যে গোচরে এসেছে। অবশ্য, সেগুলো এমন কিছু অর্থবহ নয় যার ফলে ইতিহাসে নূতন আলোক-পাত ঘটতে পারে। সুতরাং সে-সব তথ্য আর বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত করছি না; অকারণ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করে লাভ নেই। কিন্তু মূল রচনায় তথ্য-বিশৃঙ্খলা কিছু এখানে সেখানে ছিল, শিথিল বাক্য বা বাক্যাংশও ছিল; সেগুলো সংশোধন করা হ'চ্ছে।

৩। নদনদী। গঙ্গা-ভাগীরথী, আদিগঙ্গা, সরস্বতী, দামোদর ও রূপনারায়ণ।

মূল গ্রন্থে নদনদী প্রসঙ্গে যা বলেছি তাতে নূতন কিছু সংযোজন বা সংশোধনের কিছু আছে বলে মনে হয় না, দু'একটি শিথিল বাক্য বা বাক্যাংশ ছাড়া। তবে, গঙ্গা-ভাগীরথীর নিম্নতম প্রবাহ এবং তার সঙ্গে আদিগঙ্গা, সরস্বতী, দামোদর ও রূপনারায়ণের সম্বন্ধ-বিষয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ ত্রিশ বছর আগে যা করেছিলাম তা এখন কেমন যেন একটু অস্পষ্ট ও বিশৃঙ্খল বলে মনে হ'চ্ছে, যদিও তথ্যের দিক থেকে ভুল কিছু তখন করিনি। তা ছাড়া, এই তৃতীয় সংস্করণের প্রুফ পড়া এবং ভারতীয় ভূগোল সমিতির প্রথম নির্মলকুমার বসু স্মারক-বক্তৃতাটি (Chandraketugarh and Tamralipta : two port-towns of ancient Bengal and connected considerations) রচনা উপলক্ষে প্রসঙ্গটি নূতন করে বিচার বিবেচনা করতে হ'লো। এ-গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে যা বলেছিলাম প্রায় তাই এখানে বলছি, তবে আরও সংক্ষেপে এবং কিছুটা স্পষ্টতর করে এবং তথ্য ও যুক্তি-শৃঙ্খলায় সাজিয়ে।

গঙ্গা-ভাগীরথী ॥ ত্রিবেণী-হুগলী থেকে শুরু করে সোজা একেবারে সমুদ্র পর্যন্ত যে-প্রবাহকে সাধারণ ভাবে এখন বলা হয় হুগলী নদী, রাজমহলের ভেতর দিয়ে বাঙলা দেশে ঢোকার পর ফরাক্কা থেকে সমুদ্র পর্যন্ত যে-প্রবাহকে আমরা বলি গঙ্গা, লক্ষ্মণ-সেনের গোবিন্দপুর লিপিতে (আনুমানিক, ১১৭৫ খ্রী) বেতড্ড চতুরকের (হাওড়া জেলার বেতড় গ্রাম) পাশ দিয়ে দক্ষিণমুখী যে-প্রবাহটিকে বলা হয়েছে জাহ্নবী, মৎস্যপুরাণোক্ত যে-প্রবাহটি বিন্ধ্যশৈলগাত্রে প্রতিহত হ'য়ে, ব্রহ্মোত্তর (উত্তর রাঢ়) দেশ ভেদ করে, (পূর্বে) বঙ্গ ও (পশ্চিমে) তাম্রলিপ্ত (সুহ্মদেশের অন্তর্গত) স্পর্শ করে প্রবেশ করেছে গিয়ে সমুদ্রে এবং যে-গঙ্গা প্রবাহটিকে বলা হয়েছে ভাগীরথী, সেই গঙ্গা-ভাগীরথী প্রবাহই এই নদীর প্রাচীনতম ও প্রধানতম প্রবাহ। এই প্রবাহ-পথটি সম্বন্ধে সন্ধান-সম্ভাব্য ও বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যাদি যতটুকু জানা যায় তা'তে খানিকটা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায় যে, অন্তত পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক অবধি দক্ষিণে ক'লকাতা-বেতড়

পর্যন্ত এই প্রবাহ-পথের অদল-বদল বিশেষ কিছু ঘটেনি। যা ঘটেছে তা ক'লকাতা বেতড়ের দক্ষিণে, গঙ্গার নিম্নতম প্রবাহে। এই নিম্নতম প্রবাহ সম্বন্ধে কিছু কিছু ঐতিহাসিক ইঙ্গিত বায়ু ও মৎস্যপুরাণে, মহাভারতে, Periplus-গ্রন্থে ও টলেমির বিবরণীতে জানা যায়। ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গাকে মর্তে নামিয়ে আনার গল্পটি মৎস্যপুরাণে আছে, রামায়ণেও আছে, আর যুধিষ্ঠির যে এই ভাগীরথী প্রবাহের সাগর-সংগমেই তীর্থ-স্নান করেছিলেন সে-কথা বলা হয়েছে মহাভারতে। Periplus এ আছে গঙ্গা (Gange) বন্দরের কথা যার অবস্থিতি ছিল গঙ্গানদীর তীরে। টলেমিও বলেছেন এই একই গঙ্গাবন্দরের কথা ; তার অবস্থিতি ছিল গঙ্গারাষ্ট্র দেশে ; এ-দেশ নিশ্চয়ই ছিল গঙ্গার তীরেই। টলেমি তাম্রলিপ্তের (Tamalites) কথাও বলেছেন, এবং তার অবস্থিতি ছিল গঙ্গার তীরে, যে-গঙ্গার তীরে (অবশ্যই আরও অনেক উত্তরে) অবস্থিতি ছিল Palimbothra বা পাটলীপুত্র নগরের। স্বভাবতই প্রশ্ন হ'বে, Gange বন্দরের গঙ্গা আর তাম্রলিপ্ত বন্দরের গঙ্গা, দুইই কি একই গঙ্গা? লিপি, সাহিত্য ও প্রত্নসাক্ষ্যের ইঙ্গিত থেকে মনে হয়, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যেই তাম্রলিপ্তের, এবং চন্দ্রকেতু গড় ও Gange যদি এক হয় তাহলে গঙ্গাবন্দরেরও, বন্দর হিসেবে অস্তিত্ববিলোপ ঘটেছিল, খুব সম্ভব নদীপ্রবাহ শুকিয়ে যাবার দরুণ। কিন্তু যে এক বা একাধিক নদীপ্রবাহ শুকিয়ে গেল তা কোন এক বা একাধিক নদীর ?

এ-প্রশ্নের যথাযথ, নিশ্ছিদ্র উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। তবে, কিছুটা নির্ভরযোগ্য ইংগিত পাওয়া একেবারে হয়ত অসম্ভব নয়। সে-ইংগিত পেতে হ'লে সরস্বতী, আদি-গঙ্গা, দামোদর ও রূপনারায়ণ, অন্তত এই চারটি নদীর ইতিহাস ও সে-ইতিহাসের সঙ্গে গঙ্গা-ভাগীরথীর নিম্নতম প্রবাহের সম্বন্ধ কি ছিল মোটামুটি তার একটু হিশেব নেওয়া প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, সপ্তম-অষ্টম শতকের পর ও পঞ্চদশ শতকের আগে এ-সম্বন্ধে কোনো তথ্যই আমাদের জানা নেই ; যা আছে তা পঞ্চদশ শতকে ও তার পরে।

আদিগঙ্গা ॥ এই নদীটির প্রথম বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে বিপ্রদাস পিপিলাই'র (১৪৯৫ খ্রী) মনসামঙ্গল গ্রন্থে এবং পরে সংক্ষিপ্ততর পরিচয় পাওয়া যায় জাও দ্য বারোস ও ফান ডেন ব্রোকের নকসায় (যথাক্রমে ১৫৫০ ও ১৬৬০ খ্রী।) এ সম্বন্ধে যা বলবার মূলগ্রন্থেই বলা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় শুধু এই যে, আদিগঙ্গার উৎপত্তি হ'চ্ছে ক'লকাতা-বেতড়ের দক্ষিণে গঙ্গা-ভাগীরথীর বাম দিক থেকে ; নদীটি প্রথম পূর্ববাহিনী ও পরে দক্ষিণবাহিনী হয়ে সোজা চলে গেছে সাগর-সংগমে। পথে যে-সব জায়গা পড়ছে তা অনুসরণ করলে সন্দেহ থাকে না যে, এই প্রবাহ একসময় (পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতক, আনুমানিক) গঙ্গার অন্যতম প্রধান প্রবাহ ছিল। কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতই মন অধিকার করে। প্রথমত, এ-প্রবাহটিকে আদিগঙ্গা বলা

হয় কেন? কখন থেকে বলা হয়? এ-প্রবাহ কখনও কি গঙ্গার নিম্নতম প্রবাহে আদিমতম, প্রাচীনতম প্রবাহ ছিল? তা তো মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, এ-প্রবাহকে কখনও ভাগীরথী বলা হ'তো কি? হ'তো বলে তো কোনো প্রমাণ নেই। তৃতীয়ত, এ-প্রবাহটির সূচনা কবে থেকে এবং কি কারণে হয়েছিল? গঙ্গা-ভাগীরথীর মূল প্রবাহ কি শুকিয়ে গিয়েছিল? যদি তা হয়ে থাকে, কবে হয়েছিল? তৃতীয় যুগ্ম প্রশ্নটির কোনো উত্তর আমাদের জানা নেই; জানবার উপায়ও বোধ হয় আর নেই। যাই হোক, অষ্টাদশ শতকের আগেই এই অর্বাচীন নদীটি হেজে মজে মরে গেল, এবং গঙ্গা তার প্রাচীনতম ভাগীরথী (সরস্বতী) প্রবাহপথেই ফিরে গেল।

সরস্বতী ॥ গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে ত্রিবেণীতে ভাগীরথী-প্রবাহ থেকেই সরস্বতীর উদ্ভব এবং সেই উদ্ভবের অদূরেই সপ্তগ্রাম বন্দর, সরস্বতী-তীরে। সরস্বতী ত্রিবেণী থেকে দক্ষিণমুখী হয়ে ডোমজুর, আন্দুল স্পর্শ করে ভাগীরথীতেই আবার ফিরে এসেছে, সাকরাইলের কাছে। যত শুকনোই হোক সে-প্রবাহ, তার এই পথই বর্তমান পথ। কিন্তু ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে (অর্থাৎ, দা বারোস ও ফান ডেন ব্রোকের নক্সায়) সরস্বতী ত্রিবেণী থেকে মুক্ত হয়ে শাহনগর, চাঁমহা, সুন্দরী, আমগাছি স্পর্শ করে সেখান থেকে পূর্বমুখী হয়ে বেতড়ে এসে ভাগরথীতে তার জল ঢেলে দিত। Pistola বা পিছলদা থেকে সরস্বতীর জল প্রবাহিত হয় গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রাচীন খাতে। পর্টুগীজরা প্রথম সপ্তগ্রামে (Satgaw = Satgaon) আসে ১৫১৮ ও ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে, চট্টগ্রাম বন্দর থেকে। সরস্বতী বেয়ে জাহাজ চলাচল তখন সুগম ছিল না। বারোস বলছেন, "Satgaw (Satgaon) is a great and noble city though less frequented than Chittagong on account of the port not b ing so convenient for the entrance and departure of ships"। কিছুদিন পর, ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে Caesar Fredrich বলছেন, বড় বড় জাহাজগুলো সরস্বতী বেয়ে বেতড়ের উত্তরে আর যেতে পারতোনা; ছোট জাহাজগুলোও যে যেতো তা-ও কোনো মতে। বড় জাহাজগুলো সপ্তগ্রাম যেতো গঙ্গা-ভাগীরথী উজান বেয়ে; প্রথম ত্রিবেণী, তারপর সরস্বতী তীরে সপ্তগ্রাম।

দামোদর ॥ দামোদরের ইতিহাস দীর্ঘ, কিন্তু সে-দীর্ঘ ইতিহাসে আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের সমসাময়িক কালে গঙ্গা-ভাগীরথীর নিম্নতম প্রবাহে দামোদরের প্রধান প্রবাহটি দক্ষিণবাহী হয়ে হাওড়া জেলায় প্রবেশ করছে ভুরসুট (প্রাচীন, ভূরিশ্রেষ্ঠী?) গ্রামের কাছে। সেখান থেকে আমতা হ'য়ে বাগনানের ভেতর দিয়ে এই প্রবাহ এসে পড়েছে ভাগীরথীতে, ফল্তার উলটো দিকে। অথচ, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে এ-প্রবাহটি প্রধান প্রবাহ-পথ ছিল না; সে-প্রবাহপথ ছিল যাকে বলা হয় কানা দামোদর বেয়ে। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের একটি নকসায় এই কানা দামোদর বেশ

বড় নদ এবং এই নদ ভাগীরথীতে এসে পড়তো উলুবেড়িয়ার উত্তরে। সে-প্রবাহ এখনও আছে, কিন্তু ক্ষীণতর। দ্য বারোস ও ব্লেভের (Blaev) নক্সায় (যথাক্রমে ১৫৫০ ও ১৬৫০) দেখছি, দামোদর দুমুখী হ'য়ে ভাগীরথীতে এসে পড়ছে, একটি মুখ ফলতার উলটো দিকে, মাঁনং পয়েন্ট ফোর্টের কাছে, Pistola বা পিছলদহ গ্রামের একটু উত্তরে। আর একটি মুখ উলুবেড়িয়ার উত্তরে, সিজবেড়িয়া খাল বা কানা দামোদর পথে, ভাগীরথীতে। ফান ডেন ব্রোকের নক্সায় (১৬৬০) কিন্তু দামোদর সম্বন্ধে বিচিত্র এবং নূতনতর খবর পাওয়া যাচ্ছে। এ নকসায় দেখছি, দামোদরের প্রধান প্রবাহটি সোজা দক্ষিণাবহী হয়ে পড়ছে এসে রূপনারায়ণে, হাওড়া জেলায় বক্সী খালের কাছে। ক্ষীণতর দ্বিতীয় একটি শাখা দামোদরের বর্তমান প্রবাহপথ দিয়ে সোজা চলে গেছে ভাগীরথীতে। আর, তৃতীয় একটি প্রশস্ত প্রবাহ বর্ধমান শহরের পূর্বদিক স্পর্শ করে, বোধ হয় গাঙ্গুর নদীর প্রবাহ পথ বেয়ে, সোজা গিয়ে পড়েছে ভাগীরথীতে, কালনার কাছে। দামোদরের এই প্রবাহটিই কেতকাদাস-ক্ষমানন্দের বাঁকা দামোদর, যার জল, ক্ষমানন্দ বলছেন, "গঙ্গার জলে মিলিয়া" গেল।

রূপনারায়ণ ॥ দামোদর-প্রসঙ্গে এইমাত্র দেখা গেল, আগে যাই হোক, সপ্তদশ শতকে দামোদরের প্রধান প্রবাহ হাওড়া জেলার বক্সী খাল বেয়ে রূপনারায়ণে এসে পড়েছে এবং রূপনারায়ণের প্রবাহ কোলাঘাট হয়ে (তমলুক শহরের ১১ মাইল উজানে) গোঁয়াখালির কাছে এসে ভাগীরথীতে পড়েছে, বর্তমান হুগলী-পয়েন্ট-এর উলটো দিকে। ভাগীরথীর এই সংযোগ-স্থলের ১২ মাইল উজানে বর্তমান তমলুক শহর। তবে, প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগর-বন্দরের প্রত্নবস্তু তমলুক শহর থেকে যত না আহৃত হয়েছে তার দশগুণ বেশি আহৃত হয়েছে শহর থেকে বেশ দূরে দূরে, নানা স্থানে, এবং সে-সব কোনো কোনো স্থান ৮।৯ মাইল দূরে। কাজেই, বর্তমান তমলুক শহরই যে প্রাচীন তাম্রলিপ্তের একতম প্রতিনিধি তা খুব জোর করে বলা যায় না। যাই হোক, বর্তমানে তমলুক শহর যে-নদীর উপর বা যে-উপত্যকায় অবস্থিত তার নাম রূপনারায়ণ; অন্তত রেনেল সাহেবের (মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দী) সময় থেকে।

যেহেতু বর্তমান তমলুক শহরের অবস্থিতি রূপনারায়ণ-উপত্যকায়, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকরা মেনে নিয়েছেন যে, প্রাচীন তাম্রলিপ্তও এই নদীটির উপর, সমুদ্র-মোহানার অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। একটা কারণ ছিল বোধহয় য়ুয়ান চোয়াঙের সাক্ষ্য, 'তাম্রলিপ্ত ছিল একটি inlet of the sea-র উপর'।

এ-সম্বন্ধে অন্য যে-সব সাক্ষ্য আমাদের জানা আছে তা একত্র করে আর একবার এ-প্রসঙ্গটি বিচার-বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। মৎস্যপুরাণের সাক্ষ্যে মনে হয়, তাম্রলিপ্তর অবস্থিতি ছিল (সুহ্ম দেশে) ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে,

ভাগীরথীর কোনো শাখার তীরে নয়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে টলেমি পরিষ্কার, দ্ব্যর্থহীন-ভাবে বলছেন Tamalites নগর অবস্থিত ছিল main river Ganga-র উপর, যে-নদীর উপর অবস্থিত ছিল অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ নগর Palimbothra বা পাটলী-পুত্র। ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত, অর্থাৎ ফা-হিয়েন-য়ুয়ান-চোয়াঙ-ইৎসিঙের কাল পর্যন্ত যে তাহাই ছিল এমন মনে না করবার কোনো কারণ আমি দেখছিনে।

যাই হোক, পরবর্তীকালের সাক্ষ্য কি তা দেখা যেতে পারে। প্রায় হাজার বছর পরও Gastaldi (১৫৬১) ও Jao de Barros (১৫৫০) নদীটির নাম বলছেন গঙ্গা; একশ' বছর পরও (১৬৫০) Blaev নামটি লিখছেন গুয়েঙ্গা (Guenga)। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যান্য সাক্ষ্যে এবং ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি নকসায় সর্বত্রই নদীটির নাম দেওয়া হ'চ্ছে সংলগ্ন শহরটির নামানুসারে: Tamalee, Tomberlee, Tumbolee, Tombolee, Tumberleen ইত্যাদি। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে Valentin নদীটির নাম বলছেন, পত্রঘাটা, অর্থাৎ পত্রঘাটার পাশ দিয়ে যে-নদীটি বয়ে যেতো। একজনও কেউ কিন্তু রূপনারায়ণ বলছেন না। রেণেলই সর্বপ্রথম বলছেন, নদীটির নাম রূপনারায়ণ, "falsely called the old Ganges"।

মৎস্যপুরাণ, টলেমি থেকে শুরু করে সকলেই ভুল করেছেন, আর রেণেল সাহেবই একমাত্র ব্যক্তি যিনি যথার্থ বলেছেন, এমন আমি মনে করতে পারছিনে। অবশ্যই তাঁর কালে তমলুকের অবস্থিতি রূপনারায়ণের উপর, গঙ্গার উপর নয়, এবং সপ্তদশ থেকেই, হয়ত তার আগে থেকেই, গঙ্গা পূর্বদিকে সরে যেতে শুরু করেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে দামোদর, রূপনারায়ণ ইত্যাদি ছোটনাগপুর পার্বত্য অঞ্চল-নিঃসৃত অন্যান্য নদনদীগুলিও। কিন্তু ষোড়শ শতকেও তমলুক-তম্রোলি যে একদা গঙ্গার উপরই অবস্থিত ছিল, সে-স্মৃতি নিশ্চয়ই বেশ জাগরূক ছিল, যেহেতু সে-স্মৃতি খুব পূর্বাগত কিছু ছিল না। নইলে জাও দ্য বারোস, গ্যাস্টালডি, ব্লেভ্ নদীটিকে গঙ্গা কিছুতেই বলতেন না।

কিন্তু যে তাম্রলিপ্তর কথা আমি বলছি সে-তো আরও হাজার বছরের আগেকার কথা। সে-তাম্রলিপ্ত যে গঙ্গা-ভাগীরথীর উপরই ছিল এবং সেই বন্দর-নগর যে সমুদ্র-মোহানা থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোনো কারণ দেখিনে। সে-বন্দর থেকে বেশ বড় একটি সমুদ্রগামী জাহাজে চড়ে ফা-হিয়েন সিংহলে গিয়েছিলেন।

ত্রিশ বছর আগে যখন "বাঙালীর ইতিহাস"-এর নদনদী প্রসঙ্গ লিখেছিলাম তখন ইঙ্গিত করেছিলাম, গঙ্গা-ভাগীরথী খুব প্রাচীনকাল থেকেই ক্রমশ খুব ধীরে ধীরে পূর্বদিকে সরে যাচ্ছে, যত দক্ষিণে নরম মাটিতে নামছে তত বেশি সরে যাচ্ছে,

এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ছোটনাগপুর—সাঁওতালভূম—মানভূমের পাহাড় থেকে যে-সব নদনদী নিঃসৃত হয়ে, সাধারণত পূর্ব-দক্ষিণবাহিনী হ'য়ে গঙ্গা-ভাগীরথীতে পড়তো, সেগুলো ক্রমশ দীর্ঘায়ত হ'চ্ছে। আমার এই ইঙ্গিতের পশ্চাতে যুক্তি বিশেষ কিছু ছিল না, ছিল শুধু মৎস্যপুরাণোক্ত উক্তি 'ভাগীরথীর বিন্ধ্যশৈলশ্রেণী গাত্রে প্রতিহত' হবার কথা, আব ছিল ফরাক্কা থেকে শুরু করে দক্ষিণে সমস্ত গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিম তীবের ব্যক্তিগত স্থানীয় পর্যবেক্ষণ।

সম্প্রতি আমার সুযোগ হ'লো পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তাদের হাওড়া ও হুগলী জেলার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার দুটির প্রথম অধ্যায়টি (General and Physical Aspects) পড়বার, বিশেষ করে ভূগোল ও ভূগোল বিষয়ক অংশটি। এই অংশটি কে লিখেছেন, জানিনে. কোথাও কিছু উল্লেখ নেই। কিন্তু যে-ই লিখে থাকুন তাঁকে প্রকাশ্য সাধুবাদ জানাচ্ছি। পশ্চিম-বাঙলাব নদনদীগুলি সম্বন্ধে এমন বিশদ, সুন্দর, সুশৃঙ্খল ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক আলোচনা আর কোথাও আমি দেখিনি। রচনাটি পাঠ করে আমি উপকৃত হয়েছি। আমার এখন মনে হচ্ছে, ত্রিশ বছর আগে আমি যা অনুমান করেছিলাম, ভূতত্ত্ব ও ভূগোলের দিক থেকে সে অনুমান হয়তো একান্ত মিথ্যা নাও হ'তে পারে। ছোটনাগপুর পাহাড়-নিঃসৃত নদনদীগুলির কথা ব.তে গিয়ে লেখক বলছেন, "... ages ago the Damodar used to flow directly into an epicontinental sea, an extension of the Bay of Bengal. As the Gangetic delta formed, the main wes ern branch of the Ganges, namely, the Bhagirathi, intercepted the Damodar Group of rivers which were forced to form subsidiary deltas hi_her up their courses·· Its (Damodar's) deltaic action is not dependent on the tides but starts much hi her up at places where it can no longer carry the excess charge of sand that it brings down from the hills, and so drops it on the bed··"। এই উদ্ধৃতিটি হুগলী জেলা গেজেটিয়ারের (১৯১৭) প্রথম অধ্যায় থেকে (৩১ পৃ)। হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারের (১৯১৭) প্রথম অধ্যায়ে (১১ পৃ) কথাটা আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে; নীচে তা উদ্ধার করছি।

"When the epicontinental sea covered the tract now forming the Howrah district, the Bhagirathi joined the various sub deltas of the Chotanag ur rivers and pushed the Gargetic delta towards the sea and thus intercepted the peninsular streams, which, in their turn, pushed the Bhagirathi to the east by the detritus they carried. The sudden berds of the Bhagirathi below Kalna, of the Damodar below Burdwan, of the Dwarakeshar near Arambagh, of the Silai above

Ghatal and of the Haldia near the saline soil limit, seem to justiy this conclusion. This abrupt bends were most probably the debouching points of the Chota Nagpur rivers into the ancient channel of the Bhagirathi or the epicontinental sea. As the delta face advanced southwards the braided Channels of the Bhagirathi vanished ..."

স্বভাবতই মনে হয়, গঙ্গা-ভাগীরথী বইতো আরও পশ্চিম ঘেঁষে। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ যত রচিত হয়েছে, উপসাগর সরে গেছে তত, গঙ্গা-ভাগীরথীও ধীরে ধীরে সরে গেছে তত পূর্বে। দামোদর-গোষ্ঠীর নদীগুলির ব-দ্বীপে যে স্রোত-তাড়িত পাথুরে বালি ও পলিমাটি জমা হ'তো তার বল, ভাঙ্গা চাপ এই সরে সরে যাওয়ার একটা কারণ হওয়া বিচিত্র নয়। এই পূবে সরে সরে যাওয়া এবং দামোদর-গোষ্ঠীর নদীগুলির দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হওয়া, এ খাত থেকে ও খাতে, ও খাত থেকে আর একখাতে ধাবমান হওয়া সমস্তই যেন মনে হয়, নিম্নতম প্রবাহে গঙ্গা-ভাগীরথীর ক্রমশ পূর্বশায়ী হওয়ার সঙ্গে জড়িত। উত্তরতর প্রবাহে, অর্থাৎ, উত্তর বর্ধমান ও উত্তর মুর্শিদাবাদের উত্তরে তা হয়নি; তার প্রধান কারণ, সে-ভূমি lateritic, দৃঢ়, কঠিন সে মাটি বঙ্গোপসাগর-তাড়িত, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপকৃত নরম পলিমাটি নয়।

(৪) রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার ॥

তাম্রলিপ্তি থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপ-উপদ্বীপ ও দেশগুলিতে যাবার সমুদ্রপথের বর্ণনা-প্রসঙ্গে মালয়-উপদ্বীপে প্রাপ্ত জনৈক মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের নামাঙ্কিত একটি লেখ-র উল্লেখ করেছিলাম। বুদ্ধগুপ্ত রক্তমৃত্তিকার অধিবাসী ছিলেন; তিনি মালয়ে গিয়েছিলেন বাণিজ্য-ব্যপদেশে। যাত্রা করেছিলেন রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের আশীর্বাদ নিয়ে, এ-সব সমস্তই ঐতিহাসিক মনন-কল্পনাসিদ্ধ। সেখানে ভুল করিনি। কিন্তু লিখেছিলাম, "এই রক্তমৃত্তিকা মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি (য়ুয়ান-চোয়াঙের লো-টো-মো-চিহ্) বা চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গামাটিও হতে পারে; শেষেরটি হওয়াই অধিকতর সম্ভব।" তখন মনে হয়েছিল, চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি (তারও অর্থ রক্তমৃত্তিকা) মালয়ের কাছাকাছি; সুতরাং রক্তমৃত্তিকা সে-রাঙ্গামাটি হবার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু আমার এ-অনুমান ভুল। এখন আর সন্দেহ করবার কারণ নেই যে, মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত লিপিকথিত রক্তমৃত্তিকা কর্ণসুবর্ণান্তর্গত, য়ুয়ান-চোয়াঙ-কথিত লো-টো মো-চিহ্। য়ুয়ান-চোয়াঙ বলে গেছেন, এই লো-টো-মো-চিহ্-তে ছিল একটি বৌদ্ধবিহার। এখন আর কোনও সন্দেহ নেই যে, মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত তদানীন্তন গঙ্গা-ভাগীরথী সমীপবর্তী, কর্ণসুবর্ণান্তর্গত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের ভিক্ষুসংঘের আশীর্বাদ নিয়ে গিয়েছিলেন বাণিজ্য ব্যপদেশে, জীবনোপায়-সমৃদ্ধির সন্ধানে, অন্য কোনও স্থানের অন্য কোনও মহাবিহার থেকে না। য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণ যে কত বাস্তবানুগ, এই আবিষ্কার তার অন্যতম প্রমাণ।

এই স্থির, ধ্রুব ঐতিহাসিকোক্তি করা সম্ভব হলো ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে, আমার প্রাক্তন ছাত্র ডক্টর সুধীররঞ্জন দাশের উদ্দীপনা ও নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদ জেলার চিরুটি গ্রাম-সন্নিহিত, প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অন্তর্গত রাঙ্গামাটি অঞ্চলের রাজবাড়ীডাঙ্গার উৎখননের ফলে। এই উৎখনন থেকে পাওয়া গেছে ষষ্ঠ-সপ্তম খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর কিছু কিছু প্রত্নবস্তু, একাধিক বৌদ্ধমন্দির ও বিহারের কিছু প্রত্নাবশেষ এবং একাধিক মৃৎফলক যাতে পরিষ্কার খোদিত আছে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের নাম। গোল শীলমোহর ফলকটির উপরিভাগে বৌদ্ধ ধর্মচক্র; তার দুই পাশে মুখোমুখি উপবিষ্ট দু'টি হরিণ; দৃশ্যটি সারনাথ মৃগবিহারে বুদ্ধদেবের ধর্মচক্রপ্রবর্তন ঘটনাটির প্রতীক। ফলকটির নীচের অংশে দুটি লাইন লেখা: শ্রীরক্তমৃত্তিকা-মহাবৈহা। রিরার্য ভিক্ষুসংঘস্য ॥

[পাঠপঞ্জী ॥ Das, S. R, Rajbadidanga (Excavation Report), Calcutta, 1968.]

(৫) জনপদ-বিভাগ সম্বন্ধে নূতন তথ্য ॥

নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনগুলির ভেতর শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ (শ্রীহট্ট) লিপি এবং লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের ময়নামতী লিপি তিনটিতে জনপদ-বিভাগ সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন তথ্য জানা যাচ্ছে। যেমন, পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির বিস্তৃতি সম্বন্ধে, পট্টিকের বা পট্টিকেরক সম্বন্ধে। পশ্চিমভাগ লিপিটিতে দেখছি, দশম শতাব্দীতে শ্রীহট্টও পুণ্ড্রবর্ধন (পৌণ্ড্র) -ভুক্তির সমতট মণ্ডলের অন্তর্গত। লড়হচন্দ্রের প্রথম পট্টোলীটিতে জানা যাচ্ছে, পট্টিকের-কেরও অবস্থিতি ছিল (একাদশ শতাব্দী) পৌণ্ড্রভুক্তির সমতট মণ্ডলে, এবং এই পট্টিকেরকে লড়হচন্দ্র লড়হমাধব-ভট্টারকের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

(৬) দক্ষিণ-রাঢ় ॥ ভুরসুট-ভূরিশিট-ভুরসিট=ভূরিসৃষ্টি ভূরিশ্রেষ্ঠিক-ভূরিশ্রেষ্ঠী ॥

এই অধ্যায়ে একাধিক বার এবং অন্য দু'একটি অধ্যায়ে' ভুরসুট বা ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রাম বা অঞ্চলের কথা বলেছি, এবং এক জায়গায় বলেছি এই গ্রাম বা অঞ্চলটির অবস্থান ছিল হাওড়া জেলায়, অন্যত্র বলেছি, হুগলী জেলায়।

কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। মধ্যযুগীয় বাঙালীর ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি, ভুরসুট বলে গ্রাম যেমন আছে তেমনই ভুরসুট বলে একটি পরগণাও আছে, এবং সে-পরগণা বর্তমান হাওড়া ও হুগলীর জেলার নানা অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। এখনও ভুরসুট বা ভুরশুট বলে দু'টি গ্রাম আছে, একটি হাওড়া জেলার উদয়পুর থানার অন্তর্গত, আর একটি হুগলী জেলার জঙ্গীপুর থানার। এই দু'টি গ্রামই প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠীর স্মৃতি বহন করছে, এবং সে-স্মৃতি হাওড়া ও হুগলী জেলার এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিতৃত। এই বিস্তৃত অঞ্চলটাই একসময়ে অধ্যুষিত ছিল ভূরি বা অসংখ্য শ্রেষ্ঠীদের দ্বারা, এই কথাটাই ছিল আমার বক্তব্য। সে-বক্তব্য আজও একই আছে ॥

[এ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৯১৭, পৃপৃ ৩০-৩৪।]

চতুর্থ অধ্যায়

ধন-সম্বল

(৬) মুদ্রায় সামাজিক ধনের রূপ ॥

প্রাচীন বাঙলায় মুদ্রায় সামাজিক ধনের রূপ কি ভাবে ধরা পড়েছিল, এ সম্বন্ধে নূতন কিছু তথ্য ইতোমধ্যে জানা গেছে, কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও অনুসন্ধানের ফলে কিছু নূতন আলোচন-বিশ্লেষণের ফলে। এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এখন কিছুটা স্পষ্টতর। সংক্ষেপে এই স্পষ্টতর রূপটির একটু পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন।

রাষ্ট্রগঠনের অপরিবিস্তৃত সার্থক প্রয়াস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অপরিবিস্তৃত বিস্তার ছাড়া মুদ্রা-প্রচলনের প্রয়োজন সাধারণত হয় না; অন্তত ভারতবর্ষের ইতিহাসে তেমন প্রমাণ নেই, তা শীলমোহর মুদ্রিত (punch mark d) মুদ্রাই হোক আর টঙ্কশালার ঢালাই করা (cast) মুদ্রাই হোক। শুধু স্থানীয় হাটবাজারের কেনা-বেচার ব্যাপারেই নয়, বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারেও দ্রব্য-বিনিময়ে (exchang by barter) ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো যায়, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। তবে, যে-সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্যিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের বা বণিক গোষ্ঠীর (guild) অধিকার স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত, অন্যার্থে সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক থেকে যে-সমাজ অর্থনৈতিক ব্যাপারে যত বেশি সুবিন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত, সে-সমাজে মুদ্রার প্রচলন তত বেশি। অর্থাৎ, সেই সব সমাজ মুদ্রা-বিনিময় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজ; বস্তুত সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে মুদ্রা-বিনিময়-নির্ভর অর্থনৈতিক জীবনকে সভ্যতার অন্যতম দ্যোতক বলে মনে করা হয়।

বাঙলাদেশে প্রাচীনতম ধাতু (তামা) মুদ্রা পাওয়া গেছে প্রত্নোৎখনন বা প্রত্নানুসন্ধানের ফলে, উত্তরবঙ্গের মহাস্থান (বগুড়া জেলা) ও বাণগড়ে (দিনাজপুর জেলা), আর পাওয়া গেছে নিম্নগাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের তমলুক (মেদিনীপুর) ও চন্দ্রকেতুগড়ে (২৪ পরগণা)। উভয় অঞ্চলেই শীলমোহর মুদ্রিত এবং ঢালাই করা, দু'রকমের মুদ্রাই পাওয়া গেছে। প্রত্নখননের সংস্তরের (stratification) সর্বত্র খুব সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত না, তবু মোটামুটি বলা চলে, ঢালাই-মুদ্রা থেকে শীলমোহরিত মুদ্রা প্রাচীনতর, এবং এই মুদ্রার প্রচলন বহুদিন অব্যাহত ছিল। গাঙ্গেয় উত্তরভারতে যে-সব জায়গায় এই দুই জাতীয় মুদ্রাই পাওয়া গেছে, সে-সব জায়গায়, যেমন, হস্তিনাপুরে, দিল্লীর পুরাণকেল্লায়, কৌশাম্বীতে, উজ্জয়িনীতে, এই দুই মুদ্রার প্রচলন শুরু হয় (একমাত্র প্রমাণ, প্রত্ন-সংস্তরের সাক্ষ্য) মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। প্রাচীন বাঙলায় তা হয়েছিল বলে মনে হয় না। বস্তুত প্রত্নসংস্তরের সাক্ষ্য থেকে এই দুই জাতীয় মুদ্রারই প্রচলন শুরু খ্রীষ্টপূর্ব মোটামুটি ৩২৫—৩০০'র আগে হয়েছিল বলে অনুমান করবার কোন কারণ নেই।

অন্যতর সাক্ষ্যের ইঙ্গিতও একই। মহাস্থানে মৌর্য-ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা যে ভগ্নাংশ-লিপিটি পাওয়া গেছে তা'তে দুই মূল্যের দু'টি মুদ্রার উল্লেখ আছে, একটি গণ্ডক, আর একটি কাকনিক (=অর্থশাস্ত্রোক্ত কাকনিকা)। এই মুদ্রা দু'টির স্বরূপ কি ছিল, জানবার উপায় নেই। এ দু'টি কি ধাতুমুদ্রা না আর কিছু, তা-ও নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই। শুধু এইটুকু আমাদের জানা আছে, বাঙলাদেশে কিছুদিন আগেও প্রচলিত ছিল, চার কড়িতে এক গণ্ডা, আর কৌটিল্য ও অন্যান্য সাক্ষ্য থেকে বলা যায়, এক কাকনিক ছিল বিশ কড়ির সমান মূল্য। এই একান্ত ঐতিহ্যবাহিত, পরম্পরাগত আর্যাগণনা থেকে হয়ত বলা যায়, প্রাচীন বাঙলায় কড়িই ছিল নিম্নতম দ্রব্যমূল্যমান,* এবং সেই মানদ্বারাই নির্ণীত হ'ত উচ্চতর মুদ্রামান। আমার নিজের ধারণা, গণ্ডক ছিল শীলমোহরিত নিম্নতম মুদ্রা, আর কাকনিক ছিল ঢালাই করা তঙ্কশালার মুদ্রা। অনুমান করা চলে, মৌর্য আমল থেকে শুরু করে বেশ কিছুকাল এই দুই মুদ্রারই প্রচলন ছিল বাঙলাদেশে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর তৃতীয়পাদে অজ্ঞাতনামা গ্রীক গ্রন্থকারের লেখা Periplus গ্রন্থে বলা হয়েছে, দক্ষিণতম বঙ্গের গঙ্গা (Gange) বন্দরে সমসাময়িক কালে Caltis নামে এক সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল। এই উক্তির ঐতিহাসিক যাথার্থ্য কতটুকু, বলা কঠিন। বাঙলাদেশে এই সময়ে সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন ব্যাখ্যা করা একটু মুশকিল। তবে, এমন হ'তে পারে, কেউ কেউ তা বলেওছেন, এই Caltis কুষাণ সম্রাটদের প্রচলিত সুবর্ণমুদ্রা। কুষাণেরা যে এই সময় বারাণসী পর্যন্ত তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন, এবং তাদের আধিপত্যের প্রভাব যে পূর্বভারতেও বিস্তৃতিলাভ করেছিল, এ সম্বন্ধে অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণও বিদ্যমান।

প্রত্নসাক্ষ্যই হোক বা লিপি বা প্রাচীনগ্রন্থ-সাক্ষ্যই হোক, মুদ্রা প্রচলনের যত প্রমাণ প্রাচীন বাঙলায় পাওয়া যাচ্ছে, তা হয় উত্তরবঙ্গ (বগুড়া, দিনাজপুর) থেকে, না হয় নিম্নগাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ থেকে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। নানা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের নানা জায়গায় বলা হয়েছে, কি করে ইতিহাসের সূচনা থেকেই বাঙলার ভাগ্য নির্ণীত হয়েছে মধ্য-গাঙ্গেয় উত্তর-ভারতের ইতিহাসদ্বারা, কি করে সেখানকার ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, অবস্থার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বাঙলা দেশে এসে ঢেউ তুলেছে এবং তার ফলে এ-দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। মুদ্রা-প্রসঙ্গে যে-সময়ের কথা বলা হ'চ্ছে সে-সময়ে এবং তার অনেক পরেও মধ্য-গাঙ্গেয় ভারতের জীবন-প্রবাহের

* কড়ি সামুদ্রিক দ্রব্য ; উত্তর বঙ্গোপসাগরে এ দ্রব্য কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাচীন বঙ্গে কড়ি বাণিজ্যিক দ্রব্য, বাইরে থেকে মূল্য দিয়ে আমদানী করতে হ'তো। মধ্যযুগীয় বাঙালীর সাহিত্যে, পূজার্চনায়, এমন কি ব্যবসাবাণিজ্যে কড়ির স্থান সম্বন্ধে গ্রন্থমধ্যে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, একাধিক জায়গায়।

পূর্বযাত্রার পথ ছিল প্রধানত দু'টি : একটি পাটলিপুত্রে গঙ্গা পার হয়ে উত্তর-বিহারের চম্পা থেকে সোজা উত্তর-বঙ্গের ভেতর দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরবর্তী কামরূপ পর্যন্ত ; আর আর একটি রাজমহলে গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশে ঢুকে নদীর দুই তীর ধরে ধরে একবারে সাগর মোহনা পর্যন্ত। দু'টি পথই প্রাচীন ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ, উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃতির পূর্বাভিযানের পথ। প্রথম পথের উপর মহাস্থান, কোটিবর্ষ (বাণগড়); দ্বিতীয় পথের শেষ প্রান্তে, সাগরতীরে তাম্রলিপ্ত, গঙ্গাবন্দর, চন্দ্রকেতুগড়। মৌর্যবংশ প্রতিষ্ঠার আগেও এই পথ দু'টির অস্তিত্ব ছিল ; লোকজনের আসা-যাওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যও চলতো পথ দু'টি ধরে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে তার আভাস ইঙ্গিত একেবারে অপ্রতুল নয়। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০র আগে মুদ্রার প্রচলন ছিল এ-সব অঞ্চলে, এমন মনে হয় না ; প্রয়োজনও বোধ হয় ছিল না। তার প্রধান কারণ বোধ হয়, তার আগে ভারতের পূর্বাঞ্চলে রাষ্ট্র গঠনের কোন সার্থক প্রয়াস দেখা দেয়নি। সে-প্রয়াসের প্রথম ইঙ্গিত, গ্রীক ঐতিহাসিককুল-কথিত Prasioi ও Gangaridae রাষ্ট্র দু'টি। দ্বিতীয় ইঙ্গিত, বাঙলাদেশে মৌর্যরাষ্ট্রের বা অন্তত মৌর্য রাষ্ট্রীর প্রভাবের সক্রিয় অনুপ্রবেশ। আমার এ-ব্যাখ্যা যুক্তিসিদ্ধ মনে হলে স্বীকার করতে হয়, শীলমোহরিত মুদ্রা বা তঙ্কশালা-নির্গত ঢালাই মুদ্রাই হোক, গণ্ডক বা কাকনিক মুদ্রাই হোক, অথবা ক্যাসটিস স্বর্ণমুদ্রাই হোক, প্রাচীনতম বঙ্গের কোন মুদ্রাই মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০র আগে নয়, এবং সে মুদ্রা মধ্য-গাঙ্গেয় উত্তর-ভারতের প্রতিধ্বনি মাত্র।

মৌর্য আমলের পর থেকে শুরু করে গুপ্তপর্ব সূচনার আগে পর্যন্ত, এই দীর্ঘকালের মধ্যে প্রাচীন বঙ্গে কি ধরণের মুদ্রা প্রচলিত ছিল তা জানবার কোনও উপায় নেই। তবে দেশের নানা জায়গায় প্রচুর কুষাণ মুদ্রা পাওয়া গেছে ; মনে হয়, কুষাণ আমলে, এবং হয়ত তার পরেও, উত্তর-ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে এই সব মুদ্রা কিছু কিছু এই অঞ্চলেও প্রচলিত হ'য়েছিল। উত্তর-ভারতের অন্যান্য মুদ্রাও এই সময়ে অল্পবিস্তর প্রচলিত হ'য়েছিল, এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে। সন্দেহ নেই যে, ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রেই তা হ'য়েছিল। কিন্তু কুষাণ মুদ্রাই হোক বা উত্তর-ভারতীয় অন্যান্য মুদ্রাই হোক, এই সব মুদ্রার সঙ্গে স্থানীয় কেনাবেচার জন্য প্রচলিত পূর্বতন কড়ি, গণ্ডক, কাকনিক, শীলমোহরিত ও তঙ্কশালা-নির্গত প্রভৃতি মুদ্রার সম্বন্ধ কি ছিল এবং স্থানীয় দ্রব্যমূল্যের সঙ্গেই বা কি সম্বন্ধ ছিল, এ-সম্বন্ধে কিছু বলবার কোনো উপায়ই আজও আমরা জানিনে।

গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী আমলে প্রাচীন বাঙলায় প্রচলিত মুদ্রা সম্বন্ধে মূল গ্রন্থে সবিস্তারে প্রচুর কথা বলা হয়েছে। তার পর, গত পঁচিশ বছরের ভেতর বেশ কয়েকজন পণ্ডিত এ-সম্বন্ধে বেশ কিছু আলোচনা গবেষণা করেছেন, কিন্তু তার ভেতর না তথ্যের দিক থেকে না ব্যাখ্যার দিক থেকে আমি এমন কিছু পেয়েছি যা এই সংযোজনে উল্লেখ

করতে পারি। মুদ্রার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের, বিশেষভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্বন্ধের প্রসঙ্গটি বোধ হয় আমিই প্রথম উত্থাপন করেছিলাম, এবং সেই সঙ্গে কয়েকটি প্রশ্নেরও উল্লেখ করেছিলাম। সদ্যোক্ত আলোচনা-গবেষণায় সৌভাগ্যত প্রসঙ্গটির স্বীকৃতি অন্তত লক্ষ্য করেছি, কিন্তু প্রশ্নগুলির উত্তরের চেষ্টা লক্ষ্য করিনি। যে-ভাবে আমি প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছিলাম, আমার ইতিহাসগত উত্তর তার মধ্যেই নিহিত আছে, বেশ কিছুটা স্পষ্টভাবেই। পঁচিশ বছরের আলোচনা-গবেষণায় এমন কিছু আমি পাইনি যাতে আমার মতামত পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করতে পারি।

তবে, একটি আবিষ্কার ইতোমধ্যে ঘটেছে যা অর্থবহ এবং যার উল্লেখ ও আলোচনা অপরিহার্য। কুমিল্লা জেলার ময়নামতীর উৎখননের ফলে কয়েকটি স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার মজুত ভাণ্ডার (hoard) আবিষ্কৃত হয়েছে। দুঃখের বিষয়, প্রত্নোৎখননের কোন সংস্তর থেকে কোন ভাণ্ডারটি পাওয়া গেছে, কি ভাবে পাওয়া গেছে, প্রকাশিত বিবরণে তা' খুব পরিষ্কার নয়; বস্তুত সংস্তরণ ক্রিয়াটিই যেন খুব সুস্পষ্টতায় করা হয়নি। তা ছাড়া, এই মুদ্রাগুলির বিশদ বিবরণ এবং আলোচনাও এ-যাবৎ প্রকাশিত হয়নি; সংক্ষিপ্তভাবে যা হয়েছে তা থেকে কিছু কিছু মন্তব্য মাত্র করা যেতে পারে। বলা উচিত, মুদ্রাগুলি দেখবার সুযোগ আমার হয়নি।

প্রকাশিত বিবরণ থেকে মনে হয়, মুদ্রাগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে সুবর্ণমুদ্রাগুলি যার সঙ্গে গুপ্তোত্তর বাঙলায় প্রচলিত অপেক্ষাকৃত পাতলা ওজনের 'নকল' স্বর্ণমুদ্রার কোনও পার্থক্য নেই বললেই চলে; এ-ধরনের মুদ্রা সপ্তম শতকের শেষ পর্যন্তও প্রচলিত ছিল। এই মুদ্রাগুলির একদিকের বামপাশে দণ্ডায়মান একটি নারীমূর্তি, আর একদিকে একটি উপবিষ্ট অথবা দণ্ডায়মান নরমূর্তি, খুব সম্ভব, যথাক্রমে রাজা ও রাণীর, অথবা রাজা ও শ্রী বা লক্ষ্মীর। অনেকগুলি মুদ্রার একদিকে, গুপ্তমুদ্রার অনুকরণে, দণ্ডায়মান মূর্তির বাম হাতের নীচে ছোট এক লাইন একটি লেখ। এই লেখগুলির পাঠোদ্ধার এখনও হয়নি, তবে একটি মুদ্রায় যে 'বলভট' বলে একটি ব্যক্তিনাম লেখা আছে, সে-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। আর একটিতে যা লেখা আছে তা পড়া হয়েছে 'ভঙ্গল মৃগাঙ্কস্য' বলে; পড়েছেন ময়নামতীর বিবরণ লেখক এফ. এ. খান, প্রধানত দেববংশীয় রাজাদের শীলমোহর ও তাম্রশাসনোৎকীর্ণ "শ্রীভঙ্গল মৃগাঙ্ক"-লাঞ্ছনটি অনুসরণ করে। দীনেশচন্দ্র সরকার মশায় মনে করেন, এই পাঠ যথার্থ নয়, শুদ্ধ পাঠ হওয়া উচিত 'অভিনব মৃগাঙ্কস্য', যেহেতু দেববংশীয় রাজা ভবদেবের শীলমোহর ও তাম্রশাসনে যা লেখা আছে তার পাঠ "শ্রীঅভিনব মৃগাঙ্ক"। যাই হোক, সন্দেহ নেই, দক্ষিণ-পূর্ববাঙলায় এই 'নকল', গুপ্তোত্তর সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন হয়েছিল দেববংশের রাজত্বের আমলে, অষ্টম শতকে।

আর এক পর্যায়ের মুদ্রা ময়নামতীতে পাওয়া গেছে, অধিকাংশই রৌপ্যমুদ্রা, সংখ্যায়

সুপ্রচুর, ওজনে খুব হালকা, এবং বোধ হয় একাধিক মূল্যমানের। যত মুদ্রা পাওয়া গেছে সবই প্রকৃতিতে এতই একই রকমের যে এর ভেতর কোনও ক্রমবিবর্তন-বিবর্ধন নেই বললেই চলে, অর্থাৎ কালের কোন চিহ্ন যেন এগুলির উপর মুদ্রিত নেই। এই মুদ্রাগুলির একদিকে আছে একটি বিন্দুবলয়চক্র, তার ভেতরে একটি রেখাচক্র, আব বাঁ দিক ঘেঁষে আছে একটি উপবিষ্ট বৃষমূর্তি। অন্য দিকে আছে দুটি বৃত্ত, বাইরে রেখাবৃত্ত, ভেতরে বিন্দুবৃত্ত। এফ এ· খান ঃই রেখা ও বিন্দুবৃত্ত অলংকৃত লাঞ্ছনটিকে ত্রিরত্ন কেন বলেছেন, বুঝা দুষ্কর। কতকগুলি মুদ্রার একদিকে একটি ছোট লেখ আছে; লেখটিকে কেউ কেউ পড়েছেন 'পটিকের্য' বলে, কেউ কেউ পড়েছেন 'পট্টিকের' বলে। আবার অন্য কতকগুলি মুদ্রায় যে লেখটি আছে সেটিকে 'হরিকেল' বলে পড়া চলে। বুঝতে কষ্ট হয়না, মুদ্রাগুলি যথাক্রমে পট্টিকের ও হরিকেলের তঙ্কশালায় মুদ্রিত ও সেখান থেকে নির্গত হয়েছিল। কতগুলি মুদ্রাব উল্টোপিঠে 'ধর্মবিজয়', কতগুলির উল্টোপিঠে 'ললিতকরঃ' বলে ছোট একটি লেখ আছে, ধর্মবিজয় ও ললিতকর বোধ হয় ব্যক্তিনাম বা উপাধি, হয় স্থানীয় শাসনকর্তার বা তঙ্কশালাব অধিকর্তার। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এই রৌপ্যমুদ্রাগুলি প্রায় সবই দক্ষিণ-পূর্ব ঙ্গের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালের (দশম-একাদশ শতাব্দী) পট্টিকের ও হরিকেল দুইই এঁদের রাজ্যভুক্ত ছিল। মুদ্রাগুলিতে যে লেখ আছে তার অক্ষরসাক্ষ্য আমার এ-ধারণার প্রতিকূল নয়। কিন্তু আমার এই ধারণার অন্য কারণও আছে।

এ-তথ্য সুবিদিত যে, আরাকানে এক চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজত্ব খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী কি তারও আগে থেকে শুরু করে অন্তত একাদশ শতাব্দীর মধ্যপাদ পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। সেই সময় পগান-রাজ আনাউরহ্থা (১০৪৪—১০৭৭) উত্তর আরাকান জয় ও অধিকার করেন, যার ফলে তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমা পট্টিকের পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই চন্দ্রবংশীয় রাজাদের শঙ্খ, বৃষ, অংকুশ, চামর, শ্রীবৎসচিহ্ন প্রভৃতি লাঞ্ছিত এবং রেখ ও বিন্দুচক্রালংকৃত প্রচুর রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে। এই মুদ্রাগুলির মধ্যে যেগুলি প্রাচীনতর সেগুলির সঙ্গে প্রাচীন ফুনান, দ্বারবতী, এবং প্রাচীন প্যু ও মোন রাজাদের অন্যান্য রাজধানীতে প্রাপ্ত মুদ্রার আত্মীয়তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কিন্তু যে মুদ্রাগুলি পরবর্তী কালের (সেগুলি সংখ্যায় কিছু কম নয়), সেগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা লালমাই-ময়নামতীতে পাওয়া রৌপ্য মুদ্রাগুলির সঙ্গে: বৃষ লাঞ্ছন এবং রেখ ও বিন্দুচক্রালংকার প্রায় একই রকমের। আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজধানী প্রাচীন বৈশালীতে প্রাপ্ত বহু বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিমার সঙ্গে ময়নামতীর সাম্প্রতিক উৎখনন থেকে প্রাপ্ত প্রতিমার অনেক-গুলির সঙ্গে আশ্চর্য মিল; উভয়ক্ষেত্রেই শৈলীসাক্ষ্যের ইঙ্গিতে প্রতিমাগুলির তারিখ মোটামুটি দশম শতাব্দী।

কিন্তু মুদ্রায় সামাজিক ধনের রূপ প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন

হ'চ্ছে, লালমাই-ময়নামতীতে পাওয়া রৌপ্যমুদ্রাগুলির রূপা ধাতুটি এল কোথা থেকে। গুপ্তোত্তর 'নকল' ও হালকা ওজনের, খাদ মেশানো সুবর্ণমুদ্রার সোনা নিয়ে বড় কিছু প্রশ্ন নেই; শশাঙ্কের আমল থেকে তো এই প্রকৃতির সুবর্ণমুদ্রাই বাঙলা দেশে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত। এই সোনা প্রাচীনতর, ওজনে ভারী, প্রায় নিখাদ সুবর্ণমুদ্রা থেকে অথবা সোনার তাল গলিয়ে পাওয়া সোনা। কিন্তু প্রাচীন বাঙলায় রূপা এত সহজলভ্য ছিল না। এই প্রসঙ্গে মূল গ্রন্থমধ্যেই বলা হয়েছে, কিছু বিস্তৃতভাবেই, গুপ্ত আমলে এবং পরে পাল আমলে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলনের কথা। সেই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করেছিলাম বৈগ্রাম-পট্টোলী কথিত রূপক মুদ্রার কথা, স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রার আপেক্ষিক মূল্য-সম্বন্ধের কথা, রৌপ্যের অপ্রতুলতার কথা, এবং শেষ পর্যন্ত রৌপ্যমুদ্রার একান্ত অনস্তিত্বের কথা। পাল আমলে যে কিছুটা চেষ্টা হয়েছিল রৌপ্যমুদ্রার পুনঃপ্রচলনের, এবং সে-চেষ্টা যে সার্থক হয়নি, সে কথাও বলেছিলাম। আজও এ-কথা সত্য। কিন্তু এতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। রৌপ্য বিদেশাগত; যে-কারণেই হোক, দেশে রূপার আমদানী বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। সুতরাং রৌপ্যমুদ্রাও অপ্রচলিত হয়ে যায়; পাল আমলের রৌপ্যমুদ্রা তো অত্যন্ত নিকৃষ্ট পর্যায়ের। সে রূপা পূর্বতন রৌপ্যমুদ্রা থেকে পাওয়া। আমার ধারণা, গুপ্তপর্বেই রূপার অপ্রতুলতা ঘটতে শুরু হয়; বস্তুত (প্রথম) কুমারগুপ্তের পর রৌপ্যমুদ্রার আর উল্লেখও নেই। বৈদেশিক বাণিজ্যে যে-সব ভারতীয় তথা বাঙালী বণিকেরা লিপ্ত হ'তেন তাঁরা দ্রব্য-বিনিময়ে সোনা ছাড়া, সুবর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কোনও ধাতু বা ধাতুমুদ্রা নিতে চাইতেন না; দ্বিতীয় শতাব্দীর প্লিনি এবং নবম—একাদশ শতাব্দীর আরব বণিকদের সাক্ষ্য থেকে ভারতীয় বণিকদের এই অপরূপ স্বর্ণপ্রিয়তার অপরিবর্তিত ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুতরাং রূপা দুর্লভ বস্তু হবে, আপেক্ষিকতায় সোনার চেয়ে রূপার দাম হবে বেশি, এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

তা'লে লালমাই-ময়নামতীতে প্রাপ্ত সুপ্রচুর রৌপ্যমুদ্রার, যত হালকা ওজনেরই হোক, রূপা এল কোথা থেকে? আমার উত্তর সংক্ষিপ্ত: এ রূপা এসেছে আরাকান থেকে, বর্মা ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়াজাত রূপা। আরাকানের সঙ্গে ময়নামতীর ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল, এ-অনুমানের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান, এবং সেই বাণিজ্যাশ্রয়েই প্রাচীন আরাকানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার। লালমাই-ময়নামতীর পট্টিকের নগর ও রাজ্য সেই বাণিজ্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির উৎস এবং ত' অন্তত সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকেই।

পঞ্চম অধ্যায়

ভূমি-বিন্যাস

গত পঁচিশ-ত্রিশ বছরের ভেতর ভূমি-বিন্যাস সংক্রান্ত যত নূতন লিপি-প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রধানত বাংলদেশে, তবে পশ্চিমবঙ্গেও, তা থেকে এমন কোনও তথ্য পাওয়া যাচ্ছেনা যাকে বলা যায় একান্ত অভিনব, যার ফলে এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণের বিবৃতি, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার কোন সংশোধন বা পরিবর্তন প্রয়োজন আছে। নূতন লিপিগুলির এতৎসংক্রান্ত তথ্যাদির প্রকৃতি, ভূমি ক্রয়বিক্রয় ও দানের রীতি ও ক্রম, ভূমির প্রকারভেদ, মাপ ও মূল্য, চাহিদা, সীমা-নির্দেশ, উপস্বত্ব, কর-উপরিকর প্রভৃতি সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা সমস্তই অতিরিক্ত, যথার্থ নূতন কিছু নয়। তবু, দু' একটি দৃষ্টান্ত, যা অংশত নূতন, তা উল্লেখ করা যেতে পারে, যদিও তথ্যগুলি তেমন অর্থবহ নয়।

১২৮ গুপ্ত সংবতে (৪৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) বর্তমান বগুড়া জেলার অন্তর্গত প্রাচীন শৃঙ্গবেরবীথির পূর্ণকৌশিকা-অধিকরণে কিছু ভূমি ক্রয়বিক্রয় ও দানক্রিয়া হয়েছিল; ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারটা পট্টীকৃত করেছিলেন আয়ুক্তক অচ্যুত। পট্টোলীটি অধুনা জগদীশপুর পট্টোলী বলে খ্যাত এবং রক্ষিত আছে রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে। যাই হোক, ঐ সময়ে শৃঙ্গবেরবীথিতে ভূমির দাম ছিল প্রতি কুল্যবাপে দুই দীনার। প্রায় সমসাময়িক কালে বর্তমান বগুড়া-দিনাজপুর সীমাসঙ্গমে পঞ্চনগরী বিষয়েও ভূমির দাম একই ছিল, অথচ কোটিবর্ষ বিষয়ে ছিল তিন দীনার, ফরিদপুরে চার দীনার। মনে হয়, প্রায় পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুরু করে মোটামুটি দু'শ বছর উত্তরবঙ্গে ভূমির দাম প্রতি কুল্যবাপে দুই থেকে তিন দীনার, পূর্ববাংলায় চার দীনার।

ভূমির মাপ সম্বন্ধে প্রায় তুচ্ছ করবার মত হ'লেও একটু নূতন খবর আছে লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের (আ. ১০০০-২০ ও আ. ১০২০-৪৫ ও খ্রীষ্টাব্দ) তিনটি ময়নামতী তাম্রপট্টোলীতে। এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ভূমি-পরিমাণ দেওয়া হচ্ছে পর পর ক্রমহ্রস্বায়মান পাঁচটি মাপে; পাটক, দ্রোণ, যষ্ঠি, কাক এবং বিন্দু। পাটক ও দ্রোণ (৪০ দ্রোণে এক পাটক) সুপরিজ্ঞাত; কাক ও তাই। কিন্তু যষ্ঠি, যার অর্থ লাঠি, এই যষ্ঠি মাপটি কি? দ্রোণের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? সেনবংশীয় রাজাদের লিপি-মালায় 'নল' বলে একটি ভূমি-মাপের উল্লেখ আছে; এই 'নল' মাপ পূর্ববাংলায় কোন কোন জায়গায় কিছুদিন আগে পর্যন্তও প্রচলিত ছিল। যষ্ঠি কি 'নল'; দু'য়ে কি কোন সম্বন্ধ ছিল? বিন্দু মাপটিই বা কি? কাকের সঙ্গে বিন্দুর সম্বন্ধ কি? এ-সব প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।

গোবিন্দচন্দ্রের উর্ধ্বতন তৃতীয় পূর্বপুরুষ রাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ লিপিতেও একটু নূতন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এখানে দেখছি, শ্রীহট্ট জেলার মৌলবীবাজার অঞ্চলে দশম শতকে ১০ দ্রোণে ১ পাটক ভূমি গণনা করা হ'তো, অথচ ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে (৫০৭ খ্রীষ্টাব্দ) গুণাইঘর পট্টোলীর সাক্ষ্যে দেখেছিলাম, ত্রিপুরা অঞ্চলে ৪০ দ্রোণবাপে ১ পাটক ধরা হ'তো। তা'লে এই দাঁড়াচ্ছে যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর ত্রিপুরার ১ পাটক জমি দশম শতাব্দীর শ্রীহট্টের ১ পাটক জমির চারগুণ, অবশ্যই যদি ধরে নেওয়া যায়, দ্রোণ বলতে দুই কালে দুই জায়গায়ই একই পরিমাণ ভূমি বুঝাতো! আর তা না হ'লে বলতে হয়, চার শতাব্দীর ভেতর দ্রোণের ভূমি-পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল, অথবা বিভিন্ন স্থানে ভূমিপরিমাণ বিভিন্ন ছিল বরাবরই।

অষ্টম অধ্যায়

গ্রাম ও নগর-বিন্যাস

কি পশ্চিমবঙ্গে কি বাঙলাদেশে ইতোমধ্যে এমন কোন উৎখনন ব প্রত্নানুসন্ধান কোথাও হয়নি' যাতে নগর ও নগরের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে বস্তুনির্ভর ধারণা কিছু করা যেতে পারে। এ-গ্রন্থ রচনাকালে এক রামপাল ছাড়া এ-ধরণের বস্তুনির্ভর সাক্ষ্য আর কোথাও ছিলনা ; রামপালের সাক্ষ্যও প্রত্নবিজ্ঞানের দিক থেকে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। তা যাই হোক, নগর সম্বন্ধে গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণ দু'টিতে যা বলা হয়েছিল তা প্রায় সমস্তই হয় লিপি না হয় কাব্য-সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে ; যেমন, রামাবতী বা বিজয়পুরের বর্ণনা প্রধানত যথাক্রমে রামচরিত ও পবনদূত-নির্ভর। অন্যান্য নগরের সাক্ষ্য হয় য়ুয়ান্-চোয়াঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, না হয় গ্রীক বা লাতিন বৃত্তান্ত, না হয় প্রাচীন পালিগ্রন্থ বা এই জাতীয় কিছু। বলা বাহুল্য এ-সব সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য হ'লেও অত্যন্ত অপ্রচুর, কিছুটা অস্পষ্টও বটে। আর, লিপিমালার সাক্ষ্য কাব্য-সাক্ষ্যেরই অনুরূপ ; উচ্ছ্বাসময় অত্যুক্তি ও অলংকারপ্রিয় কবিদের বস্তুসম্বন্ধবিহীন কল্পনা ভেদ করে নগরের যথার্থ চিত্র বা আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় প্রায় দুঃসাধ্য।

ইতোমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে চন্দ্রকেতুগড়ে ও কর্ণসুবর্ণে কিছু উৎখনন হয়েছে। কিন্তু চন্দ্রকেতুগড়ের উৎখননে যদিও নগর-নির্মাণের আভাস কিছু পাওয়া যায়, সে-আভাস অত্যন্ত অস্পষ্ট, প্রচুর তো নয়ই ; আর, কর্ণসুবর্ণের রাজবাড়ীডাঙ্গার উৎখননে যা পাওয়া গেছে তা একটি বৌদ্ধ-বিহারের, ঠিক নগরের নয়। বাংলাদেশে ময়নামতী-উৎখনন সম্বন্ধেও একই উক্তি প্রযোজ্য। এখানকার তথাকথিত শালবনবিহার যথার্থত ভবদেব-মহাবিহার। বিহার নগরোপম হ'লেও তার চরিত্র ঠিক নগরের চরিত্র নয় ; সে-চরিত্র সোমপুর মহাবিহার বা নালন্দা বা বিক্রমশিলা মহাবিহারেরই অনুরূপ। তা ছাড়া, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ পট্টোলীতে জানা যাচ্ছে যে, রাজা শ্রীচন্দ্র শ্রীহট্ট মণ্ডলে তাঁর নিজের নামাঙ্কিত শ্রীচন্দ্রপুরে একটি বিরাট 'ব্রাহ্মণপুর' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ব্রাহ্মণপুর আর কিছুই নয়, ন্যূনাধিক ৬০০০ ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত এবং প্রায় সমসংখ্যক কি তারও বেশি সেবক-সেবিত একটি বিস্তৃতায়তন ব্রাহ্মণ্য মঠ, বোধ হয়, বৌদ্ধ নালন্দা মহাবিহারেরই মত। সন্দেহ নেই, শ্রীহট্ট-সুরমা-বরাক উপত্যকা অঞ্চলকে এইভাবেই সর্ব-ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বাঙ্গীকৃত করা হ'চ্ছিল, যার প্রাচীনতর সাক্ষ্য ভাস্করবর্মার নিধনপুর লিপি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, শ্রীচন্দ্রপুর-ব্রাহ্মণপুর নগরোপম হওয়া সত্ত্বেও, তাকে যথার্থত নগর বলা কঠিন।

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে নগর-নির্মাণের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে, যার সঙ্গে সামাজিক ধনোৎপাদনের, তার রীতি-পদ্ধতির এবং উদ্বৃত্ত ধনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই তাৎপর্যের উপরই গ্রাম ও নগরের চেহারা ও চরিত্রের যত পার্থক্য তা নির্ভর করে। এ-গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণে এই চেহারা ও চরিত্র-পার্থক্যের দিকে আমি কিছু ইঙ্গিত করেছিলাম। প্রাচীন বঙ্গদেশে একদিকে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী পূর্ববর্তী এবং অন্যদিকে তার পরবর্তী নগরগুলি সম্বন্ধে যে পার্থক্য বিদ্যমান তার দিকেও কিছুটা ইঙ্গিত করেছিলাম। সে-ইঙ্গিতের পশ্চাতে ছিল আমার মনে তদানীন্তন বাঙ্গালী-সমাজের ধনোৎপাদন ও উদ্বৃত্ত ধনের ভাবনা। কিন্তু, যে-ভাবে আমি নগর-বৃত্তান্ত বলেছিলাম তা'তে আমার এই ভাবনা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেনি ; তা ছাড়া, লিপি-সাক্ষ্য ও কাব্য সাক্ষ্য সম্বন্ধে আমার আরও সন্দিহান হওয়া উচিত ছিল।

ইতোমধ্যে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় প্রত্ন-উৎখনন বেশ কিছু হ'য়েছে, প্রধানত প্রাগৈতিহাসিক ও আদি-ঐতিহাসিক প্রত্নস্থানগুলিতে, কিন্তু স্বল্প হ'লেও ঐতিহাসিক কালের কিছু কিছু প্রাচীন নগরের প্রত্ন-উৎখননও হয়েছে, যেমন, অহিচ্ছত্রায়, উজ্জয়িনীতে, কৌশাম্বীতে। নগর-নির্মাণের ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা-বিশ্লেষণ-আলোচনাও কিছু হয়েছে, বিদেশে, ভারতবর্ষেও। এ-সবের প্রেক্ষাপটে কিছুদিন আগে আমি নিজেও কিছু বিশ্লেষণ-আলোচনা করেছিলাম,* প্রধানত প্রত্নাবিষ্কারের উপর নির্ভর করে, যেহেতু বাধ্য হয়ে আমি এ সিদ্ধান্তে আগেই পৌঁছেছিলাম যে, সাহিত্য-নির্ভর নগর-নির্মাণ-সাক্ষ্যের উপর পুরাপুরি বিশ্বাস স্থাপন করা বড় কঠিন। উজ্জয়িনীর প্রত্নখননলব্ধ বৃত্তান্ত আর "মেঘদূত"-এ কালিদাসের উজ্জয়িনী বর্ণনার পার্থক্য দুস্তর ; ঐতিহাসিকের পক্ষে এই দুস্তর ব্যবধান পার হওয়া বড়ই মুশকিল।

কিছুদিন আগে সদ্যকথিত আমার আলোচনা-বিশ্লেষণ সম্বলিত বিস্তৃত নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে ("Rural Urban Dichotomy in Indian tradition and history," in *Annals of the Bhandarkar Oriental Researrh Institute*, Golden Jubilee Volume, ১৯১৭ pp. 863 892। সে-নিবন্ধের বক্তব্য এখানে পুনরুল্লেখের কোনও প্রয়োজন নেই। তবে, সে-বক্তব্য অনুসরণ করে প্রাচীন বাংলার নগরগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'চার কথা বলা যেতে পারে।

মোটামুটি দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে সপ্তম-অষ্টম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার বাণিজ্যসমৃদ্ধি ভালই ছিল ; বাণিজ্যলব্ধ উদ্বৃত্ত ধনও ছিল। তাম্রলিপ্ত ও Ganges বা গঙ্গাবন্দর নগর, পুণ্ড্রনগর, কোটিবর্ষ, পঞ্চনগরী, কর্ণসুবর্ণ, প্রভৃতি সমস্তই সপ্তম-অষ্টমশতক পূর্ববর্তী। এ-সমস্ত নগরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হয় বাণিজ্যিক

কারণে না হয় রাষ্ট্রশাসনের প্রয়োজনে, কিন্তু যে-প্রয়োজনেই হোক, নগরগুলি নির্মিত হয়েছিল বাণিজ্যলব্ধ উদ্বৃত্ত ধনে। তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রনগর (মহাস্থান), কোটিবর্ষ (বাণগড়), চন্দ্রকেতুগড় (= Gange গঙ্গানগর ?) প্রভৃতি স্থানের প্রত্নাবশেষই তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ বহন করে। এসব জায়গার পোড়ামাটির যে-সব নিদর্শন ইত্যাদি পাওয়া গেছে তার মধ্যে নাগরিকতার ছাপ তো সুস্পষ্ট। গঙ্গাবন্দরের বিলুপ্তি বোধ হয় কিছু আগেই ঘটে থাকবে; অষ্টম শতক থেকে তাম্রলিপ্ত বন্দর নগরের কথাও আর শোনা যাচ্ছেনা। অন্য প্রকৃতির, প্রধানত রাজধানী বা রাষ্ট্র শাসনের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে নগরের কথা অবশ্যই শোনা যাচ্ছে, যেমন চন্দ্ররাজাদের রাজধানী সমতটান্তর্গত ক্ষীরোদানদী তীরবর্তী (বর্তমান কুমিল্লা শহরের অদূরে) চণ্ডীমুড়া পাহাড়ের উপর দেবপর্বত, বিক্রমপুর (বজ্রযোগিনী-পাইকপাড়া-রামপাল), রামাবতী, লক্ষ্মণাবতী, বিজয়পুর, বিজয়নগর প্রভৃতি। কিন্তু এ-সব নগরের এমন কোনও প্রত্নাবশেষ আমাদের সামনে নেই যা থেকে এদের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা কিছু করা যেতে পারে। ঐতিহাসিকের বিস্ময় এই যে, পালসম্রাটদের মত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী রাজবংশেরও কেহ কোনও রাজধানী নির্মাণ করেননি, এমন কি ধর্মপাল-দেবপালও নন। জয়স্কন্ধাবার (military encampment) থেকেই তাঁরা রাজকার্য নির্বাহ করতেন; সেখান থেকেই তাঁদের যাবতীয় শাসননির্দেশ নির্গত হতো। তাঁদের ও চন্দ্র বর্মণ-সেন রাজাদের ভূমিদান পট্টোলী-গুলিরও অধিকাংশই নির্গত হয়েছিল “বিজয়স্কন্ধাবার” থেকে। এর কারণ কি? এ পর্বের নগরগুলি কি ছিল গ্রামেরই বৃহত্তর, সমৃদ্ধতর সংস্করণ মাত্র? আকৃতিতে পার্থক্য ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রকৃতিতেও কি তা-ই ছিল? বোধ হয় তাই। একান্ত গ্রাম-নির্ভর কৃষিনির্ভর অর্থবিন্যস্ত সমাজে নগরের রূপ ও চরিত্র অন্য কিছু হ'বার কথা নয়।

নবম অধ্যায়

রাষ্ট্রবিন্যাস

এ-অধ্যায়ে সংযোজন করবার মত নূতন তথ্য তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। নূতন দু'একটি রাজপুরুষের নাম এখানে সেখানে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তা এমন কিছু অর্থবহ নয়। একটি নাম আমার একটু কৌতূহলদ্দীপক মনে হয়েছে; সেটি উল্লেখ করছি। চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রের (দশম শতাব্দী) পশ্চিমভাগ পট্টোলীতে পাদমূলক নামে একটি রাজপুরুষের উল্লেখ আছে। দীনেশচন্দ্র সরকার মশায় মনে করেন, পাদমূলক হ'চ্ছেন একান্ত সচিব বা Private Secretary। আমার মনে হয়, দীনেশবাবুর অনুমান-অনুবাদ যথার্থ। যদি তা হয় তাহলে আমাদের সমসাময়িক শাসন-কর্তৃপক্ষ শব্দটিকে কাজে লাগাতে পারেন। (*E' igr p ic discoveries in East Pakistan,*

রাজবৃত্ত

(৩) মুরণ্ড—মুরুণ্ড ॥

ইতিমধ্যে শ্রীহট্ট জেলার মৌলবীবাজার মহকুমার শ্রীমঙ্গল থানার অন্তর্গত কলপুর গ্রাম থেকে একটি তাম্রপট্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। জয়স্বামী নামে এক শৈব ব্রাহ্মণ ভগবৎ অনন্তনারায়ণের (অনন্তশয়ান বিষ্ণুর) একটি মঠ নির্মাণ করিয়েছিলেন, এবং সেই মঠের বলি, চরু এবং সত্র যাতে নিয়মিত রক্ষিত হয় তার জন্য স্থানীয় রাজপুরুষদের কাছে কিছু ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন, সন্দেহ নেই, যথাযথ মূল্যের পরিবর্তে। পট্টোলীটি সেই প্রার্থিত ভূমিদানের, এবং তা রক্ষিত ছিল অথবা পট্টীকৃত হয়েছিল 'কুমারামাত্য অধিকরণে'। ঐ অঞ্চলের, অর্থাৎ শ্রীহট্ট অঞ্চলের তদানীন্তন অধিপতি ছিলেন জনৈক সামন্ত শ্রীমরুণ্ডনাথ যাঁর অব্যবহিত পূর্বপুরুষ ছিলেন 'সামন্ত-সৈন্যপতি' শ্রীনাথ। পট্টোলীটির পাঠ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে কমলাকান্ত চৌধুরী মশায়-প্রণীত Copper plates of Sylhet, vol I (7th.—11th. Century A. D.), Sylhet, ১৯৬৭—বইটিতে। অক্ষরের আকৃতি-প্রকৃতি দেখে চৌধুরী মশায় যথার্থ অনুমান করেছেন, পট্টোলীটির কাল খ্রীষ্ট্রীয় সপ্তম শতাব্দী। এ-তারিখ যে যথার্থ তা মনে করবার আর একটি বড় কারণ আছে। একাধিক দিক থেকে এই লিপিটির শীলমোহর, প্রতীক চিহ্ন, পট্টীকরণ কর্তার অধিকরণ প্রভৃতির সঙ্গে সপ্তম শতাব্দীর সমতট অঞ্চলের আরও অন্তত দু'টি পট্টোলীর আশ্চর্য মিল আছে; একটি শ্রীধারণ রাতের কৈলান পট্টোলী, অন্যটি সামন্ত লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলী। যাই হোক, এ-তথ্য আগেই জানা ছিল, ঢাকা ও ত্রিপুরার খড়্গ রাজবংশ (যাদের জয়স্কন্ধাবার ছিল কর্মান্তবাসক=ত্রিপুরা জেলার বড় কামতা), সামন্ত লোকনাথের বংশ এবং রাত বংশ, এই তিনটি বংশই সপ্তম শতাব্দীর; প্রায় সমসাময়িকই বোধ হয় বলা যায়, কেউ কিছু আগে বা পরে। তিনটি বংশই, অন্তত শেষোক্ত দু'টি তো বটেই, সামন্ত বংশ এবং তিনটিই সমতটের বিভিন্ন অংশের সামন্তাধিপতি ছিলেন; কিন্তু ইঁহাদের সমতটেশ্বর মহারাজাধিরাজ যে কে ছিলেন তা কিছু জানা যাচ্ছে না। এখন কলপুর পট্টোলী থেকে জানা গেল যে, এই সপ্তম শতাব্দীতেই, এই সমতটমণ্ডলেরই আর এক অংশে, অর্থাৎ শ্রীহট্ট অঞ্চলে, আর একজন সামন্ত ছিলেন, সামন্ত সৈন্যপতি শ্রীনাথের পুত্র সামন্ত শ্রীমুরণ্ড নাথ। এই মুরণ্ডনাথ কে, এই অদ্ভুত নামটি তিনি কোথা থেকে পেলেন?

এ-গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের মুরণ্ড কোম সম্বন্ধে এবং তৎসম্পর্কে কুষাণ মুদ্রার প্রচলন সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলেছিলাম। মুরণ্ডরা যে খ্রীষ্ট্রীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে বিহার অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, এ-তথ্য আগেই জানা ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ায় উচ্চকল্পের (মধ্যপ্রদেশের সাতনা

জেলায়) রাজা জয়নাথের মহিষী এবং রাজা শর্বনাথের মাতার নাম ছিল মুরুণ্ডস্বামিনী মুরুণ্ডদেবী, এ-তথ্যও জানা ছিল। এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সপ্তম শতাব্দীর শ্রীহট্ট অঞ্চলে এক সামন্ত মুরণ্ডনাথকে। তিনি যে মুরণ্ড বা মূরণ্ড কোমেরই একজন নায়ক, সে-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। শক-কুটুম্ব মুরণ্ড মুরণ্ডরা কি তখনও তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করছিলেন ?

(৫) গৌড়াধিপ শশাঙ্ক ॥ সপ্তম শতক ॥

বছর দেড় দুই আগে মেদিনীপুর জেলার এগরা থানায় এগরা গ্রামে শশাঙ্কের রাজত্বকালীন একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। শাসনটিতে শশাঙ্কের রাজ্যসংবৎসরের তারিখ উল্লিখিত নেই। বিশেষ কিছু নূতন খবরও নেই যা সমসাময়িক অন্যান্য লিপি থেকে জানা যায় না। তবে, শাসনে বিষয়াধিকরণান্তর্গত অনেকগুলি গ্রামের উল্লেখ আছে; তার ভেতর অন্তত চারটি অগ্রহার-গ্রাম। শাসনানুসারে কার্পাসপত্রক নামক একটি গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণকে ১০০ দ্রোণবাপ ভূমি দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল; প্রতি দ্রোণের মূল্য ধার্য হয়েছিল চারপণ কড়ি হিসেবে, ১০০ দ্রোণবাপের জন্য ৪০০ পণ কড়ি। লক্ষ্যণীয় এই যে, সপ্তম শতকের প্রথমার্ধেই ভূমির মূল্য নির্ধারিত ও প্রদত্ত হচ্ছে কড়িতে, দীনারে নয়, দ্রম্মেও নয়।

শাসনটি এখনও অপ্রকাশিত, তবে অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এটির পাঠোদ্ধার, অনুবাদ ও সম্পাদনা শেষ করেছেন, এবং রচনাটি প্রকাশোন্মুখ। তাঁর একান্ত সহৃদয় আনুকূল্যেই সম্ভব হলো সদ্যোক্ত সংযোজনটি। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

(৫– ৬) একটি নূতন রাজবংশ ॥ দেববংশ (আ. ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ ॥

সপ্তম শতাব্দীতে বিভিন্ন সময়ে সমতটমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে অন্তত তিন'ট ছোট বড় রাজবংশের আধিপত্য ছিল। তাঁরা কেউ ছিলেন সামন্ত, কেউ বা স্বাধীন নরপতিত্বও দাবি করেছেন। খড়্গ বংশ, লোকনাথের বংশ এবং রাতবংশ ছাড়া ইতিমধ্যে এই সমতটমণ্ডলেরই শ্রীহট্ট অঞ্চলে আর এক সামন্ত শ্রীমুরণ্ডনাথের সন্ধান পাওয়া গেছে; তার কথা এই পরিশিষ্টে একটু আগেই বলা হয়েছে। এই শতাব্দীতে এবং এই সময় থেকে প্রাচীন বাঙলার সামাজিক কাঠামোটি যেন মোটামুটি বুঝা যাচ্ছে : সে-কাঠামোটিতে সামন্ততন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রচলন ও প্রসার যেন সুস্পষ্ট। এ-তথ্য উল্লেখযোগ্য যে, সমতটমণ্ডলভুক্ত শ্রীহট্ট অঞ্চলের সামন্ত মুরণ্ডনাথের পিতৃপরিচয় 'সামন্ত সৈন্যপতি'

হিশেবে। সামন্তদের সৈন্যদল গঠন ও পোষণ করতে হ'তো, এ-তথ্যের ইঙ্গিত যেন এই পদবীটিতে স্পষ্ট। যুদ্ধের সময় অধীশ্বর মহারাজাধিরাজাকে সৈন্য-সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতিও কি ছিল? যদি তা থেকে থাকে তা'লে তো সামন্ত-সমাজবিন্যাস (য়ুরোপীয় feudalism অর্থে নয়) আর অস্বীকার করবার উপায় থাকে না।

যাই হোক, ঠিক সপ্তম শতাব্দীতে নয়, কিন্তু অক্ষর-সাক্ষ্যে মনে হয়, শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনও সময় এই সমতটমণ্ডলেই পতিকের (=পট্টিকের, কুমিল্লা শহরের অদূরবর্তী ময়নামতী) অঞ্চলে আর একটি নূতন রাজবংশের খবর ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। এই রাজবংশের রাজা ভবদেব ছিলেন পরমসৌগত (অর্থাৎ বুদ্ধদেব-ভক্ত) এবং তিনি ছিলেন পরমভট্টারক ও মহারাজাধিরাজ। আমার ধারণা, এই রাজবংশ মাৎস্যন্যায়-পর্বেরই অন্যতম সংকেত, অনেক সংকেতের মধ্যে একটি। এই দারুণ রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের সময় ক্ষুদ্র কোনও অঞ্চলের অধিপতিও স্বাধীন সার্বভৌম মহারাজাধিরাজের পদবী দাবি করবেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

লালমাই (লালমাটি) পূর্ব বাংলার পুরাভূমির একটি অংশ; এই অংশে, কুমিল্লা শহর থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে, ময়নামতীর নাতিউচ্চ পাহাড়; উত্তর-দক্ষিণে প্রায় দশ-এগারো মাইল তার বিস্তার। এরই একটি অংশে, শালবনে ঢাকা বিস্তৃত একটি উঁচু ঢিবিতে, গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, যুদ্ধেরই প্রয়োজনে মাটি খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে পড়লো এক বৌদ্ধ মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ, দু'টি স্থানীয় রাষ্ট্রাধিপতি, আনন্দদেব ও ভবদেবের নামাঙ্কিত দু'টি তাম্রশাসন, "ভবদেব-মহাবিহার" মুদ্রিত একটি লাল বেলে পাথরের শীল-মোহর, এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু রৌপ্যমুদ্রা যাতে মুদ্রিত আছে 'পতিকের' শব্দটি। সন্দেহ নেই, পতিকের, পট্রিকেরা, পট্টিকেরক, পাইটকেরা সমস্তই সমার্থক। একটি নূতন স্থানীয় রাজবংশ এই ভাবে বাঙালীর ইতিহাসে সংযোজিত হ'লো।

দু'টি তাম্রশাসনই পাওয়া গেছে বেশ ক্ষতাবস্থায়, এবং একটিরও পাঠ এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। তবে, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ভবদেবের শাসনটির মোটামুটি একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে (Journal of the Asiatic Society, Letters, Vol XVII, 1957, p. 83 ff. and plates)। এই বিবরণ থেকে জানা যায়, ভবদেবের পিতা ছিলেন আনন্দদেব এবং পিতামহের নাম ছিল বীরদেব। ভবদেবের আর একটি নাম ছিল অভিনবমৃগাঙ্ক। ভবদেবের প্রধান কীর্তি তাঁর নিজের নামে "ভবদেব-মহাবিহার" প্রতিষ্ঠা; শালবনপুরে এই বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে বলে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে এই বিহার শালবনবিহার বলে পরিচিত। ভবদেব সমগ্র সমতটমণ্ডলের অধীশ্বর ছিলনা কিনা বলা কঠিন, কিন্তু রাজ্যের পরিধি যে বেশ বিস্তৃত ছিল, তা অনুমান করা চলে। তাঁর রাজধানী ছিল চণ্ডীমুড়া পাহাড়ের

উপর দেবপর্বত নগরে ; চণ্ডীমুড়া পাহাড় ময়নামতী শৈলশ্রেণীর প্রায় দক্ষিণতম প্রান্তে।

(৬) লামা তারনাথের 'চন্দ্র' বংশ কাহিনী ॥

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর তিব্বতী ঐতিহাসিক বৌদ্ধ লামা তারনাথ (জন্ম ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস গ্রন্থে (১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ) বলেছেন, ভঙ্গল (বঙ্গাল দেশ, সাধারণভাবে পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ) দেশে পাল-সম্রাটদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আগে এই দেশ চন্দ্রান্তনামা রাজাদের এক রাজবংশের অধীন ছিল। তিনি এই রাজাদের অনেকের নামোল্লেখ করেছেন, অনেকের কীর্তিকাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও কিছু দিয়েছেন। তাঁর মতে, গোবিন্দচন্দ্র ও ললিতচন্দ্র এই বংশের শেষ দুই রাজা, এবং তারপরই এই দেশে নৈরাজ্য। তখন "পূর্বাঞ্চলের পাঁচটি প্রদেশে, অর্থাৎ ভঙ্গল, ওড়িবিস ও অন্যান্য তিনটিতে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, অভিজাত, ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য, সকলেই নিজ নিজ গৃহে এবং প্রতিবাসীদের মধ্যে রাজার মত ব্যবহার করতেন ; সমগ্র দেশের উপর আধিপত্য করবার মতন রাজা কেউ ছিল না"।

স্পষ্টতই তারনাথ প্রায় আটশত বছর পর শোনা কথার, পরম্পরাগত মৌখিক ইতিহাসের উপর নির্ভর করেছিলেন, কারণ, পালপর্বের আগে চন্দ্রান্তনামা রাজাদের কোনো রাজবংশের কোনো সাক্ষ্য এ-যাবৎ পাওয়া যায়নি, না প্রত্নসাক্ষ্যে না অন্য কোনো সাহিত্য-সাক্ষ্যে। এ-তথ্য যথার্থ যে, পালপর্বে, দশম-একাদশ শতকের বঙ্গ-বঙ্গালে বেশ কয়েক বংশব্যাপী চন্দ্রান্তনামা রাজাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এবং তাঁদের সম্বন্ধে গত পঁচিশ বছরের ভেতর আরও অনেক নূতন তথ্য আমরা জেনেছি (এই পরিশিষ্টেই সে-কথা বলা হ'বে একটু পরেই)। এমন হ'তে পারে, তারনাথ এই চন্দ্রান্তনামা রাজাদের সঙ্গে তাঁর নিজের শোনা বা পড়া কাহিনী গুলিয়ে ফেলেছিলেন ; সন-তারিখের বা দেশ-কাল-পাত্রের হিশেব তিনি গ্রাহ্য করেন নি। মন্ত্রতন্ত্রবিশ্বাসী, আধিভৌতিক ক্রিয়াকর্মে বিশ্বাসী বৌদ্ধ লামার তা করবার কথাও নয়। পালপর্বের ইতিহাস সম্বন্ধেও তিনি যা লিখে রেখে গেছেন, সে-সম্বন্ধেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। সেখানেও ইতিহাস, গালগল্প, কথাকাহিনীর অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

(৭) পালায়ন ॥

(প্রথম) শূরপাল (আ ৮৪৬-৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ) ॥ পূর্ববর্তী সংস্করণে বলা হয়েছিল, দেবপালের পর পাল-সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন (প্রথম) বিগ্রহপাল, এবং শূরপাল ও বিগ্রহপাল ছিলেন একই ব্যক্তি, অর্থাৎ শূরপাল ছিল বিগ্রহপালের অন্য আর একটি নাম। শুধু তা-ই নয়, অনুমান করা হয়েছিল, বিগ্রহপালের পিতা ছিলেন দেবপালের সমরনায়ক বাকপাল। ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুর জেলার কোনো

এক স্থানে শূরপালের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে ; এই শাসনের সাক্ষ্যানুসারে সদ্যোক্ত তিনটি তথ্যই অযথার্থ ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। এই সাক্ষ্য থেকে এখন জানা যাচ্ছে, দেবপালের পর সম্রাট হয়েছিলেন তাঁরই পুত্র শূরপাল, এবং তিনি, রাজৌনাগ্রামে প্রাপ্ত একটি প্রতিমালেখ-সাক্ষ্যে, অন্তত পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন ; আনুমানিক ৮৫০ থেকে ৮৫৭ পর্যন্ত তার রাজত্বকাল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। শূরপালের পর সম্রাট হয়েছিলেন (প্রথম) বিগ্রহপাল ; তিনি ছিলেন ধর্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাকপালের পৌত্র এবং জয়পালের পুত্র। এমন হ'তে পারে, কোনো কারণে বিগ্রহপাল শূরপালকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে সম্রাট হয়েছিলেন, কিন্তু যে-কারণেই হোক, তাঁর পক্ষে বেশিদিন রাজত্ব করা সম্ভবপর হয়নি, কারণ তাঁর পুত্র নারায়ণ-পাল যে আ. ৮৬০ থেকে ৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, প্রায় ৫৬।৫৭ বৎসর, রাজত্ব করেছিলেন তার লিপিসাক্ষ্য বিদ্যমান। বিগ্রহপাল (আ. ৮৫৭—৮৬০) তাঁর পুত্র নারায়ণপালের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন, কেন, তা জানবার কোনো উপায় নেই।

শূরপালের এই শাসনটি থেকে জানা যাচ্ছে (১) তাঁর পিতা দেবপাল নেপাল-রাজকে পরাজিত করেছিলেন এবং (২) সুবর্ণদ্বীপের অধিপতি দেবপালের চরণে প্রণত হ'য়েছিলেন। নেপালের সঙ্গে যে দেবপালের পিতা ধর্মপালের কিছু সংঘর্ষ হয়েছিল এবং ধর্মপাল সেই সংঘর্ষে জয়ী হয়েছিলেন সে-ইংগিত মূল গ্রন্থমধ্যেই আছে। এ-সময়ে নেপাল ছিল তিব্বতের অধীনে। অসম্ভব নয় যে, দেবপালের সঙ্গেও নেপালের কিছু সংঘর্ষ হয়েছিল, এবং এই নেপালীরা ছিল ভোট-ব্রহ্মীয় কম্বোজ কোমের লোক। সুবর্ণদ্বীপাধিপতির প্রণতির উল্লেখ নিঃসন্দেহে দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসনোক্ত শৈলেন্দ্রবংশীয় শ্রীবিজয়াধিপতি (সুমাত্রা-মালয় উপদ্বীপ) বালপুত্রদেবের প্রতি ইঙ্গিত। দেবপালের অনুমতিক্রমে বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাঁরই অনুরোধে দেবপাল এই বিহারের পরিপোষণের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করেছিলেন। শূরপালের তাম্রশাসনের ইঙ্গিত এই ঐতিহাসিক তথ্যটির প্রতি। গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণে দেবপাল-প্রসঙ্গে এই মূল্যবান তথ্যটি উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলাম ; এই সুযোগে সে-অপরাধ স্বীকার করছি।

শূরপালের এই তাম্রশাসন থেকে জানা যাচ্ছে যে, তিনি তাঁর মাতা, অর্থাৎ দেবপাল-মহিষীর নির্দেশে শ্রীনগরভুক্তিতে, অর্থাৎ পাটনা অঞ্চলে, চারটি গ্রাম দান করেছিলেন, দু'টি বারাণসীতে রাজমাতা-প্রতিষ্ঠিত একটি শিবলিঙ্গ-মন্দিরের উদ্দেশে, এবং অন্য দু'টি রাজমাতারই শ্রদ্ধার পাত্র শৈবাচার্যদের পরিপোষণের জন্য।

(৭) রাঢ়া-গৌড়ে কম্বোজাধিপত্য ॥

এই কম্বোজরা পূর্বদক্ষিণ ভারতের (Cambodia-Laos-Vietnam) কম্বুজ হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়, যেহেতু কম্বোজ ও কম্বুজ দুই এক শব্দই নয় (কম্বু = শঙ্খ, কম্বুজ = শঙ্খজাত, অর্থাৎ সমুদ্রের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ)। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গন্ধার-কুটুম্ব কম্বোজদের সঙ্গেও রাঢ়া-গৌড়ের কম্বোজদের কোনো সম্বন্ধ ছিল বলে মনে হয় না। আমার ধারনা, আমাদের এই কম্বোজরা "পাগ সাম-জোন-জাং"-গ্রন্থের কম্-পো-ৎস বা কম্বোজ, এবং এদেরই বংশধর বর্তমান উত্তর-বাংলার কোচেরা।

(৭) বঙ্গে-বঙ্গালে চন্দ্রাধিপত্য ॥

এ-সম্বন্ধে এ-গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণে যা লেখা ও ছাপা হয়েছিল তার প্রায় সবটাই নূতন করে লিখবার প্রয়োজন হয়েছে। গত পঁচিশ বৎসরের নূতন আবিষ্কার সবচেয়ে বেশি আলোকিত করেছে এই বিষয়টিকে, বিশেষভাবে লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ের উৎখননের ফলে। শ্রীহট্ট জেলার পশ্চিমভাগ গ্রামে তাঁর রাজত্বের পঞ্চম বৎসরে পট্টীকৃত রাজা শ্রীচন্দ্রের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। আর, তিনটি তাম্রপট্টোলী পাওয়া গেছে ময়নামতী পাহাড়ের চারপত্রমুড়া অঞ্চলের উৎখনন থেকে; এই তিনটির প্রথম ও দ্বিতীয় পট্টোলীটি জনৈক চন্দ্রান্তনামা রাজা লড়হচন্দ্রের নামাঙ্কিত এবং তৃতীয়টি একই চন্দ্রান্ত রাজা গোবিন্দচন্দ্রের নামাঙ্কিত। চতুর্থ একটি পট্টোলীও একই উৎখনন থেকে পাওয়া গেছে; জনৈক রাজা শ্রীবীরধর দেব বিষ্ণুচক্রলাঞ্ছিত এই পট্টোলীদ্বারা ১৭ পদ ভূমি দান করেছিলেন। পট্টোলীটির অক্ষর-সাক্ষ্যে মনে হয়, বীরধরদেব একাদশ-দ্বাদশ শতকের কোনও সময়ে সমতটমণ্ডলের ময়নামতী অঞ্চলে কোথাও রাজত্ব করতেন। কিন্তু তাঁর বংশ-পরিচয় কি, সমতটমণ্ডলেশ্বর চন্দ্রান্তনামা রাজা শ্রীচন্দ্রের বংশধরদের সঙ্গে তাঁর কোনও আত্মীয়তা ছিল কি না, এ-সম্বন্ধে অন্য কোনও তথ্যই জানা যায় না।

যাই হোক, পূর্বোক্ত রাজা শ্রীচন্দ্র, লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের পট্টোলী চারিটিতে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার দশম-একাদশ শতকের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সম্বন্ধে অনেক নূতন খবর জানা যাচ্ছে। এই রাজাদের বেশ কয়েকটি পট্টোলীর খবর আগেও আমাদের জানা ছিল, কিন্তু নূতন আবিষ্কারের ফলে শুধু রাজবৃত্ত ব্যাপারে নয়, সাংস্কৃতিক ব্যাপারেও নূতন আলোকপাত ঘটেছে। যথাস্থানে তা উল্লেখ করা হ'বে।

এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রোহিতাগিরিবাসী চন্দ্রবংশীয় জনৈক পূর্ণচন্দ্র। দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন, এই রোহিতাগিরি বিহারান্তর্গত বর্তমান শাহাবাদ

জেলার রোহ্‌টাসগড়। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মনে করতেন, এবং আমিও মনে করি, রোহিতগিরি লালমাই (লালমাটি = রক্তমৃত্তিকা) শব্দটিরই সংস্কৃত রূপমাত্র মাত্র, এবং চন্দ্রবংশীয় রাজারা এই লালমাইময়নামতী অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। যাই হোক, স্বাধীন নরপতি না হ'লেও পূর্ণচন্দ্র যে একজন স্থানীয় প্রতাপশালী প্রধান ছিলেন, এমন অনুমানে কোনও বাধা নেই।

পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্রই বোধ হয় এ-বংশের প্রথম পুরুষ যিনি বৌদ্ধ ধর্মের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু এ-বংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি ছিলেন সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র পরমসৌগত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র (এই দীর্ঘ পরিচয়টি শুধু পশ্চিমভাগ পাট্টোলীতেই পাওয়া যায়, পরবর্তী অন্যান্য পট্টোলীতে তিনি শুধু মহারাজাধিরাজ মাত্র)। ত্রৈলোক্যচন্দ্র নানাদিকে তাঁর সামরিক প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। হরিকেল (শ্রীহট্ট) অঞ্চল যে তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করতো, সে খবর আগেই জানা ছিল। এখন জানা যাচ্ছে, তিনি সমতটও (কুমিল্লা-শ্রীহট্ট-নোয়াখালি) তাঁর অধিকারে এনেছিলেন। তখন সমতটের রাজধানী ছিল ক্ষীরোদানদী (কুমিল্লা শহরোপান্তে গোমতী নদীর শাখা খিরা বা খিরনাই নদী)-তীরবর্তী দেবপর্বত, যে দেবপর্বত ছিল দেববংশীয় রাজা ভবদেবের এবং বোধ হয় রাজা কান্তিদেবেরও রাজধানী। দেবপর্বতের অবস্থিতি ছিল লালমাই—ময়নামতী পাহাড়ের উপরই। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের কিছু আগে কাম্বোজ (কোচ বংশীয়?) রাজাদের হাতে দেবপর্বত বিধ্বস্ত হয়েছিল, এমন একটি ইংগিত শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ পট্টোলীতে পাওয়া যায়। তাঁর রাজধানী ছিল বঙ্গে, চন্দ্রদ্বীপে।

হয় ত্রৈলোক্যচন্দ্র নিজেই, অথবা তাঁর পুত্র পরমসৌগত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র তাঁর রাজত্বের (৯২৫-৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) পঞ্চম বৎসরের আগে কোনও একসময় চন্দ্রদ্বীপ থেকে বঙ্গের বিক্রমপুরে তাঁদের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। শ্রীচন্দ্রের নামাঙ্কিত পট্টোলীগুলি থেকে তাঁর রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা কঠিন নয়। চন্দ্রদ্বীপ বিক্রমপুর, হরিকেল প্রভৃতি অঞ্চল তো চন্দ্রবংশীয় রাজাদের করতলগত ছিলই। এখন পশ্চিমভাগ পট্টোলী থেকে জানা যাচ্ছে, পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির সমতটমণ্ডলের শ্রীহট্ট অঞ্চলও এই রাজ্যভুক্ত ছিল। ইদিলপুর পট্টোলী থেকে আগেই জানা ছিল, ফরিদপুর অঞ্চলও চন্দ্রদের আধিপত্য স্বীকার করতো। অর্থাৎ, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গদেশ জুড়ে (ঢাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট) চন্দ্ররাজ্য বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমভাগ লিপি-সাক্ষ্যে মনে হয়, শ্রীচন্দ্র লৌহিত্য-বিধৌত কামরূপে একটি বিজয়াভিযান পাঠিয়েছিলেন এবং গৌড়দের পরাজিত করেছিলেন। (লড়হচন্দ্রের ১ম ময়নামতী লিপি)। তবে, শ্রীচন্দ্রের সবচেয়ে মহৎকীর্তি শ্রীহট্ট অঞ্চলে একটি বিরাট দেবস্থান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পত্তন, যার বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়

নবাবিষ্কৃত পশ্চিমভাগ পট্টোলীতে। ধর্মকর্ম-অধ্যায়ের পরিশিষ্টে সে বিবরণ পাওয়া যাবে।

শ্রীচন্দ্রের পুত্র কল্যাণচন্দ্রের (আ. ৯৭৫-১০০০ খ্রিষ্টাব্দ) সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তিনি লৌহিত্যতীরে ম্লেচ্ছদের এবং গৌড়দের অপমানিত করেছিলেন। মনে হয় এই দাবি তাঁর একান্ত নিজস্ব একক দাবি নয়। হয়তো তিনি পিতা শ্রীচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কামরূপ-প্রাগজ্যোতিষ ও গৌড় বিজয়াভিযানে যোগ দিয়েছিলেন; এই দাবি সেই ইংগিত বহন করছে মাত্র। কিন্তু এই ম্লেচ্ছরা কারা? গৌড়রাজ বলতেই বা কার প্রতি ইংগিত করা হ'চ্ছে? কেউ কেউ মনে করেন, ম্লেচ্ছ বলতে কামরূপের শালস্তম্ভবংশীয় রাজাদের প্রতি ইংগিত করা হ'চ্ছে। কিন্তু এ-ও তো হ'তে পারে, এই ম্লেচ্ছ শব্দটি মেচ্ এই কৌম নামেরই সংস্কৃতিকরণ, যেমন দীনেশচন্দ্রের মত আমারও ধারণা কাম্বোজ শব্দটি কোচ কৌমনামেরই সংস্কৃতীকরণ। আর, গৌড়দের অধিপতি এই দশম-একাদশ শতাব্দীতে তো সুপরিচিত পালবংশীয় রাজাদের কেউ ছিলেন না, কারণ এই সময় গৌড় তাঁদের হস্তচ্যুত হয়ে চলে গিয়েছিল কাম্বোজবংশীয় পালরাজাদের হাতে। ধর্মপাল-দেবপালের বংশধরদের রাজত্ব তখন পূর্ব ও দক্ষিণ বিহারে সীমিত।

কল্যাণচন্দ্রের পুত্র ছিলেন পরমসৌগত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ লড়হচন্দ্র (নামটি যে দেশজ, সন্দেহ নেই)। বস্তুত শ্রীচন্দ্রের কাল থেকে চন্দ্রবংশীয় প্রত্যেকটি রাজার এই একই ঔপধিক পরিচয়। লড়হচন্দ্র বোধ হয় একাধিকবার বারাণসী এবং প্রয়াগে গিয়েছিলেন ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে। তিনি পট্টিকেরকে একটি বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেই মন্দিরে স্বনামের সঙ্গে যুক্ত করে লড়হমাধব-ভট্টারক নামে এক বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করেছিলেন।

লড়হচন্দ্রের (আ. ১০০০—১২ খ্রীষ্টাব্দ) পর তাঁর পুত্র গোবিন্দচন্দ্র (আ. ১০১২-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) রাজসিংহাসন অধিকার করেন। তিনি শিব-ভট্টারকের নাম করে নট্টেশ্বর-ভট্টারকের (নৃত্যপর শিবের) উদ্দেশ্যে পেরনাটন-বিষয়ে (পৌণ্ড্র-বর্ধনভুক্তির সমতটমণ্ডলে) সাহরতলাক গ্রামে দুই পাটক ভূমি দান করেছিলেন। এই গোবিন্দচন্দ্রই বোধ হয় চন্দ্রবংশের শেষ রাজা, এবং ইনিই বোধ হয় বঙ্গালদেশের সেই গোবিন্দচন্দ্র যিনি চোল-সম্রাট রাজেন্দ্রচোলের কাছে পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। বোধহয় ইনিই মধ্যযুগীয় ময়নামতীর গানের রাজা গোবিন্দচন্দ্র। কিন্তু চন্দ্রবংশের পতন বোধ হয় রাজেন্দ্রচোলের বঙ্গালদেশ বিজয়ের জন্য নয়, কারণ রাজেন্দ্রচোল পূর্বভারতে রাজত্ব বিস্তার করতে আসেননি; তাঁর অভিযান সাময়িক দিগ্বিজয়াভিযান ছিল মাত্র। মনে হয়, চন্দ্রবংশের পতন হয়েছিল কলচুরীরাজ কর্ণের বঙ্গবিজয়াভিযানের ফলে। কর্ণ

দাবি করেছেন, তিনি পূর্বদেশের রাজাকে এক বিষম যুদ্ধে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেছিলেন। এই রাজা গোবিন্দচন্দ্র হওয়াই সম্ভব। যাই হোক, এর পর চন্দ্রবংশীয় রাজাদের কথা আর শোনা যাচ্ছে না।

আত্মপরিচয় বর্ণনায় এই রাজবংশের সকলেই, বোধ হয় সুবর্ণচন্দ্রের সময় থেকেই, অন্তত শ্রীচন্দ্রের সময় থেকে তো বটেই, 'পরমসৌগত', অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মানুগত। পট্টোলী-গুলি সমস্তই বৌদ্ধ ধর্মচক্রলাঞ্ছিত। কিন্তু লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁদের বৌদ্ধ-ধর্মানুগত্যের পরিচয় অত্যন্ত শিথিল, বোধহয় পরম্পরা রক্ষা মাত্র। লড়হচন্দ্র তো স্পষ্টতই বৈষ্ণবধর্মানুরক্ত ছিলেন। তিনি ভূমিদান করেছেন বাসুদেব-ভট্টারককে প্রণাম জানিয়ে, লড়হমাধবভট্টারক নামে এক বিষ্ণু-কৃষ্ণের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে ভূমিদান করেছেন, প্রয়াগ-বারাণসী গেছেন ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে। তাঁর পট্টোলী দুটির বক্তব্য ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক দেবদেবী, পৌরাণিক স্মৃতিকথা ও কাহিনী, এবং পৌরাণিক বাতাবরণে আচ্ছন্ন। বারাণসী তীর্থ-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের উল্লেখও নেই আছে শিব, পার্বতী ও ব্রহ্মার। গোবিন্দচন্দ্রের পট্টোলীর বক্তব্যও তাই। তিনি ছিলেন শিবধর্মানুরক্ত; তিনি ভূমিদান করেছেন শিবভট্টারককে প্রণাম জানিয়ে নট্টেশ্বর ভট্টারক অর্থাৎ নৃত্যপর শিব দেবতার উদ্দেশ্যে। এই দুই নৃপতির কোনও পট্টোলীর বিষয়বস্তুতেই কোথাও বৌদ্ধধর্মানুগত্যের কোনও পরিচয় নেই, একমাত্র 'পরমসৌগত' পরিচয় ও ধর্মচক্রলাঞ্ছনটি ছাড়া।

কালটি একাদশ শতকের প্রথমার্ধ বা মধ্যপাদ। পূর্ব-ভারতের পূর্বাঞ্চলে ধর্ম ও সমাজের বাতাস কোনদিকে বইছে, বৌদ্ধধর্মের বাতাবরণ ক্রমশ কি ভাবে শিথিল হয়ে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুকূলে বইতে আরম্ভ করেছে, লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দ-চন্দ্রের পট্টোলীগুলি তার ইংগিত বহন করছে। এ-সম্বন্ধে মূলগ্রন্থে ত্রিশ বৎসর আগে যা বলেছিলাম নবাবিষ্কৃত পট্টোলীগুলিতে তার সুস্পষ্ট সমর্থন পাওয়া গেল।

এই পরিশিষ্টের রাজবৃত্ত অধ্যায়ে লামা তারনাথের চন্দ্রবংশ-কাহিনী অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, পাল-পূর্ব কালে প্রাচীন বাংলায় চন্দ্রান্ত্যনামা রাজাদের একটি সুদীর্ঘ রাজ-বংশের রাজত্বের কথা তারনাথ তাঁর বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে লিখে রেখে গেছেন। তারনাথের এই সাক্ষ্যের যে কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, সে কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। তবে, প্রাচীন বাংলা-সংলগ্ন আরাকানে চন্দ্রান্ত্যনামা রাজাদের এক সুদীর্ঘ রাজবংশের ইতিহাসের সঙ্গে ঐতিহাসিকদের পরিচয় অনেকদিনের। সে-ইতিহাস তদানীন্তন আরাকান রাজধানী বেসালী বা বৈশালীর প্রত্নসাক্ষ্যে এবং মধ্য-বর্মার পগান রাজবংশের পুরাণ-কাহিনীতে সমর্থিত। আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজা আনন্দচন্দ্রের (অক্ষরসাক্ষ্যে আনুমানিক ৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ) একটি সুদীর্ঘ প্রশস্তি-শিলালেখ পাওয়া গেছে, বৈশালী সংলগ্ন সিথাউংয়ের একটি স্তম্ভগাত্রে। এই প্রশস্তিতে আনন্দচন্দ্রের ঊর্ধ্বতন চব্বিশ পুরুষের উল্লেখ আছে এবং একুশ জন রাজার নামে দেওয়া আছে। অর্থাৎ, আনুমানিক চতুর্থ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি

কোনও সময় এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকবে। এ-অনুমান বোধ হয় করা যেতে পারে যে, তারনাথ এই রাজবংশের সঙ্গে বঙ্গ-বঙ্গালের চন্দ্রবংশের কাহিনী গুলিয়ে ফেলেছিলেন।

যাই হোক, কেউ কেউ মনে করেন, আরাকানের এই চন্দ্রবংশের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মনে করবার কারণও আছে। আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের প্রচুর ধাতুমুদ্রা পাওয়া গেছে; শঙ্খ বৃষ, অংকুশ, চামর, শ্রীবৎসচিহ্ন প্রভৃতি লাঞ্ছিত এই মুদ্রাগুলির সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের মুদ্রার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আরাকানের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এমন অনেক প্রতিমা পাওয়া গেছে যার সঙ্গে লালমাই-ময়নামতীর নবাবিষ্কৃত প্রতিমা-সাক্ষ্যের সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের। তা' ছাড়া, বর্মী হ্মন্নানয়াজাবিন (Hmannan Yazawin)-গ্রন্থে আছে, পগান রাজ আনাউরহ্থা (১০৪৪—১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) উত্তর আরাকান জয় ও অধিকার করেন, যার ফলে তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমা পট্টিকের পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। আনাউরহ্থার পুত্র চ্যানজিথার এক কন্যা পট্টিকেরার এক রাজপুত্রের প্রতি প্রেমাসক্ত হন, কিন্তু এ-প্রেম পরিণয়ে পরিণতি লাভ করেনি। এক পুরুষ পর এই বঞ্চিতা নারীরই পুত্র রাজা অলৌঙসিথু (১১১২—১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) পট্টিকেরার এক রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। অলৌংসিথুর মৃত্যুর পর, তাঁরই পুত্র রাজা নরথু বিধবা বিমাতাকে হত্যা করেন। বিধবা কন্যার নৃশংস হত্যার খবর পেয়ে পট্টিকের-রাজ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আটটি যোদ্ধাকে পাঠান এই হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য। পগানে পৌছে রাজাকে আশীর্বাদ করবার ছল করে তাঁরা রাজপ্রাসাদে ঢুকে রাজাকে হত্যা করেন এবং নিজেরাও নিহত হন, অথবা আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করেন। এ-কাহিনী অবিশ্বাস করবার আমি কোনো কারণ দেখিনে। অন্তত পট্টিকেরা রাজ্যের সঙ্গে যে পগান রাজবংশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, এ সম্বন্ধে তো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

যাই হোক, কেউ কেউ মনে করেন, আনাউরহ্থার আরাকান বিজয়ের পর আরাকান-চন্দ্রবংশের অস্তিত্ব আর সেখানে ছিল না; সেই রাজবংশ আরাকান পরিত্যাগ করে চলে এসেছিলেন প্রতিবেশী পট্টিকের রাজ্যে এবং সেখানে নূতন এক চন্দ্রবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বংশই দক্ষিণপূর্ব বাংলার, বঙ্গ-বঙ্গালের চন্দ্রবংশ। এই অনুমানের যুক্তি ও সাক্ষ্যসম্মত কোনও কারণ এখনও কিছু দেখতে পাচ্ছিনে। আনাউরহ্থার আরাকান-বিজয় ১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে হতে পারে না। শ্রীচন্দ্রের রাজবংশ তার আগেই সমতট মণ্ডলে, অর্থাৎ দক্ষিণপূর্ব বাংলায় (পট্টিকের যার অন্তর্ভুক্ত) সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে দুই চন্দ্রবংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ও যোগাযোগ ছিল, এমন অসম্ভব নয়।

[পাঠপঞ্জী: Sircar, D. C, Epigraphic Discoveries in East

নয়পাল (আ ১০২৭—১০৪২ খ্রীষ্টাব্দ)

কিছুদিন আগে, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে, বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের অনতিদূরে সিয়ান গ্রামের শাহজাহানপুর পাড়ার মখদুম শাহ জালানের জীর্ণ একটি দরগায় দু'টি শিলা ফলক পাওয়া যায়। ফলক দুটি বস্তুত একটি বৃহৎ ফলকের দুই ভগ্ন অংশ। দুটি ফলকই ক্ষত বিক্ষত, জীর্ণ, অস্পষ্ট, প্রথমটি অপেক্ষাকৃত কম, দ্বিতীয়টি বেশি। সুতরাং উভয় ফলকেরই সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার অসম্ভব। বহু পরিশ্রমে, বহু অধ্যবসায়ে দীনেশচন্দ্র সরকার মশায় যতটা সম্ভব বিভিন্ন অংশের কিছু কিছু পাঠোদ্ধার করেছেন ; কিন্তু যতটুকু করেছেন তার ফলে পালবংশের কোনও কোনও রাজা সম্বন্ধে, বিশেষ করে (প্রথম) মহীপালপুত্র রাজা নয়পাল সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত ঘটেছে। শিলালেখটি কে উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছেনা, কিন্তু রাজা নয়পালের রাজত্বকালেই যে তা করানো হয়েছিল, এবং যে নরপতির কীর্তিকলাপ এই লেখতে কীর্তিত হয়েছে তিনি যে রাজা নয়পাল ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না, এ-অনুমান সহজেই করা যায়। প্রশস্তি-লেখটির সূচনায়, দীনেশচন্দ্র বলছেন, "পালবংশের ধর্মপাল, তৎপুত্র দেবপাল, বিগ্রহপাল (দ্বিতীয়), এবং নয়পালের নাম উদ্ধার করা গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে ধর্মপালের পিতা গোপাল এবং নয়পালের পিতা এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপালেরও নামোল্লেখ ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে। নয়-পালের পরবর্তী কোন পাল-রাজার নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। প্রশস্তিটিতে যাঁহার ধর্মকীর্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহাকে অনেক সময় নরপতি রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই রাজা যে নয়পাল ব্যতীত অপর কেহ তাহার কোন প্রমাণ প্রশস্তিতে পাওয়া যায় না।"

এই প্রশস্তিটির ১৬নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে, নরপতি (নয়পাল) চেদিরাজ কর্ণের কোটি কোটি সৈন্য ধ্বংস করে প্রজাগণের আনন্দবিধান করেছিলেন। কিন্তু তিব্বতী সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, চেদিরাজের সঙ্গে যুদ্ধ কোনও পক্ষেরই জয়পরাজয়ে মীমাংসিত হয়নি। মূলগ্রন্থে সে কথা বলা হয়েছে, এখানে আর পুনরুক্তি করে লাভ নেই।

সিয়ান গ্রামের এই প্রশস্তিটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যেন নরপতি নয়পালের কীর্তি-কলাপ বর্ণনা, এবং সে-সব কীর্তি প্রায় সমস্তই ধর্মকর্ম সংক্রান্ত। অনেক এই ধরণের

কীর্তির মধ্যে কয়েকটি তালিকাগত করা যেতে পারে : পুরারি বা শিবের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং শৈব সাধুদের বাসের জন্য একটি দ্বিতল মঠ ; একাদশ বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা ; জগন্মাতার জন্য স্বর্ণকলসশোভিত শিলাবলভী (পাথরের চূড়া) নির্মাণ ; পাথরের তৈরী মন্দিরে নয়টি চণ্ডিকামূর্তি প্রতিষ্ঠা ; দেবীকোটে হেতুকেশ শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা ; ক্ষেমেশ্বর শিবের পাথরের মন্দির, মঠ ও সরোবর প্রতিষ্ঠা ; উচ্চদেব-সংজ্ঞক বিষ্ণুমন্দির, তৎসংলগ্ন আরোগ্যশালা ও বৈদ্যাবাস প্রতিষ্ঠা ; ঘণ্টী বা শিব ও তাঁর চারদিকে চৌষট্টি মাতৃকামূর্তি প্রতিষ্ঠা ; চম্পা নগরীতে বটেশ্বরের শিলামন্দির প্রতিষ্ঠা ; (প্রতীহাররাজ) মহেন্দ্রপাল-প্রতিষ্ঠিত চর্চা বা জগদম্বার শৈলমন্দিরে শিলাদ্বারা চূড়া ও সোপান নির্মাণ ; ধর্মারণ্যে মতঙ্গবাপীর সংস্কার, মতঙ্গেশ্বর শিবের মন্দির নির্মাণ, এবং সেই মন্দিরে শিবের কন্যা শ্রী বা লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা ; সূর্যমন্দির প্রতিষ্ঠা ; বৈদ্যনাথ শিবের স্বর্ণখোল নির্মাণ এবং মন্দির-শিখরে স্বর্ণকলস স্থাপন ; অট্টহাসে জগন্মাতার মন্দিরে স্বর্ণকলস স্থাপন ; গঙ্গাসাগরে স্বর্ণত্রিশূল, রৌপ্যের সদাশিব প্রতিমা, স্বর্ণের চণ্ডিকা ও গণেশ প্রতিমা এবং এই প্রতিমা দুটির স্বর্ণপীঠ নির্মাণ ; চন্দ্র প্রতিমা, রৌপ্যের সূর্য প্রতিমা, শিবের স্বর্ণপ্রতিমা এবং নবগ্রহের জন্য স্বর্ণপদ্ম নির্মাণ , শৈবসাধুদের জন্য মঠ প্রতিষ্ঠা , একটি মঠ নির্মাণ ও তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠ বিষ্ণু প্রতিমা প্রতিষ্ঠা ; এবং পিঙ্গালার্যা নাম্নী জগন্মাতার মন্দিরে চূড়া এবং সরোবর নির্মাণ।

এ-প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র যে মন্তব্য করেছেন তা সর্বথা যথার্থ। তিনি বলছেন, "...সিয়ান-প্রশস্তিতে যে-নরপতির ধর্মকীর্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার ভক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল শিবের প্রতি এবং তাঁহার কাছে শিবের পরই ছিল জগন্মাতার স্থান। কিন্তু তিনি বিষ্ণু, সূর্য, গণেশ, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতার প্রতিও একেবারে ভক্তিহীন ছিলেন না।"

"পালবংশীয় রাজা নয়পালকে পূর্বে বৌদ্ধ মনে করা হইত। বাণগড় শিলা-প্রশস্তির আবিষ্কারের ফলে দেখা গিয়াছে যে, তিনি শৈবাচার্য সর্বশিবের নিকট শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি শিব এবং শক্তির উপাসক ছিলেন বলা যায় ; কিন্তু পৌরাণিক বা স্মার্ত মতাবলম্বী হিন্দুর ন্যায় অন্যান্য দেবদেবীকেও তিনি অবজ্ঞা করিতেন না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সিয়ান-প্রশস্তিতে রাজার কীর্তিকলাপের মধ্যে বৌদ্ধবিহার নির্মাণ এবং বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই।"

কালটি একাদশ শতকের প্রথমার্ধ। সুতরাং ধর্মের এই দিক পরিবর্তনে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

[এই সংযোজনাংশের সমস্ত তথ্যই আহৃত হয়েছে : দীনেশচন্দ্র সরকার, "সিয়ান গ্রামের শিলালেখ", সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৮৩ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৮৩, ১-২২ পৃ প্রবন্ধটি থেকে।]

(৭) পাল-রাজাদের তারিখ

পাল-বংশীয় রাজাদের রাজত্বের আরম্ভ ও অবসানের তারিখ ইত্যাদি নিয়ে তর্কবিতর্কের শেষ নেই ; একজন পণ্ডিতের নির্ধারণের সঙ্গে আর একজনের মতামতের ঐক্য আর কিছুতেই হ'চ্ছে না। বোধ হয় হ'বার কথাও নয়। এখনও মাঝে মাঝে রাজাদের নাম ও রাজ্যাঙ্কের উল্লেখ-সম্বলিত নূতন শিলা বা তাম্রলেখ, প্রতিমালিপি, পাণ্ডুলিপিইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে। তার ফলে কারও কারও রাজত্বকাল বেড়ে যাচ্ছে, যেমন রামপালের। নূতন রাজার নামও পাওয়া যাচ্ছে, যেমন শূরপালের। যে-কোনও রাজার রাজ্যাঙ্কের শেষ-জ্ঞাত তারিখটিই সাধারণত ধরা হয় তাঁর রাজত্বের অবসানের তারিখ বলে ; এই তারিখটি যখন নূতন কোনও সাক্ষ্যে এগিয়ে যায় দু'চার পাঁচ-সাত বছর কি তারও বেশি তখন জানা তারিখ সাজিয়ে যে সৌধটি খাড়া করা হয়েছিল তা তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে। সুতরাং নূতন করে আবার তখন আর একটা কাঠামো দাঁড় করাতে হয়, কারণ মোটামুটি একটা কাঠামো ছাড়া ইতিহাসকে দাঁড় করানো যায়না। সেজন্য মনে রাখা ভাল যে, কোনও রাজত্বের আরম্ভ বা অবসানের তারিখ একান্ত সুনিশ্চিত নয়, আনুমানিক মাত্র এবং তা-ও নূতন সাক্ষ্যে নূতনতর বিলম্বিত তারিখ পাওয়া গেলে পরিবর্তনীয়।

যাই হোক, এ-গ্রন্থ রচনার পর এ-প্রসঙ্গে, নূতন আবিষ্কার ও নূতন আলোচনা-গবেষণার ফলে যে-সব নূতন তথ্য জানা গেছে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেহেতু গ্রন্থমধ্যে তারিখগুলি তদনুযায়ী সংশোধন করা হয়েছে।

(প্রথম) গোপালদেব কবে প্রকৃতিপুঞ্জের 'নির্বাচনে' পাল-সিংহাসনে বসেছিলেন তা সুনির্ধারিতভাবে আমাদের জানা নেই। সকল দিক বিবেচনা করে মোটামুটি ধরে নেওয়া হয়েছে খ্রীষ্টাব্দ ৭৫০এ। তাঁর পুত্র ধর্মপাল অন্তত ৩২ বৎসর এবং ধর্মপালের পুত্র দেবপাল অন্তত ৩৫ বা ৩৯ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। সমগ্র তালিকাটির চালাচালির সুবিধার জন্য বিলম্বিত ৩৯ বৎসরটি ধরে গণনা করাই যুক্তিযুক্ত।

দেবপাল-পুত্র শূরপাল সম্বন্ধে সংবাদটি নূতন। তাঁর মীর্জাপুর তাম্রশাসন থেকেই আমরা প্রথম জানতে পারলাম যে, দেবপালের মৃত্যুর পর শূরপালই পাল-সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন। রাজৌনা-প্রতিমালিপি অনুসারে তিনি অন্তত ৫ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। আগেই জানা ছিল, তাঁর উত্তরাধিকারী (প্রথম) বিগ্রহপাল অন্তত ৩ বৎসর এবং তৎপুত্র নারায়ণপাল অন্তত ৫৪ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।

নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপালের রাজত্বের কাল সম্বন্ধে একটি নূতন তথ্য জানা গেছে। লণ্ডনের ভিকটোরিয়া ও অ্যালবার্ট মুাজিয়মে বলরামের একটি প্রতিমা আছে ; সেই প্রতিমাটির পাদপীঠে একটি লিপি উৎকীর্ণ। রাজ্যপালের রাজত্বের পূর্বজ্ঞাত শেষ তারিখ ছিল ৩২ বৎসর ; এখন এই নূতন সাক্ষ্যে জানা যাচ্ছে, তিনি

অন্তত ৩৭ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী (দ্বিতীয়) গোপাল রাজত্ব করেছিলেন অন্তত ১৭ বৎসর। এই তারিখটি জানা যাচ্ছে মৈত্রেয়-ব্যাকরণের একটি তালপাতার পুঁথি থেকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তারিখটি পড়েছিলেন ৫৭, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭ এবং দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, ১১। আমি ১৭ পাঠটিই গ্রহণ করেছি, কারণ ৫৭ বৎসরের সুদীর্ঘ রাজত্ব পাল-কাঠামোতে গুছিয়ে তোলা কঠিন যেহেতু এতটা সময়ের জায়গা পাওয়া কঠিন; এবং ১১ বড় বেশি কম।

(দ্বিতীয়) গোপালের পর রাজা হন (দ্বিতীয়) বিগ্রহপাল। বিগ্রহপাল নামাঙ্কিত একটি মৃৎফলক-লিপি বহুদিন জ্ঞাত; এই ফলকের রাজ্যাঙ্ক তারিখ ৮। একই নামাঙ্কিত তিনটি প্রতিমালিপিও আছে; তিনটিই বিহারের কুর্কিহার থেকে। তিনটি প্রতিমাই মুকুট-পরিহিত বুদ্ধের, তিনটিই সর্বতোভাবে একই শৈলীর একই প্রতিমালক্ষণ যুক্ত। একটির রাজ্যাঙ্ক-তারিখ ৩ বা ২, আর দুইটির ১৯। তিনটি প্রতিমাই যে একই রাজার আমলের এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নেই। তা' ছাড়া, ব্রিটীশ ম্যুজিয়মে রক্ষিত বৌদ্ধ পঞ্চরক্ষার একটি পাণ্ডুলিপির ভণিতায় এক পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ বিগ্রহপালদেবের উল্লেখ আছে; এই পাণ্ডুলিপি লেখা শেষ হয়েছিল তাঁর রাজত্বের ২৬তম বৎসরে। কেউ কেউ বলেছেন, এই রাজ্যাঙ্ক-তারিখগুলি (দ্বিতীয়) বিগ্রহপালের হ'তে পারে, (তৃতীয়) বিগ্রহপালের হ'তেও কোন বাধা নেই, এবং এ-দুজনের একজন অন্তত ২৬ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এই ২৬ বৎসরের রাজত্বকাল (তৃতীয়) বিগ্রহপালের, (দ্বিতীয়) বিগ্রহপালের নয়। কেন, তা বলছি।

(প্রথম) মহীপালের বাণগড় শাসনে বলা হয়েছে, তাঁর পিতৃরাজ্য বিলুপ্ত হয়েছিল অনধিকারীদের (কাম্বোজ=কোচদের ?) হাতে; তিনি তার পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এই বিলুপ্তি ঘটেছিল (দ্বিতীয়) বিগ্রহপালের রাজত্ব কালে। সেই বিগ্রহপাল তাঁর ১৯ রাজ্যাঙ্ক বৎসরে নিজেকে পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ বলে বর্ণনা করেছেন, এমন করা একটু অস্বাভাবিক। তাঁর রাজত্বকালে পাল-রাজ্যে বড় দুর্যোগ; সেই দুর্যোগের মধ্যে তিনি বেশিদিন রাজত্ব করতে পেরেছিলেন মনে হয় না। অন্যদিকে, যদি ধরা যায়, নালন্দা মৃৎফলক-লিপি এবং তিনটি কুর্কিহার প্রতিমালিপি, সব ক'টিই (তৃতীয়) বিগ্রহপালের তাহলে এই রাজার রাজ-জীবনে একটি সঙ্গতি ও ধারাবাহিকতা পাওয়া যায়। প্রথম কুর্কিহার প্রতিমালিপিটিতে রাজ্যাঙ্ক তারিখ ৩ (বা ২); এই লিপিতে বিগ্রপালের পরিচয় শুধু 'শ্রীমান' বলে; ৮ রাজ্যাঙ্কের নালন্দা মৃৎফলক লিপিটিতে সে-পরিচয় বিবর্তিত হয়েছে 'শ্রীমন মহারাজ'এ; এবং ১৯ রাজ্যাঙ্কের কুর্কিহার প্রতিমালিপি-দুটিতে একবারে 'শ্রীমন বিগ্রহপালদেব রাজাধিরাজ পরমভট্টারক' রূপে। (দ্বিতীয়) বিগ্রহপালের দুর্যোগময় রাজত্বকালে এ-ধরনের ক্রমবিবর্তন অনুমান করা

কঠিন, বিশেষ করে যখন তাঁরই রাজত্বকালে রাজ্যের বৃহৎ একটি অংশ ছেড়ে দিতে হয়েছিল শত্রুর হাতে।

কিন্তু, (তৃতীয়) বিগ্রহপালই দীর্ঘতর কাল, অর্থাৎ, অন্তত ২৬ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন, এ-অনুমানের বড় কারণ কুর্কিহারের মুকুট-শোভিত বুদ্ধদেবের প্রতিমা তিনটির শিল্পশৈলী ও প্রতিমালক্ষণ। এ-তথ্য সুবিদিত যে, মুকুট-পরিহিত বুদ্ধের প্রতিমালক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল গন্ধারে, তবে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের আগে নয়। গন্ধার থেকে এই বিশিষ্ট প্রতিমা শৈলীটি কাশ্মীরে প্রসারিত হয়েছিল, মনে হয়, ষষ্ঠ সপ্তম শতকে। তারপরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কুর্কিহারের এই মূর্তি তিনটিতে আর, পাওয়া যাচ্ছে বর্মাদেশে, পগানের আনন্দমন্দিরে ও অন্যত্র, যেখানে প্রতিমাটির পরিচয় জম্বুপতি নামে। পগান-প্রতিমাগুলির সুস্থির তারিখ মোটামুটি একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ (১০৫০-১১০০)। এই প্রতিমাগুলির সঙ্গে কুর্কিহারের প্রতিমাগুলির শিল্পশৈলী ও প্রতিমালক্ষণ-সাদৃশ্য এত ঘনিষ্ঠ যে, কুর্কিহারের প্রতিমাগুলি একাদশ শতকের প্রথমার্ধের আগে কিছুতেই হতে পারে না। সুতরাং এই প্রতিমালিপি তিনটির বিগ্রহপাল (তৃতীয়) বিগ্রহপাল হওয়াই বেশি সঙ্গত।

(দ্বিতীয়) বিগ্রহপাল কতকাল রাজত্ব করেছিলেন তার ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যাচ্ছেনা। মনে হয়, দশম শতাব্দীর দুর্যোগময়ী সন্ধ্যায় বেশিদিন তাঁর রাজত্ব করা সম্ভব হয়নি।

(দ্বিতীয়) বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর রাজা হয়েছিলেন (প্রথম) মহীপাল; তিনি অন্তত ৪৮ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের মধ্যে একটি স্থির-নির্দিষ্ট তারিখকে স্থান দিতেই হয়। সারনাথে প্রাপ্ত একটি প্রতিমালিপিতে বলা হয়েছে, (প্রথম) মহীপালের আদেশে সেখানে কিছু কিছু নূতন মন্দিরাদি নির্মাণ ও কিছু পুরাতন মন্দিরাদির সংস্কার-ক্রিয়ার ভার দেওয়া হয়েছিল তাঁর দুই ভাই স্থিরপাল ও বসন্তপালের উপর। লিপিটির তারিখ ১০৮৩ বিক্রমাব্দ=খ্রীষ্টাব্দ ১০২৬। সুতরাং এই তারিখটি বহু অনিশ্চয়তার মধ্যে একটি স্থিরনিশ্চিত চিহ্ন।

মহীপালের পর পাল-সিংহাসন আরোহণ করেন রাজা নয়পাল, নয়পাল অন্তত ১৫ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেরও মোটামুটি একটি স্থিরবিন্দু আছে: কলচুরী-রাজ কর্ণের সঙ্গে তাঁর একটি সংঘর্ষ হয়েছিল। কর্ণ খ্রীষ্টীয় ১০৪১-এ সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন; সুতরাং এই তারিখটিকে নয়পালের ১৫ বছর রাজত্বকালের মধ্যে স্থান দিতে হয়।

নয়পালের উত্তরাধিকারী (তৃতীয়) বিগ্রহপাল অন্তত ২৬ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে।

(তৃতীয়) বিগ্রহপালের পরে পর পর রাজা হয়েছিলেন (দ্বিতীয়) মহীপাল ও

(দ্বিতীয়) শূরপাল। এ'দের রাজত্বকাল সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নেই ; তবে দু-জনের কেউই বোধ হয় খুব সংক্ষিপ্তকালের বেশি রাজত্ব করতে পারেন নি।

(দ্বিতীয়) শূরপালের উত্তরাধিকারী রামপাল অন্তত ৫৩ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। দিল্লীর ন্যাশনাল ম্যুজিয়ুমে বৌদ্ধ পঞ্চরক্ষা-গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি আছে, পাণ্ডুলিপিটি লেখা শেষ হয়েছিল রামপালের রাজ্যাঙ্ক ৫৩ বৎসরে। রামপালের পরে পর পর রাজা হয়েছিলেন কুমারপাল এবং (তৃতীয়) গোপাল। কুমারপালের রাজত্বের কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়না ; অনুমান করা চলে মাত্র। (তৃতীয়) গোপাল অন্তত ১৪ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।

(তৃতীয়) গোপালের পর রাজা হ'য়েছিলেন মদনপাল। তিনি অন্তত ১৮ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের দুটি স্থির নির্দিষ্ট তারিখ জানা যায়। বলগুদর প্রতিমালিপিটিতে তাঁর রাজ্যাঙ্ক তারিখ দেওয়া আছে ১৮, আর বৎসরটি উল্লেখ করা হয়েছে শকাব্দ ১০৮৩ বলে, অর্থাৎ মদনপালের ১৮ তম রাজ্যাঙ্ক হচ্ছে খ্রীষ্টাব্দ ১১৪৩। এই রাজারই নানগড় প্রতিমালিপিটির তারিখ হচ্ছে বিক্রমাব্দ ১২০১, অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ ১১৪২-৪৩। সুতরাং মদনপালের রাজত্বকাল খ্রীষ্টাব্দ ১১৪৮-এ অবসিত হয়েছিল, এমন অনুমানে বাধা নেই।

মদনপালের পর গোবিন্দপাল রাজা হয়েছিলেন। এই রাজার গয়া-শিলা-লেখতে তারিখ দেওয়া আছে বিক্রমাব্দ ১২৩২=খ্রীষ্টাব্দ ১১৭৪। গোবিন্দপাল অন্তত এই তারিখটি পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন, সন্দেহ নেই।

তালিকাগত করলে পাল-রাজাদের রাজত্বের তারিখগুলি এই রকম দাঁড়ায়।

রাজার নাম	রাজত্বকাল	মোটামুটি তারিখ (খ্রীষ্টাব্দে)
(প্রথম) গোপাল	জানা নেই ; আ. ২৫ বৎসর	৭৫০-৭৭৫
ধর্মপাল	৩২ বৎসর	৭৭৫-৮০৭
দেবপাল	৩৯ ,,	৮০৭-৮৪৬
(প্রথম) শূরপাল	৫	৮৪৬-৮৫১
(প্রথম) বিগ্রহপাল	৩ ,,	৮৫১-৮৫৪
নারায়ণপাল	৫৪ ,,	৮৫৪-৯০৮
রাজ্যপাল	৩৭ ,,	৯০৮-৯৪৫
(দ্বিতীয়) গোপাল	১৭ ,,	৯৪৫-৯৬২
(দ্বিতীয়) বিগ্রহপাল	জানা নেই ; আ. ১৭ বৎসর	৯৬২-৯৭৯
(প্রথম) মহীপাল	৪৮ বৎসর	৯৭৯-১০২৭
নয়পাল	১৫ ,,	১০২৭-১০৪২
(তৃতীয়) বিগ্রহপাল	২৬ ,,	১০৪২-১০৬৮

রাজার নাম	রাজত্বকাল	মোটামুটি তারিখ (খ্রীষ্টাব্দে)
(দ্বিতীয়) মহীপাল	জানা নেই	} আঃ ১ বৎসর ১০৬৮-১০৬৯
(দ্বিতীয়) শূরপাল	„ „	
রামপাল	৫৩ বৎসর	১০৬৯-১১২২
কুমারপাল	জানা নেই ঃ আ. ১ বৎসর	১১২২-১১২৩
(তৃতীয়) গোপাল	জানা নেই : আ. ২ বৎসর	১১২৩-১১২৫
মদনপাল	১৮ „ (শক ১০৮৩)	১১২৫-১১৪৩
গোবিন্দপাল	জানা নেই ঃ (বিক্রমাব্দ ১২৩২)	১১৪৩-১১৭৪

একাদশ অধ্যায়

দৈনন্দিন জীবন

এ-অধ্যায়ে সংশোধন বা সংযোজনার কোনো প্রয়োজন অনুভব করছি না। টুকরো টাকরা নূতন খবর দু-চারটি পাওয়া যায় না, এমন নয়; কিন্তু তা এমন কিছু কৌতূহলোদ্দীপক নয়। মূল গ্রন্থোক্ত বিবরণের সাধারণ চিত্র এবং চরিত্রও তাতে কিছু বদলায় না। গত পঁচিশ বছরের ভেতর তাম্রলিপ্ত, চন্দ্রকেতুগড় ও ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রচুর পোড়ামাটির ছোট ছোট ফলক পাওয়া গেছে। সেই সব ফলকে সমসাময়িক কালের দৈনন্দিন জীবনের নানা টুকরো-টাকরা পরিচয় পাওয়া যায়, নানা ছায়াছবি দেখা যায়। তেমন কিছু কিছু ফলকের ছবি গ্রন্থশেষের চিত্র-সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু যেহেতু এই ফলকগুলি মুখ্যত মৃৎশিল্প-নিদর্শন, এগুলোর আলোচনা করা হয়েছে, কিছুটা সংক্ষিপ্ত ভাবেই, শিল্পকলা অধ্যায়ের, অর্থাৎ চতুর্দশ অধ্যায়ের সংশোধন ও সংযোজনায়। কিছু কিছু ধর্মকর্ম-সংবাদও এই ফলকগুলিতে পাওয়া যায়; এ-ধরনের সংক্ষিপ্ত সংবাদ যোজিত হলো দ্বাদশ অধ্যায়ের সংশোধন ও সংযোজনায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

ধর্মকর্ম ঃ ধ্যান-ধারণা

গত পঁচিশ বছরের ভেতর প্রাচীন বাঙলার নানা জায়গা থেকে মৃৎশিল্পের প্রচুর ফলক (তাম্রলিপ্ত, চন্দ্রকেতুগড়, ময়নামতী), প্রচুর প্রস্তর ও ধাতব মূর্তি ও প্রতিমা এবং বেশ কিছু শিলালিপি ও তাম্রপট্ট আবিষ্কৃত (প্রধানত ময়নামতী থেকে) হয়েছে ; এখনও মাঝে মাঝেই হচ্ছে (যেমন, মেদিনীপুর জেলায় এগরাগ্রামে গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের রাজত্বকালীন একটি তাম্রশাসন)। কিন্তু তার ফলে সংশোধনের বা নূতন সংযোজনের প্রয়োজন হতে পারে এমন তথ্যের পরিমাণ খুব বেশি নয়। তাম্রশাসন ও শিলালেখ-গুলি থেকে যে-সব নূতন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা যথাস্থানে সংযোজন করা হয়েছে ; এই অধ্যায়েও তেমন দু-একটি তথ্য আছে। অধিকাংশ মূর্তি ও প্রতিমায় ধর্মকর্মের, ধ্যান-ধারণার ও প্রতিমালক্ষণের যে-পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা প্রায় সবই পূর্বজ্ঞাত তথ্যেরই পুনরুক্তি। তবু, নবাবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুগুলির ভেতর, বিশেষভাবে মৃৎশিল্পনিদর্শন গুলির ভেতর, কিছু কিছু প্রতিমাশিল্প ও স্থাপত্যনিদর্শন গুলির ভেতর, ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণাগত নূতন তথ্য কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। সংযোজন প্রসঙ্গে মাত্র সে-সব তথ্যগুলিরই উল্লেখ করা যেতে পারে।

(২) প্রাক-আর্যব্রাহ্মণ্য লোকায়ত ধর্মকর্ম ॥

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রত্নোৎখনন ও অনুসন্ধানের ফলে প্রচুর মৃৎশিল্পনিদর্শন আবিষ্কারের ভেতর পোড়ামাটির তৈরী বেশ কিছু ফলক (১২ থেকে ২২ ইঞ্চি) পাওয়া গেছে যার বিষয়বস্তু হচ্ছে নানা ভঙ্গিতে নরনারীর সুস্পষ্ট মৈথুন (মিথুনমাত্র নয়) ক্রিয়া। এত বেশি সংখ্যায় না হলেও তাম্রলিপ্ত থেকেও এ-ধরনের ছোট ছোট মৈথুন ফলক কিছু কিছু পাওয়া গেছে। শিল্পরূপ দেখে মনে হয়, খৃষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় থেকে চতুর্থ-পঞ্চম শতক পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের সামুদ্রিক বন্দরগুলিতে এই ধরনের ফলকের বেশ একটা চাহিদা ছিল। কেন ছিল, কি ছিল এগুলির উদ্দেশ্য ও ব্যবহার, সমাজের কোন স্তরে ছিল এগুলির প্রচলন, এ-সব প্রশ্নের কোনো সঠিক উত্তরই দেবার উপায় আজও নেই। তবে, আমার ধারণা, ঠিক পূজার জন্য বা ধর্মীয় প্রতীক হিশেবে ব্যবহৃত না হলেও প্রজনন-ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ রূপ হিশেবে এ-ধরনের ফলকের একটা মাঙ্গলিক প্রতীকত্ব ছিল এবং লোকেরা অন্যান্য মাঙ্গলিক-চিহ্নের মত মৈথুন-ফলকও ঘরে রাখতেন। এই চন্দ্রকেতুগড় থেকেই বেশ কয়েকটি ফলক (৩ থেকে ৫ ইঞ্চি প্রমাণ) পাওয়া গেছে যাতে চিত্রিত হয়েছে কিঞ্চিৎ লীলায়িত ভঙ্গিতে দণ্ডায়মানা একটি নারীমূর্তি ; তার ডান হাত থেকে ঝুলছে একটি মাছ। এই জাতীয় ফলক

যে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো তা ফলকগুলির মাথায় বা পেছনে উপরের দিকে এক বা একাধিক ছিদ্র থেকেই অনুমান করা যায়। শিল্পরূপ সাক্ষ্যে মনে হয়, এই ফলকগুলিরও তারিখ তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতকের ভেতর। মাছ যে প্রজনন-শক্তির প্রতীক এ-তথ্য তো সুপরিজ্ঞাত ; সেই হিশেবেই লোকেরা এই ধরনের ফলক ঘরে রাখতো। তাতে প্রতীক মাঙ্গলিক চিহ্নে গৃহ অর্থযুক্ত হতো, ঘর সাজানোও হতো।

চন্দ্রকেতুগড় থেকে অনেক ছোট ছোট (৩ থেকে ৫।৬ ইঞ্চি) পোড়ামাটির তৈরী ছেলেমেয়েদের খেলনার রথ পাওয়া গেছে। প্রত্যেকটি রথেই কোনো না কোনো দেবতা (হয় অগ্নি, না হয় ইন্দ্র, না হয় কুবের) একটি আসনে আসীন। একটি আসন বিধৃত হয়ে আছে মুখোমুখি দণ্ডায়মান দুটি ভেড়ার মাথার উপর, আর একটি ডানা যুক্ত এক হাতীর মাথার উপর। এই চক্রযুক্ত খেলনা-রথগুলির আকৃতি ছোট, কিন্তু এগুলির শিল্পরূপ বৃহদাকৃতির, শিল্পায়তনের ওজন ও বিস্তার বড় বড় রথের। আমার দৃঢ় ধারণা, এই খেলনা-রথগুলি তৈরী হয়েছিল ছেলেমেয়েদের জন্যই, কিন্তু বৃহদায়তন সুবৃহৎ চক্রবাহিত রথগুলির অনুকরণে, যেমন আজও করা হয় শহরে, গ্রামে, পুরীর জগন্নাথের রথযাত্রার দিনে, ছেলেমেয়েদের আনন্দ-বিধানের জন্য। আর, রথযাত্রা যে প্রাক-আর্যব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্ম-ধ্যান ধারণার অন্যতম একটি অনুষ্ঠান, একথা আজ আর অস্বীকার করা যায় না।

(৪) জৈনধর্ম ॥

মূলগ্রন্থেই বলা হয়েছে, জৈনধর্মই বাঙালার আদিতম আর্য ধর্ম। কিন্তু পাহাড়পুর পট্টোলী-উল্লিখিত (৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) বটগোহালী বা গোয়ালভিটার জৈন-বিহারের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আবিষ্কৃত ছোট একটি জিন-প্রতিমা ছাড়া আর কোথাও এমন কোনো প্রত্নচিহ্ন পাওয়া যায়নি যাকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের আগে কাল-চিহ্নিত করা যেতে পারে। অন্তত তেমন কোনো প্রমাণ আমার জানা নেই। পাহাড়পুরের জিন-প্রতিমাটি বহুকাল অন্তর্হিত ; আমি তার ছবিও কোথাও দেখিনি। তবে, সাত-আট বৎসর আগে চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে আহৃত, পাথরে তৈরী, মুণ্ডহীন, ভগ্নপদ, শ্রীবৎসলাঞ্ছন-চিহ্নিত, কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান, একান্ত নগ্ন ছোট একটি জিনমূর্তি পাওয়া গেছে। ছবিতে যতটা ধরা যায় দেখে মনে হয়, প্রতিমাটি পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে কোনো সময়ে তৈরী হয়েছিল, অর্থাৎ গুপ্তপর্বে। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তা হলে এই প্রতিমাটিই প্রাচীন বাঙালার আদিতম জৈন-প্রতিমা যা আজও লোকচক্ষু-গোচর।

বেশ কয়েক শতাব্দী পর, মোটামুটি নবম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া অঞ্চলে জৈনধর্ম সুপ্রচলিত ছিল এবং এই ধর্ম বহুলোকের মানসাশ্রয় ছিল, এমন অনুমানের সমর্থনে প্রচুর প্রতিমা ও কিছু কিছু মন্দিরসাক্ষ্য বিদ্যমান।

তেমন কয়েকটি প্রতিমা ও মন্দিরের ফটো-প্রতিলিপি এ-গ্রন্থের চিত্র-সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যাবে। আসানসোলের কাছে দোমহানী-কেলেজোরায় প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ ধাতু নির্মিত নবম শতকীয় একটি অতি মনোরম ঋষভনাথের কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান প্রতিমা, পুরুলিয়া জেলার পাকবিড়রা গ্রাম থেকে পাওয়া, ক্লোরাইট পাথরে তৈরী, তীর্থঙ্করদেরদ্বারা পরিবৃত অবস্থায় কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান, নবম শতকীয় একটি ঋষভনাথের প্রতিমা, একই গ্রাম থেকে পাওয়া, একই পাথরে তৈরী নবম শতকীয় একটি পার্শ্বনাথের প্রতিমা, এই পাকবিড়রা গ্রাম থেকেই পাওয়া, ক্লোরাইটে তৈরী, কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান, আনুমানিক একই তারিখের তীর্থঙ্কর পদ্মপ্রভুর এক অতিকায় প্রতিমা এবং বাঁকুড়া জেলায় তালডাংড়া থানার অন্তর্গত দেউলভিড়া গ্রামের, ক্লোরাইটে তৈরী, দশম শতকীয় একটি তীর্থঙ্কর মুণ্ড এমন অনেক জৈন-প্রতিমা নিদর্শনের কয়েকটি মাত্র।

পুরুলিয়া জেলার পাকবিড়রা গ্রামে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; সদ্যবর্ণিত প্রতিমা-প্রমাণগুলিই তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই পাওয়া গেছে চারিদিকে চারজন তীর্থঙ্কর-শোভিত ছোট একটি চৌমুখ নিবেদন-মন্দির, একটি সুবৃহৎ ক্লোরাইট প্রস্তরখণ্ড কুঁদে তৈরী। ভাস্কর-সাক্ষ্যে মনে হয় মন্দিরটি নবম শতকীয়। বাঁকুড়া ও এই পুরুলিয়া জেলারই নানা জায়গায় পাথরে ও ইঁটে তৈরী, রেখবর্গীয় অনেকগুলি মন্দির ধ্বংসাবশেষের নানা অবস্থায় আজও দাঁড়িয়ে আছে। এ সব কটি দেবায়তনই দশম থেকে দ্বাদশ শতকের ভেতর নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমানে বিশেষ বাধা নেই। স্থাপত্যরীতি ও রূপই এ-অনুমানের হেতু। এই মন্দিরগুলির মধ্যে বাঁকুড়া জেলার সোনাতপল গ্রামের মন্দির, পুরুলিয়া জেলার দেউলঘাটি গ্রামের দু'টি মন্দির এবং এই জেলারই রেখবর্গীয় অথচ একটু ভিন্ন চরিত্রের, পাথরের তৈরী আর একটি দেবায়তনের উল্লেখ করতেই হয়, যেহেতু কি ধর্মের দিক থেকে কি স্থাপত্যরূপ ও রীতির দিক থেকে এই দেবায়তনগুলি এ যাবৎ আমাদের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

এই দেবায়তনগুলির উল্লেখ আমি করছি জৈন ধর্মকর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে, যেহেতু আমার অনুমান, মন্দিরগুলি সবই জৈন-ধর্মকর্ম সংপৃক্ত। নবম থেকে দ্বাদশ শতক, এই প্রায় চারশত বছর, অন্তত বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলে, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের প্রচলন খুব দেখতে পাচ্ছিনে; প্রতিমা ও মন্দির-সাক্ষ্য তেমন কিছু নেই, একমাত্র তেলকুপী ছাড়া। অথচ, অন্যপক্ষে এই দুই জেলা থেকে জৈন প্রতিমা প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে প্রচুর, ক্রমশ আরও পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রতিমাগুলির অধিষ্ঠান কোথায় ছিল কোথায় পূজিত হতেন এই তীর্থঙ্করেরা? এ-প্রশ্নের উত্তর পেতে হ'লে স্বভাবতই এই দেবায়তনগুলির কথাই মনে হয়।

(৫) বৌদ্ধধর্মকর্ম ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ॥

চন্দ্রকেতুগড়ে খনা-মিহিরের ঢিবির ধ্বংসাবশেষের ভেতর থেকে যে-সব প্রত্নবস্তু উদ্ধার করা হয়েছে তার ভেতর ছোট একটি বুদ্ধ প্রতিমাও আছে। গড়ন শৈলী দেখে মনে হয়, প্রতিমাটি পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের আগে কিছুতেই হ'তে পারে না। তবে, প্রতিমাটির বর্তমান অবস্থা এত দীন ও সংশয়াকীর্ণ যে কিছুই স্থির করে বলবার উপায় নেই। তাম্রলিপ্তেও বেশ কয়েকটি বুদ্ধ-প্রতিমা ও বৌদ্ধধর্মাশ্রিত ফলক পাওয়া গেছে। চিত্র-সংগ্রহ ও চিত্র-পরিচিতিতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

মূলগ্রন্থের নানা জায়গায় নানা প্রসঙ্গে পাল-সম্রাট ধর্মপাল-প্রতিষ্ঠিত সোমপুর (পাহাড়পুর) মহাবিহারের কথা বলা হয়েছে। আয়তনে ও প্রতিষ্ঠায়, মহিমা ও সৌষ্ঠবে এই মহাবিহারটির মত না হলেও তুলনীয় আর একটি মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ ইতিমধ্যে ইতিহাসের গোচরে এসেছে। এই বিহারটি আবিষ্কৃত হয়েছে বর্তমান বাঙলাদেশের কুমিল্লা জেলায় লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ে বিস্তৃত প্রত্নোৎখননের ফলে। ভূমি নক্সায় সম-চতুষ্কোণ, কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির-সম্বলিত এই বিহারটি স্থাপত্যের দিক থেকে পাহাড়পুর মহাবিহারেরই অনুরূপ। বিহারটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেববংশীয় রাজা আনন্দদেবের পুত্র, পত্তিকের (পট্টিকেরা) রাজ্যের অধিপতি পরমসৌগত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ভবদেব, এবং তাঁরই নামানুসারে বিহারটির নামকরণ করা হয়েছিল ভবদেব-মহাবিহার। এ-তথ্য দুটি জানা যাচ্ছে এই বিহারেরই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রাপ্ত যথাক্রমে একটি তাম্রলিপি ও রক্তাভ পাথরের একটি শীলমোহর থেকে।

এই বিহারের সন্নিকটেই আবিষ্কৃত হয়েছে ক্ষুদ্রতর আর একটি সমচতুষ্কোণ বৌদ্ধ মন্দির। এরই তিন মাইল উত্তরে, ময়নামতীরই কোটিলমুড়া পাহাড়ে পাওয়া গেছে তিনটি স্তূপের ভগ্নাবশেষ। কোটিলমুড়ার প্রায় দু-মাইল উত্তর-পশ্চিমে চারপত্রমুড়ায় (এখানে চারটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে বলে এই ধরনের নাম) পাওয়া গেছে আরও একটি বৌদ্ধমন্দির এবং ব্রোঞ্জধাতুনির্মিত একটি স্মৃতি-সম্পুট বা relic casket। বস্তুত লালমাই ময়নামতীর ভবদেব-মহাবিহার, কোটিলমুড়া ও চারপত্রমুড়ার ধ্বংসাবশেষ থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই সুবিস্তীর্ণ নাতি-উচ্চ পাহাড় অঞ্চল জুড়ে খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম-শতক থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত তদানীন্তন বৌদ্ধধর্ম ও সংঘকে আশ্রয় করে একটি বিরাট নাগর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, যার রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল পট্টিকের নগর। সে যাই হোক, এই ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রচুর লেখ যুক্ত, স্তূপ মুদ্রিত, ধর্মচক্রলাঞ্ছিত পোড়ামাটির শীলমোহর ; ছোট ছোট, ব্রোঞ্জ ধাতুনির্মিত বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব ও বৌদ্ধ দেবী প্রতিমা ; অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং লেখযুক্ত, পাথরের বৌদ্ধ প্রতিমাদি এবং প্রচুর মৃৎশিল্পের স্থাপত্যালংকরণ। এই সব শিল্পসাক্ষ্য ও তার

ঐতিহাসিক অর্থ ও ব্যঞ্জনা বাঙালীর ইতিহাসের আদিপর্বের একটি অর্থগর্ভ সংযোজন। সীমান্তের ওপারে, বর্মাদেশের আরাকানের সঙ্গে সমসাময়িক কালে, বোধ হয় তার বেশ কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই, কুমিল্লা-ত্রিপুরা অঞ্চলের মাধ্যমেই, পূর্ব-বাঙলার সঙ্গে আরাকানের ম্রাহাউঙ অঞ্চলের এবং কাছাড় অঞ্চলের মাধ্যমে মধ্য-বর্মার পগান অঞ্চলের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। একাদশ-দ্বাদশ শতকে তো সে সম্বন্ধ রাজকীয় বৈবাহিক সম্পর্কেই পরিণতি লাভ করেছিল। যাই হউক, তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকেই বঙ্গীয় শিল্পের সঙ্গে আরাকানী শিল্পের একটা আত্মীয়তা লক্ষ্য করা যায় এবং অষ্টম নবম দশকে এই আত্মীয়তা আরও দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ হয়। ময়নামতীর ও আরাকানী শিল্পের যে-সব নিদর্শনের ফটোচিত্র আমার অধিকারে আছে তা থেকে এ-তথ্য প্রমাণ করা খুব কঠিন নয়। এই দুই স্থানীয় শিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অতি প্রত্যক্ষ।

পাহাড়পুর বা ময়নামতীর সঙ্গে তুলনীয় কিছুতেই নয়, তবু বর্ধমান জেলায় পানাগড়ের কাছে ভরতপুর গ্রামে কিছুদিন আগে ইষ্টক নির্মিত যে-স্তূপটি আবিষ্কৃত হয়েছে তা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে, যেহেতু আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে এই স্তূপটিই বৌদ্ধ স্তূপ-স্থাপত্যের আদিতম ও একতম নিদর্শন। শিল্পকলা অধ্যায়ের সংযোজনে এর স্থাপত্যের কথা যথাস্থানে বলা হবে, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মকর্ম প্রসঙ্গে এখানেই বলা উচিত যে, স্তূপটির উঁচু ভিতের চারদিকে অনেকগুলি কুলুঙ্গি আছে এবং প্রত্যেক কুলুঙ্গিতেই বজ্রাসনোপবিষ্ট, ভূমিস্পর্শমুদ্রা-চিহ্নিত, বেলে পাথরে তৈরী এক একটি বুদ্ধপ্রতিমা। প্রতিমাগুলির এবং স্তূপটির শিল্পরূপসাক্ষ্য থেকে অনুমান হয়, স্তূপটি ও প্রতিমাগুলি অষ্টম-নবম শতকে নির্মিত হয়েছিল। স্তূপটির দক্ষিণে ও পশ্চিমে একটি ইঁটের তৈরী বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। বোধ হয়, এই বিহারটিও একই সময়ে নির্মিত হয়েছিল।

(৫) শৈবধর্ম ॥

দেবপালপুত্র প্রথম শূরপালের নবাবিষ্কৃত একটি তাম্রশাসনে শৈব ধর্মকর্ম প্রসঙ্গে নূতন একটু খবর পাওয়া যাচ্ছে। শূরপাল নিজে ছিলেন বৌদ্ধ, কিন্তু তাঁর মাতা মাহটা ভট্টারিকা শিবভক্ত ছিলেন বলে মনে হয়। মাতার নির্দেশে শূরপাল শ্রীনগরভুক্তিতে, অর্থাৎ পাটনা অঞ্চলে, চারটি গ্রাম দান করেন; চারটির ভেতর দুটি দান করা হয়েছিল বারাণসীতে রাজমাতা প্রতিষ্ঠিত, রাজমাতার নামাঙ্কিত মাহটেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের উদ্দেশে; আর দুটি গ্রাম দান করা হয়েছিল কয়েকজন শৈবাচার্যকে। এই শৈবাচার্য-গোষ্ঠী মাহটেশ্বর মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, এমন অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নয়।

পালবংশীয় রাজা নয়পালকে (আ· ১০২৭—১০৩২ খ্রীষ্টাব্দ) এ-যাবৎ বৌদ্ধ

বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে বীরভূম জেলার বোলপুর মহকুমার সিয়ান গ্রামে যে শিলালেখ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় তাঁর আরাধ্য দেবতা ছিলেন শিব, এবং তারপরেই আরাধ্যা জগন্মাতা, অর্থাৎ শক্তিরূপিনী দেবী। এই শিলালেখতে নয়পালের কীর্তিকলাপের যে বিবরণ পাওয়া যায় (এই কীর্তিকলাপ রাজবৃত্ত অধ্যায়ের পরিশিষ্টে তালিকাগত করা হয়েছে), তাতে এই তথ্য পরিষ্কার। তিনি যে-সব মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা বা সংস্কার করিয়েছিলেন তার মধ্যে শিবমূর্তি, শিবলিঙ্গ ও শিব-মন্দিরই সব চেয়ে বেশি; শৈব সাধুরাও তাঁর প্রসাদ লাভ করেছিলেন। একাদশ রুদ্রমূর্তির প্রতিষ্ঠাও তাঁর শৈবধর্মের প্রতি অনুরাগের প্রমাণ। শিবের পরই দেখা যাচ্ছে জগন্মাতা, চৌষট্টী মাতৃকা ও চণ্ডিকার স্থান। তবে, যে-কোনও স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মানুসারী লোকের মত তিনিও গণেশ বিষ্ণু, সূর্য, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবীকে এবং নবগ্রহকেও ভক্তি করতেন। এই শিলালেখতেই শিবের কয়েকটি রূপের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে: পুরারি শিব, হেতুকেশ শিব, ক্ষেমেশ্বর শিব, বরাক্ষেশ্বর শিব, ঘণ্টীশ শিব, বটেশ্বর শিব, মতঙ্গেশ্বর শিব ও সদাশিব। এর ভেতর হেতুকেশ, বরাক্ষেশ্বর, ক্ষেমেশ্বর, বটেশ্বর ও মতঙ্গেশ্বর ঠিক শিবের কোনও বিশেষ প্রতিমারূপ বলে মনে হয় না; স্থান নাম থেকেই এই বিশেষণগুলির উদ্ভব হয়ে থাকবে। জগন্মাতার একটি নাম বিশেষণ যে ছিল পিঙ্গলার্যা, তাও এই শিলালেখ থেকেই জানা যাচ্ছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভাষা-সাহিত্য ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান ঃ শিক্ষা-দীক্ষা

দশম শতকের একটি ধর্ম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ॥

এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুতে নূতন সংযোজনের প্রয়োজন আছে, এমন অর্থবহ তথ্যের আবিষ্কার ইতিমধ্যে তেমন কিছু হয়নি, একটি মূল্যবান তথ্য ছাড়া। সে-তথ্যটির উল্লেখ করছি একটু পরেই, এবং কিছুটা বিশদভাবেই। এখানে সেখানে দু-একটি নূতন লেখক বা পণ্ডিতের, নূতন দু-একটি গ্রন্থের সংবাদ যে পাওয়া যাচ্ছে না এমন নয়, তবে তার ইঙ্গিত এমন নয় যে নূতন সংযোজন প্রয়োজন হয়, যেহেতু তাতে তথ্যের পরিমাণবৃদ্ধি হয় মাত্র, নূতন অর্থ সংযোজিত হয় না। সুতরাং সে-জাতীয় তথ্য আমি আর উল্লেখ করছি না।

তবে, দশম শতাব্দীর প্রাচীন বাঙলার পূর্বতম একটি প্রান্তের এমন একটি তথ্য ইতিমধ্যে জানা গেছে যা বাঙালীর ইতিহাসের দিক থেকে আমি যথেষ্ট মূল্যবান বলে মনে করি। তথ্যটি জানা যাচ্ছে পুণ্ড্রবর্ধন-বঙ্গ-সমতটাধিপতি চন্দ্রবংশীয় পরমসৌগত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে পট্টীকৃত একটি ভূমিদান-পট্টোলী থেকে। পট্টোলীটি পাওয়া গেছে শ্রীহট্ট জেলার পশ্চিমভাগ গ্রাম থেকে, সেজন্য পট্টোলীটি পশ্চিমভাগ-পট্টোলী বলে খ্যাত হয়েছে।

এই পট্টোলীদ্বারা শ্রীচন্দ্র পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত শ্রীহট্টমণ্ডলে গরলা, পোগার এবং চন্দ্রপুর বিষয়ে দুই প্রস্থে দু'টি বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করেছিলেন, প্রথম প্রস্থে ১২০ পাটক, দ্বিতীয় প্রস্থে ২৮০ পাটক। এই বিস্তৃত দুই ভূমিখণ্ড দানের পরও আরও একটি বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করা হয়েছিল চতুশ্চরণ শাখ্যাধ্যায়ী (চারবেদের বিভিন্ন শাখার ছাত্র ও অধ্যাপক), বিভিন্ন গোত্র ও প্রবর পরিচয়ের ৬০০০ ব্রাহ্মণকে, প্রত্যেককে সম পরিমাণে। তৃতীয় প্রস্থের সমগ্র ভূমিখণ্ডটির পরিমাণ কত তা কোথাও বলা হয়নি। কিন্তু তা না হলেও, অনুমান করা যেতে পারে, সপরিবারে শুধু বসবাস করবার জন্য প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণ গৃহস্থের যে ন্যূনতম পরিমাণ ভূমির প্রয়োজনে হতে পারে তার ছ-হাজারগুণ ভূমিপরিমাণ স্বল্পায়তন কিছু নয়। তিনটি বিষয়-জোড়া তিনপ্রস্থ এই সুবিস্তৃত ভূমির উত্তরে ছিল কোসিয়ার নদী (=বর্তমান কুসিয়ারা), দক্ষিণে মণি নদী (=বর্তমান, মনু নদী), পূর্বে বৃহৎকোট্ট বাঁধ (কোন সীমা বুঝাচ্ছে, বলবার উপায় নেই), এবং পশ্চিমে জুজ্জু ও কাষ্ঠপর্ণী খাল (জুর্জ্জু=বর্তমান ঝর্ণা জুজ্জনৎছড়া; কাষ্ঠপর্ণী যে কোন্ খাল বা ছড়া, অর্থাৎ ঝর্ণা, বলবার উপায় নেই) ও বেত্রঘণ্টী নদী (=বর্তমান খুঙ্খী নদী)। এই সুনির্দিষ্ট চতুঃসীমা বেষ্টিত ভূমিতে রাজা শ্রীচন্দ্র শ্রীচন্দ্রপুর নামে একটি সুবৃহৎ "ব্রহ্মপুর", অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যাদর্শানুযায়ী একটি আদর্শ ঔপনিবেশিক

ধর্ম-সংস্থান সৃষ্টি করেছিলেন। তিন প্রস্থে সুবিস্তীর্ণ ভূমিদানের উদ্দেশ্যই ছিল এই ব্রহ্মপুরপ্রতিষ্ঠা। কি-ভাবে এই প্রতিষ্ঠা ক্রিয়া হয়েছিল তা এই ভূমিদানের বিবরণের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

আর্যীকরণ, তথা ব্রাহ্মণীকরণের ক্রিয়াকৌশল (method and technique) ভারতেতিহাসের বুদ্ধি ও চক্ষুষ্মাণ পণ্ডিত ও পাঠকমাত্রেরই সুপরিজ্ঞাত। সে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মনের পশ্চাতে রেখে পশ্চিমভাগ পট্টোলীর সমৃদ্ধ তথ্যাবলীর দিকে তাকালে বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, এ ধরনের ঘনসন্নিবদ্ধ সুবিস্তীর্ণ ব্রাহ্মণ বসতির প্রয়োজন হয়েছিল এই জন্যেই যে, এই অঞ্চলটিতে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রচলন তেমন ছিল না, অন্তত প্রভাব বিস্তার করবার মত যথেষ্ট ছিল না। এ অনুমান যে কল্পনা নয় তা এই তিন প্রস্থ ভূমির দান-বিবরণের মধ্যেই আছে। পূর্ব-ভারতের পূর্বতম একটি প্রান্তে দশম শতাব্দীতেও তদবধি অ-ব্রাহ্মণীকৃত এক বিস্তৃত অঞ্চলে ব্রাহ্মণীকরণের, অন্যার্থে সমসাময়িক ভারতীয় সংস্কৃতির সীমা-বিস্তারের চেষ্টা কি ভাবে অগ্রসর হচ্ছে, এই তাম্রপট্টোলীটি তার একটি অন্যতম প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য। একই শ্রীহট্ট অঞ্চলে (পঞ্চখণ্ডে) এবং রংপুর অঞ্চলে এর প্রথম প্রমাণ দেখা গিয়েছিল সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রশাসনে। এই লিপিতে দেখা যাচ্ছে চন্দ্রপুরী বিষয়ের ময়ূরশাল্মল অগ্রহারে ভাস্করবর্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূতিবর্মা (আ· ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদ) ভিন্ন ভিন্ন বেদের ৫৬টি বিভিন্ন গোত্রীয় অন্তত ২০৫ জন 'বৈদিক' বা সাম্প্রদায়িক' ব্রাহ্মণের বসতি করিয়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিমভাগ পট্টোলীতে দেখা যাচ্ছে, দু চারশ' নয়, ছ-হাজার ব্রাহ্মণ বসানো হচ্ছে এবং তা চার চারটি মঠকে কেন্দ্র করে, যে মঠ শুধু বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা-আরাধনার জন্য নয়, সেখানে নানা ব্রাহ্মণ্য বিদ্যা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার জন্যও।

প্রথম প্রস্থ ১২০ পাটক ভূমি দেওয়া হয়েছিল দেবতা ব্রহ্মা ও তাঁর পূজাগৃহ একটি মঠের উদ্দেশে। ব্রহ্মার মঠ ও তাঁর একক পূজার প্রচলন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে বড় একটা দেখা যায় না ; সুতরাং পূর্বভারতের পূর্বতম প্রান্তে দশম শতকে ব্রহ্মার একটি মঠ ইতিহাসের দিক থেকে কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই। এই মঠ প্রতিষ্ঠা, পোষণ ও পরিচালনার জন্য যে-পরিমাণ ভূমি প্রয়োজন তা বাদ দিয়ে ১২০ পাটকের বাকি ভূমি দান করা হয়েছিল নিম্নোক্ত ভাবে। প্রতি পাটকে দশদ্রোণ হিশেবে ১০ পাটক দেওয়া হয়েছিল জনৈক (ব্রাহ্মণ) অধ্যাপককে, চন্দ্রগোমিনের চান্দ্র ব্যাকরণ সম্বন্ধে অধ্যাপনা করবার জন্য ; ১০ পাটক ১০ জন বিদ্যার্থীর ভরণ-পোষণ ও লেখ-গুটিকার (খড়িমাটির পেন্সিল) ব্যয় নির্বাহের জন্য ; ৫ পাটক প্রতিদিন ৫ জন অতিথি-সেবার জন্য ; এক পাটক সেই ব্রাহ্মণের জন্য যিনি এই মঠ নির্মাণ করিয়েছিলেন ; এক পাটক মঠসংলগ্ন গণকের জন্য ; ২½ পাটক মঠের

কায়স্থ বা হিসাব-রক্ষকের জন্য ; ৪ জন ফুলওয়ালা বা ফুলমালী, ২ জন তৈলক, ২ জন কুম্ভকার, ৫ জন কাহ্‌লিক অর্থাৎ কহ্‌ল বা (ছোট) ঢাকবাদক, ২ জন শঙ্খ-বাদক, ২ জন বৃহৎ ঢক্কা বা ঢাকবাদক ; ৮ জন দ্রাগড়বাদক (দ্রাগড় এক ধরনের ঘনবাদ্য) ও ২২ জন কর্মকার (ভৃত্য) ও চর্মকার, এদের প্রত্যেককে ½ পাটক হিশেবে একুনে ২৩½ পাটক ; ১ পাটক মঠ-নটের জন্য ; ২ জন সূত্রধর, ২ জন স্থপতি, ২ জন কর্মকার, প্রত্যেককে ২ পাটক হিশেবে, মোট ১২ পাটক ; ৮ জন চেটিকা (ইহারা কি দেবদাসী, না দাসী বা সেবিকামাত্র ?), প্রত্যেককে ½ পাটক হিসেবে মোট ৬ পাটক ; এবং মঠের নবকর্ম বা নিয়মিত সংস্কারব্যয় নির্বাহের জন্য ৪৭ পাটক। অর্থাৎ মঠ এবং মঠাশ্রিত যাবতীয় কর্মনির্বাহের জন্য মোট ১২০ পাটক।

দ্বিতীয় প্রস্থ ২৮০ পাটক ভূমি দেওয়া হয়েছিল ৮টি পৃথক পৃথক মঠের জন্য : চারটি দেশান্তরীয় (অর্থাৎ অ-বঙ্গাল ব্রাহ্মণ, পূজক ও ভক্ত-দের জন্য, আর বাকি চারটি বঙ্গাল (ব্রাহ্মণ, পূজক ও ভক্ত)-দের জন্য ; প্রথম চারটির নাম দেশান্তরীয় (অর্থাৎ বিদেশীয়) মঠ ; শেষের চারটির, বঙ্গাল মঠ। দুই প্রস্থ মঠেই এক এক জন করে যে-চারজন দেবতা প্রতিষ্ঠিত তাঁরা হচ্ছেন বৈশ্বানর বা অগ্নি, যোগেশ্বর শিব, জৈমনি বা জৈমিনি এবং মহাকাল শিব। স্বাধীন ভাবে একক বৈশ্বানর বা অগ্নির পূজা ও তাঁর জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা একটু বিস্ময়কর, যেহেতু এই ধরনের অগ্নিপূজা ও অগ্নিমন্দির বড়ই বিরল, প্রায় নেই বললেই চলে। তার চেয়েও বিস্ময়কর পূর্ব-মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবক্তা জৈমিনির দেবত্বে উত্তরণ ; ভারতবর্ষে জৈমিনির মঠ বা মন্দির আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার, প্রত্যেকটি দেবতার দু'টি করে মঠ, একটি বিদেশীদের, একটি বঙ্গালদের। এই দুই দলের মধ্যে কি কলহ, বাদ-বিসম্বাদ, রেষারেষি কিছু ছিল ? ছিল বলেই তো মনে হয়, কিন্তু, কেন ছিল ? পূজার রীতিনিয়ম পদ্ধতির কি পার্থক্য ছিল ? যে দেশান্তরীয়দের কথা ইঙ্গিত করা হ'চ্ছে তাঁরা কারা, কোথা থেকে এলেন, কি করে এবং কেন এলেন শ্রীহট্ট অঞ্চলে ? শ্রীচন্দ্রই কি এঁদের নিয়ে এসে বসবাস করিয়েছিলেন ? শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্র বঙ্গালদেশের অধিপতি ছিলেন, চন্দ্রদ্বীপে ছিল তাঁর রাজধানী। শ্রীচন্দ্র যদিও তাঁর পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের আগেই কোনও সময় চন্দ্রদ্বীপ থেকে রাজধানী তুলে নিয়ে এসেছিলেন বঙ্গে, বিক্রমপুরে, তা হলেও তিনি নিজে যথার্থত বঙ্গাল। সেই বঙ্গালদের সঙ্গে দেশান্তরীয়দের এমন কি বিরোধ ছিল যার ফলে তাঁরই দত্ত ভূমিতে, ব্রহ্মপুর-শ্রীচন্দ্রপুরে, একই দেবতা-চতুষ্টয়ের স্থান করতে হলো দুই প্রস্থ মন্দির-চতুষ্টয়ে, দুই ভিন্ন নামে চিহ্নিত করে ? ব্যাপারটা শুধু কৌতূহলোদ্দীপক নয়, ইতিহাসের দিক থেকে একটি প্রশ্নচিহ্নও বটে।

যাই হোক, ২৮০ পাটক ভূমি সম পরিমাণে, অর্থাৎ ১৪০ পাটক করে, ভাগ করে

দেওয়া হয়েছিল দুই প্রস্থ মন্দির-চতুষ্টয়ের মধ্যে, অন্যার্থে প্রত্যেকটি মন্দিরের ভাগে পড়েছিল ৩৫ পাটক করে। বিস্তৃত ভূখিখণ্ডদানের তালিকা এইভাবে দেওয়া হয়েছে ঃ চতুর্বেদ অধ্যাপনার জন্য ৮ জন অধ্যাপকের প্রত্যেককে ১০ পাটক করে, মোট ৮০ পাটক ; প্রত্যেকটি মঠে ৫ জন করে, অর্থাৎ ৮টি মঠে ৪০ জন ছাত্রের ভরণপোষণ ও শিক্ষার জন্য প্রতি ছাত্র পিছু ১ পাটক হিশেবে মোট ৪০ পাটক ; প্রত্যেকটি মঠের একজন ফুলমালী, একজন ক্ষৌরকার, একজন তৈলক ও একজন রজক, এবং ৮ জন ভৃত্য বা সেবক ও চর্মকার, প্রত্যেককে ½ পাটক হিশেবে, অর্থাৎ মোট ১৬+৩২=৪৮ পাটক, প্রত্যেকটি মঠের দুজন সেবিকা, প্রত্যেককে ¾ পাটক হিশেবে, মোট ১২ পাটক ; প্রত্যেক মন্দির-চতুষ্টয়ের দুজন মহত্তর-ব্রাহ্মণ, প্রত্যেককে ১ পাটক হিশেবে, মোট ৪ পাটক ; প্রত্যেক মন্দির-চতুষ্টয়ের একজন আবেক্ষক (superintendent), প্রত্যেককে ১ ½ পাটক হিশেবে, মোট ৩ পাটক ; প্রত্যেক মন্দির চতুষ্টয়েরে একজন কায়স্থ বা লেখক, প্রত্যেককে ২ ½ পাটক হিশেবে, মোট ৫ পাটক ; প্রত্যেক মন্দির-চতুষ্টয়র একজন গণক, প্রত্যেককে ১ পাটক হিশেবে, মোট ২ পাটক ; এবং প্রত্যেক মন্দির-চতুষ্টয়ের একজন চিকিৎসক, প্রত্যেককে ৩ পাটক হিশেবে, মোট ৬ পাটক ; সর্বশুদ্ধ ২৮০ পাটক।

আগেই বলা হয়েছে, তৃতীয় প্রস্থ ভূমি দান করা হয়েছিল ছয়হাজার ব্রাহ্মণকে, প্রত্যেককে সম পরিমাণে। এই ছ-হাজারের ভেতর ৩৫ জন ব্রাহ্মণ প্রমুখের নাম দেওয়া আছে ; এ'দের মধ্যে কয়েকজনের নামের শেষাংশ বা অন্ত্যনাম (পদবী নয়) নাগ, দত্ত, নন্দী, পাল, ধর, ঘোষ, দাস, সোম, গুপ্ত, কর ইত্যাদি দেখে মনে হয়, এই ধরনের শেষাংশ থেকেই বোধ হয় পরবর্তী কালের অব্রাহ্মণ বাঙালীদের, বিশেষ করে কায়স্থ ও বৈদ্যদের, পদবীগুলোর সূচনা হয়ে থাকবে।

কিন্তু সে যাই হোক, এই পট্টোলী থেকে এমন সব তথ্য পাওয়া গেল যা প্রাচীন বাঙলার ধর্ম ও সমাজ এবং শিক্ষা-দীক্ষার উপর নূতন আলোকপাত করেছে। ব্রহ্মা ও অগ্নির স্বাধীন স্বতন্ত্র পূজা ও মঠ, জৈমনি বা জৈমিনির দেবত্ব, পূজা ও মঠ ধর্মের দিক থেকে নূতন সংবাদ। শ্রীহট্ট অঞ্চলে দশম শতকে ব্রাহ্মণদের সুবৃহৎ উপনিবেশ স্থাপন সমাজেতিহাসের দিক থেকে গভীর অর্থবহ। দেশান্তরীয় ও বঙ্গালদের জন্য পৃথক পৃথক মঠ প্রতিষ্ঠাও কম অর্থবহ নয়। শিক্ষার দিক থেকে দেখতে পাচ্ছি, দশম শতাব্দীতে শ্রীহট্টে চন্দ্রগোমিনের চান্দ্র-ব্যাকরণের প্রচলন ও চতুর্বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। কিন্তু সবচেয়ে যা অর্থবহ তা হ'চ্ছে ব্রহ্মপুর শ্রীচন্দ্রপুরের মতন একটি সুবৃহৎ ধর্ম ও শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা।

পশ্চিমভাগ পট্টোলীটির পূর্ণমূল্যে পাঠোদ্ধার ও যথার্থ ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার। দীনেশচন্দ্র বলেছেন, এ-ধরনের সুবিস্তীর্ণ, সুবৃহৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ লিপিমালায় আর পাওয়া যায় না; উত্তর-ভারতে আর কোথাও এ-ধরণের প্রতিষ্ঠান ছিল বলে আজও জানা যায়নি। আছে শুধু দক্ষিণ-ভারতে, যেমন, অন্ধ্রপ্রদেশে তিরুমলয়-তিরুপতির শ্রীবেংকটেশ্বর দেবস্থানে। দক্ষিণ-ভারতের একাধিক লিপিতেও যে এই ধরনের ধর্ম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আছে, দীনেশচন্দ্রই তা দেখিয়েছেন। তাঁর পাঠোদ্ধার, বর্ণনা ও ব্যাখ্যার উপরই আমার উপরোক্ত বিশ্লেষণের নির্ভর। আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত, এবং তাঁর প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞ।

চতুর্দশ অধ্যায়

শিল্পকলা

গত পঁচিশ ত্রিশ বছরের ভিতর প্রাচীন বাঙলার নানা জায়গা থেকে পোড়ামাটির প্রচুর ফলক, পাথর ও মিশ্র ধাতুর তৈরী প্রচুর মূর্তি ও প্রতিমা এবং সংখ্যায় বেশ কিছু নূতন সচিত্র পাণ্ডুলিপি আমাদের গোচরে এসেছে। এ-সব নূতন আবিষ্কার তথ্যের দিক থেকে নিশ্চয়ই মূল্যবান, এবং সেই হেতু আমাদের জ্ঞাতব্য। এই কারণেই গ্রন্থ-শেষের চিত্র-সংগ্রহে দেখা যাবে, মাত্র কয়েকটি পুরাতন নিদর্শন ছাড়া আর যত শিল্প নিদর্শন ছাপা হয়েছে তা সবই প্রায় নূতন আবিষ্কার ; শুধু তাই নয়, এ-সব নিদর্শনের অধিকাংশ এখনও সর্বজনের গোচরে আসেনি। কিন্তু কোনো আবিষ্কার, কোনো তথ্যই এমন নয় যে, গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত History of Bengal, vol. I-র প্রথম সংস্করণে শিল্পবিবর্তনের ইতিহাসের যে-ধারার কথা বলেছিলাম, যে-রেখাঙ্কন করেছিলাম, রূপ (form) ও প্রসঙ্গের (content-র) যে-বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম তাতে কিছু সংশোধন বা পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে। যা কিছু নূতন তথ্য জানা গেছে তা শুধু আগেকার বক্তব্যের পরিপূরক মাত্র। তবে, তথ্যমাত্র হলেও মৃৎশিল্পে, ধাতব প্রতিমাশিল্পে এবং চিত্রশিল্পে গত পঁচিশ-ত্রিশ বছরে গুণে ও পরিমাণে অর্থবহ এমন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যে, অন্তত এ-তিনটি বিষয়ে কিছু কিছু সংযোজন প্রয়োজন মনে করছি। স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধেও হয়ত দু-চার কথা বলা প্রয়োজন হতে পারে।

মৃৎশিল্প ॥

চন্দ্রকেতুগড়ে ও ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ে প্রত্নখননের ফলে এবং তাম্রলিপ্তের সুবিস্তীর্ণ সমতলে প্রত্নানুসন্ধানের ফলে অগণিত পোড়ামাটির ছাঁচে ঢালা ফলক ও হাতে গড়া নানা শিল্পনিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তবে হাতে-গড়া নিদর্শন সংখ্যায় বেশি নয়। তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতুগড়ে যা পাওয়া গেছে, শিল্প-শৈলীর উপর নির্ভর করে সাধারণ ভাবে বলা যায়, তা সবই নির্মিত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে শুরু করে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের ভেতর, তবে অধিকাংশই, দশভাগের আট ভাগ, কি তারও বেশি), খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর ভেতর, অর্থাৎ তথাকথিত শুঙ্গ-শক-কুষাণ আমলে, বিশেষ ভাবে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ শতকে, যখন এই দুই সামুদ্রিক বন্দরে ভারত-রোম বাণিজ্যের সমৃদ্ধ বিস্তার ও তার আনুষঙ্গিক নাগরিকতার গভীর প্রভাব। ফর্ম বা রূপে হয়ত তেমন নয়, কিন্তু কন্‌টেন্ট বা বিষয়বস্তুতে এ-দুয়েরই প্রভাব কিছুতেই দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়, না চন্দ্রকেতুগড়ে, না তাম্রলিপ্তে। গ্রন্থের

শেষে মৃৎশিল্পের যে-সব প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে তার ভেতরও অনেক নিদর্শন আছে যাতে এ-প্রভাব সুস্পষ্ট। চিত্র-পরিচিতিতে তার ইঙ্গিত রাখতে চেষ্টা করবো। বেশ কিছু ফলকের শীর্ষদেশে বা পেছনে উপরের দিকে এক বা একাধিক ছিদ্র থেকে অনুমান হয়, ফলকগুলির ব্যবহার হতো ঘরের দেয়াল বা কুলুঙ্গী সাজাবার জন্য, এবং সে সব ঘর তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতুগড়ের (Gange বন্দরের ?) নাগরিকদের। এ-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণেই বলেছিলাম, নূতন আবিষ্কারগুলো দেখে আবার বলছি, এ-যুগের, অর্থাৎ শুঙ্গান্ত শক-কুষাণ আমলের (প্রথম থেকে প্রায় চতুর্থ খ্রীষ্টীয় শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত) মৃৎফলক-গুলির বিষয়বস্তুতে, অলংকরণে, কেশবিন্যাসে, পরিধেয়-বিন্যাসে এবং সাধারণ ভাবে ও রূপে যে রুচির পরিচয় স্বপ্রকাশ তা স্পষ্টতই নাগর রুচি, কৃষিজীবী বা ছোট কারুজীবী গ্রামবাসীর গ্রামীণ রুচি নয়। এই নাগর রুচিই গুপ্ত আমলের মৃৎশিল্প পর্যন্ত বিস্তৃত।

তবে, সপ্তম-অষ্টম শতকের পাহাড়পুরের এবং অষ্টম-নবম দশম শতকের ময়নামতীর মৃৎশিল্প নিদর্শনগুলি সদ্যোক্ত মৃৎশিল্পের সমগোত্রীয় নয় ; ভাবে, রূপে ও রীতিতে পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৃৎশিল্পের চরিত্র ভিন্নতর। কি শিল্পরূপে কি বিষয়বস্তুতে এদের উপর লোকায়ত জীবনের প্রতিফলন সুস্পষ্ট, তা পাহাড়পুরের বর্ণনাত্মক শিল্পেই হোক বা ময়নামতীর স্থাপত্যালংকরণে পশুপক্ষীর বিচিত্র কল্পিত শিল্পরূপেই হোক। স্মরণ রাখা ভালো যে, এই শিল্পদ্রব্যগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল বাণিজ্য-নগরে গৃহের শোভাবর্ধনের জন্য নয়, দু-টি বৌদ্ধ ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মন্দির-বিহারের প্রাচীর সজ্জার জন্য।

মৌর্য-পর্বের মৃৎশিল্প নিদর্শন স্বল্প হলেও কিছু কিছু পাওয়া গেছে তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতুগড় উভয় জায়গা থেকেই। আবক্ষ যক্ষিণী মূর্তির মুখাবয়ব ও তার গড়ন, তার মোটা ও ভারী কানের গয়না এবং তার পর্যাপ্ত কেশদামের বিন্যাস অনিবার্য ভাবে প্রাচীন পাটলীপুত্রের ধ্বংসাবশেষ থেকে আহৃত যক্ষিণী মূর্তিগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঠিক শুঙ্গ আমলের নয় কিন্তু কেশবিন্যাসে, শিরোভূষণে, অলংকরণে শুঙ্গ লক্ষণযুক্ত প্রচুর যক্ষিণীমূর্তি আহৃত ও আবিষ্কৃত হয়েছে এ দু-জায়গা থেকেই। ভূষণালং-কারের প্রাচুর্য, যৌনপ্রতীকের প্রাধান্য ও কোনো কোনো ফলকে শস্য বা মাছের প্রতীকের ব্যবহার থেকে স্বভাবতই মনে হয়, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের এই ফলকগুলি প্রায়শ প্রজনন-শক্তির, প্রাচুর্যের, শ্রী বা লক্ষ্মীর প্রতীক বলেই গণ্য করা হতো। কোনো কোনো ফলকে পুরুষ ও নারীর পরিধেয় বিন্যাসের রীতি গন্ধার-শিল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আবার কোনো কোনো ফলকের পুরুষের দেহের গড়ন ও দেহভঙ্গি স্মরণ করিয়ে দেয় কুষাণ-শিল্পের কথা বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গ্রেকো-রোম্যান শিল্পের কথা। তাম্রলিপ্তের অনেক ফলকে গ্রেকো-রোম্যান শিল্পের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট, আর চন্দ্রকেতুগড়ে পদযুগল-সহ যে-পাদুকা জোড়ার মৃৎপ্রতিলিপিটি পাওয়া গেছে তা যে গ্রেকো-রোম্যান তাতে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই।

পদযুগলটি যারই হোক। বস্তুত, এ-দুই বন্দরের ধ্বংসাবশেষের ভেতর কুষাণ-আমলের, অর্থাৎ দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের অসংখ্য মৃৎফলকে মথুরা অঞ্চলের শিল্পরূপের প্রভাবের চেয়েও গন্ধার অঞ্চলের শিল্পের প্রভাব যেন বেশি সক্রিয় বলে মনে হয়। তাম্রলিপ্তে কয়েকটি ফলক পাওয়া গেছে যার বিষয়বস্তু বৌদ্ধ জাতকের গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে, এবং একটি মৃৎভাণ্ড পাওয়া গেছে যার স্কন্ধগাত্র ঘিরে ধারাবাহিকতায় রামায়ণের একটি কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। জাতক-ফলকগুলি নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের, কিন্তু মৃৎভাণ্ডের নীচু রিলিফটির শিল্পরীতি দেখে মনে হয়, ভাণ্ডটি একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে তৈরী হয়নি', যখন বন্দর হিশেবে তাম্রলিপ্তের অস্তিত্ব আর ছিল না। অষ্টম-নবম দশম শতকীয় ময়নামতীর মৃৎশিল্প সম্বন্ধে নূতন করে বলবার কিছু নেই; এ-শিল্প মোটামুটি ভাবে পাহাড়পুরের সমসাময়িক মৃৎশিল্পেরই অনুরূপ। তবে, একটি নিদর্শনের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে; এই ফলকটি পাওয়া গেছে ময়নামতীর শালবন-বিহারের ধ্বংসাবশেষের ভেতর থেকে, এবং এতে রূপায়িত হয়েছেন হয় কোনো বোধিসত্ত্ব অথবা কোনো রাজকুমার। প্রচুর অলঙ্কারশোভিত, কুঞ্চিত ও দুল্যমান কেশদামযুক্ত, মুকুটপরিহিত, সুঠাম ও সুমণ্ডিতদেহ এই নরমূর্তিটি নবম শতকীয় প্রস্তর-ভাস্কর্যেরই মৃৎশিল্পানুবাদ বা প্রতিরূপ মাত্র।

[পাঠপঞ্জী ।। তাম্রলিপ্তে মৃৎশিল্প-নিদর্শন পাওয়া গেছে প্রচুর। এই নিদর্শনগুলি প্রধানত আশুতোষ ম্যুজিয়ম, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের সংগ্রহশালা এবং তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। তাম্রলিপ্তের মৃৎশিল্প নিয়ে ছোট ছোট ইংরেজি ও বাঙলা নিবন্ধ এদিক সেদিক কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে, তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা থেকে একটি প্রচার-পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু এই অতি মূল্যবান আবিষ্কার নিয়ে বিশদ আলোচনা আজও কিছু হয়নি, প্রামাণিক গ্রন্থও লেখা হয়নি। চন্দ্রকেতু-গড়ের নিদর্শনও কিছু কম সুপ্রচুর নয়; সেগুলি রক্ষিত আছে প্রধানত আশুতোষ ম্যুজিয়মে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-দপ্তরের সংগ্রহশালায়। এগুলো নিয়ে কিছু কিছু ইংরেজি বাংলা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে;

ধাতব প্রতিমা-শিল্প ॥

প্রস্তর-ভাস্কর্যের প্রচুর নিদর্শন ইতিমধ্যে প্রাচীন বাঙলার নানা স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে, এখনও হ'চ্ছে। কিন্তু আগেই বলেছি, এ-সম্বন্ধে শিল্পরূপ ও রীতির দিক থেকে নূতন কিছু বলবার নেই। গ্রন্থশেষের চিত্র-সংগ্রহে এই সব নূতন আবিষ্কারের অনেকগুলি নিদর্শনের ফটো-প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে এবং চিত্র-পরিচিতিতে সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে। ধাতব মূর্তিশিল্প সম্বন্ধেও প্রায় একই উক্তি করা যেতে পারে।

তবে, ইতিমধ্যে ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ থেকে, চট্টগ্রাম জেলার ঝেওয়ারী গ্রাম থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গের দু-একটি জায়গা থেকে বেশ কিছু ধাতব প্রতিমা-শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নিদর্শনগুলির কথা কিছু বলতেই হয়।

ঝেওয়ারীর আবিষ্কার এ-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের অনেক আগেই হয়েছিল; সে-সংস্করণের একাধিক জায়গায় তার উল্লেখও ছিল, কিন্তু ধাতব প্রতিমাগুলি সম্বন্ধে শিল্প-কলা অধ্যায়ে বিশেষভাবে কিছু বলিনি। এখন দু-চার কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি এবং সে-উদ্দেশে বর্তমান সংস্করণের চিত্র-সংগ্রহে তিনটি নিদর্শনের প্রতিলিপি মুদ্রিত হচ্ছে। এই নিদর্শন তিনটিকে ঝেওয়ারীর শ্রেষ্ঠ তিনটি প্রতিনিধি বলে মনে করা যেতে পারে। এদের একটি সমপদস্থানে দণ্ডায়মান, অভয়মুদ্রালাঞ্ছিত বুদ্ধমূর্তি; দ্বিতীয়টি, লীলাসনোপবিষ্টা, মুকুট ও বিচিত্রালংকারশোভিতা, প্রসারিত দক্ষিণকরকমলে ধনভাণ্ড ও বামহস্তে শস্যশীর্ষধৃতা মহাযান বৌদ্ধ দেবী বসুধারা; এবং তৃতীয়টি ধ্যানাসনোপবিষ্ট, ভূমিস্পর্শমুদ্রালাঞ্ছিত বুদ্ধ। প্রথম ও দ্বিতীয়টি স্পষ্টতই দশম শতকীয় পূর্ব-ভারতীয় প্রস্তর-ভাস্কর্য শিল্পরূপের ধাতব অনুবাদ। তৃতীয়টি একাদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল বলে আমার অনুমান, কিন্তু সমকালীন পূর্বভারতীয় প্রস্তর বা ধাতব শিল্পের রূপের সঙ্গে এই মূক, আড়ষ্ট বুদ্ধ প্রতিমাটির সমগোত্রীয়তা ততটা আছে বলে যেন আমার মনে হয় না যতটা আছে সমসাময়িক আরাকানী বৌদ্ধ প্রতিমাশিল্পের সঙ্গে। ঝেওয়ারীর প্রায় সব নিদর্শনই বৌদ্ধধর্মীয়, এবং অধিকাংশই একাদশ-দ্বাদশ শতকীয়; সন্দেহ নেই, সবই ছিল স্থানীয় কোনো বৌদ্ধ মন্দির-বিহারের সম্পত্তি। অনুমান হয়, এই মন্দির-বিহারের সঙ্গে সমসাময়িক আরাকানের বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির একটা যোগাযোগ ছিল, এবং সেই যোগাযোগের ফলেই একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় ঝেওয়ারীর ধাতব শিল্পের সঙ্গে আরাকানী প্রতিমা শিল্পের কিছুটা আত্মীয়তা ঘটে থাকবে।

ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ থেকে বেশ কিছু ধাতব প্রতিমাশিল্প নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে; তার ভেতর থেকে যে কয়েকটি নিদর্শনের প্রতিলিপি বর্তমান সংস্করণে ছাপা হচ্ছে সেগুলিকে ময়নামতীর ধাতব প্রতিমা শিল্পের প্রতিনিধি বলে মনে করা যেতে পারে। চিত্র-পরিচিতিতে নিদর্শনগুলির প্রতিমা-পরিচয় পাওয়া যাবে; এখানে সংক্ষেপে

শিল্পরূপের কথা বলাই প্রাসঙ্গিক হবে। নিদর্শন ক'টি সবই নবম-দশকীয় পূর্বভারতীয় প্রস্তরশিল্পের প্রায় ধাতব অনুবাদ। শুধু তা-ই নয়, এ-গুলির সঙ্গে সমসাময়িক বিহারের, অর্থাৎ কুর্কিহার ও নালন্দার, বিশেষ ভাবে নালন্দার, ধাতব প্রতিমা-শিল্পের সাদৃশ্য এত গভীর ও সর্বতোভদ্র যে, কেউ যদি বলে এ-গুলি রচিত ও নির্মিত হয়েছিল নালন্দারই কর্মশালায় তা হলে তাকে খুব ভ্রান্ত বলা হয়ত যায় না। প্রমাণ কিছু দেওয়া কঠিন, প্রায় অসম্ভব বললেই চলে, তবু, আমার অনুমান, এই ছোট ছোট নিদর্শনগুলি নালন্দার কর্মশালায়ই নির্মিত হয়েছিল এবং সেখান থেকে ভক্ত বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীরা এগুলি বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন ভবদেব-মহাবিহারের মন্দিরে নিবেদন করবার জন্য।

ধর্মকর্ম-অধ্যায়ের সংযোজনে বলেছি, নবম-দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকে উত্তর বর্ধমান, বীরভূম, বিশেষ ভাবে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অঞ্চলে জৈনধর্মের বেশ প্রসারলাভ ঘটেছিল। গত পঁচিশ-ত্রিশ বছরের ভেতর এ-ব্যাপারে প্রচুর প্রত্ন-প্রমাণ পাওয়া গেছে; তার ভেতর মন্দির ও প্রতিমা-প্রমাণও আছে, এমন কি ধাতব প্রতিমারও। তেমন একটি সুন্দর ধাতব প্রতিমাশিল্প-নিদর্শন বর্তমান সংস্করণের চিত্র-সংগ্রহে প্রকাশিত হচ্ছে। কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান, পাদপীঠে ঋষভলাঞ্ছিত, নগ্ন, জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের এই প্রতিমাটি স্পষ্টতই নবম শতকীয় পূর্ব-ভারতীয় প্রতিমাশিল্পের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

পূর্ব ভারতীয় ধাতব শিল্পের ইতিহাস, রূপ, রীতি ও আঙ্গিক সম্বন্ধে কালানুক্রমিক, ধারাবাহিক বিশ্লেষণ ও আলোচনা পাওয়া যাবে বর্তমান গ্রন্থকারের প্রকাশোন্মুখ সুবৃহৎ একটি গ্রন্থে (Eastern Indian Bronzes, Lalit Kala Akademi, New Delhi)।

চিত্রশিল্প ॥

এ-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের শিল্পকলা-অধ্যায় যখন লিখেছিলাম তখন মাত্র ২১টি চিত্রিত পাণ্ডুলিপি আমার জানা ছিল, এবং তার উপর নির্ভর করেই চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য তা বলেছিলাম। সে-বক্তব্যে নূতন কিছু সংযোজনের প্রয়োজন আমি বোধ করছিনে, অর্থাৎ শিল্পরূপ ও রীতি সম্বন্ধে নূতন কথা বলবার মত অর্থগর্ভ নূতন আবিষ্কার ইতিমধ্যে বিশেষ কিছু হয়নি। তবে, কিছুদিন আগে অধ্যাপক শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী প্রাচীন বাঙলার চিত্রকলা সম্বন্ধে একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছেন ("পালযুগের চিত্রকলা," আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৮৭৮, ১৮৮ পৃ, ৪৫ রঙীন ও ১০ সাদাকালো চিত্র)। এ-গ্রন্থে গ্রন্থকার এই শিল্পের ইতিহাসের সুশৃঙ্খল একটি ধারাবাহিক বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, কালক্রম অনুসরণ করে; শিল্পরীতি ও প্রতিমালক্ষণও আলোচনা করেছেন, কিন্তু সবচেয়ে যা মূল্যবান তা

হচ্ছে, প্রচুর নূতন তথ্যের সংবাদ তিনি বহন করে এনেছেন, এবং তার ভেতর অনেক তথ্য তাঁর নিজেরই আবিষ্কার। যাঁরা এ-বিষয়ে বিশেষভাবে উৎসাহী তাঁরা তো গ্রন্থখানা পড়বেনই, কিন্তু সাধারণ ইতিহাস-পাঠকেরও গ্রন্থোক্ত নূতন তথ্যগুলো জানা উচিত।

গ্রন্থকার সর্বশুদ্ধ অন্যূন ৬০ খানা চিত্রিত পুঁথির সংবাদ দিচ্ছেন এবং বলছেন, "এ ছাড়াও আছে কিছু সংখ্যক তারিখ-বিহীন চিত্র-সংযুক্ত নেপালী পুঁথি।" যাই হোক, সদ্যোক্ত এই ৬০ খানা চিত্রিত পুঁথিকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন ; ভাগ তিনটি এই :

(১) তারিখ-সহ চিত্র-সংযুক্ত পূর্ব-ভারতীয় পুঁথি (২৮)। তালিকা-শেষে প্রত্যেকটি পুঁথির তারিখ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

(২) তারিখ-বিহীন চিত্র-সংযুক্ত পূর্ব-ভারতীয় পুঁথি (১৪)।

(৩) তারিখ-সহ চিত্র-সংযুক্ত নেপালী পুঁথি (১৮)। এ-পুঁথিগুলি লিখিত ও চিত্রিত হয়েছিল নেপালে, কিন্তু সমসাময়িক নেপালে যে পুঁথিচিত্রশৈলী প্রচলিত ছিল তা স্পষ্টতই পূর্ব-ভারতীয়, এবং সেই হেতু বর্তমান প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। এ-ক্ষেত্রেও তালিকা শেষে তারিখ সম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ আলোচনা আছে।

চিত্রাঙ্কনের রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে আলোচনা করেছেন এবং সে-প্রসঙ্গে যে-সব নিদর্শন উদ্ধার করেছেন তা পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ। তা'তেও কিছু নূতন তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

স্থাপত্যশিল্প ॥

ধর্মকর্ম অধ্যায়ের সংযোজনে বর্ধমান জেলায় পানাগড়ের কাছে ভরতপুর গ্রামে যে বৌদ্ধ স্তূপটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার কথা ইতিপূর্বেই বলেছি। এ-যাবৎ আমরা যতদূর জানি, এই স্তূপটিই প্রাচীন বাঙলার আদিতম স্তূপ। স্তূপটির পাটাতনটিই শুধু অবশিষ্ট আছে, উপরিভাগের আর যা কিছু সবই মাটির ধূলায় মিশে গেছে। সুতরাং কি ছিল অণ্ডের, হর্মিকের ও ছত্রাবলীর আকৃতি-প্রকৃতি কিছুই আজ আর বলবার উপায় নেই। গোলাকৃতি পাটাতনটি দাঁড়িয়ে আছে একটি সমচতুষ্কোণ ভিতের উপর ; ভিতটির প্রত্যেকটি দিকে পাঁচটি করে রথ বা projection, অর্থাৎ এটি একটি পঞ্চরথস্তূপ যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে ওড়িশার রত্নগিরির ধ্বংসাবশেষের ভেতর। ভিত ও পাটাতন তৈরী হয়েছিল ইটের উপর ইট সাজিয়ে, গেঁথে গেঁথে ; বোধ হয় সমস্ত স্তূপটিই ছিল ইটের তৈরী। পাটাতন-কুলুঙ্গির প্রস্তর বুদ্ধ-প্রতিমাগুলির শিল্পশৈলী ও স্তূপটির গঠনরীতি ও রূপ দেখে মনে হয়, স্তূপটি নির্মিত হয়েছিল নবম শতকের কোনো সময়ে। (**Excavations at Bharatpur, by S N. Samanta, in Burdwan University Souvenir, 1980**)।

ইতিমধ্যে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় যে বেশ কয়েকটি রেখবর্গীয় দেবায়তনের খবর জানা গেছে, তার কথা ইতিপূর্বেই বলেছি। অধিকাংশ মন্দির ইটের তৈরী, কিন্তু দু'একটি পাথরের মন্দিরও আছে। এ-গুলি সম্বন্ধে স্থাপত্যশিল্পের দিক থেকে নূতন কিছু বলবার নেই ; সবই রেখবর্গীয় মন্দির-শিল্পের স্থানীয় ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। তবু, এ-সমস্তই তথ্য হিসেবে জ্ঞাতব্য। এমন কয়েকটি মন্দিরের প্রতিলিপি চিত্র সংগ্রহে মুদ্রিত হ'লো। মন্দিরগুলি সবই দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় বলে অনুমান হয়।

এ-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয় তখন সুবিস্তৃত তেলকুপীগ্রামের অবস্থিতি ছিল বিহারান্তর্গত মানভূম জেলার রঘুনাথপুর থানার অধীনে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনাথপুর থানা তেলকুপীসহ চলে এলো পশ্চিমবঙ্গে, পুরুলিয়া জেলায়। পাল-সম্রাট রামপাল (আ, ১০৬৯-১১২২) যখন কৈবর্তরাজ ভীমের হাত থেকে বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার করেন তখন তাঁর অনেক সামন্ত-মহাসামন্ত তাঁকে সাহায্য করেছিলেন ; এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন তৈলকম্পীর রুদ্রশিখর। বর্তমান তেলকুপী প্রাচীন তৈলকম্পীর রূপান্তর এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই ; তেলকুপী-পাঞ্চেট (পঞ্চকোট) অঞ্চল এখনও শিখরভূম, অর্থাৎ শিখর রাজবংশের অঞ্চল বলেই পরিচিত। দশম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এই শিখরভূমের রাজধানী তেলকুপী স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য পঞ্চদেবতা পূজার এবং আঞ্চলিক ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের, বিশেষভাবে স্থাপত্য শিল্পের একটি জনপ্রিয় প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। এ-গ্রন্থ যখন রচিত হচ্ছিল, তখন আমি সে-সব প্রত্নসাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আজ এ-গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণ যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখন সে-সব প্রত্নসাক্ষ্যের কিছুই আর লোকচক্ষুর গোচরে নেই। প্রায় ২৭/২৬টি মন্দির তাদের ধ্বংসাবশেষের বিভিন্ন অবস্থায় তখনও ইতস্তত দাঁড়িয়েছিল, প্রাচীন ঐশ্বর্য ও গৌরবের মূক সাক্ষী হিশেবে। আজ পাঞ্চেট বা পঞ্চকোটে দামোদর নদের যে বিরাট বাঁধ তৈরী হয়েছে তার ফলে সমস্তই ডুবে গিয়েছে দামোদরের গভীর জলের নীচে। একটি মন্দিরের চূড়াও আজ আর দেখা যায় না ; কিছু যে এখানে কখনও ছিল এমনও মনে হয় না। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান বিভাগ যখন জানলেন, তেলকুপীর সলিল-সমাধি রচিত হ'চ্ছে তখন আর এই বিপুল প্রত্নসাক্ষ্যকে রক্ষা করবার কোনো উপায়ই অবশিষ্ট ছিল না।

আর একবার প্রমাণিত হ'লো যে, বর্তমান জীবিত মানুষের দাবি-দাওয়া অতীত ও মৃত মানুষের প্রত্নসাক্ষ্যের দাবি-দাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান। এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই ; ভাব-বিলাসেরও কোনো স্থান এ-ক্ষেত্রে নেই।

যাই হোক, আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, যার উপর ভার পড়েছিল তেলকুপীর এই প্রত্নসাক্ষ্য যতটা পারা যায় ততটা অন্তত উদ্ধার করা এবং তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা তিনি আমার অন্যতম প্রাক্তন-ছাত্রী, ডক্টর শ্রীমতী দেবলা মিত্র, যিনি বর্তমানে

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের এডিশন্যাল ডিরেক্টার-জেনারেল। প্রাচীন দলিলপত্র ঘেঁটে, একাধিকবার মজ্জমান তেলকুপী পরিদর্শন করে তেলকুপীর প্রত্নসাক্ষ্য সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য প্রভূত পরিশ্রমে তিনি তা উদ্ধার করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ Telkupi—a submerged temple site in West Bengal (Memoirs of the Archaeolesgical Survey of India, no. 76) থেকে আহরণ করে তেলকুপীর তদানীন্তন ধর্ম ও স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে দু'চার কথা এখানে সংযোজন করছি, ইতিহাস নির্মাণের পথে কত বাধা বিঘ্ন তার একটু আভাস দেবার জন্য।

প্রাচীন তৈলকম্পী যে একটি সমৃদ্ধ মন্দির-নগরী ছিল, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্দির-গুলির ধ্বংসাবশেষ থেকেই তা অনুমান করা যায়। তা ছাড়া ১৯৫৬-৫৭ সালে দামোদরের জলের নীচে একেবারে তলিয়ে যাবার আগেও যে এই নগরী ও তার উপকণ্ঠে অন্তত ২৫।২৬টি মন্দির ধ্বংসের নানা অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল তা শ্রীমতী দেবলা মিত্রের আহৃত প্রত্নসাক্ষ্য থেকেই জানা যায়। এই মন্দির-নগরীর কেন্দ্র ছিল যাকে সেদিন পর্যন্তও লোকেরা জানতো ভৈরবথান বা ভৈরবস্থান বলে; এই ভৈরবথানেই ছিল অন্তত ১৩টি মন্দির। ছোট ছোট আরও কত মন্দির যে ছিল তার তো কোনো হিসেবই নেই। তা ছাড়া, ইতস্তত দাঁড়িয়েছিল আর ও ১৩টি। যে-কোনো দেবস্থানই সাধারণ লোকের কাছে পরিচিত ছিল 'থান' বা স্থান বলে; এই নগরীতে এমন 'থান' ছিল অনেক, যেমন, নিরনীথান, দুর্গাথান, চরকথান, শিবথান, কালীথান, জামকুকড়া থান ইত্যাদি।

তৈলকম্পী এই অঞ্চলে প্রধানত স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্যতম কেন্দ্র ছিল; মন্দিরগুলিতে যে-সব দেবদেবীদের পূজার্চনা হতো প্রত্নসাক্ষ্য থেকে জানা যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন উমা-মহেশ্বর, বিষ্ণু, নরসিংহাবতার, মহিষমর্দিনী দুর্গা, মাতৃকাদেবী, লিঙ্গ-রূপী শিব, অন্ধকাসুরবধ-রত শিব, লকুলীশ শিব, সূর্য, গণেশ ইত্যাদি। সংখ্যা থেকে অনুমান হয়, শৈব ধর্মেরই প্রাধান্য ছিল বেশি। অন্তত একটি জৈন মন্দিরও বোধ হয় ছিল; একটি মন্দিরের জগমোহন অংশে জৈন নেমিনাথের শাসন-দেবী অম্বিকার একটি বৃহদাকৃতি প্রতিমা পাওয়া গেছে।

স্থাপত্যশিল্পের দিক থেকে তেলকুপীর মন্দিরগুলিকে উত্তর-ভারতীয় রেখবর্গীয় মন্দিরের আঞ্চলিক একটি রূপ বললে ভুল কিছু বলা হয় না। স্থানীয় বেলে পাথরে তৈরী এই মন্দিরগুলি সবই আয়তনে ছোট, দৈর্ঘ্য ও পরিসরে আপেক্ষিকভাবে ক্ষুদ্রাকৃতি। পুরুলিয়ার অন্যত্র রেখবর্গীয় সে-সব মন্দির ধ্বংসের বিভিন্ন দশায় আজও দাঁড়িয়ে আছে (চিত্র-সংগ্রহে এমন ২।৩টি মন্দিরের ছবি প্রকাশিত হয়েছে), এ-মন্দির-গুলি তাদেরই সমগোত্রীয়, আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতেও। এই ধরনের মন্দির শুধু

পুরুলিয়াতেই নয়, বাঁকুড়া ও বর্ধমানেও আছে, ওড়িশাতেও আছে। পঞ্চদশ শতকীয় (১৪৬১ খ্রীষ্ট শতক) বরাকরের মন্দির তিনটিও একই পরিবারভুক্ত বলা যেতে পারে। তেলকুপীর কোনো মন্দিরেই কোনো লিপিসাক্ষ্য নেই ; সুতরাং মন্দিরগুলির নির্মাণ কাল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ভাবে কিছু বলবার উপয়ে নেই। তবে স্থাপত্য রীতি থেকে মনে হয়, এ-অঞ্চলে এই রেখবর্গীয় মন্দির-নির্মাণ শুরু হয়েছিল নবম-দশম শতকে এবং একটানা অন্তত ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত চলেছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইতিহাসের ইঙ্গিত

ইতিপূর্বে ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে কোনো সংশোধন বা সংযোজনার প্রয়োজন বোধ করিনি।

এই অধ্যায়েও সংশোধন বা সংযোজনার কোনো প্রয়োজন বোধ করছিনে। প্রুফ পড়তে গিয়ে মনে হলো, এ-অধ্যায় আবার নূতন করে লিখতে হলেও আমার বক্তব্যের বিশেষ অদল বদল কিছু হতো না, তবে নিশ্চয়ই তা বলতাম অন্যতর ভাষায়, অন্যতর ভঙ্গিতে।

পরিশিষ্ট "খ"

লেখমালা-পঞ্জী

(পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত)